হারলান কোবেন

গন ফর গুড

অনুবাদ : সালমান হক





গন ফর গুড

মূল | অনুবাদ
হারলান কোবেন | সালমান হক

প্রথম প্রকাশ
জুলাই, ২০২০
দ্বিতীয় মুদ্রণ
ডিসেম্বর, ২০২০

প্রকাশক
এ. কে. এম. মাফিউল কাদির আদন
চিরকুট প্রকাশনী
২/৩ প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ
সজল চৌধুরী

মূল্য
চারশত টাকা মাত্র

Gone for Good by Harlan Coben
Translated by Salman Haque
Published by Chirkut Prokashoni
Price TK. 400.00 only

এক

ভাইয়া এখনও বেঁচে আছে–মারা যাবার তিন দিন আগে আমাকে বলে যায় মা। এটা অবশ্য তার শেষ কথা ছিল না, তবে এর পরে খুব বেশি আর মুখ খোলেনি।

একবার মাত্র কথাটা উচ্চারণ করে এ সম্পর্কে মুখে কুলুপ আঁটে সে। শরীরের অবস্থা তখন ভীষণ খারাপ। যমে মানুষে টানাটানি যাকে বলে। মরফিন দিয়েও লাভ হচ্ছিল না। গায়ের রঙ জন্ডিসের রোগীদের মতো হলদেটে। চোখ বসে গেছে কোটরে। দিনের বেশির ভাগ সময়ই ঘুমিয়ে কাটছিল।

কথাটা বলার পরে আর মাত্র একবারের জন্যে খানিকটা হুঁশ ফেরে বেচারির। সেই সময়টুকু অতিবাহিত হয় মা হিসেবে কতটা ভালো ছিল সে, তাকে কতটা ভালোবাসি–এসব বিদায়ী কথাবার্তা জানাতে।

ভাইয়ার ব্যাপারে কখনো কথা বলতাম না আমরা। তবে তার উপস্থিতি অনুভব করতাম প্রতি মুহূর্তে। এমনকি তখনও মনে হচ্ছিল যে আমাদের পাশেই বসে আছে সে।

"বেঁচে আছে ও।"

ঠিক এই কথাটাই বলে মা। কথাটা যদি আসলেও সত্য হয়, তাহলে সেটা ভালো হবে নাকি খারাপ সেটা বলা আমার পক্ষে কঠিন।

চারদিন পর তাকে কবরে শুইয়ে আসি।

শিভাহ[১]'র উদ্দেশ্যে সবাই বাসায় ফেরার পর হনহন করে লিভিংরুমে প্রবেশ করে বাবা। রাগে রক্তিম হয়ে উঠেছে মুখটা। পাশেই বসে ছিলাম আমি। আমার বোন, মেলিসা আর ওর স্বামী রালফ সিয়াটল থেকে চলে

---

[১] আনুষ্ঠানিক শোকপ্রকাশের অনুষ্ঠান

এসেছে। সেলমা খালা আর মারে খালু পায়চারি করছে ঘরের ভেতরে। শিলা, আমার প্রেমিকা–পাশেই বসে আছে আমার হাত ধরে।

এ কজনই ছিলাম আমরা।

ফুল দিয়ে বড় একটা বেদি সাজানো হয়েছে। কার্ডটা দেখার পর হাসিমুখে আমার হাতে আস্তে করে একবার চাপ দিল শিলা। কোন বার্তা লেখা নেই সেখানে–শুধু একটা ড্রয়িং।

কিছুক্ষণ পরপর জানালা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছে বাবা। গত এগারো বছরে দুবার ডাবল বি পিস্তলের গুলিতে ভেঙে গেছে এই জানালার কাঁচ। "*কুত্তার দল,*" বিড়বিড় করে বলে চোখ বুজে অন্যদিকে মুখ ফেরালো। এই রাগের সাথে প্রিয়জন হারানোর বেদনা যোগ হয়ে তার অনুভূতিটা যে এখন কেমন তা কল্পনা করতেও কষ্ট হচ্ছে।

আরেকটা বিশ্বাসঘাতকতা। বিগত কয়েক বছরে সবচেয়ে পরিচিত ব্যাপারগুলোর একটা।

দমবন্ধ লাগছে।

"হেঁটে আসছি একটু বাইরে থেকে," বলে উঠে দাঁড়ালাম। উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে শিলা।

"আসবো সাথে?"

"থাক।"

জবাবে মাথা নাড়লো শিলা। প্রায় এক বছর ধরে একসাথে আছি আমরা। আমার অদ্ভুত আচরণের সাথে এর আগে কেউ এভাবে মানিয়ে নিতে পারেনি। আবারো সহমর্মি ভঙ্গিতে আমার হাতে আলতো চাপ দিল সে। উষ্ণতা হয়ে পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়লো একটা অনুভূতি।

আমাদের বাসার দরজার সামনে ওয়েলকাম ম্যাট হিসেবে কৃত্রিম ঘাসের একটা পাপোষ রাখা। কোনার দিকে একটা প্লাস্টিকের ডেইজি। দেখে মনে হয় যেন কোন ড্রাইভিং রেঞ্জ থেকে উঠিয়ে আনা হয়েছে। ওটা মাড়িয়ে সামনে ডাউনিং প্লেসের দিকে এগিয়ে গেলাম। রাস্তার দুপাশে ষাটের দশকে তৈরি সাধারণ দর্শন দোতলা সব বাড়ি।

ধূসর স্যুটটা এখনও আমার পরনে। গরমে গা চুলকাচ্ছে রীতিমত। উত্তাপ বিলাতে আজ কোন প্রকার কার্পণ্য করছে না সূর্যটা। *পচন ধরার জন্যে চমৎকার একটা দিন*, কেউ একজন বলে উঠলো আমার ভেতর থেকে। মায়ের হাসিমুখ দেখতে পেলাম চোখের সামনে–সেই জগতমোহিনী হাসি।

গন্তব্য কোথায় সেটা জানা থাকলেও মুখ ফুটে কখনো স্বীকার করবো না। এক অমোঘ আকর্ষণে আমার পা-জোড়া আপনা আপনিই ছুটে চলেছে সেদিকে। অনেকে হয়তো বলতে পারে এটা আমার বিকৃত মানসিকতার পরিচয়। আবার অনেকে বলবে দুঃস্মৃতির অবসান ঘটানোর জন্যে এই কাজ করছি। কিন্তু আমার মতে এগুলোর কোনটাই ঠিক নয়।

যেখানটায় সবকিছু শেষ হয়েছিল, সেই জায়গাটা একবার দেখতে চাই, ব্যস এটুকুই।

ব্যস্ত মফস্বলের গুঞ্জন কানে আসছে। বাচ্চারা সাইকেলে চেপে ঘোরাঘুরিতে ব্যস্ত। মিস্টার কিরিনো লনের ঘাস ছাঁটছেন, দশ নম্বর রাস্তায় একটা ফোর্ড ডিলারশিপ আছে তার। লেভিনদের বাড়িতে কয়েকজন মিলে দুদলে ভাগ হয়ে রাগবি খেলছে, প্রায় কাউকেই চিনলাম না। কফম্যানদের উঠোন থেকে দেখা যাচ্ছে বারবিকিউয়ের ধোঁয়া।

গ্লাসম্যানদের পুরনো বাসাটা অতিক্রম করলাম। ছয় বছর বয়সে মার্ক গ্লাসম্যান স্লাইডিং ডোরের কাঁচ ভেঙে বাইরে লাফ দিয়েছিল একবার। সুপারম্যান সেজেছিল সে। সেদিনের চিৎকার আজও কানে বাজে, রক্তে ভেসে গিয়েছিল চারপাশ। প্রায় চল্লিশটার মতো সেলাই পড়েছিল বেচারার শরীরে। সেই মার্ক এখন আইপিও–এর ব্যবসা করে কোটিপতি। আমরা গর্দভ মার্ক বলে ডাকতাম ওকে, এখন নিশ্চয়ই আর কেউ সেই নামে ডাকে না।

মারিয়ানোদের হলদে বাড়িটার অবস্থাও সুবিধার না। অ্যাঞ্জেলা মারিয়ানো ছিল আমাদের পাড়ার 'খারাপ মেয়ে'। আমার থেকে দুবছরের বড়। উঠোনে সল্পবসনে তাকে রোদ পোহাতে দেখে শরীরের ভেতর প্রথম হরোমনের নাচন টের পেয়েছিলাম। আক্ষরিক অর্থেই মুখে পানি চলে আসতো। মা-বাবার সাথে প্রতিদিন লেগেই থাকতো অ্যাঞ্জেলার, টুলশেডের আড়ালে বসে সিগারেট টানতো। দমকা দমকা ধোঁয়া বেরতো তার মুখ দিয়ে। মনে আছে, মোটর সাইকেল চালিয়ে আসতো ওর বয়ফ্রেন্ড। গত বছর ম্যাডিসন অ্যাভিনিউয়ে একবার দেখা হয়েছিল অ্যাঞ্জেলার সাথে। স্বভাবতই ধরে নিয়েছিলাম যে খুব একটা ভালো অবস্থায় নেই সে। ভুল ভেবেছিলাম, চেহারা দেখে ভীষণ হাসিখুশিই মনে হচ্ছিল সেদিন।

২৩ নম্বর ডাউনিং প্লেস হচ্ছে এরিক ফ্র্যাঙ্কেলদের বাড়ি। সেভেন্থ গ্রেডে থাকার সময় এরিকের বার মিটজভাহ অনুষ্ঠানটা হয়েছিল স্পেস-ট্রাভেল থিমে। প্ল্যানেটেরিয়ামের নকশায় সাজানো হয়েছিল চ্যাপেলের ছাদ–পরিচিত অপরিচিত সব তারকারাজি জ্বলজ্বল করছিল সেখানে। সিটিং কার্ড অনুযায়ী আমার জন্যে "টেবিল অ্যাপোলো-১৪"–তে বসার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেন্টারপিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল বড় একটা রকেট, লঞ্চিং প্যাডও ছিল ওটার। আর কর্মরত সব ওয়েটারদের পরনে ছিল স্পেস-স্যুট। আসল স্পেসস্যুটের সাথে ওগুলোর তফাৎ খুঁজে বের করা দায়। আমাদের টেবিলে সার্ভ করছিলেন "জন গ্লেন"। সিন্ডি শ্যাপিরো আর আমি অবশ্য চ্যাপেল থেকে চুপিসারে বের হয়ে গিয়েছিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা আয়েশ মিটিয়ে একে অপরকে চুমু খেয়েছি সেদিন। আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকলেও সিন্ডি ওর অভিজ্ঞতার জেরে ঘাটতিটুকু পুষিয়ে নিয়েছিল। ওর ঠোঁটের স্পর্শে একটু

পরপর চমকে উঠছিলাম। বিশ মিনিট পরেই অবশ্য আমার মনে অদ্ভুত একটা প্রশ্নের উদয় হয়েছিল–"ব্যস, এটুকুই? এরপর কী করবো?"

কাজ (!) শেষে চুপচাপ আবার আমাদের অ্যাপোলো ১৪ টেবিলে ফিরে আসি। হার্বি জেইন ব্যান্ডের *'ফ্লাই মি টু দ্য মুন'* বাজছিল তখন। কেইন, আমার ভাই, পাশে টেনে নিয়ে সব কিছু জানতে চায় বিস্তারিত। খুশিমনেই বলি আমি। মুখে দরাজ হাসি ফোটে ওর, সাব্বাসির ভঙ্গিতে পিঠে চাপড়ও দেয়। সেই রাতে আমাদের বাঙ্ক বেডে (কেইন ওপরে, আমি নিচে) শুয়ে নাইন্থ গ্রেডে পড়ুয়া এক ছেলের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জীবন দর্শন ব্যাখা করে কেইন। স্টেরিওতে ব্লু ওয়েস্টার কাল্টের "ডোন্ট ফিয়ার দ্য রিপার" বাজছিল সে রাতে। পরবর্তীতে অবশ্য বুঝতে পারি যে ওর সেদিনকার কথাগুলোর বেশিরভাগই ভুল ছিল। (মেয়েদের বুকের ওপরে একটু বেশিই জোর দিয়ে ফেলেছিল)। কিন্তু সেরাতের কথা মনে হলেই মুখে আপনাআপনি একটা হাসি ফোটে আমার।

"বেঁচে আছে..."

একবার মাথা ঝাঁকিয়ে চিন্তাটা দূর করে দিলাম। এখন আছি হোল্ডারদের আগের বাড়ির পাশে। কভিংটন টেরেস। বার্নেট হিল এলিমেন্টারি স্কুলে পড়ার সময় প্রতিদিন এই পথেই যেতাম আমি আর কেইন। চাইলে হোল্ডারদের বাড়ির ঠিক পাশ দিয়ে শর্টকাট নেয়া যায়। তবে সেটার জন্যে ওদের উঠোনের মধ্যে দিয়ে যেতে হতো। এখনও সেটা সম্ভব কিনা কে জানে। আমার মা (সবাই সানি নামে ডাকতো তাকে, বাচ্চারাও) প্রায়ই চুপি চুপি পিছু নিত আমাদের দুই ভাইয়ের। ঘাড় ফিরিয়ে দেখতাম একটা ঝোপের আড়ালে লুকোচ্ছে সে। আমাদের চোখে চোখে রাখার তার সেই অভ্যাসটার কথা মনে হলে এখনও হাসি পায়। তখন লজ্জাও লাগতো কিছুটা, কিন্তু কেইনকে কখনো বিচলিত করেনি ব্যাপারটা। কেবল কাঁধ ঝাকাতো নির্বিকার ভঙ্গিতে। এতটাই 'কুল' ছিল সে যে এসব ব্যাপার পাত্তাই দিত না। কিন্তু আমি ওরকম ছিলাম না।

ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো আবারো। এসব ঘটনা থেকে মনোযোগ ঘোরাতে হবে।

কেন যেন মনে হচ্ছে সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে। অবশ্য আমার কল্পনাও হতে পারে ব্যাপারটা। বাইসাইকেলের শব্দ, বাস্কেটবলের ড্রিবলিং, লন মোয়ারের গুঞ্জন–সবকিছু যেন থেমে যাচ্ছে আমার আগমনে। রৌদ্রজ্জ্বল এই বিকেলবেলায় ধূসর স্যুট গায়ে অদ্ভুত একটা লোক হেঁটে যাচ্ছে–এটাই হয়তো অনেকের তাকিয়ে থাকার কারণ। কিন্তু অনেকের চোখের দৃষ্টি দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে আমার আসল পরিচয়টা জানে তারা। আমি যে তাদের সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে পারি এটা বিশ্বাস করা বোধহয় তাদের পক্ষে কঠিন।

কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই ৯৭ কডিংটন টেরেস পার হয়ে এলাম। টাই আগেই ঢিলা করে নিয়েছি। হাতজোড়া পকেটে। ডান পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে ফুটপাথের কিনারায় গুঁতোচ্ছি কিছুক্ষণ ধরে। *এখানে কেন এসেছি আমি?* একটা পর্দা সরে যেতে দেখলাম। মিসেস মিলারের চেহারা ভেসে উঠলো সেখানে। কড়া দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি কিছুক্ষণ। এরপর আমাকে অবাক করে দিয়ে কোমল হয়ে এলো সেই দৃষ্টির ঝাঁঝ। একটা সাধারণ বেদনার সুতোয় যুক্ত আমরা দুজনই। তার উদ্দেশ্যে মাথা নাড়লাম, চোখের কোনায় পানির উপস্থিতি টের পাচ্ছি।

আপনারা হয়তো টোয়েন্টি-টোয়েন্টি বা প্রাইম-টাইম লাইভে খবরটা দেখেছেন। অন্যান্য লেট নাইট শো-গুলোতেও কম আলোচনা হয়নি। যারা জানেন না তাদের জন্যে বলছি–আজ থেকে এগারো বছর আগে অক্টোবর মাসের ১৭ তারিখে আমার ভাই কেইন ক্রেইন ধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে খুন করে আমাদের প্রতিবেশী জুলি মিলারকে। ঘটনাস্থল ৯৭ কডিংটন টেরেস, লিভিংস্টোন, নিউজার্সি। সেই সময় কেইনের বয়স ছিল ২৪ বছর। জুলিকে তার নিজের বাসার বেইজমেন্টে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত প্রমাণাদি থেকে এটা অবশ্য নিশ্চিত হওয়া যায়নি যে তাকে সেখানেই খুন করা হয়েছে নাকি খুন করার পর সেখানকার সাদাকালো স্ট্রাইপড কাউচটার ওপরে লাশ ফেলে যাওয়া হয়েছে। বেশিরভাগ মানুষই প্রথম সম্ভাবনাটার পক্ষপাতী। গ্রেফতারের আগেই পালিয়ে যায় আমার ভাই, আনুষ্ঠানিক বক্তব্য এটাই বলে।

গত এগারো বছর ধরে পলাতক কেইন। মাঝে সাঝে গুজব শোনা যায় যে তাকে 'অমুক' অঞ্চলে দেখা গেছে।

প্রথমবার খবর আসে ঘটনার এক বছর পর। উত্তর সুইডেনের এক জেলেপল্লীতে নাকি আস্তানা গেড়েছে সে। ঝাঁপিয়ে পড়ে ইন্টারপোল। কিন্তু তাদের নাকের ডগা দিয়ে উধাও হয়ে যায় আমার ভাই। বোধহয় কেউ আগেই জানিয়ে দিয়েছিল। সেই 'কেউ'-টা যে কে হতে পারে সেব্যাপারে কোন ধারণা নেই।

এর চার বছর পর শোনা যায় বার্সেলোনায় আছে সে। কেইন নাকি সেখানে 'বিলাসবহুল সৈকতমুখী হাসিয়েন্দা' ভাড়া করে আরামসে দিন কাটাচ্ছে। নিপুণ ফিগারের অধিকারিণী, কৃষ্ণকেশী এক নর্তকীকে তার বাহুডোরে দেখা যায় প্রায়ই। খবরের কাগজে ঠিক এভাবেই বর্ণিত হয়েছিল ঘটনাটা। লিভিংস্টোন থেকে ছুটি কাটাতে যাওয়া এক মার্কিন নাগরিক সঙ্গীনির সাথে সৈকতে নৈশ ভোজরত অবস্থায় দেখতে পায় তাকে। কেইনের ব্যাপারে বলা হয়–পেটানো স্বাস্থ্যের অধিকারী, রোদে পোড়া তামাটে গায়ের রঙ। পরনে বুকের বোতাম খোলা সাদা শার্ট আর পায়ে মোজা ছাড়া লোফার। লিভিংস্টোনের সেই বাসিন্দার নাম রিক হরোয়িটজ। ফোর্থ গ্রেডে মিস্টার

হান্টের ক্লাসে আমার সহপাঠী ছিল সে। বিরতির সময় জ্যান্ত শুঁয়োপোকা খেয়ে আমাদের দেখাতো রিক।

বার্সেলোনা থেকেও পালিয়ে যায় কেইন।

শেষবার খবর আসে আমার ভাইয়ের নতুন আস্তানা ফ্রান্সের আল্পস পর্বত (খুনের ঘটনার আগে ওকে কখনো স্কি করতে দেখিনি)। অবশ্য ফোর্টি এইট আওয়ার্স অনুষ্ঠানে একটা প্রতিবেদন বাদে এ ব্যাপারে খুব একটা মাতামাতি হয়নি। বিগত বছরগুলোতে. কেইন রূপ নিয়েছে রীতিমত এক কিংবদন্তীতে। ভিএইচওয়ানে সম্প্রচার করার মতো অনুষ্ঠানের ঘাটতি পড়লে যেমন তারা "হোয়্যার আর দে নাও" অনুষ্ঠানের দ্বারপ্রান্ত হয়, অনেকটাই সেরকম তার ব্যাপারটা।

টেলিভিশনের "টিম কভারেজ" বা "মফস্বলে গন্ডগোল" জাতীয় অনুষ্ঠান আমার কখনোই ভালোলাগে না। এ জাতীয় অনুষ্ঠানের 'বিশেষ প্রতিবেদনে' (বিশেষ প্রতিবেদন ছাড়া কখনো কি সাধারণ প্রতিবেদন প্রচার করে না তারা?) সবসময় কেইনের একটা ছবিই দেখানো হয়। টেনিস খেলার কাপড় পরনে ছবিটায় চমৎকার দেখায় তাকে (একসময় টেনিসের জাতীয় র‍্যাঙ্কিংয়েও বেশ ওপরের দিকে উঠে এসেছিল কেইন)। অপরাধীদের সুন্দর চেহারা দেখে মানুষ অভ্যস্ত নয়। তাই ছবিটা দেখামাত্র নিশ্চয়ই ঘৃণায় ভরে ওঠে সবার মন। ছবিটায় হাস্যোজ্জ্বল কেইনকে দেখে মনে হতে পারে তার জন্ম হয়েছে সোনার চামচ মুখে দিয়ে (মোটেও সত্য নয়)।

একটা ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে আমিও অংশ নিয়েছিলাম। নির্মাতা আমার সাথে যোগাযোগ করেছিল বেশ আগেভাগে। তার বক্তব্য অনুযায়ী ভিক্টিম এবং দোষী–দুই পরিবারের বাস্তব ছবি ফুটিয়ে তুলতে চায়। জনতার আদালতে যে আমার ভাইয়ের ভাবমূর্তি ভালো নয় সেকথা কয়েকবার করে আমাকে মনে করিয়ে দেয় সে। তাই কেইনের '*আসল ব্যক্তিত্ব*' সম্পর্কে বর্ণনার জন্যে তার পরিবারের খুব কাছের কাউকে দরকার।

বলা বাহুল্য, ফাঁদটায় পা দিয়েছিলাম।

সোনালি চুলের চোখ ধাঁধানো সুন্দরী এক উপস্থাপিকা এক ঘণ্টা ধরে আমার সাক্ষাৎকার নিয়েছিল। সত্যি কথা বলতে গোটা ব্যাপারটা তখন উপভোগই করেছিলাম। তার কণ্ঠেও সমবেদনার কোন অভাব ছিল না। আমার জন্যে পাথেয় হিসেবে কাজ করেছিল সেটাই। সাক্ষাৎকার শেষে হাসিমুখে আমাকে স্টুডিওর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয় সে। পরবর্তীতে অনুষ্ঠানটা যখন প্রচারিত হয় তখন সেখানে আমার কেবল একটা লাইন শুনতে পেয়েছিলাম–'কেইনকে সাধু বলবো না আমি, জুলিয়া"। এমনকি উপস্থাপিকার প্রশ্নটা পর্যন্ত কেটে দেয়া হয়েছিল (জুড়ে দেয়া হয়েছিল নাটকীয় সব ক্লাইম্যাক্স মিউজিক)।

যাইহোক, এ বিষয়ে আর কিছু না বলি।

আমার না এসব কখনোই বিশ্বাস হয়নি। এমনটা নয় যে কখনো ভাবিনি। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি মারা গেছে কেইন। এগারো বছর আগে।

এমনকি আমার মা-ও বিশ্বাস করতো যে কেইন মৃত। মন থেকেই বিশ্বাস করতো। কথাটা স্বীকার করতে অবশ্যই কষ্ট হতো তার। আর সেইসাথে এটাও বিশ্বাস করতো যে তার ছেলে নির্দোষ। বরং গোটা ঘটনায় সে-ই ভিক্টিম।

"বেঁচে আছে ও...নির্দোষ।"

মিলারদের বাসার সদর দরজা খুলে গেল এসময়। বাইরে বেরিয়ে এলেন মিস্টার মিলার। নাকের ওপর চশমাটা ঠিক করে কোমরে হাত দিয়ে সুপারম্যানের ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকালেন।

"ভাগো এখান থেকে, উইল।"

সেটাই করলাম।

এর থেকেও বড় একটা ঘটনা ঘটলো এক ঘণ্টা পর।

শিলা আর আমি তখন বাবা-মায়ের বেডরুমে। জ্ঞান হবার পর থেকে আজ অবধি এখানে একই আসবাব দেখে আসছি। বিশাল বিছানাটায় বসে আছি দুজনে। সাদা চাদরের ওপরে মায়ের সবচেয়ে ব্যক্তিগত জিনিসগুলো ছড়িয়ে রাখা। নাইটস্ট্যান্ডের ড্রয়ারটায় গাদাগাদি করে থাকতো এগুলো। বাবা এখনও নিচে জানালার পাশে বসে আছে। চোখে শূন্য দৃষ্টি।

মায়ের এই স্মৃতিচিহ্নগুলো হঠাৎ নাড়াচাড়া করার শখ হলো কেন, তা বলতে পারবো না। ব্যাপারটা যে যথেষ্ঠ কষ্টদায়ক হতে চলেছে আমার জন্যে, সেটাও জানতাম। ইচ্ছেকৃতভাবে বেদনাদায়ক কাজে হাত দেয়া এবং এসবের মাঝে স্বান্তনা খোঁজার অদ্ভুত একটা সম্পর্ক আছে। অনেকটা আগুন নিয়ে খেলার মতো। সেটাই করছিলাম বোধহয়।

শিলার সুন্দর চেহারাটার দিকে তাকালাম একবার। ঘাড় একদিকে কাত করে মনোযোগ দিয়ে জিনিসগুলো দেখছে সে। হয়তো অদ্ভুত শোনাবে, কিন্তু ওর দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকতে পারি আমি। অনেকের কাছেই হয়তো ওকে সেরকম অর্থে "সুন্দরী" লাগবে না (চেহারার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্যে), কিন্তু ওর যে এই সহজাত কমনীয়তা, যেন ছোঁয়া দিলেই ভেঙে পড়বে এরকম ব্যক্তিত্ব–সেটাই সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে আমাকে। জগত সংসার বড্ড তুচ্ছ মনে হয় ওকে দেখলে। ইচ্ছে করে ওর জন্যে বুক চিতিয়ে সব বিপদের সামনে দাঁড়াতে। হ্যাঁ, এতটাই অমোঘ আকর্ষণ।

"অনেক হয়েছে, এবার এদিকে তাকাও," মৃদু হেসে এসময় বলে শিলা।

"ওরকম কিছু করছি না।"

অবশেষে মুখ তুলে আমার চোখে চোখ রাখলো সে। "কী?" জিজ্ঞেস করলো পরমুহূর্তে।

"আমার জীবন তুমি," কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম।

"তুমিও কম সুন্দর না।"

"হ্যাঁ, এটা অবশ্য ঠিক বলেছো।"

"তোমাকে কেন যে এত বেশি ভালোবাসি..."

"আমাকে না ভালোবেসে যাবে কই, শুনি?"

একবার ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে চোখ নাচালো শিলা। বিছানার যে পাশটায় মা ঘুমোতো সেদিকটায় দৃষ্টি যেতেই স্থির হয়ে গেল একদম।

"কী ভাবছো?" জিজ্ঞেস করলাম।

"তোমার মাকে নিয়ে," হেসে বললো শিলা। "তাকে খুবই পছন্দ করতাম আমি।"

"তাকে যদি আরো আগে থেকে চিনতে..."

"আসলেই।"

মায়ের এতদিনের জমানো কাগজপত্রগুলো হাতে তুলে নিলাম আবারো। আমার, মেলিসা আর কেইনের জন্মসনদ। কেইনের টেনিস খেলা সংক্রান্ত প্রকাশিত খবরের লেমিনেটিং করা কাট-আউট। ওর সবগুলো ট্রফিই এখনও রাখা আছে পুরনো ঘরটাতে। আমাদের ছোটবেলার অনেকগুলো ছবি চোখে পড়লো। এছাড়াও খুনের ঘটনার আগ অবধি কেইনের নানা বয়সী ছবি। সানি...ছোটবেলা থেকেই মাকে এই নামে ডাকে সবাই। যথার্থ একটা ডাকনাম। পিটিএ প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সময়ের তার একটা ছবি দেখলাম। স্টেজে কী যেন বলতে ব্যস্ত সে, আশপাশে ঘিরে থাকা অন্যান্য অভিভাবকেরা হাসিমুখে শুনছে তার কথা। স্কুলের মেলায় দৌড়রত অবস্থার একটা ছবি খুঁজে পেল শিলা। সেখানে পরনে জোকারের পোশাক তার। আমার বন্ধুমহলেও 'সানি' নামটা বেশ জনপ্রিয় ছিল। সবসময় আমাদের বাসাতেই ক্লাস পিকনিক হতো। নতুন নতুন চমক দিয়ে সবার মন জয় করে নিত মা। এটাই ছিল তার জনপ্রিয়তার মূল কারণ। উদ্দীপনার একটা আলোকচ্ছটা সবসময় ঘিরে থাকতো তাকে।

প্রায় দুঘণ্টা ধরে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করলাম আমরা। শিলা সময় নিয়ে প্রত্যেকটা ছবি দেখলো। "এটা কে?" হঠাৎ একটা ছবি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো ও।

ছবিটা আমার হাতে তুলে দিল। সত্তর দশকের এই ছবিটায় মাকে অদ্ভুত একটা হলুদ বিকিনি পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেলাম। শরীরের বাকগুলো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। খাটো একটা লোককে এক হাতে জড়িয়ে ধরে আছে সে। নাকের নিচে বিশাল এক গোঁফ লোকটার।

"রাজা হোসেন," বললাম আমি।

"কিহ?"

মাথা নাড়লাম।

"মানে জর্ডানের রাজার কথা বলছো?"

"হ্যাঁ, মিয়ামির সৈকতে তার সাথে দেখা হয়েছিল মা-বাবার।"

"আর?"

"মা অনুরোধ করেছিল একটা ছবি তোলার।"

"যাহ, মজা করছো নিশ্চয়ই।"

"প্রমাণ তো তোমার চোখের সামনেই আছে।"

"ওনার দেহরক্ষীদের তো দেখছি না।"

"মায়ের সাথে ছবি তোলার সময় কোন দরকার ছিল না হয়তো।"

হাসলো শিলা। ঘটনাটা সম্পর্কে মা বিস্তারিত বলেছিল আমাকে। বাবার ক্যামেরা নাকি ঠিকমতো কাজ করছিল না সেদিন। বারবার ঝাঁকি মেরে ঠিক করার চেষ্টা চালাচ্ছিল। এদিকে অধৈর্য ভঙ্গিতে তাকে বারবার চোখ রাঙ্গানি দিয়েই চলেছে মা। পুরোটা সময় ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে ছিলেন রাজা। অবশেষে তার প্রধান দেহরক্ষী এগিয়ে এসে ক্যামেরা হাতে নিয়ে সেটা ঠিক করে বাবাকে দেয়।

আমার মা, সানি।

"চমৎকার একজন মানুষ ছিলেন," শিলা বললো স্মৃতিকাতর কণ্ঠে।

মিলার মেয়েটার লাশ পাওয়া যাওয়ার পর মায়ের চাঞ্চল্য যে অনেকটাই কমে গিয়েছিল সেটা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না! আগুনে যেন পানি ঢেলে দিয়েছিল কেউ। খুনের ঘটনাটার ব্যাপারে শোনার পর একবারের জন্যেও হাত ছুড়োছুড়ি করে বা চিৎকার করে কাঁদতে শুনিনি তাকে। মাঝে মাঝে মনে হতো যে কাঁদলেই বরং ভাল হতো। সদা হাস্যোজ্জ্বল এবং প্রাণোদনায় ভরপুর এরকম একটা মানুষের এভাবে চুপ হয়ে যাওয়াটা মেনে নেয়া কষ্টকর। একদম নিরামিষ হয়ে যায় এরপর তার জীবন।

ডোরবেল বেজে উঠলো এসময়। বেডরুমের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখি এইপস-এসেন থেকে খাবার নিয়ে এসেছে। বাবা প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশিই অর্ডার দিয়ে ফেলেছিল। আরো লোক সমাগমের আশা করেছিল নিশ্চয়ই। বাসায় বাবার উপস্থিতি অনেকটাই টাইটানিক জাহাজের ক্যাপ্টেনের মতো। প্রথমবার যখন গুলি করে জানালার কাঁচ ভেঙে ফেলা হয়েছিল, প্রতিবাদের মুঠো পাকিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল সে। এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাওয়ার কথাও বলেছিল মা। কিন্তু বাবা হাত নেড়ে উড়িয়ে দেয় প্রস্তাবটা। তার মতে এখান থেকে চলে যাবার অর্থ হচ্ছে পরাজয় স্বীকার করা; নিজের ছেলের দোষ স্বীকার করে নেয়া। এখান থেকে চলে যাবার অর্থ–কেইনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা।

বোকা।

আমার দিকে তাকিয়ে আছে শিলা। ওর উষ্ণ দৃষ্টিতে উত্তাপ খোঁজার চেষ্টা করলাম কিছুক্ষণ। এক বছর আগে কাজের খাতিরে পরিচয় হয় আমাদের। নিউ ইয়র্ক শহরের ফোর্টি ফার্স্ট স্ট্রিটে অবস্থিত কোভেনান্ট হাউজের সিনিয়র

ডিরেক্টর আমি। একটা দাতব্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমাদের কাজ হচ্ছে বাড়ি থেকে পালানো কিশোর-কিশোরীদের সহযোগিতার ব্যবস্থা করা। সেখানেই ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করতে এসেছিল ও। পৈতৃক নিবাস আইডাহোর ছোট একটা শহরে। অবশ্য ওর মধ্যে ঠিক 'ছোট শহরের মেয়ে' ব্যাপারটা ছিল না। অনেক দিন আগেই বাসা ছেড়ে পালিয়েছে। ওর অতীত সম্পর্কে এটুকুই জানি কেবল।

"অনেক বেশি ভালোবাসি তোমাকে।"

"না ভালোবেসে যাবে কোথায়?" আমার কথাই আমাকে ফিরিয়ে দেয় সে।

জবাবে একটা হাসি ফোটে আমার মুখে। মায়ের জীবনের শেষ দিনগুলোতে তার খেয়াল রাখতো শিলা। কমিউনিটি বাসে পোর্ট অথোরিটি থেকে নর্থফিল্ড অ্যাভিনিউ অবধি এসে বাকি পথটা হেঁটেই পাড়ি দিত। ওখান থেকে সেইন্ট বার্নাবাস মেডিক্যাল সেন্টার খুব একটা দূরে না। শেষবার এই হাসপাতালে আমাকে জন্ম দেয়ার সময় পা রেখেছিল মা। পুরো ব্যাপারটার মধ্যে খুঁজলে হয়তো জীবনচক্র সংক্রান্ত ব্যাপার-স্যাপার পাওয়া যাবে, কিন্তু আমার মাথায় কখনো এসব খেলা করেনি।

মায়ের সাথে শিলা কেমন ব্যবহার করতো তা অবশ্য বেশ ভালো করেই খেয়াল করেছিলাম। সেজন্যেই ঝুঁকিটা নিলাম।

"তোমার বাবা-মায়ের বাসায় ফোন করবে নাকি?" নরম সুরে বললাম।

যেন সজোরে গালে চড় বসিয়েছি এমন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো শিলা। নেমে দাঁড়ালো বিছানা থেকে।

"শিলা?"

"এখন এসব নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না, উইল।"

বাবা-মায়ের একটা বাঁধাই করা ছবি হাতে নিয়ে বললাম, "কখনোই এ ব্যাপারে কিছু বলতে চাও না।"

"আমার বাবা-মা সম্পর্কে কিছুই জানো না তুমি।"

"জানতেই তো চাই," বললাম।

"ঘর পালানো ছেলেমেয়েদের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তোমার," অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে বললো শিলা।

"তো?"

"পরিস্থিতি কতটা খারাপ হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা আছে নিশ্চয়ই।"

আসলেও আছে। ওর চেহারার বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আবারো ভাবলাম। নাকটা একটু বেশিই বাঁকা মনে হয় মাঝে মাঝে, এর পেছনে কি বিশেষ কোন কারণ আছে? "এটাও জানি যে তুমি যদি এসব ব্যাপারে কথা না বলো তাহলে সেটা তোমার জন্যে আরো বেশি খারাপ।"

"বলেছি তো কথা, উইল।"

"আমার সাথে বলোনি।"

"তুমি আমার থেরাপিস্ট না।"

"আমাকে ভালোবাসো তুমি?"

"হ্যাঁ," বলে আমার দিকে তাকালো ও। "কিন্তু এখন এসব বিষয়ে কথা বলতে চাইছি না। জোর কোরো না, প্লিজ।"

এর জবাবে বলার মতো কিছু খুঁজে পেলাম না। হয়তো ঠিকই বলছে ও। ছবির ফ্রেমটায় আবারো হাত বুলাতে শুরু করলাম। আর ঠিক তখনই ঘটলো ঘটনাটা।

সামান্য নড়ে গেল ভেতরের ছবিটা।

পেছনে আরেকটা ছবি দেখা যাচ্ছে। ওপরের ছবিটা একটু সরিয়ে দিলাম একপাশে। পেছনে একটা হাত দেখা যাচ্ছে এখন। আরো সরানোর চেষ্টা করেও লাভ হলো না, আটকে যাচ্ছে। দ্রুত ফ্রেমের পেছনের ক্লিপে হাত চলে গেল আমার। সেটা একদিকে সরিয়ে দিতেই ফ্রেমের পেছনের অংশটা বিছানায় পড়লো। সাথে দুটো ছবি।

বাইরে থেকে যে ছবিটা দেখা যায়, সেটায় মা-বাবা হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় যেন ছুটি কাটাতে গিয়েছিল। চেহারায় একদম নির্ভার এক অভিব্যক্তি। কিন্তু আমার চোখ আটকে গিয়েছে দ্বিতীয় ছবিটায়।

ওটার নিচের দিকে টাইম স্ট্যাম্প বলে দিচ্ছে যে ছবিটা মাত্র দুই বছর আগের। একটা পাহাড় চূড়ায় তোলা হয়েছে ওটা। পেছনে কোন বাড়ি চোখে পড়লো না, কেবল তুষারাবৃত পর্বতমালা। দেখে মনে হচ্ছে *দ্য সাউন্ড অভ মিউজিক* ছবিটার শুরুর কোন দৃশ্য। ব্যাকপ্যাক কাঁধে শর্টস পরে ছবিতে দাঁড়িয়ে আছে একজন। চোখে সানগ্লাস, পায়ে হাইকিং বুট। হাসিটা আমার খুবই পরিচিত, চেহারাটাও। যদি সে চেহারায় বলিরেখার ছাপ ফুটতে শুরু করেছে এখন। চুল আগের চেয়ে লম্বা। দাড়িতে ধূসর ছাপ। কিন্তু তাকে চিনতে কোন অসুবিধে হলো না আমার।

ছবির ব্যক্তিটি হচ্ছে আমার ভাই। কেইন।

দুই

পেছনের ঝুলবারান্দায় একা বসে আছে বাবা। অন্ধকার ঘনিয়েছে বেশ কিছুক্ষণ হলো। সেই আঁধার পানেই দৃষ্টি। তার পেছনে গিয়ে দাঁড়ানোর সাথে সাথে পুরনো একটা স্মৃতি এসে নাড়া দিয়ে গেল আমাকে।

জুলির খুন হবার চার মাস পরে আমাদের বেইজমেন্টে বাবাকে এভাবেই আমার দিকে পিঠ দিয়ে বসে থাকতে দেখেছিলাম একদিন। তার ধারণা ছিল বাসায় আর কেউ নেই। ডান হাতের তালুতে .২২ ক্যালিবারের রুগার বন্দুকটা। যেন ছোট্ট কোন পোষা প্রাণীকে আদর করছে এমন ভঙ্গিতে ওটার গায়ে হাত বুলাচ্ছিল সে। সত্যি কথা বলতে সেদিনের আগে কোন কিছুতে অতটা ভয় পাইনি। পায়ে যেন শেকড় গজিয়েছিল আমার। ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলাম। বাবার দৃষ্টি বন্দুকটার দিকে। এর কিছুক্ষণ পর আবারো সিঁড়ির ওপরে উঠে গিয়ে এমন ভাব করি যেন ঠিক সেই মুহূর্তেই প্রবেশ করেছি সেখানে। শব্দ করে নিচে নেমে আসতে আসতে বাবার হাত থেকে বন্দুকটা উধাও হয়ে যায়।

এরপরের এক সপ্তাহ তার সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম পুরোটা সময়।

কাঁচের স্লাইডিং দরজাটা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এসে ডাকলাম বাবাকে।

ঘুরে আমার দিকে তাকালো সে, মুখে দরাজ হাসি। যে কোন পরিস্থিতিতে আমার জন্যে এই হাসিটা থাকবেই তার ঠোঁটের কোণে। "উইল, বাবা," গম্ভীর কণ্ঠটা কোমল করে বললো। ছেলেমেয়েদের দেখলে সবসময় খুশি হয় বাবা। আমাদের সাথে তার সম্পর্কটা বন্ধুত্বের। আর এই বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের জন্যেই চোখ বুঁজে নির্ভর করতে ইচ্ছে করে। আপনার দিকে তাকিয়ে সে যদি কখনো হাসি দেয়, তাহলে সেই হাসিতে ভুলবেন না। তার দুনিয়া হচ্ছে তার পরিবার। এছাড়া অন্য কারো সেরকম কোন গুরুত্ব নেই। অচেনা কারো বা বন্ধুদের দুঃখ দুর্দশা কখনো স্পর্শ করেনি তাকে। পরিবারকে কেন্দ্র করেই তার জীবন।

বাবার পাশের লাউঞ্জ চেয়ারটায় গিয়ে বসলাম। কীভাবে কথাটা তুলবো বুঝতে পারছি না। লম্বা করে শ্বাস নিলাম কয়েকবার, শব্দ শুনে বুঝলাম যে সে-ও একই কাজ করছে। তার পাশে আসলেই নিরাপত্তার একটা বলয় যেন ঘিরে ধরে আমাকে। নিজেকে বড্ড নিরাপদ মনে হয়। লম্বায় এখন আমি তাকে ছাড়িয়ে গেছি, বাবাও বুড়িয়ে গেছে–তবুও এটা জানি যে কোন বিপদ হলে ঠিকই আমাকে রক্ষা করতে নিজের শতভাগ দিয়ে চেষ্টা করবে সে।

আর আমিও পেছনে সরে গিয়ে তাকে সেটা করতে দেবো।

"ঐ ডালটা কেটে ফেলতে হবে," অন্ধকারের দিকে নির্দেশ করে বললো সে।

"হ্যাঁ," কোন গাছ চোখে না পড়লেও বললাম।

কাঁচের দরজা ভেদ করে আবছা আলো এসে পড়ছে আমাদের ওপরে। সেই আলোতে বুঝতে পারলাম যে রাগ কমে এসেছে তার। সেই জায়গায় দখল নিয়েছে একাকীত্ব আর প্রিয়জন হারানোর বেদনা। মাঝে মাঝে মনে হয় জুলি খুন হবার পর পুরো পরিবারকে একাই আগলে রাখার চেষ্টা করেছিলেন বাবা। আর সেই চেষ্টা তার মানসিক অবস্থার ওপর বেশ ভালোরকম প্রভাব ফেলে। চেহারায় এখনও সেই বিহ্বলতা খেলা করতে দেখি। যেন আচমকা কেউ ঘুষি বসিয়ে দিয়েছে তার পেটে।

"ঠিক আছো তুমি?" জিজ্ঞেস করে বাবা। সবসময় এভাবেই কথা শুরু করে সে।

"হ্যাঁ...মানে যতটা ঠিক থাকা যায় আরকি..."

"বোকার মতো প্রশ্ন করেছি," হাত নেড়ে বলে বাবা।

আবারো স্পষ্ট হয়ে ওঠে নীরবতা। একটা সিগারেট ধরায় সে কিছুক্ষণ পরে। বাবা সাধারণত বাড়িতে ধূমপান করে না; বাচ্চাদের স্বাস্থ্য সবার আগে–এই মূলনীতিতে বিশ্বাসী। একটা লম্বা টান দিয়েই হঠাৎ আমার দিকে ফেরে সে, যেন আমি যে এখানে ছিলাম এটা মনেই ছিল না। এরপর পা দিয়ে মাড়িয়ে নিভিয়ে ফেলে সিগারেটটা।

"সমস্যা নেই কোন," বলি আমি।

"তোমার মাকে কথা দিয়েছিলাম যে কখনো বাড়িতে সিগারেট খাবো না।"

এ নিয়ে আর তর্ক করি না। হাত ভাঁজ করে কোলের ওপর রাখি। এরপর বলেই ফেলি আসল কথাটা। "মারা যাবার আগে মা একটা কথা বলে গেছে আমাকে।"

আমার দিকে ঘুরে যায় তার চোখজোড়া।

"কেইন নাকি এখনও বেঁচে আছে।"

এক মুহূর্তের জন্যে জমে যায় বাবা। একটা কাষ্ঠল হাসি ফোটে তার মুখে। "ঔষধের কারসাজি, উইল।"

"আমিও সেটাই ভেবেছিলাম," বললাম।

"কিন্তু এখন আর ভাবছো না?"

বাবার দিকে ভালো করে তাকালাম। দেখে তো মনে হচ্ছে না কিছু লুকোনোর চেষ্টা করছে। কেইন সম্পর্কে নানারকম গুজবের কখনোই কোন অভাব হয়নি। যখন খুনটা হয়, তখন তার বয়স ছিল চব্বিশ। আর মধ্যবিত্ত পরিবারের চব্বিশ বছর বয়সী কোন ছেলের কতই বা টাকা-পয়সা থাকবে। তাই স্বভাবতই এই প্রশ্নটা মনে জাগতে পারে যে কীভাবে এতদিন টিকে আছে আমার ভাই? আমার কাছে জানতে চাইলে বলতাম–টিকে থাকার কোন প্রশ্নই আসে না। কারণ এগারো বছর আগে মারা গেছে সে। কিন্তু অনেকেই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে এখনও নিয়মিত তাকে টাকা পাঠানো হয় আমাদের পরিবার থেকে।

"এতদিন পরে হঠাৎ এই কথা কেন বললো সেটাই ভাবছিলাম," কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললাম আমি।

"ঔষধের কারসাজি," আবারো বললো বাবা। "মৃত্যুশয্যায় লোকে নানারকম কথাবার্তাই বলে, উইল।"

দ্বিতীয় বাক্যটার রেশ বজায় থাকলো বেশ কিছুক্ষণ। এরপর জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার কি ধারণা কেইন বেঁচে আছে?"

"না," বলে অন্য দিকে মুখ ঘোরালো বাবা।

"মা কি তোমাকে কিছু বলেছিল?"

"তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে?"

"হ্যাঁ।"

"যা তোমাকে বলেছে, সেটাই।"

"ও বেঁচে আছে, এটা?"

"হ্যাঁ।"

"আর কিছু?"

কাঁধ ঝাঁকালো বাবা। "এটাও বলেছিল যে কেইন খুন করেনি জুলিকে। এতদিনে ফিরে আসার কথা ছিল তার, কিন্তু কী একটা কাজ করতে হবে আগে।"

"কী কাজ?"

"এগুলো প্রলাপ, উইল।"

"তুমি জিজ্ঞেস করোনি তাকে?"

"করেছিলাম তো। করবো না কেন? কিন্তু প্রলাপ বকেই চলেছিল ও। আমার কথা যেন কানেই যাচ্ছিলো না। তাই চুপ করিয়ে দেই। বলি যে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

আবারো অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল বাবা। একবার ভাবলাম তাকে কেইনের ছবিটা দেখাই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা করলাম না। কিছু করার আগে আমাকে ব্যাপারটা নিয়ে আরো ভাবতে হবে।

"বলি যে সব ঠিক হয়ে যাবে," আগের কথার পুনরাবৃত্তি করলো বাবা।

কাঁচের দরজা দিয়ে ঐ পুরনো দিনে ফটো কিউবগুলোর একটা দেখতে পাচ্ছি। পুরনো ছবিগুলো রোদের আলোতে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। বর্তমান সময়ের কোন ছবি নেই সেখানে। আমাদের বাড়িটা নির্দিষ্ট একটা সময়ের আবর্তে আটকে গেছে। এগারো বছর আগের সেই দিনটা ফিরে ফিরে আসে বারবার।

"আসছি, দাঁড়াও," বলে উঠে পড়লো বাবা।

অন্ধকারে নির্দিষ্ট একটা দূরত্বে গিয়ে দাঁড়ালো। নিশ্চয়ই ভাবছে আমি দেখতে পাচ্ছি না তাকে। খেয়াল করলাম যে কাঁধজোড়া কাঁপছে তার, মাথা নিচু করে রেখেছে। এর আগে কখনো বাবাকে কাঁদতে দেখিনি। দেখতেও চাই না। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলাম।

মা-বাবার ছুটি কাটাতে গিয়ে তোলা সেই হাসিখুশি ছবিটার কথা ভাবলাম। হয়তো বাবাও এখন সেটা নিয়েই ভাবছে।

সেই রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাবার পর খেয়াল করলাম শিলা বিছানায় নেই। উঠে বসে শব্দ শোনার চেষ্টা করলাম। চারদিক স্তব্ধ। অন্তত আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে কোন শব্দ আসছে না। নিচের রাস্তার মৃদু গুঞ্জন অবশ্য আবছাভাবে শোনা যাচ্ছে কান পাতলে। বাথরুমের দিকে তাকালাম। বাতি নেভানো। আসলে পুরো বাড়িতেই কোন বাতি জ্বলছে না।

একবার ভাবলাম জোরে ডাক দেই, কিন্তু এই শব্দহীনতা বড্ড অস্বাভাবিক ঠেকছে। আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে চাইছে যেন আমাকে। বিছানা থেকে নেমে পড়লাম। নিচের কার্পেট স্পর্শ করলো পায়ের পাতা। অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংগুলোতে সাধারণত এরকম কার্পেট থাকে যাতে নিচের তলায় শব্দ কম যায়।

খুব বেশি বড় নয় অ্যাপার্টমেন্টটা। লিভিংরুমে উঁকি দিলাম। জানালার কার্নিশে বসে নিচের রাস্তার দিকে একমনে তাকিয়ে আছে শিলা। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলাম ওর পিঠের দিকে। ওর সুন্দর কাঁধ জোড়া কাঁপছে নিঃশ্বাসের তালে তালে। চাইলে এই দৃশ্য সারাজীবন দেখতে পারবো। মৃদু বাতাসে দুলছে লম্বা কোমর অবধি ছড়ানো চুলগুলো। আবারো মোচড় দিয়ে উঠলো বুকের ভেতরে। এখনও ভালোবাসার প্রাথমিক পর্যায়ে আছি আমরা। একজন আরেকজনকে ছাড়া থাকতেই পারি না। দেখামাত্র পেটে প্রজাপতির নাচন শুরু হয়ে যায় আপনা আপনি। অল্প সময়ের মধ্যে দারুণ একটা সম্পর্কে রূপ নেবে গোটা ব্যাপারটা।

এর আগে শুধুমাত্র একবার কাউকে ভালোবেসেছিলাম, সেটা অনেক বছর আগের কথা।

"কী করছো?" জিজ্ঞেস করলাম।

খানিকটা ঘুরলো ও, সেটুকুই যথেষ্ঠ। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে কাঁদছে শিলা। তবে কোন শব্দ নেই সেই কান্নার। শুধুমাত্র দুচোখ থেকে পানি ঝরছে। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকলাম বেশ কিছুক্ষণ। কী করবো বুঝতে পারছি না।

"শিলা?"

আমাদের দ্বিতীয় ডেটে শিলা একটা কার্ডের খেলা দেখিয়েছিল। সেই খেলায় আমি পুরো তাসের ডেক থেকে দুটো কার্ড পছন্দ করে দিয়েছিলাম। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিল সে গোটা সময়। এরপর সেই ডেকের সবগুলো কার্ড মেঝেতে ফেলে দেয় শিলা। কিন্তু আমি যে দুটো কার্ড পছন্দ করেছিলাম, সেটা ঠিকই শোভা পাচ্ছিল হাতে। একটা হাসি ফোটে আমার মুখে।

সেসময় ওর আচরণে, কীভাবে বলি...বোকা বোকা একটা ভাব ছিল। কার্ডের খেলা, চেরি ফ্লেভারের কুল-এইড আর বয় ব্যান্ডের ভক্ত মেয়েটা। ও-ই আমার পরিচিত একমাত্র ব্যক্তি, যে অপেরা গাইতে পারে। একজন আদর্শ বইপোকা। আর হলমার্কের আবেগী বিজ্ঞাপনগুলো দেখে কেঁদে বুক ভাসায়। আরেকটা জিনিস খুব পছন্দ তার–নাচ। চোখ বন্ধ করে আমার কাঁধে মাথা রেখে তালের সাগরে ডুবে যায় প্রায়ই।

"আমি দুঃখিত, উইল," আমার দিকে না তাকিয়েই বলে শিলা।

"কেন?" জিজ্ঞেস করলাম।

"ঘরে যাও, আমি আসছি," রাস্তার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল।

ইচ্ছে হচ্ছিল ওখানে থেকে ওকে স্বান্তনা দেই। কিন্তু তেমনটা করলাম না। এই মুহূর্তে ওর চারপাশে যে দেয়াল তুলে রেখেছে সেটা ভেদ করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। কিছু একটা আমার থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছে ওকে। উল্টোপাল্টা কিছু বললে সেটায় এখন ক্ষতি হবে বরং। অন্তত নিজেকে এই বলেই প্রবোধ দিয়েছিলাম। ঘরে ফিরে অপেক্ষা করতে থাকি ওর জন্যে। আর সেটা ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলগুলোর একটা।

শিলা আর ফিরে আসেনি।

তিন

লাস ভেগাস, নেভাদা

বিছানায় আরামসে চিত হয়ে ঘুমোচ্ছিল মর্টি মেয়ার। কিন্তু কপালে বন্দুকের মাজলের ছোঁয়াটা চিনতে অসুবিধে হলো না কোন।

"ওঠো," অচেনা একটা কণ্ঠস্বর বলে উঠলো এসময়।

ঘুম ছুটে গেছে মর্টির। ঘরের বাতি নেভানো। মাথা ওঠানোর চেষ্টা করেও লাভ হলো না কোন, বন্দুকটা এখনও শক্ত করে চেপে ধরে রেখেছে আততায়ী। নাইট টেবিলে রাখা ঘড়িটার দিকে তাকালো সে। কিন্তু সময় জানানোর মতো কিছু নেই ওখানে। এসময় মনে পড়ে গেলো যে লিয়া মারা যাবার পর থেকেই কোন ক্লক-রেডিও নেই বাসায়। চার বেডরুমের সেই কলোনিয়ালটা বিক্রি করে দেয়ার পর অনেক কিছুর অনুপস্থিতির সাথেই মানিয়ে নিতে হয়েছে।

"এসবের কোন দরকার নেই কিন্তু," মর্টি বললো। "সেটা তোমরা ভালো করেই জানো।"

"ওঠো।"

এবারে বন্দুকটা সরিয়ে নিল আততায়ী। অন্ধকারে চোখ সয়ে এলে বুঝতে পারলো লোকটার চেহারা একটা স্কার্ফ দিয়ে ঢাকা। ছোটবেলার '*দ্য শ্যাডো*' নামের সেই রেডিও অনুষ্ঠানটার কথা মনে পড়ে গেল তার।

"তোমার সাহায্য দরকার, মর্টি।"

"আমাকে চেনেন আপনি?"

"উঠে পড়ো।"

নির্দেশ মানলো মর্টি। বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালো। মাথাটা দপদপ করছে অবশ্য। বড্ড বেশি ড্রিঙ্ক করে ফেলেছে আজকে।

"তোমার মেডিক্যাল ব্যাগটা কোথায়?" জিজ্ঞেস করলো লোকটা।

যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো মর্টির। তাহলে এই ব্যাপার। আততায়ীর শরীরে ক্ষতচিহ্ন খোঁজার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু বড্ড বেশি অন্ধকার। "আপনার দরকার?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"না, মেয়েটা নিচে।"

মেয়ে?

বিছানার নিচ থেকে চামড়ার মেডিক্যাল ব্যাগটা বের করে নিল মর্টি। বহুল ব্যবহারে জীর্ণ ব্যাগটা তার অনেকদিনের সঙ্গী। একসময় তার নামের আদ্যক্ষর সোনালি অক্ষরে শোভা পেতো ওটার গায়ে। এখন আর দেখা যায় না। চেইনও বন্ধ হয় না ঠিকভাবে। কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির মেডিক্যাল স্কুল থেকে পাশ করার পর তাকে এটা কিনে দিয়েছিল লিয়া। সেটাও প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। এর পরের তিন যুগ গ্রেট নেকে কাজ করেছে সে। লিয়ার সাথে তিন ছেলেকে বড় করেছে। এখন তার বয়স সত্তরের কোঠায়। এই বদ্ধ, স্যাঁতসেঁতে অ্যাপার্টমেন্টটায় একা একা থাকে। পরিচিত মোটামুটি সবাই টাকা পায় তার কাছে।

জুয়া–এই নেশাই কাল হয়েছে তার। অবশ্য পথটা স্বেচ্ছায়ই বেছে নেয়া, তাই আক্ষেপের খুব বেশি সুযোগ নেই। এই বদভ্যাস ত্যাগ করারও চেষ্টা করেছে, কিন্তু বেশিদিন দূরে থাকতে পারেনি। অনেকে হয়তো বলতে পারে যে লিয়া তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে এই পথে যেতে। কথাটা খানিকটা সত্যও বটে। তাও লিয়া বেঁচে থাকতে প্রায়ই নিজেকে থামানোর চেষ্টা করতো মর্টি। এখন আর কিছুতে যায় আসে না।

সবকিছু হারিয়েছে সে, নিজের মেডিক্যাল লাইসেন্সটাও। পশ্চিমের এই গর্তে এসে গা ঢাকা দিয়েছে এক পর্যায়ে। প্রতি রাতেই জুয়া খেলে। ছেলেরা সব বড় হয়ে গেছে, পরিবার পরিজন নিয়ে ব্যস্ত। কেউই যোগাযোগ করে না তার সাথে। মায়ের মৃত্যুর জন্যে তাকেই দোষারোপ করে সবাই। লিয়া নাকি মর্টির জন্যে এত তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে গেছিল। এই কথাটাও অস্বীকার করার উপায় নেই।

"তাড়াতাড়ি," লোকটা তাড়া দিল।

"হ্যাঁ, আসছি।"

বেইজমেন্টের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগলো দুজনে। বাতি জ্বালানোই আছে। তার নতুন এই বাসাটা ফিউনারেল হোম হিসেবে ব্যবহৃত হতো এক সময়। সেটারই একতলায় একটা রুম ভাড়া নিয়েছে মর্টি। ফলে বেইজমেন্ট ব্যবহারেরও সুযোগ পায়। একসময় এখানে মৃতদেহ রাখা হতো এমবামিংয়ের জন্যে।

বেইজমেন্টের পেছনের দিকে একটা মরচে ধরা লোহার স্লাইড রাখা। মৃতদেহগুলো ঐ পথেই নামানো হতো পার্কিং লট থেকে। চারপাশের দেয়ালে টাইলস বসানো। অযত্নে অবশ্য বেশিরভাগ টাইলসেরই বেহাল দশা।

কেবিনেটের দরজাগুলো উধাও। তবে মৃত্যুর গন্ধটা এখনও বাতাসে ভাসে, মাটি কামড়ে পড়ে থাকা পুরনো দিনের অতৃপ্ত আত্মার মতো।

রোগীকে একটা স্টিলের টেবিলের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে। একনজর দেখেই মর্টি বুঝে গেল যে অবস্থা সুবিধার নয়। আততায়ীর দিকে ফিরে তাকালো সে।

"সাহায্য করো ওকে," বললো লোকটা।

তার কথা বলার ধরন ভালো ঠেকলো না মর্টির কাছে। চাপা ক্ষোভ আর নগ্ন আবেগের মিশেলে অদ্ভুত শোনাচ্ছে।

"অবস্থা ভালো না," সত্যিটাই বললো মর্টি।

"ও মারা গেলে তুমিও মরবে," তার বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে বললো লোকটা।

শব্দ করে ঢোঁক গিললো মর্টি। বিপদে পড়েছে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। গত কয়েক বছরে অনেক লোককে এরকম পরিস্থিতিতে সাহায্য করেছে সে। কিন্তু এই প্রথম কোন মহিলাকে নিয়ে এসেছে কেউ। মর্টির উপার্জনের একমাত্র উপায় হচ্ছে এরকম রোগীদের সাহায্য করা। শরীরে গুলি নিয়ে কোন হাসপাতালের জরুরী বিভাগে যাবার অর্থ হচ্ছে পুলিশি ঝামেলায় জড়ানো। তাই মর্টির কাছে সেবা নিতে আসে তারা।

মেডিক্যাল স্কুলের প্রাথমিক পাঠের কথা মনে পড়ে গেলো তার। এবিসি–*এয়ারওয়ে, ব্রিদিং, সার্কুলেশন।* মহিলার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে ভীষণ।

"আপনি করেছেন তার এই অবস্থা?"

চুপ করে থাকলো লোকটা।

মর্টি প্রস্তুতি শুরু করলো। রোগীর একটু উন্নতি হলেই এখান থেকে বিদায় নেবে নিশ্চয়ই। তাই তাড়াতাড়ি কাজে লেগে পড়াই উত্তম।

ওর কাজ শেষ হলে, আলতো করে মহিলাকে তুলে নিল লোকটা। "কাউকে যদি কিছু বলো–"

"এর থেকেও বড় হুমকি পেয়ে অভ্যস্ত আমি।"

তাড়াতাড়ি মহিলাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল লোকটা। বেইজমেন্ট থেকে তখনই ওপরে উঠলো না মর্টি। ঘুম থেকে ওভাবে হঠাৎ জেগে ওঠার ফল ভোগ করছে এখন।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে অবশেষে উঠে দাঁড়ালো সে, আপাতত বিছানায় উঠে পড়াই উত্তম। কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে ওঠার আগে একটা মারাত্মক ভুল করে বসলো মর্টি।

পেছনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো।

লোকটা রোগীকে গাড়ির কাছে নিয়ে গেছে ততক্ষণে। খুব সাবধানে পেছনের সিটে শুইয়ে দিল তাকে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মর্টি। একবার মনে হলো কেউ নড়ছে পেছনের সিটে।

চোখ সরু করে দেখার চেষ্টা করলো দৃশ্যটা। সাথে সাথে কেঁপে উঠলো তার পুরো শরীর।

আরেকজন আরোহী আছে গাড়িতে, পেছনের সিটে; যার কোনভাবেই থাকার কথা না এখানে। আপনাআপনি ফোনে হাত চলে গেল মর্টির, কিন্তু রিসিভারটা তোলার আগেই থেমে গেল। কাকে ফোন দেবে? কী বলবে?

চোখ বন্ধ করে বাকি ধাপগুলো উঠে গেল সে। বিছানায় শুয়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করলো যা দেখেছে।

চার

শিলা আমার জন্যে ছোট্ট একটা চিরকুট রেখে গেছে।

সবসময় ভালোবেসে যাবো তোমাকে।

সেদিন আর ঘরে ফেরেনি ও। গোটা সন্ধ্যা নিশ্চয়ই জানালার ধারেই বসে ছিল। আমি যখন টের পাই যে ও বিছানায় নেই তখন প্রায় ভোর পাঁচটা। সময়ের ব্যাপারটায় অবাক হইনি কারণ সবসময়ই আগেভাগে উঠে পড়ে শিলা। ওকে দেখলে সামরিক বাহিনীর সেই পুরনো বিজ্ঞাপনটার কথা মনে হয় আমার। রাত ন'টা বাজার আগেই অন্যান্য সবার চেয়ে অনেক বেশি কাজ করে ফেলে সে। এরকম মানুষ আপনারাও চেনেন নিশ্চয়ই।

শিলা আমাকে একবারই বলেছিল কথাটা–ওর আগে উঠে অভ্যাস, কারণ খামারে থাকতে প্রতিদিন সকাল সকাল কাজ শুরু করতে হতো। এ ব্যাপারে আরো প্রশ্ন করেও কোন উত্তর পাইনি। অতীত সম্পর্কে সবসময়ই রাখঢাক করতো ও, তাই সবসময় সাবধানী থাকতে হতো সেব্যাপারে কথা বলার সময়।

ওর এরকম একটা কাজে তাই দুশ্চিন্তার চেয়ে বিভ্রান্তিই বেশি কাজ করছে আমার মনে।

গোসল সেরে কাপড় পাল্টে নিলাম। আমার ভাইয়ের ছবিটা ডেস্ক ড্রয়ারে রাখা আছে। ওটা বের করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম লম্বা একটা সময়। বড্ড খালি খালি লাগছে বুকের ভেতরে। মস্তিষ্কের চাকাগুলো ঘুরছে বনবন করে। একটা চিন্তাই বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে মনেঃ

অসাধ্য সাধন করেছে কেইন।

আপনারা হয়তো এটা ভেবে অবাক হতে পারেন যে কেন আমি ধরেই নিয়েছিলাম ও মারা গেছে। বলা যায় মনে মনে সবসময়ই একটা ক্ষীণ আশা জিইয়ে রেখেছিলাম আমি। ওকে ভীষণ ভালোবাসতাম। আর ভালোবাসা

অন্ধ। তাছাড়া আমার চেয়ে ভালো করে ওকে কেউ চিনতো না। একদম আদর্শ চরিত্রের ছিল সে, এটা বলবো না। খুব দ্রুত মাথায় রক্ত উঠে যেত। হাতাহাতি নিত্য ব্যাপার ছিল। খারাপ সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু আর যা-ই হোক, খুনি হতে পারে না কেইন।

এছাড়াও কেইনের নির্দোষ হওয়ার পেছনে ক্রেইন পরিবারের আরো তত্ত্ব আছে।

প্রথমত, পলাতক অবস্থায় কীভাবে টিকে থাকবে কেইন? ব্যাঙ্কে কেবল আটশো ডলার ছিল তার। ইন্টারপোল পর্যন্ত লেগে ছিল তার পেছনে, সুতরাং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এরকম ভেল্কি দেখানোর রসদ কোথায়? তাছাড়া জুলিকে কেনই বা মারতে যাবে সে? গত এগারো বছরে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলো না কেইন? শেষবার যখন বাসায় এসেছিল তখন ওরকম পাগলের মতো করছিলো কেন? আমাকে কেন বলেছিল যে বিপদে আছে? আর আমিই বা কেন জোর করিনি সবকিছু খুলে বলতে?

কিন্তু সবচেয়ে খারাপ (বা ভালো–আপনার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করছে) ব্যাপারটা হচ্ছে ঘটনাস্থলে যে রক্ত পাওয়া যায়, তার একটা ছোট অংশ ছিল কেইনের। ফোঁটায় ফোঁটায় রক্তের ধারা উঠে গিয়েছিল সিঁড়ি বেয়ে। মিলারদের বাড়ির পেছন দিকের উঠোনে ঝোপের ধারেও রক্তের উপস্থিতি পাওয়া যায়। ক্রেইন পরিবারের ধারণা আসল খুনি জুলিকে হত্যার পর কেইনকে গুরুতর আহত করে। আর সেই ক্ষতের কারণে পরবর্তীতে মারা যায় আমার ভাই। কিন্তু পুলিশ অত জটিলতার মধ্যে যায়নি। তাদের মতে জুলিই কোন একভাবে আহত করে কেইনকে।

সেই সাথে আরেকটা কারণ আছে ক্রেইন পরিবারের এসব তত্ত্বে বিশ্বাস করার। ঘটনার রাতে মিলারদের বাড়ির বাইরে অপরিচিত একজনকে দেখেছিলাম আমি।

যেমনটা আগেও বলেছি, পুলিশ বা গণমাধ্যম–কেউই আমাদের কথা বিশ্বাস করতে রাজি না। তবুও আমাদের পরিবারের এহেন বিশ্বাসের পেছনে কী কী কারণ ছিল তা ব্যাখা করলাম আপনাদের কাছে। দুটো উপায় ছিল আমাদের হাতে। এটা মেনে নেয়া যে জুলির মতো নিরীহ মেয়েটাকে আসলেও খুন করেছে কেইন, এরপর এগারো বছর ধরে পালিয়ে আছে (পুলিশ এবং গণমাধ্যমের শকুন চোখ ফাঁকি দিয়ে)। অথবা সেই রাতে জুলির সাথে তার ইচ্ছাতেই মিলিত হয়েছিল (এজন্যেই আলামত পেতে অসুবিধে হয়নি পুলিশের) কেইন এবং পরবর্তীতে বাইরে থেকে কেউ এসে দুজনকে হত্যা করে। জুলির লাশটা সেখানে রেখে গেলেও কেইনকে গুম করে ফেলা হয়। আমি হয়তো কডিংটন টেরেসে ঘটনার রাতে সেই লোকটাকেই দেখেছিলাম।

এটা বলাটা অত্যুক্তি হবে যে আমি যেভাবে বললাম ঠিক সেভাবেই সবকিছু ঘটেছিল। কিন্তু আমরা তো কেইনকে চিনি। লোকে যেসব বলেছিল তা করা সম্ভব নয় ওর পক্ষে। তাহলে কী ঘটেছিল সেদিন?

অনেকেই আমাদের পরিবারের তত্ত্বটার সাথে সুর মিলিয়েছিল, কিন্তু এদের বেশিরভাগই আবার ছিল নানারকম ষড়যন্ত্রতত্ত্বে বিশ্বাসী। যেমন অনেকেই ভাবে যে এলভিস প্রিসলি আর জিমি হেনড্রিক্স এখনও কোন নির্জন দ্বীপে বসে একসাথে গিটার বাজাচ্ছে। টেলিভিশনের প্রোগ্রামগুলো ছিল আরো এক কাঠি সরেস। সময়ের সাথে সাথে কেইনের পক্ষে কথা বলা কমিয়ে দেই। আমার নিজেরও তো একটা জীবন আছে। ক্যারিয়ার আছে। বাকিটা জীবন পলাতক কোন খুনির ভাই হয়ে বেঁচে থাকতে চাইনি।

কোভেন্যান্ট হাউজের পক্ষ থেকে আমাকে নিয়োগ দেয়ার ব্যাপারে শুরুতে কিছু দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাজ করছিলো নিশ্চয়ই। তাদের দোষও দেয়া যায় না সেজন্যে। আমি সিনিয়র ডিরেক্টর হলেও লেটারহেডে আমার নাম উহ্য রাখা হয়। তহবিল গঠনের বড় অনুষ্ঠানগুলোতে কখনো যাই না। পর্দার পেছনে থেকে করতে হয় সব কাজ। এ ব্যাপারে অবশ্য আমার কোন আপত্তিও নেই।

ছবির মানুষটার দিকে তাকালাম আবারো। খুব পরিচিত একজন, আবার সেই সাথে বড্ড অপরিচিত।

আমার মা কি শুরু থেকেই মিথ্যে বলে আসছে?

বাবা আর আমাকে না জানিয়ে কেইনকে সাহায্য করে গিয়েছে সে? কেইন যে মারা গিয়েছে এই তত্ত্বের সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিল মা-ই। গোটা সময় চুপিসারে তাকে টাকা পাঠিয়েছে মা? সানি কি শুরু থেকেই জানতো কোথায় গা ঢাকা দিয়ে আছে কেইন?

এসব ভেবেই দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয়া যাবে।

ছবিটা থেকে জোর করে দৃষ্টি সরিয়ে রান্নাঘরের কেবিনেট খুললাম। আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি যে আজ সকালে লিভিংস্টোনে যাবো না। কফিনের মতো স্তব্ধ ঐ বাড়িটায় সময় কাটানো অসম্ভব আমার পক্ষে। তাছাড়া কাজেও ফিরতে হবে। মা বেঁচে থাকলে এটাই করতে বলতো, আমি নিশ্চিত। বাটিতে গোল্ডেন গ্রাহাম সিরিয়াল ঢেলে নিয়ে শিলার নম্বরে ফোন দিয়ে একটা মেসেজ রেকর্ড করে রাখলাম। বললাম তাকে কতটা ভালোবাসি। আমাকে যেন ফোন দেয়।

আমার অ্যাপার্টমেন্টটা (নাকি আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট বলবো?) নাইন্থ এভিনিউয়ের টোয়েন্টি ফোর্থ স্ট্রিটে। চেলসি হোটেল থেকে খুব একটা দূরে না জায়গাটা। ১৭ ব্লক দূরে অবস্থিত কোভেনান্ট হাউজে সাধারণত হেঁটেই যাই প্রতিদিন। কাছেই ওয়েস্ট সাইড হাইওয়ে। ঘর পালানো ছেলেমেয়েদের মাথা গোঁজার জন্যে আদর্শ একটা জায়গা ছিল এটা। কিন্তু ফোর্টি সেকেন্ড স্ট্রিটে অভিযান চালানোর পর পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। আগে ঐ জায়গাটাকে

জাহান্নামের চৌরাস্তা বললেও বাড়িয়ে বলা হতো না। রাস্তাটা ধরে হেঁটে যেতে হলে পথচারীদের পাড়ি দিতে হতো অনেকগুলো গণিকালয়। পতিতাদের দালালগুলো হাত ধরে টানাটানি করতো। পর্নো প্যালেস আর থিয়েটারও ছিল কয়েকটা। এই পথ পার হবার পরে সুস্থ মস্তিষ্কের কেউ যদি গোসল করতে চাইতো, তাহলে তাকে দোষ দেয়ার কোন উপায় ছিল না। মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং মানসিক বিকৃতি এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছিল যে বিবেকবান যে কেউ অসুস্থবোধ করবে। আমিও কিন্তু একজন পুরুষ মানুষ। কামনা, লালসা আমারও আছে। কিন্তু নেশাখোর, দাঁতহীন পতিতাদের দেখে কীভাবে কারো মনে কামনার উদ্রেক ঘটে তা বলতে পারবো না।

সেই হিসেবে বলা যায় বিখ্যাত সেই উচ্ছেদাভিযানের কারণে আমাদের কাজ একটু কঠিন হয়ে যায়। কোভেন্যান্ট হাউজের কর্মীরা আগে জানতো ঠিক কোথায় কীভাবে কাজ করতে হবে। ঘর পালানো ছেলেমেয়েদের সহজেই খুঁজে পাওয়া যেত।

তাছাড়া পুরো শহরটা আপাতদৃষ্টিতে যতটা নিরীহ মনে হয়, অতটাও নিরীহ নয়। পথচারী বা পর্যটকদের এখন আর আগের মতো হেনস্তা হতে হয় না। রাস্তার পাশে জানালায় ঝোলানো **'শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে'** লেখা সাইনের সংখ্যাও কমে গেছে। *'শেভিং রায়ান'স প্রাইভেটস'* কিংবা *'বনফায়ার অভ দ্য প্যান্টিস'* জাতীয় পোস্টার আর দেখা যায় না। কিন্তু অবক্ষয় কি আর থামানো যায়? সমাজের সেই কালো দাগ ফিরে আসে বারে বারে। টিকে থাকে তেলাপোকার মতো অন্ধকার কোণে। পুরোপুরি মিটিয়ে ফেলা যায় না কখনোই।

আর সমাজের এই অন্ধকার দিক একেবারে উধাও হয়ে গেলেও সমস্যা। যখন চোখের সামনে এসব জিনিসপত্রের আনাগোণা থাকবে তখন নিজেকে সাধু ভাবতে খুব একটা বেগ পেতে হয় না। অনেকের জন্যে এরকম সাধু মনোভাব থাকাটা জরুরী। আরেকটা ব্যাপার, কেমন শত্রুকে বেশি ভয় মানুষের? খোলা ময়দানে তরবারি বের করে যে ব্যক্তি, তাকে? নাকি আড়াল থেকে ছুরি মারে যে, তাকে? তাছাড়া, এই পর্যায়ে আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন বেশি কথা বলছি আমি, আলো থাকলে অন্ধকার থাকবেই। খাদ ছাড়া কোন কিছু হয় নাকি?

প্রথম হর্নটা শুনে কোন ভাবান্তর হলো না আমার। নিউ ইয়র্ক সিটিতে থাকি। এখানে হর্ন না শুনে হাঁটা আর সাঁতার কাটতে নেমে শরীর না ভেজানো একই কথা। তাই পরিচিত কণ্ঠে "অ্যাসহোল" কথাটা না শোনা পর্যন্ত ঘুরে তাকালাম না। কোভেন্যান্ট হাউজের ভ্যানটা দাঁড়িয়ে আছে আমার পাশে। চালকের আসনে স্কয়ার্স, গাড়িতে সে বাদে আর কেউ নেই। জানালা নামিয়ে চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে ফেললো সে।

"উঠে বসো।"

কথা না বাড়িয়ে দরজা খুলে উঠে পড়লাম গাড়িতে। সাথে সাথে সিগারেট, ঘাম এবং বোলোনিয়া স্যান্ডউইচের পরিচিত গন্ধটা নাকে এসে লাগলো। কার্পেটে নানা ধরনের দাগ। গ্লোভ কম্পার্টমেন্ট দেখে মনে হতে পারে খালি একটা গর্ত। সিটের স্প্রিংগুলো শব্দ করে অনবরত।

"কোথায় যাচ্ছিলে?" রাস্তার দিক থেকে চোখ না ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো স্কয়ার্স।

"কাজে।"

"কেন?"

"থেরাপি," বললাম। বুদ্ধিমানের জন্যে ইশারাই যথেষ্ঠ।

মাথা নাড়লো স্কয়ার্স। সারা রাত নিশ্চয়ই গাড়ি চালিয়েছে সে। উদ্ধার করার মতো ছেলেমেয়েদের খুঁজে বেড়িয়েছে ওর জহুরি চোখ। তবে খুব একটা ক্লান্ত মনে হচ্ছে না ওকে দেখে, কখনোই মনে হয় না। আশির দশকের রক ব্যান্ডের সদস্যদের মতো লম্বা চুল, মাঝে সিঁথি। ওকে কখনো ক্লিন-শেভড অবস্থায় দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু কখনো দাড়ি খুব একটা বড় হতেও দেখিনি। দাড়ির ফাঁক দিয়ে যেটুকু চামড়া দেখা যায় সেখানে বসন্তের দাগের মতো গর্ত। পায়ের বুটজোড়া ফ্যাকাসে হতে হতে প্রায় সাদাই হয়ে গেছে। জিন্সটা দেখে মনে হবে একপাল মহিষ দৌড়ে গেছে ওটার ওপর দিয়ে। মস্ত ভুঁড়িটা মাঝবয়সী প্লাম্বারদের কথা মনে করিয়ে দেয়। ক্যামেলের একটা প্যাকেট রাখা আস্তিনে। দীর্ঘ সময় তামাক সেবনের কারণে হলদেটে দাঁত।

"বিধ্বস্ত মনে হচ্ছে তোমাকে দেখে," বললো ও।

"তাহলে তো অবস্থা আসলেও বেশি খারাপ," বললাম আমি। "তুমি বলছো যখন।"

হাসলো কথাটা শুনে। আমরা ওকে স্কয়ার্স বলি কপালের বর্গাকার ট্যাটুগুলোর জন্যে। আক্ষরিক অর্থেই সেখানে চারটা স্কয়ারের দেখা মিলবে। স্কয়ার্স এখন বেশ বিখ্যাত একজন ইয়োগা ইনস্ট্রাক্টর। ভিডিও আর ইয়োগা স্কুলের চেইনও আছে ওর। সেজন্যেই অনেকে ধরে নেয় যে ট্যাটুটার সাথে হিন্দু ধর্মের কোন সাযুজ্যতা আছে। ভুল ধারণা।

একসময় ওটা আসলে নাৎসি বাহিনীর স্বস্তিকা চিহ্ন ছিল। চারটা বাড়তি দাগ দিয়ে ঘরগুলো পুরো করে নিয়েছে।

ব্যাপারটা কল্পনা করা আমার জন্যে একটু কষ্টকরই বটে। কারো স্বভাব চরিত্র নিয়ে সচরাচর কোন মন্তব্য করে না। আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু বলা যায় ওকে। প্রথম যেদিন ট্যাটুটার ব্যাপারে আমাকে বলে, দেখার মতো অবস্থা হয়েছিল চেহারার। অবশ্য স্বস্তিকাটা নিয়ে কোন প্রকার অপরাধবোধ কাজ করে না ওর মধ্যে। কেন আঁকিয়েছিল সে ব্যাপারেও কিছু বলেনি। শিলার

মতো সে-ও অতীত সম্পর্কে মুখে কুলুপ এঁটে রাখতে পছন্দ করে। অন্যেরা অবশ্য অনেক কিছুই বলে। কিছুটা বুঝতে পারি এখন।

"ফুলগুলোর জন্যে ধন্যবাদ," বললাম আমি।

জবাবে কিছু বললো না স্কয়ার্স।

"আসার জন্যেও," যোগ করলাম খানিকটা বিরতি দিয়ে। ভ্যানে করে কোভেন্যান্ট হাউজের কয়েকজন বন্ধুকেও নিয়ে এসেছিল ও। শেষকৃত্যে পরিবারের বাইরের লোক বলতে তারাই ছিল সর্বসাকুল্যে।

"সানি চমৎকার একজন মানুষ ছিল," বলল স্কয়ার্স।

"হ্যাঁ।"

গাড়ির ভেতরটা নীরব থাকলো পরবর্তী কিছুক্ষণ। "কিন্তু অনুষ্ঠানটা ভালো হয়নি।"

"তুমি না বললে জানতামই না।"

"মানে, কতজন লোক হয়েছিল, বলো তো?"

"স্বান্তনা দেয়ায় তোমার জুড়ি হয় না।"

"স্বান্তনা চাও? তাহলে জেনে রাখো–মানুষের চেয়ে খারাপ কিছু আর হয় না।"

আবারো নীরবতা। একটা সিগন্যালে থেমে আমার দিকে তাকালো স্কয়ার্স। আস্তিন থেকে সিগারেটের প্যাকেট হাতে নিল। "সমস্যা কী? বলবে?"

"সেরকম কিছু না। আমার মা মারা গেছে কদিন আগে।"

"আচ্ছা থাক, বলো না।"

সবুজ বাতি জ্বললে আবারো চলতে শুরু করলো ভ্যানটা। কেইনের ছবিটা ভেসে উঠলো চোখের সামনে। "স্কয়ার্স?"

"শুনছি।"

"আমার ধারণা," বললাম, "আমার ভাই বেঁচে আছে।"

তখনই কিছু বললো না স্কয়ার্স। প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে মুখে দিল।

"হঠাৎ এই বোধোদয়?"

"বাহ, অনেকদিন কাউকে 'বোধোদয়' শব্দটা ব্যবহার করতে শুনিনি। তোমার মুখে শুনবো, এটাও ভাবিনি।"

"নাইট কোর্সে ভর্তি হয়েছি," বললো স্কয়ার্স। "ধারণা পাল্টানোর কারণ?"

কোভেন্যান্ট হাউজের ছোট্ট পার্কিং লটটায় গাড়ি থামালো ও। আগে সাধারণত রাস্তার ওপরেই গাড়ি রাখতাম আমরা, কিন্তু ভবঘুরেরা গাড়িতে ঢুকে উৎপাত করতো প্রায়ই। পুলিশ ডাকতে হতো না কখনোই, কিন্তু বারবার ভাঙা কাঁচ মেরামত করা বিরক্তিকর। খরচও হয়। এরপরে গাড়ির দরজা

খোলাই রাখা হতো ইচ্ছে করে, যাতে ভেতরে বিশ্রাম নিতে পারে ভবঘুরেরা। সেন্টারে যে আগে আসতো সে ভ্যানের দরজায় টোকা দিলে বেরিয়ে যেত তারা।

কিন্তু সেটাও বন্ধ করতে হয়েছে কারণ কদিন বাদেই ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে ওঠে ভ্যানটা। ভদ্র ভাষায় বললাম কথাটা। গৃহহীনদের অবস্থা খুব একটা সুবিধের নয় কখনোই। বমি, প্রস্রাব-পায়খানা, কাদা–এসব ছাড়াও অনেক কিছু পরিষ্কার করতে হয়েছে।

ভ্যানের ভেতরেই কীভাবে কথাটা বলবো সেটা নিয়ে চিন্তার স্রোত বইতে শুরু করলো আমার মাথায়। "একটা প্রশ্ন করি তোমাকে।"

চুপচাপ অপেক্ষা করছে স্কয়ার্স।

"আমার ভাইয়ের ঘটনাটার ব্যাপারে তুমি কী ভাবো, সেটা কখনো বলোনি আমাকে," বললাম।

"এটা প্রশ্ন?"

"প্রশ্ন না বলে পর্যবেক্ষণও বলতে পারো। আচ্ছা প্রশ্নই যখন শুনতে চাইছো, কেন বলোনি?"

"তোমার ভাইয়ের ঘটনাটার ব্যাপারে আমার কী মতামত সেটা কেন বলিনি?"

"হ্যাঁ।"

"তুমি জিজ্ঞেস করোনি," কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো স্কয়ার্স।

"বেশ, এখন জিজ্ঞেস করছি," বললাম। "তোমার কি মনে হয় যে বেঁচে আছে ও?"

"হ্যাঁ, সবসময়ই এটা মনে হয়েছে।"

অবাক না হয়ে পারলাম না। "অথচ আমি যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কী হতে পারে সেটা নিয়ে প্যাঁচাল পেরেছি..."

"সেসময় ভাবতাম যে আসলে কাকে কথাগুলো বোঝানোর চেষ্টা করছো, আমাকে নাকি তোমাকে?"

"আমার পাল্টা যুক্তিগুলো কখনোই বিশ্বাস হয়নি তোমার?"

"নাহ," নির্বিকার কণ্ঠে বললো স্কয়ার্স। "কখনো না।"

"কিন্তু প্রতিবাদ তো করোনি।"

"কখনো গুরুতর কিছু মনে হয়নি। কথাগুলো কাউকে বলা তোমার জন্যেও জরুরী ছিল," বলে সিগারেটে লম্বা একটা টান দেয় স্কয়ার্স।

"–তাই নাকি?"

"বেশিরভাগ সময়, হ্যাঁ।"

"কিন্তু আমার কথায় তো যুক্তি ছিল," বললাম।

"তোমার মতে।"

"কিন্তু তোমার সেরকমটা মনে হয় না?"

"নাহ, হয় না," স্কয়ার্স বলে। "তোমার ধারণা যে কেইনের কাছে লুকিয়ে থাকার মতো পর্যাপ্ত টাকা-পয়সা ছিল না। কিন্তু গা ঢাকা দেয়ার জন্যে খুব বেশি খরচের দরকার হয় না। আমাদের সাথে যে প্রতিদিন এত ঘর পালানো ছেলেমেয়েদের দেখা হয়, তারা যদি আসলেও চাইতো, তাহলে কিন্তু একদম উধাও হয়ে যেতে পারতো।"

"কয়েক দেশের পুলিশ খোঁজে না ওদের কাউকে।"

"ইন্টারপোলের ব্যাপারটা," যেন কোন বাচ্চার বোকার মতো কথা শুনছে, এমন ভঙ্গিতে বললো স্কয়ার্স। "তোমার কি ধারণা যে পৃথিবীর সবগুলো দেশের পুলিশ অফিসারের ঘুম থেকে উঠেই তোমার ভাইকে খোঁজা শুরু করে?"

স্কয়ার্সের কথায় যুক্তি আছে। বিশেষ করে এখন যখন জানি যে মায়ের পক্ষ থেকে অর্থ সমাগমের সমূহ সম্ভাবনা ছিল কেইনের। "ও কাউকে খুন করার মতো মানুষ না।"

"ফালতু কথা।"

"তুমি তো ওকে চিনতেই না।"

"আমি আর তুমি তো বন্ধু, নাকি?"

"হ্যাঁ।"

"আমি যে একসময় ক্রস পুড়িয়ে 'হেইল হিটলার' বলে চিৎকার করতাম, সেটা তো বিশ্বাস করো?"

"এটা আলাদা ব্যাপার।"

'না, আলাদা না।" ভ্যান থেকে বের হলাম দুজনেই। "তুমি একবার আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে যে ট্যাটুটা তুলে ফেলি না কেন, মনে আছে?"

মাথা নাড়লাম। "নিজের চরকায় তেল দিতে বলেছিলে জবাবে।"

"হ্যাঁ। আসলে চাইলেই লেজারের সহায়তায় পুরোপুরি উঠিয়ে ফেলতে পারি ট্যাটুটা, কিংবা এরকম অদ্ভুত বাক্সগুলোর জায়গায় অন্য কিছু আঁকাতে পারতাম। সেটা করিনি, কারণ ট্যাটুটা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কাজ করে।"

"কীসের? অতীতের?"

হলুদ দাঁত বের করে হাসলো স্কয়ার্স। "সম্ভাবনার।"

"বুঝলাম না।"

"কারণ তুমি একটা গর্দভ।"

"আমার ভাই নিরীহ একটা মেয়েকে ধর্ষণ করে হত্যা করার মতো মানুষ না।"

"ইয়োগা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোতে অনেক মন্ত্র শেখায়, জানো তো?" স্কয়ার্স বললো। "কিন্তু একটা কথা মন্ত্রের মতো বারবার জপ করলেই সেটা সত্য হয়ে যায় না।"

"বেশ গম্ভীর কথাবার্তা বলছো আজকে," বললাম।

"আর তুমি গর্দভের মতো আচরণ করছো," বলে সিগারেট নেভায় স্কয়ার্স। "তোমার ভাই বেঁচে আছে একথা মনে হলো কেন হঠাৎ, বলবে?"

মূল প্রবেশপথের কাছে পৌছে গেছি আমরা প্রায়।

"আমার অফিসে আসো," বললাম।

শেল্টারে পা রেখেই চুপ হয়ে গেলাম দুজনে। অনেকের মনে হতে পারে যে অফিসটা খুব একটা সুবিধের নয়। কিন্তু কোভেন্যান্ট হাউজের মূলমন্ত্র হচ্ছে, আমাদের নিজেদের বাচ্চারা যেরকম নিরাপদ স্থানে সময় কাটায়, ঠিক সেরকম একটা পরিবেশ এখানেও ঘর পালানো ছেলেমেয়েদের জন্যে বজায় রাখা। এই বক্তব্যটা শোনার পর দাতাদের অনেকেই চুপ হয়ে যায়। অন্যান্য চ্যারিটিগুলোর মতোই শুরুতে আমাদের চ্যারিটিও তাদের কাছে অপরিচিত ঠেকে–কিন্তু এর পরেই সত্যটা বোধগম্য হয়।

স্কয়ার্স আর আমি দুজনেই চুপ করে আছি এখন, কারণ বাড়িতে গেলে আমাদের সবার মনোযোগ চলে যায় আমাদের বাচ্চাদের ওপর। সেটা তাদের প্রাপ্য। এখানকার ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেও সেই কথাটা প্রযোজ্য। তাদের দীর্ঘ, ঝঞ্ঝাপূর্ণ জীবনে এই প্রথম হয়তো কেউ আসলেও গুরুত্ব দিচ্ছে তাদের। প্রত্যেকের সাথে এমন ভাবে কথা বলি, যেন মেলায় হারিয়ে যাওয়া ভাইকে খুঁজে পেয়েছি। আশা করি আমার ব্যবহৃত উপমাটায় বিরক্ত হবেন না কেউ। চুপচাপ তাদের কথা শুনি, কোন তাড়াহুড়া করি না সেসময়। যা বলি সরাসরি চোখের দিকে তাকিয়ে বলি। কখনো তাদের অতীত নিয়ে ঘাটাই না। হাত মেলাই, জড়িয়ে ধরি।

এই ছেলেমেয়েদের সাথে মেকি কোন আচরণ করা যায় না। সাথে সাথে ধরে ফেলবে সেক্ষেত্রে। নিঃশর্তভাবে তাদের এখানে ভালোবাসি আমরা। এটা আমাদের প্রতিদিনের কাজ। প্রতিদিনই যে সফল হই, সেটা ভাবা ভুল হবে অবশ্য। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সফল হই না। ওদের বড় একটা অংশ হারিয়ে যায় আমাদের কাছ থেকে। ফের নেমে পড়ে রাস্তায়, আশ্রয় খোঁজে অন্ধকারে। কিন্তু এখানে, আমাদের বাড়িতে, আরামে থাকে তারা। এখানে তাদের ভালোবাসার কোন কমতি নেই।

আমার অফিসে ঢুকে দেখি দুজন–একজন পুরুষ, একজন নারী–অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে। থমকে যায় স্কয়ার্স। আশপাশে তাকায় একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

"পুলিশ," আমার উদ্দেশ্যে বলে।

হেসে আমার দিকে এক পা এগিয়ে আসে অপেক্ষারত মহিলাটা। লোকটা তার পেছনেই দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। "উইল ক্লেইন?"

"জি?"

নিমেষে নিজের পরিচয়পত্র বের করে আমাকে দেখালো সে। তার সঙ্গীও একই কাজ করলো। "আমার নাম ক্লডিয়া ফিশার, ও ড্যারিল উইলকক্স।

ফেডারেল ব্যুরো অভ ইনভেস্টিগেশনে স্পেশাল এজেন্ট হিসেবে কর্মরত আছি আমরা।"

"এফবিআই," যেন আমার উন্নতিতে মুগ্ধ, এমন ভঙ্গিতে শব্দটা উচ্চারণ করলো স্কয়ার্স। ক্লডিয়ার পরিচয় পত্রের দিকে একবার তাকিয়ে পরমুহূর্তে বললো, "আপনি দেখি চুল কেটে ফেলেছেন।"

সাথে সাথে পরিচয়পত্রটা আবারো আগের স্থানে রেখে ভ্রুজোড়া উঁচু করে স্কয়ার্সের দিকে তাকালো মহিলা। "আপনি?"

"খুব সহজেই প্রেমে পড়ে যাই।"

ভ্রু কুঁচকিয়ে আমার দিকে দৃষ্টি ফেরালো ক্লডিয়া। "আপনার সাথে কিছু কথা ছিল আমাদের, আলাদাভাবে।"

ক্লডিয়া ফিশারের দৈহিক গড়ন খাটোই বলা চলে, পেটানো শরীর। হাইস্কুলের অ্যাথলেটদের এরকম ফিগার দেখা যায়। প্রথম দর্শনে দেখে মনে হচ্ছে যে পার্টিতে গেলে চুপ করে বসে থাকবে না সে, আবার খুব বেশি হৈ-হল্লাও করবে না। চুল আসলেও ছোট করে রেখেছে, সত্তরের দশকে এই ধরনের চুলের কাটিং দেখা যেত, তবে তাকে মানিয়েছে। কানে ছোট্ট দুল, নাক কিছুটা খাঁড়া।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজনের উপস্থিতি খুব একটা ভালো চোখে দেখি না আমরা। কোন অপরাধীকে আশ্রয় দেয়ার ইচ্ছে নেই আমাদের, তাই বলে সরাসরি তাদের হাতে তুলে দেয়াটাও সমীচিন নয়। একবার যদি খবর ছড়িয়ে যায় যে আমাদের এখানে পুলিশের আনাগোনা আছে, তাহলে ছেলেমেয়েরা এখানে আসতে ভরসা পাবে না। ভরসা জিনিসটা তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাছে। আমরা হচ্ছি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ একটা সংস্থা। ঘর পালানো ছেলেমেয়েদের জন্যে সুইজারল্যান্ড।

আর এফবিআইয়ের লোকেদের ওপর আমার ব্যক্তিগত আক্রোশও নেহায়েত কম নয়। কেইনের কেসটার ব্যাপারে তারা যা করেছে...

"আমি চাই ও থাকুক," বললাম।

"আমরা যে ব্যাপারে কথা বলবো সেটার সাথে ওনার কোন সম্পর্ক নেই।"

"ধরে নিন ও আমার অ্যাটর্নি।"

ফিশারকে আপাদমস্তক একবার দেখে নিল ক্লডিয়া। অগোছালো চুল, ক্যানভাসে বুট, কপালের ট্যাটু, মলিন জিন্স। আশাব্যঞ্জক কিছু চোখে পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

আমার ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেলাম। চেয়ারে বসে ডেস্কের ওপরে পা তুলে দিল স্কয়ার্স। শব্দের সাথে ধূলোও ছড়িয়ে পড়লো আশপাশে। ফিশার আর উইলকক্স দাঁড়িয়েই আছে।

"কী করতে পারি আপনার জন্যে, এজেন্ট ফিশার?" জিজ্ঞেস করলাম হাত নেড়ে।

"শিলা রজার্স নামে একজনকে খুঁজছি আমরা।"

আর যা-ই হোক, এটা আশা করিনি।

"তাকে কোথায় খুঁজে পাবো, জানেন?"

"তাকে কেন খুঁজছেন?" জিজ্ঞেস করলাম।

জবাবে আমাকে ভদ্র একটা হাসি উপহার দিল এজেন্ট ফিশার। "তিনি কোথায় আছেন আপাতত সেটা আমাদের বলুন?"

"কোন সমস্যা?"

"আপাতত," কথাটায় বাড়তি জোর দিল মহিলা, "তাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই আমরা।"

"কোন ব্যাপারে?"

"আপনি কি আমাদের সাহায্য করতে অপারগতা প্রকাশ করছেন?"

"আমি কোন কিছুতেই অপরাগতা প্রকাশ করছি না।"

"তাহলে আমাদের বলুন শিলা রজার্সকে কোথায় খুঁজে পাবো।"

"তাকে কেন খুঁজছেন আপনারা, সেটা জানতে চাই।"

উইলকক্সের দিকে তাকালো ফিশার। আস্তে করে একবার মাথা নাড়লো লোকটা। আবারো আমার দিকে দৃষ্টি ফেরালো ফেডারেল এজেন্ট। "আজকে আমি আর উইলকক্স শিলা রজার্সের কর্মস্থলে গিয়েছিলাম, কিন্তু সেখানে উপস্থিত হননি তিনি। তখন কিছু প্রশ্ন করে জানতে পারি যে অসুস্থতার কারণে ছুটি নিয়েছেন। শেষ যে ঠিকানায় থাকতেন সেখানে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখি কয়েক মাস আগেই বাসাটা ছেড়ে দিয়েছেন তিনি। বর্তমানে আপনার সাথে ৩৭৮ টোয়েন্টি ফোর্থ স্ট্রিটে থাকছেন। সেখানেও গিয়েছিলাম, কিন্তু তাকে পাইনি।"

"খুব সুন্দর করে কথা বলেন আপনি," স্কয়ার্স মন্তব্য করলো এসময়।

"আমরা কোন ঝামেলা করতে চাচ্ছি না, মি. ক্রেইন," ওকে পাত্তাই দিল না এজেন্ট ফিশার।

"ঝামেলা?" বললাম।

"শিলা রজার্সকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে খুঁজছি আমরা। ব্যাপারটা জরুরী। কাজটা সহজেই করতে চাইছি, নাহলে অনর্থক জল ঘোলা করতে হবে।"

"ভয় পেয়েছি," হাত কচলে বললো স্কয়ার্স।

"কী সিদ্ধান্ত নিলেন, মি. ক্রেইন?"

"আপনারা আসুন এখন," বললাম শান্তস্বরে।

"শিলা রজার্সের ব্যাপারে কতটা জানেন আপনি?"

অদ্ভুত *তো!* মাথা ব্যাথা করতে শুরু করেছে। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে ক্লডিয়া ফিশারের দিকে এগিয়ে দিল উইলকক্স। "আপনি কি মিস

রজারের ক্রিমিনাল রেকর্ড সম্পর্কে অবহিত আছেন?" জিজ্ঞেস করলো ফিশার।

মুখের অভিব্যক্তি স্বাভাবিক রাখে রীতিমত যুদ্ধ করতে হচ্ছে। এমনকি স্কয়ার্সও অবাক হয়ে গেছে কথাটা শুনে।

কাগজটা দেখে পড়তে শুরু করলো ফিশার। "শপ লিফটিং, পতিতাবৃত্তি, মাদক বিক্রি।"

"যত্তসব বোকামি," নাক দিয়ে শব্দ করে বললো স্কয়ার্স।

"অস্ত্রসহ ডাকাতি।"

"এটা ইন্টারেস্টিং," মাথা নেড়ে বললো স্কয়ার্স। "সে যে ডাকাতি করেছে এটার কোন চাক্ষুস প্রমাণ নেই বোধহয়।"

"জি।"

"তাহলে তো সে নির্দোষও হতে পারে।"

আবারো ভ্রূ কুঁচকালো ফিশার।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছি আমি।

"মি. ক্রেইন?"

"আপনাদের সাহায্য করতে পারবো না আমি," বললাম।

"পারবেন না নাকি করবেন না?"

"আপনার যা ইচ্ছা ভাবতে পারেন।"

"ব্যাপারটা হয়তো আপনার কাছে দেজাভুর মতো ঠেকছে, মি. ক্রেইন।"

"কী বলতে চাচ্ছেন?"

"প্রথমে ভাইয়ের জন্যে তথ্য গোপন করেছেন, এখন প্রেমিকার জন্যে।"

"জাহান্নামে যান।"

আমার এরকম উত্তরে হতাশ মনে হলো স্কয়ার্সকে।

ফিশার কিন্তু পিছু হটলো না। "আপনি কিন্তু ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবছেন না," বললো সে।

"কীরকম?"

"এর ফল কি হতে পারে ভেবেছেন?" বললো সে। "যেমন ধরুন কোভেন্যান্ট হাউজের কোন ডোনার যদি জানতে পারে যে অপরাধে সহযোগিতার কারণে আপনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তখন কী হবে?"

"এই ব্যাপারে কাকে জিজ্ঞেস করা উচিত আপনাদের, জানেন?"

নাক কুঁচকালো ক্লডিয়া ফিশার, যেন স্কয়ার্স তার সুন্দর জুতোর তলায় লেগে যাওয়া কোন ময়লা বৈ কিছু নয়।

"জোয়ি পিস্টিলো," স্কয়ার্স বললো। "জোয়ি হয়তো আপনাদের এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে।"

এবারে ফিশার আর উইলকক্সের অবাক হবার পালা।

"আপনাদের কারো মোবাইল ফোন আছে?" স্কয়ার্স জিজ্ঞেস করলো। "চাইলে ওকে এখনই জিজ্ঞেস করতে পারেন।"

একবার উইলকক্সের দিকে, এরপরে স্কয়ার্সের দিকে তাকালো ফিশার। "আপনি কি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ইন-চার্জ জোসেফ পিস্টিলোর কথা বলছেন?" জিজ্ঞেস করলো সে।

"ফোন দিন তাকে," স্কয়ার্স জবাব দিল। "ওহহো, আপনাদের বোধহয় ওর প্রাইভেট লাইনের নম্বর জানা নেই," বলে হাত বাড়িয়ে দিল স্কয়ার্স। "আমাকে দিন তাহলে?"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফোনটা বের করে দিল ফিশার। নম্বর ডায়াল করে কানে ফোন চাপালো স্কয়ার্স। আয়েশ করে চেয়ারে বসে আছে সে, পা এখনও ডেস্কের ওপরে। একটা কাউবয় হ্যাট থাকলেই ব্যাপারটা জমে যেত পুরোপুরি।

"জোয়ি! চিনতে পেরেছো আমাকে?" বলে কিছুক্ষণ ওপাশের কথা শুনলো স্কয়ার্স, এরপর হাসিতে ফেটে পড়লো। তাকে আন্তরিক ভঙ্গিতে ফোনে কথা বলতে দেখে চোখ-মুখ শুকিয়ে গেল ফিশার আর উইলকক্সের। অন্যসময় হলে ক্ষমতার এরকম অকস্মাৎ পালাবদল উপভোগই করতাম। স্কয়ার্স এখন রীতিমত সেলেব্রিটি, একথা প্রায়ই ভুলে যাই। আমার মাথায় অবশ্য অন্য কথা ঘুরছে।

কয়েক মিনিট পর এজেন্ট ফিশারের দিকে ফোনটা এগিয়ে দিল স্কয়ার্স। "জোয়ি আপনাদের সাথে কথা বলতে চায়।"

ফিশার আর উইলকক্স ঘর থেকে বের হয়ে গেল ফোন নিয়ে।

"এফবিআই," আবারো আগের মতো মুগ্ধ স্বরে বললো স্কয়ার্স।

"আমিও অবাক হয়েছি," বললাম।

"এটা কিন্তু আশা করিনি। শিলার রেকর্ডের কথা বলছি। কে ভাববে..."

আমি অন্তত ভাবিনি।

ফিশার এবং উইলকক্স ফিরলো কিছুক্ষণ পর। চেহারায় আবারো রঙ ফিরেছে তাদের। হেসে স্কয়ার্সের দিকে ফোনটা বাড়িয়ে দিল ফিশার। একটু বেশিই মেকি ঠেকলো হাসিটা।

"কী হয়েছে, জোয়ি?" কানে ফোন ঠেকিয়ে বললো স্কয়ার্স। নীরবে ওপাশের কথা শুনলো কিছুক্ষণ, এরপর "আচ্ছা," বলে কেটে দিল।

"কী হয়েছে?" বললাম আমি।

"জোয়ি ইস্ট কোস্ট এফবিআইতে উঁচু পোস্টে আছে।"

"আর?"

"তোমার সাথে সামনাসামনি দেখা করতে চায়," আগের আত্মবিশ্বাস হারিয়েছে স্কয়ার্স।

"কী?"

"ও যা বলবে, সেটা শুনতে বোহধয় আমাদের ভালো লাগবে না।"

পাঁচ

অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ইন-চার্জ জোসেফ পিস্টিলো আমার সাথে শুধু দেখাই করতে চাননি, বিশেষভাবে বলে দিয়েছেন আমি যেন একা আসি।

"আপনার মা মারা গিয়েছেন, বুঝতে পারছি পরিস্থিতি," বললেন তিনি।

"কীভাবে বুঝতে পারছেন?"

"সরি?"

"আপনি কি খবরের কাগজে দেখেছেন?" জিজ্ঞেস করলাম। "কোন বন্ধুর কাছে শুনেছেন? নাহলে জানলেন কীভাবে মা মারা গেছে?"

বেশ কিছুটা সময় আমার দিকে শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন টেকো ভদ্রলোক। দশাসই স্বাস্থ্য তার, পুরু আঙুলগুলো ডেস্কের ওপর অস্থির ভঙ্গিতে নড়ছে।

"নাকি," পুরনো একটা ক্রোধ ধীরে ধীরে মাথাচাড়া দিচ্ছে। "আপনার কোন এজেন্ট আমাদের ওপর নজর রাখছিল? বাসায়, হাসপাতালে, আমার অফিসে? হাসপাতালে নার্সেরা যে নতুন আর্দালির ব্যাপারে ফিসফাস করতো, সে আপনার লোক ছিল? নাকি ফিউনারেল হোমের লিমুজিন ড্রাইভারের ছদ্মবেশে এসেছিল সে?"

কেউই চোখ নামাচ্ছি না।

"আপনার এই অপূরণীয় ক্ষতির জন্যে আমরা আসলেও দুঃখিত," পিস্টিলো বললেন।

"ধন্যবাদ।"

"শিলা রজার্সকে আমরা কোথায় পেতে পারি সে ব্যাপারে কিছু বলছেন না কেন?" চেয়ারে হেলান দিলেন তিনি।

"আপনারা কেন বলছেন না যে ওকে খোঁজার কারণ কী?"

"শেষবার তার সাথে আপনার দেখা হয়েছিল কখন?"

"আপনি কি বিবাহিত, এজেন্ট পিস্টিলো?"

"গত ছাব্বিশ বছর ধরে। তিনটা বাচ্চা আছে আমাদের," আগের সুরেই বললেন তিনি।

"আপনার স্ত্রীকে ভালোবাসেন?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে আমি যদি হুট করে এসে একদিন তার সম্পর্কে উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করি, হুমকি-ধামকি দেই, আপনি কী করবেন?"

"আপনি যদি এফবিআইয়ের লোক হন, তাহলে ওকে বলবো সহযোগিতা করতে," একবার মাথা নেড়ে বললেন পিস্টিলো।

"তাই?"

"হ্যাঁ," বলে ডান হাতের তর্জনী উঁচু করলেন পিস্টিলো, "তবে এখানে একটা ব্যাপার আছে।"

"কী?"

"আমাকে জানতে হবে যে সে পুরোপুরি নির্দোষ। তাহলে তো আর ভয়ের কিছু নেই।"

"কেন প্রশ্নগুলো করা হচ্ছে, এ সম্পর্কেও কিছু ভাববেন না?"

"অবশ্যই ভাববো। কিন্তু জানতে চাইবো কিনা..." বাক্যটা শেষ করলেন না তিনি। "আপনাকে একটা প্রশ্ন করি এখন।"

সোজা হয়ে বসলাম।

"আমি জানি যে আপনার ধারণা আপনার ভাই মারা গেছেন।"

কিছু বললাম না।

"হঠাৎ যদি জানতে পারেন যে তিনি বেঁচে আছেন, সাথে এটাও জানতে পারলেন যে জুলি মিলারকে আসলেও হত্যা করেছিলেন তিনি," আবারো চেয়ারে হেলান দিলেন এফবিআই এজেন্ট, "মানে সবই কল্পনা করতে বলছি কিন্তু আপনাকে।"

"এরপর, আরো বলুন," বললাম।

"তখন আপনি কী করবেন? তাকে ধরিয়ে দিবেন? নিজের রাস্তা মাপতে বলবেন? নাকি তাকে সাহায্য করবেন?"

আবারো নীরবতা।

"আমাকে এখানে নিশ্চয়ই কাল্পনিক খেলায় অংশগ্রহণ করতে ডেকে পাঠাননি।"

"না, তা পাঠাইনি।"

তার ডেস্কের ডান পাশে একটা কম্পিউটার মনিটর রাখা। স্ক্রিনটা ঘুরিয়ে দিলেন যাতে আমি দেখতে পাই। এরপর কী-বোর্ডে কিছু বাটনে চাপ দিলেন। একটা রঙিন ছবি ফুটে উঠলো সেখানে, দম আটকে যাবার যোগাড় হলো আমার।

একটা সাধারণ দর্শন ঘর। কোনার লম্বা ল্যাম্পটা ওলটানো। বাদামি কার্পেটে কফি টেবিলটা পড়ে আছে কাত হয়ে। পুরো ঘরটা তছনছ করেছে যেন কেউ। ঘরের মেঝেতে একজনকে দেখা যাচ্ছে, চারপাশে রক্তের

ছোটখাটো পুকুর। গাঢ়, লাল রক্ত। চিত হয়ে, হাত পা ছড়িয়ে পড়ে থাকার ভঙ্গিটা দেখে মনে হচ্ছে যেন কেউ বেশ উঁচু থেকে ফেলে দিয়েছে তাকে।

মনিটরের দিকে তাকিয়ে থাকলেও পিস্টিলোর চাহনিটা অনুভব করতে পারছি। মনোযোগ দিয়ে আমার প্রতিক্রিয়া দেখছেন তিনি। একবার চোখাচোখি হলো আমাদের, এরপর আবারো মনিটরের দিকে তাকালাম।

কী-বোর্ডে চাপ দিলেন পিস্টিলো। রক্তাক্ত ছবিটার জায়গায় অন্য আরেকটা ছবি ফুটে উঠলো। একই ঘর। কিন্তু ল্যাম্পটা দেখা যাচ্ছে না এখন আর। কার্পেটে রক্তের দাগ আছে অবশ্য। অন্য একজনকে পড়ে থাকতে দেখলাম মেঝেতে। বাচ্চাদের মতো হাঁটু চেপে ধরে আছে সে। প্রথম লোকটার পরনে ছিল কালো টিশার্ট আর কালো প্যান্ট। আর এই লোকটার পরনে ফ্ল্যানেলের শার্ট, নিল জিন্স।

আরেকটা বাটনে চাপ দিতেই পুরো ঘরটা ভেসে উঠলো মনিটরে। দুজনকেই দেখা যাচ্ছে এখন। একজন ঘরের মাঝখানে, আরেকজন দরজার কাছাকাছি। এই অ্যাঙ্গেল থেকে কেবল মাত্র একজনের চেহারা দেখা যাচ্ছে, চিনি না তাকে আমি। কিন্তু অন্যজনের চেহারা ঢেকে আছে।

ভয় পেয়ে গেলাম। কেইন? এদের একজন কি তাহলে...?

কিন্তু প্রশ্নগুলোর কথা মনে হলো তখনই। কেইনের ব্যাপারে আলাপ করতে এখানে আসিনি আমি।

"ছবিগুলো তোলা হয়েছে নিউ মেক্সিকোর অ্যালবাকার্কিতে, এই উইকেন্ডে," পিস্টিলো বললেন।

"কিছু বুঝতে পারছি না," ভ্রূকুটি করে বললাম।

"ক্রাইম সিনটার অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না, তবে কিছু চুল আর ফাইবার খুঁজে পেয়েছি আমরা," হেসে বললেন এফবিআই এজেন্ট। "এসব টেকনিক্যাল ব্যাপারে আমার দখল কম। এখন এত আধুনিক সব টেস্ট করে ওরা, রীতিমতো অবিশ্বাস্য! কিন্তু মাঝে মাঝে আদ্যিকালের পদ্ধতিতেই সবচেয়ে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।"

"আপনি কোন ব্যাপারে কথা বলছেন সেটা কি আমার জানার কথা?"

"ক্রাইম সিনটা কেউ ভালো করে পরিষ্কার করার চেষ্টা করেছে, তবুও আমাদের ক্রাইম সিন টিম খুব কসরত করে একজন ব্যক্তির আঙুলের ছাপ উদ্ধার করতে পেরেছে। ডাটাবেজের কারো ছাপের সাথে সেটা মেলে কিনা তা জানার জন্যে নতুন প্রাপ্ত ছাপটা সিস্টেমে আপলোড করা হয়েছিল। আজকে সকালে ফলাফল পাওয়া গেছে," সামনে ঝুঁকে আসলেন পিস্টিলো। "বলুন দেখি কার আঙুলের ছাপের সাথে মিলে গেছে ওটা?"

শূন্য চোখে জানালার বাইরে থাকা শিলার ছবিটা ভেসে উঠলো মনের পর্দায়।

"আমি দুঃখিত, উইল।"

"আপনার গার্লফ্রেন্ডের, মি. ক্রেইন। যার একগাদা ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে। যাকে হঠাৎ করেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

ছয়

এলিজাবেথ, নিউ জার্সি

কবরস্থানের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে ওরা।

নিজের মার্সিডিজ লিমোজিনটার পেছনের সিটে বসে আছে ফিলিপ ম্যাকগুয়ান। মার্সিডিজের বিশেষ এই মডেলটায় তার চাহিদা মোতাবেক বুলেটপ্রুফ বডি আর কাঁচের ব্যবস্থা করা হয়েছে। খরচ হয়েছে প্রায় চল্লিশ লক্ষের মতো। ফাস্ট ফুড রেস্টুরেন্ট, জেনারেল স্টোরগুলো পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে গাড়িটা। লিমোর ভেতরকার বারে বানানো স্কচ ড্রিঙ্কটা শোভা পাচ্ছে তার ডান হাতে। বাদামি তরলটুকুর দিকে তাকালো সে, নড়ছে না একটুও। অবাক না হয়ে পারলো না।

"আপনি ঠিক আছেন, মি. ম্যাকগুয়ান?"

সঙ্গীর দিকে তাকালো ম্যাকগুয়ান। ফ্রেড ট্যানারকে বিশালদেহী বললেও কম বলা হবে। হাতগুলো দেখলে মনে হয় ম্যানহোলের ঢাকনার চারপাশে কতগুলো সসেজ জোড়া দেয়া হয়েছে। চোখে আত্মবিশ্বাসের কোন ঘাটতি নেই। পুরনো স্টাইলে বিশ্বাসী ট্যানারের পরনে শেলাক স্যুট, কনিষ্ঠ আঙুলে গোবদা একটা সোনার আঙটি। এই বিশাল আঙটিটা সবসময় হাতে থাকে ট্যানারের। যখনই কথা বলে অন্য হাতে আঙুল দিয়ে আঙটিটা নাড়াচাড়া তার দীর্ঘ দিনের অভ্যাস।

"ঠিক আছি আমি," মিথ্যা বললো ম্যাকগুয়ান।

পার্কার এভিনিউয়ে রুট ২২ দিয়ে বেরিয়ে এলো লিমুজিনটা। ট্যানার এখনও আঙটিটা ঘোরাচ্ছে। লোকটার বয়স পঞ্চাশ। তার বসের তুলনায় দেড় যুগ বেশি। ছোট করে ছাঁটা চুলে ক্রু কাট দেয়া। নিজের কাজে প্রচণ্ড দক্ষ ট্যানার, মাথা ঠান্ডা থাকে সবসময়। ক্ষমা বলে কোন কিছু তার অভিধানে নেই। বিশাল থাবা দুটো আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের সিদ্ধহস্ত। ভয়ানক সব শত্রুর মুখোমুখি হয়েও বেঁচে ফিরেছে সবসময়।

কিন্তু এবারের ব্যাপারটা ভিন্ন। আগের কোন কিছুর সাথে তুলনাই চলে না।

"কে এই লোকটা, শুনি?" ট্যানার জিজ্ঞেস করলো।

মাথা ঝাকালো ম্যাকগুয়ান। তার নিজের পরনের স্যুটটাও হাতে সেলাই করা। জোসেফ অ্যাব্বুড এক্সক্লুসিভ।

ম্যানহাটানের পশ্চিমে একটা দালানের তিনতলা ভাড়া নিয়েছে সে। আগেকার আমলে, ম্যাকগুয়ানকে হয়তো মাফিয়ার কনসিলায়ার বা ক্যাপো বলতো অনেকে। কিন্তু এখন আর সেই দিন নেই (হলিউডে যা-ই বলা হোক না কেন)। তখনকার অন্ধকারাচ্ছন্ন, গুমোট, ঘামের গন্ধে ভর্তি ব্যাকরুমের চলনও আর নেই। ট্যানার অবশ্য ওরকম পরিবেশেই অভ্যস্ত। এখন রীতিমতো দাপ্তরিক রীতিনীতি মেনে চলতে হয়। সেক্রেটারি আছে, সরকার ট্যাক্স নেয়। বৈধ ব্যবসা।

তাই বলে কালো কখনো সাদা হয় না।

"আর আমরা কেন যাচ্ছি?" ট্যানারের চুপ করার লক্ষণ নেই। "তার তো আপনার কাছে আসার কথা, তাই না?"

জবাব দিল না ম্যাকগুয়ান। ট্যানার এসব বুঝবে না।

ঘোস্ট যদি বলে দেখা করতে হবে, তাহলে আর কোন উপায় নেই।

আপনি কে, কত গভীর জলের মাছ, তাতে কিছু যায় আসে না। ঘোস্টকে মানা করার অর্থ, তাকে নিজ বাড়িতে আমন্ত্রণ পাঠানো। সেটার সাথে যমদূতকে নিজ বাড়িতে তলবের কোন পার্থক্য নেই। ম্যাকগুয়ানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দারুণ, তার লোকেরাও দক্ষ। কিন্তু ঘোস্টের কাছে এসব পেরুনো কোন ব্যাপারই না। ধৈর্যের কোন অভাব নেই তার। সময় নিয়ে পর্যবেক্ষণ করবে। বর্মে ফাঁক খোঁজার চেষ্টা করবে। এরপর সময় বুঝে ঠিকই পৌছে যাবে, যখন আশপাশে কেউ থাকবে না।

এর থেকে যত তাড়াতাড়ি আপদ কাটানো যায়, তত ভালো। নিজে যাওয়াই উত্তম।

কবরস্থান থেকে এক ব্লক দূরে থেমে গেলো লিমোজিনটা।

"তুমি তো বুঝতে পারছো যে আমি কী চাইছি?" ম্যাকগুয়ান বললো।

"চিন্তা করবেন না। জায়গামতো লোক দাঁড়িয়ে আছে।"

"আমি ইশারা না করা পর্যন্ত কিছু করবে না।"

"হ্যাঁ, আগেও একবার বলেছেন এ কথা।"

"ওকে খাটো করে দেখো না।"

দরজার হাতল আঁকড়ে ধরলো ট্যানার। রোদে চকচক করছে তার সোনালি আঙটিটা। "কিছু মনে করবেন না, মি. ম্যাকগুয়ান। কিন্তু আমরা যার কাছে এসেছি, সে তো আমার আপনার মতোই সাধারণ একজন মানুষ।"

এ ব্যাপারে ম্যাকগুয়ান ঠিক নিশ্চিত নয়।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল ট্যানার। ওজনের তুলনায় তার মাপা চলাফেরা দেখলে অবাক হতে হয়। স্কচের গ্লাসটায় লম্বা একটা চুমুক দিয়ে বাকি তরলটুকু শেষ করলো ম্যাকগুয়ান। নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে ক্ষমতাধর মানুষদের একজন সে। ঘটে বুদ্ধি আর পকেটে টাকা না থাকলে এই অবস্থানে পৌছুনো যায় না। এখানে দুর্বলতার অপর নাম মৃত্যু। হোঁচট খাওয়া মানেই মৃত্যু। এর কোন ব্যত্যয় নেই।

আরেকটা ব্যাপার, কখনো পিছু হটা চলবে না।

এগুলো সবই জানা আছে ম্যাকগুয়ানের। কিন্তু এ মুহূর্তে সবকিছু ভুলে পালাতে ইচ্ছে করছে প্রচণ্ড। এরপর হাতের কাছে যা কিছু আছে, সেসব নিয়ে উধাও হয়ে যেতে হবে।

তার পুরনো বন্ধু কেইনের মতো।

রিয়ারভিউ মিররে ড্রাইভারের সাথে একবার চোখাচোখি হলো তার। লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে মাথা নাড়লো। গাড়ি চলতে শুরু করলো ধীর গতিতে। বামে মোড় নিতেই ওয়েলিংটন সেমেটেরির বিশাল গেটটা চোখে পড়লো। ড্রাইভারকে থামার নির্দেশ দিল। থেমে গেল লিমোটা। পেছনের সিট থেকে নেমে গাড়ির সামনে চলে এলো ম্যাকগুয়ান।

"যখন দরকার হবে তখন ডাক দিব তোমাকে।"

মাথা নেড়ে গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেল ড্রাইভার।

ম্যাকগুয়ান একা এখন।

কলার ঠিকঠাক করে নিল সে। একবার কবরস্থানের দিকে তাকালো। কেউ নেই। ট্যানার আর তার লোকেরা কোথায় লুকিয়ে আছে কে জানে। হয়তো গাছ বা ঝোপগুলোর আড়ালে। ম্যাকগুয়ান যেহেতু তাদের দেখতে পাচ্ছে না, তাহলে ঠিকঠাকই কাজ করছে নিশ্চয়ই।

আকাশ পরিষ্কার আজকে। মেঘের ছিটেফোঁটা নেই কোথাও। শুষ্ক বাতাস কিছুক্ষণ পরপর চাবুকের মতো আছড়ে পড়ছে চামড়ায়। ২২ নং রুটের গাড়ির কোলাহল কবরস্থানের ঘুমন্ত অধিবাসীদের কোন সমস্যা করছে না।

এখনও কারো চিহ্ন নেই কোথাও।

নির্দিষ্ট রাস্তাটা খুঁজে বের করে পূর্বদিকে হাঁটতে শুরু করলো ম্যাকগুয়ান। সারি সারি পাথরের ফলক পার হবার সময় আপনা আপনিই পড়তে শুরু করলো জন্ম আর মৃত্যুর সালগুলো। কে কত বছর বেঁচেছে সেটারও হিসেব শুরু হয়ে গেল মস্তিষ্কে। একটা পরিচিত নাম দেখে হাঁটার গতি কিছুটা ধীর হয়ে গেল তার। ড্যানিয়েল স্কিনার। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ১৩। তার কবরফলকের পাশে একটা হাস্যোজ্জ্বল অ্যাঞ্জেল মূর্তি। সেটা দেখে না হেসে পারলো না ম্যাকগুয়ান। স্কুলের সবচেয়ে বাজে ছেলেদের একজন ছিল এই স্কিনার। ফোর্থ গ্রেডের একটা ছেলের পেছনে লেগেই থাকতো সবসময়। বিরক্ত করতে করতে অতিষ্ঠ করে ফেলেছিল। কিন্তু সেই বছর মে'র ১১

তারিখে ফোর্থ গ্রেডের ছেলেটা বাসা থেকে একটা ছুরি নিয়ে এসেছিল। তার একবারের চেষ্টাতেই ওটা হৃৎপিণ্ডে গেঁথে যায় স্কিনারের।

বিদায়, অ্যাঞ্জেল।

চিন্তাটা ঝেটিয়ে বিদায় করার চেষ্টা করে ম্যাকগুয়ান।

সবকিছুর শুরু কি তখনই?

সামনে এগিয়ে চললো সে। কিছুদূর গিয়ে বামে মোড় নিয়ে হাঁটার গতি ধীর করলো। আর বেশি দূরে না জায়গাটা। আশপাশে নজর বুলালো একবার। এখনও কোন নড়াচড়া চোখে পড়ছে না। আগে থেকেই জায়গাটা ভীষণ চুপচাপ। অবশ্য এখানকার অধিবাসীদের সেটা নিয়ে কোন আক্ষেপ নেই। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে আবারো বামে ঘুরে ঠিক কবরটার কাছে গিয়ে থামলো সে। ফলকে লেখা নাম আর তারিখটা পড়লো। পুরনো একটা স্মৃতির কথা মনে হচ্ছে বারবার। তার মনে ঠিক কী চলছে সেটা নিজেও বলতে পারবে না। এসব নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই। ঘোস্ট আশেপাশেই কোথাও আছে, অনুভব করতে পারছে সে।

"ফুল নিয়ে আসা উচিত ছিল তোমার, ফিলিপ।"

কণ্ঠটা শুনেই রক্ত হিম হবার যোগাড় হলো ম্যাকগুয়ানের। ধীরে ধীরে পেছনে ঘুরে তাকালো সে। হাতে ফুল নিয়ে এগিয়ে আসছে জন অ্যাসেল্টা। সরে দাঁড়ালো ম্যাকগুয়ান। একবার চোখাচোখি হলো অ্যাসেল্টার সাথে। মনে হচ্ছে কেউ যেন খামচে ধরেছে তার হৃদয়টা।

"অনেক দিন পর," ঘোস্ট বললো।

অ্যাসেল্টা, যাকে ঘোস্ট নামে চেনে ম্যাকগুয়ান, এগিয়ে গেল কবরফলকের দিকে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে ম্যাকগুয়ান। ঘোস্ট পাশে দিয়ে হেঁটে যাবার সময় আশপাশের তাপমাত্রা তিরিশ ডিগ্রী কমে গেল যেন।

শ্বাস আটকে রেখেছে ম্যাকগুয়ান।

হাঁটু গেড়ে বসে ফুলগুলো আলতো করে নামিয়ে রাখলো ঘোস্ট। চোখ বন্ধ করে এক মুহূর্ত সেখানেই বসে থাকলো। এরপর উঠে দাঁড়িয়ে কবরফলকে এমন ভঙ্গিতে হাত বুলালো যেন খুব প্রিয় কাউকে আদর করছে।

দেখেও না দেখার ভান করছে ম্যাকগুয়ান।

ঘোস্টের গায়ের রঙ অতিরিক্ত ফ্যাকাসে। চেহারার নিচে নীল শিরাগুলো দপদপ করছে। চোখ প্রায় বর্ণহীন। সরু কাঁধের তুলনায় মাথাটা বেশি বড়। দেখলে বাঘের কথা মনে হয়। মাথার দুপাশে শেভ করা, মাঝে বাদামি চুলের গোছা ঝর্ণার মতো নেমে গেছে। একটা মেয়েলী ভাব আছে তার শারীরিক গঠনে। ড্রেসডেন পুতুলগুলোর কথা মনে পড়ে যায়।

আরেক পা পিছিয়ে গেল ম্যাকগুয়ান।

মাঝে মাঝে আমরা এমন কিছু ব্যক্তির মুখোমুখি হই যাদের ভেতরকার সৎ ব্যক্তিত্ব তীব্র আলোর ঝলকানির মতো ঘিরে রাখে তাদেরকে। আবার

মাঝে মাঝে এর সম্পূর্ণ উল্টোটা ঘটতেও দেখা যায়। কারো কারো উপস্থিতি ঘোর অন্ধকারের কথা মনে করিয়ে দেয়।

"কী চাই তোমার?" ম্যাকগুয়ান জিজ্ঞেস করলো।

"ভয় পেলে মানুষের মন থেকে অবিশ্বাস দূর হয়ে যায়, এটা জানো তো?"

"হ্যাঁ।"

"ভুল একটা কথা," ঘোস্ট বললো। "বরং উল্টোটাই সত্যি। বিপদে পড়লে, মৃত্যুর মুখোমুখি হলে বোঝা যায় যে ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই। এজন্যেই তখন মনেপ্রাণে লড়াই শুরু করে মানুষ। বাঁচার আশায়। আরেকবার প্রাণভরে শ্বাস নেবার আশায়। সাহায্য চায় দৈবের কাছে, কারণ মৃত্যু কারোই কাম্য নয়। মনে মনে কিন্তু ঠিকই জানে যে মৃত্যুই সর্বশেষ পরিণতি, এর পরে আর কিছু নেই। না স্বর্গ, না নরক। শুধু শূন্যতা।"

ম্যাকগুয়ানের দিকে মাথা উঁচু করে তাকালো ঘোস্ট।

"তোমাকে অনেক মিস করেছি, ফিলিপ।"

"কী চাও তুমি, জন।"

"আমার ধারণা তুমি জানো।"

আসলেও জানে ম্যাকগুয়ান, কিন্তু কিছু বললো না।

"তুমি বিপদে আছো, সেটা জানি," ঘোস্ট বললো।

"কী শুনেছো?"

"ছাড়া ছাড়া কথা," হেসে বললো ঘোস্ট। সরু ঠোঁটের হাসিটা অপার্থিব ঠেকলো ম্যাকগুয়ানের কাছে। খুব কষ্ট করে শান্ত রাখলো নিজেকে। "সেজন্যেই ফিরে এসেছি আমি।"

"সমস্যাগুলো তো আমার।"

"কথাটা যদি আসলেও সত্য হতো ফিলিপ, আমার চেয়ে খুশি আর কেউ হতো না।"

"কী চাও তুমি, জন?"

"নিউ মেক্সিকোতে তুমি যে দুজনকে পাঠিয়েছিলে, তারা ব্যর্থ হয়েছে। তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু আমি ব্যর্থ হবো না," ফিসফিসিয়ে বললো ঘোস্ট।

"আমি এখনও বুঝতে পারছি না যে তুমি কী চাইছো।"

"এতে যে আমারো ঠেকা আছে, সে ব্যাপারে তো তুমিও একমত?"

উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছে ঘোস্ট। অবশেষে মাথা নাড়লো ম্যাকগুয়ান। "আছে বোধহয়।"

"তোমার হাত অনেক লম্বা, ফিলিপ। এমন সব তথ্য জানতে পারবে যা আমার পক্ষে সম্ভব নয়," আবারো কবর ফলকটার দিকে তাকালো ঘোস্ট।

এক মুহূর্তের জন্যে ম্যাকগুয়ানের মনে হলো সে আসলেও স্বাভাবিক কারো সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

"তুমি কি নিশ্চিত যে সে ফিরে এসেছে?"

"হ্যাঁ," বললো ম্যাকগুয়ান।

"কীভাবে জানলে?"

"এফবিআইয়ের একজনের কাছ থেকে। নিশ্চিত হবার জন্যে অ্যালবাকার্কিতে পাঠানো হয়েছিল তাদের।"

"শত্রুকে খাটো করে দেখেছিল তারা।"

"তাই তো মনে হচ্ছে।"

"কোথায় পালিয়েছে জানো?"

"জানার চেষ্টা চালাচ্ছি।"

"মন থেকে চেষ্টা করছো না।"

ম্যাকগুয়ান কিছু বললো না।

"সে আবারো উধাও হয়ে গেলে বোধহয় তুমি খুশি হবে?"

"তাহলে সবকিছু সহজ হবে একটু।"

মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিল ঘোস্ট। "এবার হবে না।"

আবারো নীরব হয়ে গেল চারপাশ।

"সে কোথায় আছে এটা কে জানতে পারে?" ঘোস্ট জিজ্ঞেস করলো।

"ওর ভাই জানতে পারে। এফবিআইয়ের লোকজন তুলে নিয়ে গেছে তাকে ঘণ্টাখানেক আগে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে।"

এই কথাটা প্রভাব ফেললো ঘোস্টের ওপরে। "কীসের জন্যে জিজ্ঞাসাবাদ?"

"আমরা এখনও জানি না।"

"তাহলে এখান থেকেই কাজ শুরু করতে পারি আমি," নরম সুরে বললো ঘোস্ট।

কোনমতে মাথা নাড়লো ম্যাকগুয়ান। আর তখনই তার দিকে এগিয়ে এলো ঘোস্ট। হাত বাড়িয়ে দিল। পুরো শরীর কেঁপে উঠলো ম্যাকগুয়ানের। জমে গেছে একদম।

"পুরনো বন্ধুর সাথে হাত মেলাতে ভয় পাচ্ছো?"

আসলেও পাচ্ছে। আরেক পা এগিয়ে এলো ঘোস্ট। অনিয়মিত শ্বাস ফেলছে ম্যাকগুয়ান। ট্যানারকে সিগন্যাল দেবে নাকি ভাবলো।

একটা বুলেটই এসবের ইতি টানতে পারে। একটা বুলেট।

"হাত মেলাও, ফিলিপ।"

এই আদেশ বরখেলাপের সাহস নেই ম্যাকগুয়ানের। ইচ্ছের বিরুদ্ধেই ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে দিল সে। ঘোস্ট যে অগণিত মানুষ মেরেছে সেটা জানা আছে তার। খুব বেশি কষ্টও করতে হয়নি তাকে। খুনি না, সাক্ষাৎ মৃত্যু

বলা হয় ঘোস্টকে। ঘোস্টের সামান্য স্পর্শে মনে হয় যেন পুরো শরীরের রক্ত বিষ হয়ে গেছে। স্কিনারের হৃৎপিণ্ডে যেরকম অনায়াসে ছুরিটা চালিয়ে দিয়েছিল সে, ঠিক সেভাবেই অন্য যে কারো বুকে ছুরি বসাতে পারবে।

চোখ নামিয়ে নিল ম্যাকগুয়ান।

আরেকটু সামনে এগিয়ে এসে শক্ত করে ম্যাকগুয়ানের হাত ধরলো ঘোস্ট। দাঁতে দাঁত চেপে চিৎকার করা থেকে নিজেকে আটকালো ম্যাকগুয়ান। হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করেও লাভ হলো না। ঢিল পড়ছে না ঘোস্টের হাতের মুষ্ঠিতে।

এসময় ম্যাকগুয়ান টের পেল যে শীতল কিছু একটা স্পর্শ করছে তার হাতের তালু।

আরো শক্ত করে ম্যাকগুয়ানের হাত চেপে ধরলো ঘোস্ট। ব্যাথায় অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এলো ম্যাকগুয়ানের মুখ দিয়ে। ঘোস্টের হাতে যা-ই থাকুক না কেন, সেটা বেয়নেটের মতো চেপে বসছে। এক হাঁটু গেড়ে বসে পড়তে বাধ্য হলো ম্যাকগুয়ান।

ওর চোখ তুলে তাকানো অবধি অপেক্ষা করলো ঘোস্ট। চোখাচোখি হলো দুজনের। ম্যাকগুয়ানের মনে হলো তার ফুসফুস দুটা কাজ করা বন্ধ করে দেবে যে কোন মুহূর্তে। একে একে অকেজো হয়ে যাচ্ছে শরীরের সব অঙ্গ। অবশেষে ঢিল দিল ঘোস্ট। ম্যাকগুয়ানের হাতে ধারালো কিছু রেখে আঙুলগুলো সেটার ওপর ভাঁজ করে দিল। পেছনে সরে গেল এরপর।

"একাই বোধহয় ফিরতে হবে তোমাকে, ফিলিপ।"

"মানে?" কোনমতে বললো ম্যাকগুয়ান।

জবাব না দিয়ে ঘুরে সেখান থেকে চলে গেলো ঘোস্ট। নিচে তাকিয়ে হাতের মুঠো খুললো ম্যাকগুয়ান।

ট্যানারের সোনার আঙটিটা চকচক করছে সেখানে।

সাত

পিস্টিলোর সাথে মিটিং শেষ হলে ভ্যানে চেপে বসলাম আমি আর স্কয়ার্স। "তোমার বাসায়?" জিজ্ঞেস করলো ও।

মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"কান খোলা আছে আমার।"

পিস্টিলোর সাথে যা যা কথা হয়েছে সব বিস্তারিত খুলে বললাম ওকে।

আনমনে মাথা ঝাঁকালো স্কয়ার্স। "অ্যালবাকার্কি? জায়গাটা খুবই অপছন্দ আমার। কখনো গিয়েছো?"

"না।"

"টেক্সাস আর নিউ মেক্সিকোর অদ্ভুত একটা মিশ্রণ জায়গাটা।"

"কথাটা মনে থাকবে আমার, স্কয়ার্স।"

"শিলা কবে গেল ওখানে?"

"জানি না," বললাম।

"চিন্তা করো। গত উইকেন্ডে কোথায় ছিলে?"

"লিভিংস্টোনে।"

"আর শিলা?"

"ওর তো শহরে থাকার কথা ছিল।"

"ফোন দিয়েছিলে?"

ভাবলাম কিছুক্ষণ। "না, ও ফোন দিয়েছিল আমাকে।"

"কলার আইডি?"

"নম্বরটা ব্লকড দেখাচ্ছিল।"

"কেউ কি নিশ্চিত করতে পারবে যে ও শহরে ছিল?"

"মনে হয় না।"

"তাহলে অ্যালবাকার্কিতে যাওয়া ওর পক্ষে অসম্ভব না," স্কয়ার্স বললো।

আমার মাথায়ও এই কথাই ঘুরছিলো। তবে মুখে আনলামনা সেটা। "অন্য ব্যাখাও তো থাকতে পারে," বললাম।

"যেমন?"

"আঙুলের ছাপগুলো হয়তো পুরনো।"

ভ্রুজোড়া কুঁচকে ফেললো স্কয়ার্স, এখনও রাস্তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

"হয়তো অ্যালবাকার্কিতে গত মাসে বা গত বছর গিয়েছিল?" বললাম। "কতদিন পর্যন্ত আঙ্গুলের ছাপ থাকে?"

"লম্বা সময় বোধহয়।"

"তাহলে এরকমই কিছু হয়েছে," বললাম। "অথবা কোন ফার্নিচারে ওর হাতের ছাপ লেগে ছিল। সেটা নিউ ইয়র্ক থেকে ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

"একটু অতি কল্পনা হয়ে যাচ্ছে," সানগ্লাস ঠিক করে বললো স্কয়ার্স।

"কিন্তু অসম্ভব না।"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আবার এটাও হতে পারে যে কেউ ওর আঙ্গুলগুলো ধার নিয়েছিল। উইকেন্ডে অ্যালবাকার্কিতে ব্যবহার করে আবার ফেরত দিয়েছে।"

আমাদের অতিক্রম করে গেল একটা ট্যাক্সি। ডান দিকে মোড় নিল স্কয়ার্স। আরেকটু হলেই পাঁচ ছয়জনের একটা দলের ওপর উঠে যাচ্ছিল গাড়ি। এটা ম্যানহাটানের লোকজনের বদভ্যাস। ট্রাফিক লাইটের পরোয়াই করে না কেউ। সবসময় তাড়াহুড়ো।

"শিলাকে তো চেনো তুমি," বললাম।

"হ্যাঁ।"

"তোমার কি আসলেও মনে হয় যে ও কাউকে খুন করতে পারে?" কষ্ট হলেও কথাগুলো বললাম।

লম্বা একটা সময় চুপচাপ গাড়ি চালালো স্কয়ার্স। একটা মোড়ে লাল বাতি চোখে পড়ায় গাড়ি থামালো। "তোমার ভাইয়ের ঘটনাটার ব্যাপারে কথা বলছো মনে হচ্ছে।"

"স্কয়ার্স," বললাম। "আমি শুধু বোঝাতে চাচ্ছি যে অন্য সম্ভাবনাও থাকতে পারে।"

"আর আমি বোঝাতে চাচ্ছি, তোমার মাথা ঠিকমতো কাজ করছে না, উইল।"

"মানে?"

"একটু আগে কী বলেছো, মনে আছে? নিউ ইয়র্ক থেকে একটা চেয়ার অ্যালবাকার্কিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেখানে শিলার হাতের ছাপ থাকতে পারে। গত রাতে শিলা কাঁদতে কাঁদতে দুঃখ প্রকাশ করেছে তোমার কাছে। আর সকাল বেলা উধাও হয়ে গেল। এখন এফবিআইয়ের লোকেরা এসে বলছে যে ক্রাইম সিনে ওর হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। চেয়ার, আসলেই?"

"এর অর্থ এটা নয় যে ও কাউকে খুন করেছে।"

"এর অর্থ," স্কয়ার্স বললো, "সে কোন না কোন ভাবে জড়িত।"

কথাটা মানতে কষ্ট হলেও, তর্ক করলাম না। সিটে হেলান দিয়ে জানালার বাইরে তাকালাম।

"কী ঘটতে পারে, স্কয়ার্স?"

"কিছু বুঝতে পারছি না।"

আবারো নীরবে কিছুদূর এগিয়ে গেল গাড়িটা।

"ওকে ভালোবাসি আমি।"

"জানি।"

"হয়তো আমাকে মিথ্যে বলেছে ও।"

"হয়তো।"

প্রথম যে রাতটা একসাথে কাটিয়েছিলাম সেদিনকার কথা ভাবলাম। বিছানায় আমার বুকের ওপর মাথা দিয়ে শুয়ে ছিল শিলা। এক হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছিলাম ওকে। সেদিনের সেই অপার্থিব অনুভূতির কথা কোনদিন ভুলতে পারবো না। ঐ মুহূর্তটা ছিল একান্তই আমাদের। "অতীত বলতে কিছু নেই আমার," কোমল সুরে বলেছিল ও, যেন নিজেকেই প্রবোধ দিচ্ছে। কেন কথাটা বললো জিজ্ঞেস করেছিলাম, কিন্তু উত্তর পাইনি। আমার বুকে মাথা রেখে অন্য দিকে তাকিয়ে ছিল বাকিটা সময়।

"ওকে খুঁজে বের করতে হবে আমাকে," বললাম।

"হ্যাঁ, জানি।"

"তুমি সাহায্য করবে?"

কাঁধ ঝাঁকালো স্কয়ার্স। "আমাকে ছাড়া এমনিতেও কাজটা করতে পারবে না।"

"তা ঠিক," বললাম। "তাহলে আমাদের কী করা উচিত প্রথমে?"

"পুরনো একটা প্রবাদ শুনেছো নিশ্চয়ই?" স্কয়ার্স বললো, "সামনে যাবার আগে পেছনে তাকাতে হয়।"

"এটা কি এখন বানালে?"

"হ্যাঁ।"

"যুক্তি আছে অবশ্য।"

"উইল?"

"কী?"

"অতীত ঘাটলে অনেক সময় এমন জিনিস বেরিয়ে আসে যা মেনে নেয়াটা একটু কষ্টকর হয়ে পড়ে।"

"সেটা তো মেনে নিতেই হবে," ভুল কিছু বলেনি স্কয়ার্স।

আমাকে বাসায় নামিয়ে দিয়ে কোভেন্যান্ট হাউজের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল সে। অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে চাবিটা টেবিলে ঢিল দিয়ে রাখলাম। আরেকটু

হলেই শিলার নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠছিলাম। অন্তত নিশ্চিত হওয়া যেত ও আসলেই বাসায় নেই। শেষ মুহূর্তে ওরকম কিছু করলাম না। বড্ড বেশি খালি খালি লাগছে অ্যাপার্টমেন্টটা। গত চার বছর ধরে যে জায়গাটাকে নিজের বাসা ঠাউরাচ্ছি, সেটা হঠাৎ করেই অচেনা ঠেকছে। মনে হচ্ছে, অনেকদিন ধরে খালি পড়ে ছিল জায়গাটা।

কী করবো এখন?

ভালোমতো খুঁজে দেখা যাক, কোন সূত্র পাই কিনা। হঠাৎই একটা চিন্তা মাথায় আসায় থমকে গেলাম কয়েক মুহূর্তের জন্যে। খুব সহজ জীবন-যাপন করতো শিলা। ছোটখাটো সব ব্যাপারেও আনন্দ পেতো। আমাকেও তেমনটা করতে শিখিয়েছিলো। আমরা যখন একসাথে থাকা শুরু করি, সাথে করে একটা মাত্র স্যুটকেস নিয়ে এসেছিল। অর্থকষ্টে আছে, সেরকম কিছু নয়। ওর ব্যাঙ্কের স্টেটমেন্ট দেখেছি আমি কয়েকবার। অ্যাপার্টমেন্টের খরচও ঠিকঠাক দিত। কিন্তু শিলার আচার-আচরণ মিনিমালিস্টদের মতো। তাদের দর্শনে বিশ্বাসী ছিল বলা যায়। যত কম জিনিস, তত ভালো। আগে এ ব্যাপারে খুব বেশি ভাবিনি, কিন্তু এখন সবকিছু অন্য দৃষ্টিতে দেখতে হচ্ছে। কম জিনিসের অর্থ, কোথাও শেকড় গাড়বে না। চাইলেই সরে যাওয়া যাবে।

বেডরুমের চেয়ারের ওপর ঝুলছে আমার অ্যামহার্স্ট কলেজ সোয়েটশার্টটা। ওটা হাতে নিতেই বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। হোমকামিং উইকেন্ডটা আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ওখানে কাটিয়েছিলাম আমরা। অ্যামহার্স্ট ক্যাম্পাসের পাশে একটা পাহাড় আছে। ছাত্রছাত্রীরা খুব বেশি জটিলতার মধ্যে না গিয়ে 'দ্য হিল' বলেই ডাকে ওটাকে।

একরাতে আমি আর শিলা হাত ধরাধরি গোটা ক্যাম্পাস চক্কর দেই। পাহাড়ের নরম সবুজ গাছের ওপরে শুয়ে আকাশ দেখি অনেকক্ষণ। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা হয় আমাদের। এতটা প্রশান্তি আগে কখনো অনুভব করিনি। প্রশান্তি আর চিত্তসুখ।

হঠাৎ করেই প্রথমে আমার পেটে এরপর প্যান্টের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দেয় শিলা। ওর দিকে তাকিয়ে দেখি ঠোঁটের কোণে দুষ্ট একটা হাসি।

"ভার্সিটির দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, নাকি?"

মিথ্যে বলবো না, ব্যাপারটা আসলেও উপভোগ করছিলাম। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে, আমার প্যান্টের ভেতরে ওর হাত থাকা অবস্থায় বুঝতে পারি যে, ওর মতো কাউকেই খুঁজে গিয়েছি সারাজীবন। কোন সন্দেহ ছিল না সে ব্যাপারে। একজন আদর্শ জীবনসঙ্গী। আমার প্রথম প্রেম, শিলার আগে যাকে ভালোবেসেছিলাম, কখনো অন্য কোন সম্পর্কে জড়াতে দেয়নি। সেদিন সেই অশুভ ছায়া কেটে গিয়েছিল আমার ওপর থেকে।

সোয়েটশার্টটা দেখে সেদিনের কথা মনে পড়ে গেল। ঘাসের সেই মাতাল করা ঘ্রাণ, তারার মেলা–কখনো ভুলবো না। ওটা চেপে ধরে আবারো

নিজেকে প্রশ্নটা করলাম, সবই কি আসলে মিথ্যে ছিল? পিস্টিলোর সাথে সাক্ষাতের পর থেকে কয়েক হাজার বার নিজেকে জিজ্ঞেস করেছি এটা।

না।

এরকম ব্যাপারে ফাঁকি দেয়া যায় না। মানুষের সহিংস কাজের ব্যাপারে স্কয়ার্স হয়তো ভুল বলেনি। কিন্তু আমার আর শিলার আত্মার যে বন্ধন, সেটা মিথ্যে ছিল না।

চিরকুটটা এখনও কাউন্টারের ওপর রাখা।

সবসময় ভালোবেসে যাবো তোমাকে।

এটা বিশ্বাস করতেই হবে আমাকে। এটুকু শিলার প্রাপ্য। ওর অতীতের ওপর আমার তো কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, এর পেছনে যুক্তিযুক্ত কারণ ছিল নিশ্চয়ই। আমাকে ভালোবাসে ও। খুব ভালো করেই জানি সেটা।

এখন আমার কাজ হচ্ছে ওকে খুঁজে বের করা, সাহায্য করা। কীভাবে আবারো সবকিছু আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় সেই পথ খুঁজে বের করতে হবে।

ওকে সন্দেহ করবো না আমি।

ড্রয়ারগুলো হাতিয়ে দেখলাম। শিলার একটাই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আর একটাই ক্রেডিট কার্ড–অন্তত আমার জানামতে। কিন্তু পুরনো কোন ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্ট, রিসিট বা ব্যাঙ্কবুক চোখে পড়লো না। সবকিছু ফেলে দিয়েছে।

মাউসে হাত দিতেই মনিটর থেকে উধাও হয়ে গেল স্ক্রিনসেভারটা। শিলার অ্যাকাউন্টে সাইন-ইন করে 'ওল্ড মেইল'-এ ক্লিক করলাম। কিছুই নেই সেখানে। একটা মেইলও না। অদ্ভুত। শিলা ইন্টারনেট খুব একটা ব্যবহার করে না। তাই বলে একটা ইমেইলও থাকবে না?

ফাইলিং কেবিনেটগুলো দেখলাম, ওখানেও কিছু নেই। বুকমার্ক করা ওয়েবসাইটগুলোয় ঢুকলাম। হিস্টোরি দেখলাম। সব খালি।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে স্ক্রিনের দিকে তাকালাম। একটা চিন্তা ঘুরছে আমার মাথায় বেশ কিছুক্ষণ ধরে। ব্যাপারটা কি বিশ্বাসঘাতকতা হয়ে যাবে? হলে হোক। অতীত ঘাঁটার ব্যাপারে স্কয়ার্স ভুল কিছু বলেনি। সামনে এগোতে হলে আসলেও আগের সবকিছু জানতে হবে। আর সেক্ষেত্রে এমন কিছু জানতে হতে পারে যা হয়তো আমার ভালো লাগবে না।

Switchboard.com-এ লগইন করলাম। একটা অনলাইন টেলিফোন ডিরেক্টরি। নামের ঘরে লিখলাম–রজার্স। স্টেট–আইডাহো। শহর–ম্যাসন। কোভেন্যান্ট হাউজে ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করার জন্যে ও যে কাগজপত্র জমা দিয়েছিল সেখান থেকে এটুকু জানা আছে আমার।

একটাই হিট হলো। ফোন নম্বরটা টুকে নিলাম কাগজে। হ্যাঁ, শিলার বাবা-মাকে ফোন দেব আমি। অতীতের ব্যাপারে যখন খোঁজ খবর নিচ্ছি, ভালো করেই করা যাক কাজটা।

ফোনের রিসিভারটা তুলতে যাবো এমন সময় বেজে উঠলো ওটা। "কী করছো তুমি?" রিসিভার কানে ঠেকাতেই মেলিসার কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

তাৎক্ষণিক বলার মতো মাথায় কিছু আসলো না। অগত্যা, "একটা কাজে আটকা পড়েছি," বলে কাজ চালালাম।

"উইল," বড় বোনসুলভ কণ্ঠে বললো ও। "আমাদের মা মারা গেছে কয়েকদিন আগে।"

চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

"বাবা তোমার খোঁজ করছে। আসতেই হবে তোমাকে।"

অচেনা, জীর্ণ অ্যাপার্টমেন্টটায় নজর বুলালাম। এখানে বসে সময় নষ্ট করার কোন মানে নেই। পকেটে থাকা আমার ভাইয়ের ছবিটার ব্যাপারেও ভাবলাম কিছুক্ষণ।

"এক্ষুনি আসছি।"

"শিলা কোথায়?" দরজায় আমাকে একা দেখে জিজ্ঞেস করলো মেলিসা।

কোনমতে ব্যস্ততার অজুহাত দেখিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

আজকে আসলেও পরিবারের বাইরের কেউ একজন এসেছে। বাবার পুরনো বন্ধু, লুউ ফারলি আঙ্কেল। গত দশ বছরে বোধহয় তাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করছে দুই বুড়ো। একটা পুরনো সফটবল দলের ব্যাপারে আলাপ চলছে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। খুব ছোটবেলায় বাবাকে পলিএস্টারের তৈরি একটা জার্সিতে দেখার স্মৃতি আবছাভাবে মনে পড়লো। স্থানীয় একটা আইসক্রিম কোম্পানি লোগো আঁকা ছিল ওটার সামনের দিকে। ড্রাইভওয়েতে তার বুটের শব্দ এখনও কানে বাজে আমার। অনেক বছর আগের কথা। দুজনেই হাসছে এখন। বাবাকে এভাবে হাসতে দেখিনি অনেকদিন। আমার মা-ও মাঝে মাঝে তাদের খেলা দেখতে যেত। মনের চোখে তাকে দর্শকের সারিতে বসে থাকতে দেখলাম।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেই মনে হচ্ছে শিলাকে দেখতে পাবো। হয়তো গোটা ব্যাপারটাই বড়সড় কোন ভুল বোঝাবুঝি।

মায়ের অনেকদিন ধরেই ক্যান্সার, তাই তার আসন্ন মৃত্যুর ব্যাপারে মনে মনে প্রস্তুত ছিলাম সবাই। শেষদিকে অবশ্য খুব তাড়াতাড়ি খারাপের দিকে গড়িয়েছে পরিস্থিতি। তবুও মেনে নেয়াটা কষ্টকর।

শিলা।

এর আগেও ভালোবেসে হারিয়েছি একজনকে। এসব ব্যাপারে আমার ধ্যান ধারণা হয়তো সেকেলে ঠেকবে অনেকের কাছে। একজন আদর্শ

জীবনসঙ্গী-এই কথাটায় আসলেও বিশ্বাস করি আমি। প্রত্যেকের জীবনেই প্রথম প্রেম আসে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে প্রথম প্রেম বড়সড় একটা ক্ষত রেখে যায় হৃদয়ে। ভেবেছিলাম এই ক্ষত হয়তো কখনোই শুকোবে না। এর পেছনে কারণও আছে। শেষটা অসম্পূর্ণ ছিল আমাদের সম্পর্কের, অন্তত আমার জন্যে। আমাকে যখন ও ছেড়ে গিয়েছিল (হ্যাঁ, সেটাই মনে হয় আমার), ভেবেছিলাম, বাকি জীবনটায় হয়তো সেরকম কাউকে আর খুঁজে পাবো না। একাই থাকতে হবে।

কিন্তু শিলা এলো আমার জীবনে।

শিলার সবুজ চোখের কথা ভাবতে লাগলাম। লাল, রেশমি চুলগুলোর ভীষণ ভক্ত ছিলাম আমি। আর শারীরিক আকর্ষণ-ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। শুরুতে ওর ব্যাপারেই ভাবতাম সারাদিন। প্রজাপতির দল সারাদিন নেচে বেড়াতো পেটের ভেতরে। যখনই ওর চেহারায় চোখ পড়তো, বুকের ভেতর হৃদয়টা লাফিয়ে উঠতো যেন। ভ্যানে চড়ে স্কয়ার্সের সাথে কোথাও যাচ্ছি, কিন্তু হারিয়ে গেছি ওর ভাবনায়। সেজন্যে স্কয়ার্সের হাতে ঘুষিও খেতে হয়েছে অনেকবার। মজা করে স্কয়ার্স প্রায়ই বলে যে সেসময় নাকি শিলা-ল্যান্ডে হারিয়ে যাই আমি। ভিসিআরে একসাথে পুরনো সিনেমা দেখতাম দুজনে। আবার পজ বাটনটার উপযুক্ত ব্যবহার করতেও ভুলতাম না।

হাতে হাত রেখে হাঁটা আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। প্রায়ই লম্বা একটা দূরত্ব হেঁটে পাড়ি দেয়ার সময় পথচারীদের ব্যাপারে ফিসফিস করে কথা বলতাম। কোন পার্টিতে গেলে এক কোনা থেকে তাকিয়ে থাকতাম ওর দিকে। অন্যদের সাথে কীভাবে কথা বলছে, কীভাবে হেঁটে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাচ্ছে-এসব গেঁথে নিতাম মনের পর্দায়। যখনই চোখাচোখি হতো, সেই হাসিটা ফুটতো ওর মুখে। আর বুকের ভেতরে মোচড় দিয়ে উঠতো আমার।

শিলা একবার আমাকে দিয়ে একটা পত্রিকার জরিপের ফর্ম পূরণ করিয়েছিল। সেখানে একটা প্রশ্ন ছিল-আপনার ভালোবাসার মানুষটার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা কী? এক মুহূর্ত ভেবে লিখেছিলাম-"প্রায়ই রেস্তোরাঁয় গেলে ছাতা রেখে আসে।" জবাবটা খুবই পছন্দ হয়েছিল ওর। জোরাজুরি শুরু করে আরো কিছু লেখার জন্যে। তখন ওকে মনে করিয়ে দেই বয় ব্যান্ড আর পুরনো অ্যাব্বা রেকর্ডগুলোর কথা। গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলে যে অন্য কিছু শোনা উচিত তার।

অতীত বাদে অন্য সব ব্যাপারে কথা বলতাম আমরা। কাজের খাতিরে এই ব্যাপারটার সাথে আগে থেকেই পরিচিত আমি। সেজন্যেই একবারের বেশি দুবার ভাবিনি এসব নিয়ে। এখন ভাবলে অবাক লাগে, কিন্তু তখন কোন কিছু অস্বাভাবিক মনে হয়নি। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির কাউকে মন্তব্য করতে বললে অবশ্যই রহস্যের ঘ্রাণ পাবে। আমরা এমন আচরণ করতাম যেন

আমাদের জন্মই হয়েছে যেদিন আমাদের প্রথম দেখা হয়েছে–সেদিন। অতীত বলে কিছু নেই।

জানি, বড্ড খেলো শোনাচ্ছে।

মেলিসা বসে আছে বাবার পাশে। তাঁদের দুজনকেই লক্ষ্য করলাম ভালো করে। চেহারায় অসম্ভব মিল। আমার চেহারা অবশ্য মার দিকে গিয়েছে। বুফে টেবিলের আশপাশে ঘুরঘুর করছে রালফ। অ্যামেরিকার আর দশজন মিডল-ম্যানেজারের সাথে ওর তেমন কোন তফাৎ নেই। সাদা স্যান্ডোগেঞ্জির ওপরে হাফ-হাতা শার্ট আর ঢোলা প্যান্ট সর্বক্ষণের সঙ্গী। চকচকে জুতো, একদিকে সিঁথি করা চুল, সীমিত বুদ্ধি–হ্যাঁ, চাইলে এভাবেই বর্ণনা করা যায় ওকে। গলার টাইটা কখনো ঢিলা করতে দেখিনি।

রালফের সাথে আমার কোন দিক থেকেই মিল নেই। সত্যি কথা বলতে, ওকে আসলে খুব ভালো করে চিনিও না। সিয়াটলে থাকে ওরা, এখানে আসেই না বলতে গেলে। তবুও মেলিসার 'বিদ্রোহী' টিনেজ সময়ের কথা মনের পর্দায় ভেসে ওঠে মাঝে মাঝে। স্থানীয় 'ব্যাড বয়' জিমি ম্যাককার্থির সাথে সম্পর্ক ছিল ওর। তখন ওর চোখে যে চমকটা দেখতাম, সেটা পরে আর কখনো দেখিনি। লোক হাসাতে ওর জুড়ি মেলা ভার ছিল। কেন এভাবে বদলে গেল, সেটা আজীবন একটা রহস্য হয়ে থাকবে আমার কাছে। কি দেখে ভয় পেয়েছিল? লোকে বলে যে বড় হবার সাথে সাথে বোধোদয় হয় মানুষের। কিন্তু আমার ধারণা এক্ষেত্রে অন্য কোন কাহিনি আছে।

মেলিসা (ওকে সবসময়ই মেল বলে ডাকি আমরা) চোখ দিয়ে ইশারা করলো আমাকে। নির্ধারিত জায়গায় চলে এলাম কিছুক্ষণের মধ্যে। পকেটে হাত দিয়ে নিশ্চিত হলাম যে কেইনের ছবিটা এখনও আছে সেখানে।

"রালফ আর আমি কাল সকালে চলে যাবো," বললো ও।

"বেশ তাড়াতাড়ি," বললাম।

"মানে?"

মাথা ঝাঁকালাম জবাবে।

"আমাদের বাচ্চারা আছে। রালফের কাজ আছে।"

"ঠিক বলেছো," আগের সুরেই বললাম। "এসেছিলে এটাই অনেক।"

"একটু বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু," চোখ বড় করে বললো মেল।

আসলেও বাড়াবাড়ি করে ফেলছি। বাবা আর লুউ আঙ্কেলের পাশে বসে কি যেন খাচ্ছে রালফ। হাতে কোলস্লো লেগে আছে। মেলকে সরি বলতে গিয়েও বললাম না। আমাদের তিনজনের মধ্যে ও-ই সবার বড়। কেইনের সাথে ওর বয়সের তফাৎ তিন, আমার সাথে পাঁচ। জুলি খুন হবার পর এখান থেকে চলে যায় মেল। বড্ড কাঠখোট্টা শোনাচ্ছে হয়তো কথাটা, কিন্তু এটাই সত্য। স্বামী-সন্তান নিয়ে দেশের অন্য প্রান্তে পাড়ি জমায় সে। ওর এরকমটা করার পেছনে যে কারণ ছিল, তা মাঝে মাঝে ঠিকই বুঝতে পারি আমি।

তবুও আমাদের ওভাবে একা ফেলে চলে যাওয়ার ব্যাপারটা কখনো ভুলবো না।

পকেটে থাকা কেইনের ছবিটার কথা ভাবলাম আবারো। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম কী করবো। "তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই আমি।"

ক্ষণিকের জন্যে কেঁপে উঠলো মেলিসা। যেন বড় কোন আঘাতের জন্যে প্রস্তুত করছে নিজেকে। কিন্তু সেটা আমার মনের কল্পনাও হতে পারে। ওর সোনালি চুলগুলো কাঁধ অবধি ছড়িয়ে আছে; আর দশজন গৃহিণীর মতোই। রালফ নিশ্চয়ই এরকমটাই পছন্দ করে। আমার কাছে ভালো লাগে না ওর চুলের এই স্টাইল। কেমন যেন ভিনদেশী মনে হয়।

গ্যারেজের দরজার কাছে সরে আসলাম আমরা। পেছনে তাকালাম একবার। বাবা, লুউ আঙ্কেল আর রালফকে এখনও দেখতে পাচ্ছি।

দরজা খুলে ধরলে কৌতূহলী দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে তাকালো মেল, কিন্তু কিছু না বলে পেছন পেছন এলো ঠিকই। গ্যারেজের ভেতরটা বাড়ির অন্যান্য জায়গা থেকে বেশ ঠান্ডা। আমাদের বাড়িটা বেশ পুরনো। এখানে সেখানে রঙ উঠে গেছে, মরচে ধরেছে গ্রিলে। গ্যারেজের ভেতরে স্তূপ করে রাখা পুরনো কার্ডবোর্ড বক্স, গাড়ির চাকা। মেঝেতে তেল আর গ্রিজের কালচে দাগ। ধূলোর কারণে দম নেয়াটাই কষ্টকর। সিলিং থেকে এখনও ঝুলছে একটা দড়ি। কিছু জিনিসপত্র সরিয়ে দড়িটার সাথে একটা বল ঝুলিয়েছিল বাবা, আমার বেইসবল অনুশীলনের জন্যে। ওটা এখনও আছে দেখে অবাক হলাম।

মেলিসা কিন্তু আমার দিক থেকে চোখ সরায়নি।

কীভাবে কথাটা বলবো বুঝতে পারছি না।

"শিলা আর আমি মায়ের পুরনো জিনিসপত্র দেখছিলাম," শুরু করলাম।

চোখজোড়া সরু হয়ে আসলো ওর। সবকিছু বলতে চাইছিলাম ওকে-রাজা হোসেনের সাথে মায়ের ছবি, আমাদের পুরনো জন্মসনদ, পিটিএ কাউন্সিল। কিন্তু কিছুই বেরুলো না মুখ দিয়ে।

তাই আর কথা না বাড়িয়ে পকেট থেকে ছবিটা বের করে ওর চোখের সামনে ধরলাম।

খুব বেশি সময় লাগলো না ওর কেইনকে চিনতে। কিন্তু চেনার সাথে সাথে এমনভাবে দূরে সরে গেল যেন বিষাক্ত কিছু ধরে আছি আমি। শব্দ করে ঢোঁক গিললো একবার, লম্বা শ্বাস নিলো। ওর দিকে এগোতে গেলে হাত উঁচিয়ে থামিয়ে দিল আমাকে। এরপর যখন আমার দিকে তাকালো চেহারায় কোন অভিব্যক্তি খুঁজে পেলাম না। রাগ, হতাশা, বিস্ময়-কিছুই খেলা করছে না ওর চোখ জোড়ায়।

আবারো ছবিটা উঁচিয়ে ধরলাম। তবে এবার একবারের জন্যে চোখের পলকও পড়লো না।

"এটা কেইন," বোকার মতো বললাম।
"সেটা দেখতে পাচ্ছি আমি, উইল।"
"ব্যস, এটুকুই? আর কিছু না?"
"কী করবো আমি?"
"বেঁচে আছে ও। মা জানতো। তার কাছে ছিল ছবিটা।"
নীরবতা।
"মেল?"
"বেঁচে আছে ও," বললো মেলিসা। "শুনেছি।"
ওর এই প্রতিক্রিয়া (নাকি প্রতিক্রিয়ার অভাব বলাটা ঠিক হবে?) রীতিমতো বাকরুদ্ধ করে দিয়েছে আমাকে।
"আর কিছু বলবে?" জিজ্ঞেস করলো মেলিসা।
"আসলেই...আর কিছু বলবে না?"
"আর কী বলার আছে, উইল?"
"ওহ হ্যাঁ, তোমার তো সিয়াটলে ফিরে যেতে হবে।"
"হ্যাঁ।"
আমার থেকে দূরে সরে দাঁড়ালো ও।
পুরনো রাগটা ফিরে এলো আবার। "একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো, মেল। পালিয়ে গিয়ে কি আসলেই কোন লাভ হয়েছিল?"
"পালাইনি আমি।"
"ফালতু কথা।"
"রালফ চাকরি পেয়েছিল ওখানে।"
"ঠিক।"
"তোমার মুখে এসব কথা মানায় না।"
কেইপ কডের মোটেল পুলে আমাদের তিনজনের মার্কো পোলো খেলার কথা মনে হলো। টনি বোনোজা মেলের ব্যাপারে গুজব ছড়ানোর পর কথাটা যখন কেইনের কানে যায়, একদম লাল হয়ে ওঠে ওর চেহারা। বোনোজার বাবার নাম ভুলিয়ে দিয়েছিল সেবার, বয়সে দেড় বছরের বড় হওয়া সত্ত্বেও।
"কেইন বেঁচে আছে," আবারো বললাম।
"আমার কী করা উচিত এটা শুনে?"
"তুমি এমন আচরণ করছো যেন কিছুই যায় আসে না।"
"আসলেও কি যায়-আসে?"
"মানে?"
"কেইন আর আমাদের জীবনের অংশ নয়।"
"তোমার জীবনের অংশ নয়।"
"হ্যাঁ, উইল। কেইন আর আমার জীবনের অংশ নয়, খুশি?"
"ও তোমার ভাই।"

"নিজের জীবনের সিদ্ধান্তগুলো নিজেই নিয়েছিল ও।"

"আর এখন ওকে মৃত ধরে নিতে তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে না?"

"মৃত হলেই কি ভালো হতো না?" চোখ বন্ধ করে মাথা ঝাঁকালো মেল একবার। "হয়তো আমি আসলেও পালিয়ে গিয়েছিলাম উইল। তুমি নিজেও পালিয়েছো। আমাদের সেই সুযোগটা ছিল। আমাদের ভাই একজন খুনি অথবা এগারো বছর আগে মারা গেছে–দুটোর অর্থ একই আমার কাছে।"

আবারো ছবিটা দেখালাম ওকে। "এমনও তো হতে পারে যে ও দোষী না।"

আবারো বড় বোনসুলভ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো মেলিসা। "উইল, এগুলো বলে কি নিজেকে স্বান্তনা দিচ্ছ?"

"আমাদের খেয়াল রাখতো ও, ছোটবেলায়। ভালোবাসতো।"

"আমিও ওকে ভালোবাসতাম। কিন্তু ওর সেই রূপটাও কিন্তু দেখেছিলাম। মারামারি, রক্ত–এসব আকর্ষণ করতো ওকে। তুমিও জানো সেটা। হ্যাঁ, আমাদের হয়েও মারামারি করেছে। কিন্তু তোমার কি একবারের জন্যেও মনে হয়নি ভালো লাগে বলে কাজগুলো করতো ও? তাছাড়া মারা যাবার আগে খুব খারাপ সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল।"

"এগুলোর একটাও কিন্তু ওকে খুনি প্রমাণ করে না।"

আবারো চোখ বন্ধ করে ফেললো মেলিসা। নিজেকে সামলাতে কষ্ট হচ্ছে ওর। "তাহলে সেই রাতে কী করছিলো ও, উইল?"

আমাদের চোখে চোখ রাখলো মেল এবারে। কিছুই বললাম না। হঠাৎ খুব ঠান্ডা লাগছে আমার।

"খুনের কথা ভুলে যাও। কিন্তু জুলির সাথে সেক্স কেন করছিল কেইন?"

ওর কথাগুলো শেলের মতো বিঁধছে আমার হৃদয়ে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। "এক বছর আগে ব্রেক-আপ হয়ে গেছিল আমাদের," ক্ষীণস্বরে বললাম।

"ওকে ভুলে গিয়েছিলে বলছো?"

"আমি...ওর তো আমার প্রতি কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। কেইনেরও না। তাই এসব..."

"কেইন বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তোমার সাথে, উইল। কাপুরুষের মতো আর কতদিন সত্য থেকে পালাবে? তুমি যাকে ভালোবাসতে, তার সাথে শুয়েছিল ও। কোন ভাই এ কাজ করে?"

"আমাদের সম্পর্কটা ভেঙে গিয়েছিল," আবারো বললাম। "জুলির প্রতি আমার আর কোন অধিকার ছিল না।"

"তুমি ভালোবাসতে ওকে।"

"এসবের সাথে ঐ ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই।"

"এখন কে পালিয়ে যাচ্ছে, শুনি?" আমার চোখ থেকে চোখ সরালো না মেল।

পিছিয়ে সিমেন্টের সিঁড়িটার ওপর বসে পড়লাম হতাশ ভঙ্গিতে। দুহাতে মুখ ঢেকেছি আগেই। কিছুক্ষণ সময় লাগলো ধাতস্থ হতে। "তবুও ও আমাদের ভাই।"

"কী করতে চাও তুমি? খুঁজে বের করবে ওকে? পুলিশের হাতে তুলে দিবে? পালিয়ে থাকতে সাহায্য করবে? বলো?"

কোন জবাব নেই আমার কাছে।

আমাকে পাশ কাটিয়ে দরজার কাছে পৌঁছে গেল মেলিসা। দরজাটা খুলে বললো, "উইল?"

তাকালাম ওর দিকে।

"এসব আর আমার জীবনের অংশ নয়। আমি দুঃখিত।"

ওর কিশোরী অবস্থার ছবি ভেসে উঠলো মনের পর্দায়। বাবলগাম ফ্লেভারের পারফিউম দিত ও তখন। কেইন আর আমি একটা খেলা খেলতাম। ফোন কানে যদি উপুড় হয়ে কথা বলতো মেল, তাহলে ধরে নিতাম ছেলেদের নিয়ে বা কোন পার্টি নিয়ে কথা বলছে। কিন্তু চিত হয়ে শুলে ধরে নিতে হবে যে দিবাস্বপ্ন দেখছে। সেই স্বপ্নগুলোর একটাও বোধহয় সত্য হয়নি।

"আই লাভ ইউ," বললাম।

কেঁদে ফেললো মেল, যেন আমার মাথায় কী চলছে সেটা দেখতে পাচ্ছে।

প্রথম প্রেম কখনো ভুলি না আমরা। আমার প্রথম প্রেমের সমাপ্তি হয়েছিল একটা খুনের মাধ্যমে।

জুলি মিলারের সাথে পরিচয় হয়েছিল হাইস্কুলের প্রথম বর্ষে। এর কিছুদিন আগেই লিভিংস্টোনের আসে ওরা। দুই বছর পর ডেটিং শুরু করি আমরা। জুনিয়র আর সিনিয়র প্রমে জুটি হিসেবেই অংশ নেই। ক্লাসের সেরা জুটির তকমা জুটে যায় আমাদের। এক মুহূর্তের জন্যেও আলাদা থাকতাম না।

আমাদের ব্রেক-আপে অবশ্য কেউ অবাক হয়নি। দুজনে আলাদা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। এসব ক্ষেত্রে যা হয়, চোখের আড়াল মানেই মনের আড়াল। যদিও শুরুতে একে অপরকে কথা দিয়েছিলাম যে এই দূরত্ব কোন ফাটল সৃষ্টি করতে পারবে না আমাদের সম্পর্কে। প্রথমদিকে পারেওনি, কিন্তু একসময় বাস্তবতা ঠিকই হানা দেয়। দ্বিতীয় বর্ষে থাকার সময় একদিন ফোন করে ও আমাকে জানায় যে ইতোমধ্যে বাক নামের অন্য একজন ছেলের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে। শেষবর্ষে পড়ে ছেলেটা।

আমার উচিত ছিল তখনই ব্যাপারটা মেনে নেয়া। কিন্তু তরুণ বয়সে কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক তা বেছে নেয়াটা একটু কষ্টসাধ্য। তবে সময়ের

সাথে সাথে ঠিকই মেনে নিতাম। এক পর্যায়ে আমিও অন্য মেয়েদের সাথে ডেটে গিয়েছি। কিছুটা সময় লেগেছে, কিন্তু গিয়েছি ঠিকই। বাস্তবতা মেনে নিচ্ছিলাম ধীরে ধীরে। সময় আর দূরত্ব বড় একটা ভূমিকা পালন করছিল এই ক্ষেত্রে।

কিন্তু তখনই মারা যায় জুলি। আগের অনুভূতিগুলো ফিরে আসে আবারো। মনে হয় যেন ওর ভালোবাসার জাল থেকে বেরুতে পারবো না কোনদিন।

শিলার সাথে দেখা হবার আগ পর্যন্ত এমনটাই ভাবতাম।

বাবাকে আর ছবিটা দেখালাম না।

দশটা নাগাদ ফিরে আসলাম নিজের অ্যাপার্টমেন্টে। এখনও খালি, এখনও অচেনা। ফোনে কোন ভয়েস মেসেজ জমা হয়নি। আইডাহোর সাথে নিউ ইয়র্কের সময়ের পার্থক্য কতক্ষণের? এক ঘণ্টা? নাকি দুই? মনে নেই আমার। তার মানে সেখানে এখন আটটা বা নয়টা বাজছে।

ফোন দেয়াই যায়।

চেয়ারে বসে ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকলাম একদৃষ্টিতে, যেন ওটাই বলবে কী করতে হবে। নম্বর লেখা কাগজটা তুলে নিলাম। শিলাকে যখন ওর বাবা-মাকে ফোন করার কথা বলেছিলাম, চোখমুখ একদম শুকিয়ে গিয়েছিল। গতকালকের কথা এটা। অথচ মনে হচ্ছে কত আগের। কী করা উচিত এখন আমার? প্রথমেই মায়ের সাথে যোগাযোগ করার কথা মনে হলো। সে ঠিকই জানতো।

বেদনা নতুন করে আঁকড়ে ধরলো হৃদয়কে।

কিছু একটা করতেই হবে আমাকে। কিন্তু আপাতত শিলার বাবা-মায়ের সাথে কথা বলা বাদে আর কিছু মাথায় আসছে না।

একজন মহিলা কণ্ঠ ভেসে এলো অপর প্রান্ত থেকে। "হ্যালো?"

"মিসেস রজার্স?" গলা পরিষ্কার করে বললাম।

"জি?" ক্ষণিকের বিরতির পর বললেন তিনি।

"আমার নাম উইল ক্লেইন।"

তিনি নামটা চেনেন কিনা বোঝার জন্যে অপেক্ষা করলাম কিছুক্ষণ। জানলেও কিছু বললেন না ফোনে।

"আমি আপনার মেয়ের বন্ধু।"

"কোন মেয়ে?"

"শিলা," বললাম।

"আচ্ছা," আগের মতো একঘেয়ে স্বরেই বললেন। "ও বোধহয় এখন নিউ ইয়র্কে?"

"জি।"

"আপনি কি সেখান থেকেই ফোন দিয়েছেন?"

"জি?"

"আপনার জন্যে কী করতে পারি আমি, মি. ক্রেইন?"

এটা একটা ভালো প্রশ্ন। আমি নিজেও জানি না। তাই প্রথম যে প্রশ্নটা মাথায় এলো সেটাই করলাম। "আপনি কি জানেন যে ও কোথায়?"

"না।"

"তার সাথে দেখা বা কথা হয়নি আপনার?"

"ওর সাথে অনেক বছর ধরে যোগাযোগ নেই আমার," এবারে খানিকটা ক্লান্ত শোনালো তার কণ্ঠস্বর।

মুখ খুলেও বন্ধ করে নিলাম। চোরাগলিতে মুখ থুবড়ে পড়ছি বারবার। "আপনি কি জানেন যে ওর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না?"

"সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে যোগাযোগ করা হয়েছে আমাদের সাথে।"

ডান কান থেকে বাম কানে চাপালাম রিসিভারটা। "তাদেরকে কি কাজে আসতে পারে এমন কিছু বলেছেন?"

"মানে?"

"আপনার কি ধারণা আছে যে ও কোথায় যেতে পারে? কোন বন্ধু বা আত্মীয়ের বাসায়?"

"মি. ক্রেইন?"

"জি।"

"শিলা অনেক দিন ধরে আমাদের জীবনের অংশ নয়।"

"কেন?"

কথাটা আপনা আপনি বেরিয়ে গেল আমার মুখ দিয়ে। প্রমোদ গুণলাম, এই বুঝি বড়সড় ঝাড়ি শুনতে হয়। কিন্তু সেরকম কিছু হলো না। কোন কথাই বললেন না মিসেস রজার্স। শেষে আমিই আবারো বললাম, "আ-আসলে..." রীতিমতো তোতলাচ্ছি এখন, "ও এত চমৎকার একটা মানুষ।"

"আপনার সাথে ওর সম্পর্কটা বোধহয় বন্ধুত্ব থেকেও গভীর কিছু, তাই না মি. ক্রেন?"

"জি।"

"কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শুনেছি যে ও একটা লোকের সাথে থাকছে। আপনার ব্যাপারেই বোধহয় কথা বলছিল ওরা?"

"আমাদের সম্পর্কটা এক বছরের।"

"আপনার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে ওকে নিয়ে চিন্তিত।"

"আসলেও চিন্তিত।"

"ভালোবাসেন তাহলে ওকে?"

"খুব বেশি।"

"কিন্তু আপনাকে শিলা অতীতের ব্যাপারে কিছু বলেনি।"

এর জবাবে কী বলা যায় ভাবলাম কিছুক্ষণ। কেবল একটা উত্তরই মাথায় এলো। "বোঝার চেষ্টা করছি আমি," বললাম।

"এত সহজ না," বললেন তিনি। "আমি নিজেই বুঝি না।"

আমার প্রতিবেশী ঠিক এই সময়টাই বেছে নিল স্পীকারে গান শোনার জন্যে। বেইজের কারণে দেয়ালসুদ্ধ কাঁপছে। কর্ডলেস ফোন হওয়াতে অ্যাপার্টমেন্টের অন্য প্রান্তে চলে আসলাম।

"ওকে সাহায্য করতে চাই আমি।"

"আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, মি. ক্রেইন?"

তার কণ্ঠস্বরে কিছু একটা ছিল। শক্ত করে চেপে ধরলাম ফোনটা।

"এফবিআইয়ের যে এজেন্ট এসেছিল আমাদের বাড়িতে," বললেন মিসেস রজার্স, "সে বললো যে ওরা নাকি ঘটনাটার ব্যাপারে কিছু জানে না।"

"কোন ঘটনা?" জিজ্ঞেস করলাম।

"কার্লির ব্যাপারটা," মিসেস রজার্স জবাব দিলাম।

"কার্লি কে?" বিভ্রান্ত স্বরে জানতে চাইলাম।

আবারো দীর্ঘ বিরতি। "আপনাকে একটা উপদেশ দেই, মি. ক্রেইন?"

"কার্লি কে?" আবারো জিজ্ঞেস করলাম।

"আমার মেয়ের কথা ভুলে যান। সেটাই ভালো হবে আপনার জন্যে।"

কেটে গেল লাইন।

আট

ফ্রিজ থেকে এক বোতল ঠান্ডা বিয়ার বের করে নিয়ে বারান্দায় চলে এলাম। ভাড়া নেয়ার সময় রিয়েল এস্টেটের লোকটা যে 'বিশাল' বারান্দার কথা বলেছিল, তার সাথে এই বারান্দার খুব কমই মিল খুঁজে পাবেন। বাচ্চাদের ছোট একটা খাটও আটবে না। একজন, খুব বেশি হলে দুজন কোনমতে পাশাপাশি দাঁড়াতে পারবে। চেয়ার ঢোকানোর কোন প্রশ্নই আসে না। সামনের দৃশ্যও খুব একটা সুবিধার না। তবে বাতাসের কমতি নেই। সেটার লোভেই আসা। সূর্যটা সারাদিন উত্তাপ ছড়িয়ে বিদায় নেয়ার পর ভালো লাগে।

নিউ ইয়র্ক শহরে আলোর কোন কমতি নেই। কখনোই ঘুমায় না শহরটা। তবে আমি যেখানে থাকি সেই জায়গাটা মাঝে সাঝে একটু বিশ্রাম নেয়ার চেষ্টা করে বলা যায়। সামনের কার্বে সারি সারি গাড়ি পার্ক করা। বাম্পারগুলো বিপজ্জনকভাবে কাছাকাছি ওগুলোর। সার্বক্ষণিক একটা গুঞ্জন কানে আসে বারান্দায় দাঁড়ালেই, কেউ একজন গান শুনছে স্পীকারে। সামনের পিজ্জার দোকানটা থেকে হুল্লোড়ের শব্দ ভেসে আসছে কিছুক্ষণ পরপর। ওয়েস্ট সাইড হাইওয়েতে অনবরত ছুটে চলছে গাড়ি। তবে আগের তুলনায় অনিয়মিত এখন সেই শব্দ। ঘুমপাড়ানি গানের মতো।

মাথা কাজ করছে না ঠিক মতো। কী ঘটছে জানি না। কী করবো সেটাও জানি না। শিলার মায়ের সাথে কথা বলে উত্তর পাওয়া দূরের কথা, বরং আরো কয়েকটা নতুন প্রশ্ন যোগ হয়েছে তালিকায়। মেলিসার বলা কথাগুলো এখনও কানে বাজছে। কিন্তু ওর একটা প্রশ্ন বেশ যুক্তিসংগত, কেইন বেঁচে আছে জানার পর আমার পদক্ষেপ কী হওয়া উচিত?

অবশ্যই খুঁজে বের করতে চাই তাকে।

কিন্তু বললেই কি সেটা করতে পারবো? আমি তো কোন গোয়েন্দা না। তাছাড়া কেইন যদি আমাকে জানাতে চাইতো যে সে বেঁচে আছে, তাহলে

এতদিনে সেটা করতো। এখন আমি যদি খুঁজতে নামি, হিতে বিপরীত হতে পারে।

তাছাড়া জরুরী আরেকটা কাজ আছে আমার। সেটার গুরুত্বই বরং বেশি।

প্রথমে আমার ভাই পালিয়ে গেল। এখন বিনা নোটিশে আমার ভালোবাসার মানুষটা উধাও! ভাগ্যিস আমার কোন পোষা প্রাণী নেই।

বোতলে চুমুক দেয়ার জন্যে ঠোঁটের কাছে এনেছি এমন সময় লোকটাকে দেখলাম।

আমার বিল্ডিং থেকে পঞ্চাশ কদম দূরে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে লম্বা একটা ট্রেঞ্চ কোট, হাত দুটো পকেটে ঢুকানো। দূর থেকে তার চেহারাটা দেখে মনে হচ্ছে অন্ধকারে চকচক করছে কোন কিছু। স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশিই গোল। তার চোখজোড়া দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু নিশ্চিত আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। অনুভব করতে পারছি চাহনি। অস্বস্তিদায়ক একটা ব্যাপার।

নড়লো না লোকটা।

রাস্তায় খুব বেশি পথচারী নেই, কিন্তু যারা আছে তারা তাড়াহুড়ো করে হেঁটে চলেছে গন্তব্যের পথে। নিউ ইয়র্কারদের জন্যে এটাই স্বাভাবিক। কখনো থামে না তারা। কোন সিগনালে বা রাস্তা পার হবার সময় যদি থামতেও হয়, উসখুস শুরু করে।

কিন্তু এই লোকটা পাথরের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। দৃষ্টি আমার দিকে। চোখ পিটপিট করলাম কয়েকবার। কিন্তু লোকটা গেলো না। অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে কিছুক্ষণ পর আবার তাকালাম। এখনও আগের জায়গাতেই আছে সে।

আরেকটা ব্যাপার।

কী যেন একটা খুব পরিচিত ঠেকছে।

হয়তো ভাবতে পারেন খুব বেশি বলে ফেলছি। আমাদের মধ্যে বেশ ভালো একটা দূরত্ব, রাতের বেলা হওয়াতে আলোর পরিমাণও কম। কিন্তু আমার ঘাড়ের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেছে আসন্ন বিপদের সম্ভাবনায়।

সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমিও পাল্টা তাকিয়ে থাকবো তার দিকে। লোকটা কিন্তু এতক্ষণে একবারের জন্যেও নড়েনি। কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে কে জানে। খুব ঠান্ডা লাগতে লাগলো হঠাৎ করেই। তবুও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। এক অচেনা আত্মবিশ্বাসের উপস্থিতি টের পাচ্ছি।

ফোন বেজে উঠলো এসময়।

লোকটার দিক থেকে নজর ফিরিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালাম। এগারোটার কাছাকাছি। এসময় তো সাধারণত কেউ ফোন করে না। ঘাড় না ঘুরিয়ে একটু পিছিয়ে এসে রিসিভারটা তুলে নিলাম।

"ঘুমোবে এখন?" স্কয়ার্সের কণ্ঠস্বর।

"না।"

"বেরুবে?"

আজকে ভ্যান নিয়ে ডিউটিতে বের হবে ও। "কিছু জেনেছো?"

"আধা ঘণ্টার মধ্যে আমার সাথে স্টুডিওতে দেখা করো।"

ফোন রেখে দিয়ে আবারো ফিরে এলাম বারান্দায়। লোকটা নেই।

ইয়োগা স্কুলটার নাম 'স্কয়ার্স'। এটা নিয়ে প্রায়ই মজা করি আমি। স্কয়ার্স নামটা এখন একটা আলাদা শব্দে রূপ নিয়েছি। যেমন *ফ্যাবিও* বা *কেএফসি*। স্কয়ার্সের ইয়োগা স্টুডিও, বা স্কুল–যেটাই বলুন না কেন, ইউনিয়ন স্কয়ারে একটা বিল্ডিংয়ের ছয়তলায় অবস্থিত। প্রথম দিকে অবশ্য অতটা নামডাক ছিল না। কিন্তু হঠাৎই এক পপ শিল্পী 'আবিষ্কার' করে বসে জায়গাটা। সে তার বন্ধুদের জানায়। কয়েকমাসের মধ্যে কসমো আর এলি পত্রিকায় প্রতিবেদন বের হয় স্কয়ার্স নিয়ে। এর মধ্যে একটা কোম্পানি স্কয়ার্সকে প্রস্তাব দেয় ভিডিও কন্টেন্ট বানানোর। স্কয়ার্সও আপত্তি করেনি। ইয়োগা স্কয়ারড ওয়ার্কআউট (কপিরাইট করা নাম)–বিখ্যাত হতে খুব বেশি সময় লাগেনি। এমনকি ভিডিও শ্যুট করার দিনে স্কয়ার্স শেভও করেছিল।

বাকিটা ইতিহাস।

ম্যানহাটান বলুন বা হ্যাম্পটন, যে কোন বড়সড় অনুষ্ঠানে সবার প্রিয় 'ফিটনেস গুরু' তার চেহারা দেখাবেনই। কিছুদিন পর অবশ্য বেশিরভাগ অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণই ফিরিয়ে দিতে শুরু করে স্কয়ার্স। কিন্তু ততদিনে বুঝে গেছে যে কীভাবে জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে হবে। আপনি যদি ওর স্টুডিওতে ক্লাস করতে চান, এমনকি সবচেয়ে জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টরের কাছেও, দুই মাস আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে রাখতে হবে। প্রতি ক্লাসের জন্যে গুণতে হবে পঞ্চাশ ডলার। চারটা স্টুডিও এখন ওর। ছোটটায় একসাথে পঞ্চাশ জন লোক ক্লাস করতে পারে আর বড়টায় দুশো জন। এই রাত সাড়ে এগারোটার সময়ও তিনটা ক্লাস চলছে।

নিজেই হিসাব করে নিন।

লিফটে থাকা অবস্থাতেই সেতারের স্নিগ্ধ সুর কানে এসে লাগলো। ব্যাকগ্রাউন্ডে ঝর্ণার শব্দ। লিফটের দরজা খুললে প্রথমেই চোখে পড়বে গিফট শপ। নানা ফ্লেভারের ধূপ, বই, সিডি/ডিভিডি বিক্রি হয় সেখানে। কাউন্টারের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে কালো ইউনিফর্ম পরিহিত অতিরিক্ত শুকনো দুজন ব্যক্তি। এভাবে '*দুজন ব্যক্তি*' বলার কারণ আছে। প্রথম দর্শনেই তারা পুরুষ নাকি নারী এটা বলাটা কষ্টকর হবে বৈকি। তবে আজকে একজন পুরুষ, আর একজন নারী ডিউটিতে আছে (সম্ভবত)।

"হ্যালো," বললাম।

"জুতো খুলে ফেলুন, প্লিজ," লোকটা বললো (সম্ভবত)।

"ঠিক আছে।"

"আপনার পরিচয়?" মেয়েটা জানতে চাইলো।

"স্কয়ার্সের সাথে দেখা করতে এসেছি। আমি উইল ক্রেইন।"

আমার নাম শুনে অভিব্যক্তির কোন পরিবর্তন হলো না তাদের। "যোগী স্কয়ার্সের সাথে কি অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আপনার?"

"যোগী স্কয়ার্স?" না জিজ্ঞেস করে পারলাম না।

নির্বিকার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে দুজন।

"আচ্ছা," কিছুক্ষণ পর বললাম, "যোগী স্কয়ার্স এবং সাধারণ স্কয়ার্সের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে?"

হাসলো না তাদের কেউই। অবাক হলাম না। কম্পিউটার টার্মিনালে কিছু টাইপ করলো মেয়েটা। এরপর দুজনেই ভ্রু কুঁচকে তাকালো মনিটরের দিকে। ফোন তুলে একটা নম্বরে ডায়াল করলো লোকটা। এখনও সেতার বেজেই চলেছে। মাথা ধরে যাচ্ছে।

"উইল?"

সুন্দর একটা লিওটার্ড পরিহিত ওয়ান্ডাকে দেখতে পেলাম এসময়। হাঁটার সময়েও পিঠ একদম টানটান করে রাখে মেয়েটা, শরীরের বাঁকগুলো আরো স্পষ্ট বোঝা যায় এতে। স্কয়ার্সের লিড টিচার এবং প্রেমিকা সে। তিন বছর হতে চললো ওদের সম্পর্কের। ওয়ান্ডার আজকের লিওটার্ডটা হালকা বেগুনি রঙের। চোখ ধাঁধানো সুন্দরীর একদম আদর্শ উদাহরণ সে। স্বভাবতই কৃষ্ণাঙ্গ (হ্যাঁ, কৃষ্ণাঙ্গ) মেয়েটা অনেকের ঈর্ষার পাত্র।

আমাকে জড়িয়ে ধরলো সে। কোন জড়তা নেই ভঙ্গিতে। আন্তরিক, বন্ধুত্বপূর্ণ আলিঙ্গন। এই আলিঙ্গন যদি কখনো শেষ না হতো!

"কেমন আছো, উইল?" কোমল কণ্ঠে জানতে চাইলো।

"আগের চেয়ে ভালো।"

আমাকে ছেড়ে দিয়ে চোখের দিকে তাকালো ওয়ান্ডা। যেন মিথ্যেটা খোঁজার চেষ্টা করছে। স্কয়ার্স ওর কাছ থেকে কিছু লুকায় না। যেমনটা আমিও স্কয়ার্সের কাছ থেকে কিছু লুকোই না। সুতরাং আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আমার সব ঘটনা সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল ওয়ান্ডা। "একটা ক্লাস নেয়া শেষ করবে ও এখনই," বললো সে। "প্রণয়ম।"

মাথা নাড়লাম জবাবে।

"ওর সাথে দেখা করার আগে আমাকে একটু সময় দিতে পারবে?" ঘাড় একদিকে কাত করে বললো ওয়ান্ডা। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে যেন হঠাৎই কিছু একটা মনে পড়ে গেছে। স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কথাটা বলার চেষ্টা করলেও, কিছু একটা অন্যরকম ঠেকলো।

"নিশ্চয়ই," বললাম।

কোন শব্দ না করে করিডোর বেয়ে সামনে এগিয়ে গেল ওয়ান্ডা। পিছু নিলাম আমি। একটা বিশাল কৃত্রিম ফোয়ারা পার হয়ে আসলাম আমরা। ফোয়ারাটা এত বড় যে ইচ্ছে হচ্ছিল একটা পয়সা ছুঁড়ে দেই। একটা স্টুডিওর ভেতরে উঁকি দিলাম। পিনপতন নীরবতা সবখানে–শুধু নিঃশ্বাসের শব্দ। দেখে মনে হচ্ছে কোন সিনেমার সেট। এতজন তারকাকে কীভাবে এক জায়গায় একত্রিত করেছে স্কয়ার্স, কে জানে। চোখ বন্ধ অবস্থায়, যোগাসনের ভঙ্গিতে পাশাপাশি বসে আছে তারা।

স্কয়ার্স আর ওয়ান্ডার অফিসটা ডানদিকে। সামনের চেয়ারটায় এমনভাবে বসলো ওয়ান্ডা, যেন স্টাইরোফোমের তৈরি ওটা। ও যে ভঙ্গিতে বসেছে, সেটাকে বোধহয় পদ্মাসন বলে। বিপরীত দিকের চেয়ারে একদম সাধারণ ভঙ্গিতে বসলাম আমি। কিছুক্ষণ কোন কথা বললাম না কেউ। চোখ বন্ধ করে লম্বা শ্বাস টানলো সে কয়েকবার। অপেক্ষা করছি।

"আমি কিন্তু তোমাকে কিছু বলিনি।"

"ঠিক আছে," ইশারাটা বুঝতে সমস্যা হলো না কোন।

"আমি প্রেগন্যান্ট।"

"এটা তো ভালো খবর!" বলে ওকে অভিনন্দন জানানোর জন্যে উঠে দাঁড়ালাম।

"কিন্তু স্কয়ার্স ভালোভাবে নিচ্ছে না ব্যাপারটা।"

থেমে গেলাম। "মানে?"

"কেমন যেন ভয় পাচ্ছে।"

"ও ভয় পাচ্ছে?"

"তুমি তো জানতে না?"

"না।"

"তোমার কাছ থেকে কখনোই কিছু লুকায় না ও, উইল। আমি ওকে জানিয়েছি প্রায় এক সপ্তাহ আগে।"

আসলেও অস্বাভাবিক ব্যাপারটা।

"হয়তো আমার এরকম পরিস্থিতির কারণে বলতে চায়নি," কিছুক্ষণ পর বললাম।

"এসব বলো না," কড়া চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললো ওয়ান্ডা।

"সরি।"

অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল ওয়ান্ডা। সদা শান্ত চেহারাটা এখন আর শান্ত মনে হচ্ছে না। "আমি ভেবেছিলাম ও শুনে খুশি হবে।"

"খুশি হয়নি?"

"মনে হচ্ছে ও চায় যে...আমি..." কথা খুঁজে পাচ্ছে না যেন। "বাচ্চাটা নষ্ট করে ফেলি।"

এবারে বসেই পড়লাম চেয়ারে। "স্কয়ার্স বলেছে এটা?"

"কিছুই বলেনি। প্রতি রাতে ভ্যান নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে, শিফট না থাকলেও। অতিরিক্ত ক্লাস নিচ্ছে।"

"তোমাকে এড়িয়ে চলছে।"

"হ্যাঁ।"

অফিসের দরজা খুলে গেল এসময়। কোন প্রকার কড়া নাড়ার তোয়াক্কা না করেই ভেতরে ঢুকে পড়লো স্কয়ার্স। "চলো তাহলে?" ওয়ার্ডার দিকে তাকিয়ে সৌজন্যমূলক একটা হাসি দেয়ার পর আমার উদ্দেশ্যে বললো।

ভ্যান চলতে শুরু করার আগে কোন কথা হলো না আমাদের।

"ও তাহলে বলে দিয়েছে তোমাকে," স্কয়ার্স বললো কিছুক্ষণ পর।

প্রশ্নের মতো শোনালো না কথাটা। জবাবে আমিও কিছু বললাম না।

"আমরা এ বিষয়ে কোন কথা বলবো না," ডানে মোড় নিয়ে বললো ইয়োগা গুরু।

এই কথার পরিপ্রেক্ষিতেও আমার কাছ থেকে কোন জবাব আশা করছে না নিশ্চয়ই।

কোভেন্যান্ট হাউজের ভ্যানটা নিয়ে শহরের একদম গভীরে চলে যাই আমরা। আমাদের ছেলেমেয়েদের অনেকেই সরাসরি এসে হাজির হয় শেল্টারের দরজায়। আবার অনেককে এই ভ্যান নিয়েই উদ্ধার করি আমরা। এরকম ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্যই হচ্ছে লোকালয়ের অন্ধকার গলিগুলোতে খুঁজে দেখা। যারা আসলেও গা ঢাকা দিতে চায়, তারা সাধারণত লোকসমক্ষে খুব বেশি সময় কাটায় না। এদেরকে বলা হয় "গ্রো-অ্যাওয়েজ"। রাস্তায় বসতি গাড়া এই বাচ্চারা অনেকটা আগাছার মতো (খারাপ উদ্দেশ্যে বলিনি)। যত বেশি সময় কাটাবে, শেকড় তত শক্ত হবে।

এই ছেলেমেয়েদের অনেককেই আমরা সাথে করে নিয়ে আসতে পারি না। আগাছার উপমাটা ভুলে যান; এমনটা নয় কোন বাছবিচার করি আমরা। দরজা সবার জন্যেই খোলা। বরং মনে করুন, এই রাস্তাগুলো হচ্ছে ক্যান্সার। যত তাড়াতাড়ি ছেলেমেয়েদের মন থেকে এগুলোর স্মৃতি দূর করা যাবে, তত ভালো।

এই উপমাটাও খুব একটা ভালো হলো না বোধহয়, তবে আমি কী বোঝাতে চাচ্ছি তা ধরতে পারছেন নিশ্চয়ই।

"এফবিআইয়ের লোকেরা বাড়িয়ে বলেছে," স্কয়ার্স বললো।

"কীরকম?"

"শিলার রেকর্ডের ব্যাপারে।"

"খুলে বলো।"

"গ্রেফতারের ঘটনাগুলো অনেক বছর আগের। আসলেও শুনতে চাও?"

"হ্যাঁ।"

শহরের রেড লাইট জোনে এসে পড়েছি আমরা। পতিতাদের আস্তানা কিছুদিন পরপর জায়গা পাল্টায়। কখনো তাদের দেখা যায় লিংকন টানেলে বা জাভিতস সেন্টারের আশপাশে। কিন্তু পুলিশের বেশি কড়াকড়ির কারণে আরো দক্ষিণে এইটটিন্থ স্ট্রিটের দিকে সরে গেছে তারা। আজকে তাদের সংখ্যা হতাশাজনক রকমের বেশি।

মাথা নেড়ে তাদের দিকে ইশারা করলো একবার স্কয়ার্স। "আগে হলে ওদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যেত শিলাকে।"

"রাস্তায় কাজ করতো ও?"

"বাড়ি থেকে পালিয়ে সরাসরি এই লাইনে কাজ শুরু করে দিয়েছিল।"

ব্যাপারটা এতবার ঘটতে দেখেছি যে এখন আর অবাক হই না। কিন্তু আজ যার ব্যাপারে কথা বলছি, সে অচেনা কেউ নয়। আমার প্রেমিকা।

"অনেক বছর আগের কথা," যেন আমার মনের কথা পড়তে পারছে, এমন ভঙ্গিতে বললো স্কয়ার্স। "ষোলো বছর বয়সে প্রথম গ্রেফতার হয়েছিল।"

"পতিতাবৃত্তি?"

মাথা নেড়ে সায় জানালো ও। "পরবর্তী আঠারো মাসে আরো তিনবার। ফাইলের তথ্য অনুযায়ী লুইস কাস্টম্যান নামের এক দালালের হয়ে কাজ করতো শিলা। শেষবার যখন ধরা পড়ে তখন সাথে দুই আউন্সের মতো হিরোইন আর একটা ছুরি ছিল সাথে। পুলিশের লোকেরা মামলা দেয়ার চেষ্টা করলেও ধোপে টেকেনি।"

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। আকাশের রঙ কিছুটা ধূসর এখন। কোভেন্যান্ট হাউজে কাজ করার দরুণ এসবের কোনটাই অপরিচিত নয় আমার কাছে। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করি এসব থামানোর। সফলও হই, অনেকের জীবন বদলে যায়। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে কোন লাভ হয় না। গভীরে প্রোথিত ক্ষতটা শুকোয় না কখনো।

"ভয় পাচ্ছো কেন?" জিজ্ঞেস করলাম।

"বলেছি তো ঐ ব্যাপারে কোন কথা বলবো না আমরা।"

"ওকে ভালোবাসো তুমি। ওয়ান্ডাও তোমাকে ভালোবাসে।"

"কিন্তু ও কৃষ্ণাঙ্গ।"

ওর দিকে তাকালাম, কিন্তু কিছু বললাম না। স্কয়ার্স অন্যদের মতো না। বর্ণবাদের ঘোর বিরোধী বলা যায় বরং। কিন্তু যেমনটা একটু আগেই বললাম। কিছু ক্ষতের মূল অনেক গভীরে প্রোথিত। দুজনের মধ্যে রাতারাতি একটা দেয়াল দাঁড়িয়ে গেছে যেন। দেয়ালটা ওদের ভালোবাসার মতো শক্তিশালী না, কিন্তু ধীরে ধীরে শক্ত হচ্ছে।

"ওকে ভালোবাসো তুমি," আবারো বললাম।

গাড়ি চালানো থামালো না স্কয়ার্স।

"মনে করে দেখ, প্রথমদিকে কিন্তু ঠিক এই কারণেই আকৃষ্ট হয়েছিলে ওর প্রতি," বললাম। "কিন্তু এখন তোমাদের সম্পর্কটা অন্যরকম। মন থেকে ভালোবাসো ওকে।"

"উইল?"

"শুনছি।"

"যথেষ্ঠ হয়েছে।"

হঠাৎই বামে তীক্ষ্ণ মোড় নিল স্কয়ার্স। রাতের অধিবাসীদের ওপরে গিয়ে গিয়ে পড়লো ভ্যানের উজ্জ্বল হেডলাইট। তবে ইঁদুরের দলের ওপর টর্চের আলো ফেললে যেমন ছুটে পালায়, এরা ওভাবে পালালো না। বরং একবারের জন্যে পলকও ফেললো না কেউ। স্কয়ার্স কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো সামনের দিকে। উপযুক্ত শিকার খুঁজে নিয়ে ব্রেক কষলো।

চুপচাপ গাড়ি থেকে নেমে পড়লাম দুজনই। নির্মোহ দৃষ্টিতে আমাদের দেখছে ছেলেমেয়েদের দলটা। *লা মিজারেবলের* ফ্যান্টিনের একটা সংলাপের মনে পড়লো। মিউজিক্যাল ভার্সনের কথা বলছি। বইতে চরিত্রটা আছে কিনা বলতে পারবো না। *"যাদের কাছে টানার চেষ্টা করছো, তাদের কাছে ভালোবাসা জিনিসটা মৃত।"*

নানা বয়সী ছেলে, মেয়ে, ক্রসড্রেসার আর ট্রান্সসেক্সুয়ালদের অভাব নেই এখানে। যতরকম বিকৃতমনস্কতার কথা বলুন না কেন, এই রাস্তাগুলোয় সব দেখেছি আমি। কিন্তু একটা কথা বিশ্বাস করুন, কখনো কোন নারী খদ্দেরের দেখা পাইনি। এমনটা না যে পুরো দুনিয়ার কোথাও কোন নারী খদ্দের নেই, থাকতে পারে। কিন্তু তারা কখনো কামের তাড়নায় রাস্তায় বের হয়ে যায় না। তাই এখানকার সব খদ্দের পুরুষ। নানা বয়সের, নানা বর্ণের, নানা গড়নের। তাদের চাহিদাও ভিন্ন ধরনের–কারো সাদা পছন্দ, কারো কালো, কারো একটু বয়স্ক আবার কারো একদম কমবয়সী মেয়ে না হলে চলে না। কমবয়সী ছেলেদেরও চাহিদা আছে। অনেকের সাথে আবার গার্লফ্রেন্ডও থাকে। তবে তাদের হয়তো জোর করে নিয়ে আসা হয়েছে। খদ্দের সবসময় পুরুষ।

চাহিদা যতই ভিন্ন হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত একটা কাজের জন্যেই তো এদেরকে দরকার খদ্দেরদের। সেই কাজটা গাড়ির ভেতরে অনায়াসেই হয়ে যায়। চিন্তা করে দেখুন, দুই পক্ষেরই সুবিধা এতে। আলাদা কোন রুম ভাড়া করতে হচ্ছে না। এসটিডি[২]র ঝুঁকিও কম। কাপড়ও খুলতে হয় না পুরোপুরি। অপরিকল্পিত গর্ভধারণের ব্যাপারটা তো কেউ আমলেই নেয় না...আর বললাম না।

পুরনো পাপীরা, (আঠারোর বেশি বয়স্কদের কথা বলছি) উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালো স্কয়ার্সকে। ওকে ভালো করেই চেনে ওরা। পছন্দও করে। আমার

---

[২] সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ

উপস্থিতি নিয়ে অবশ্য কিছুটা সন্দিহান। অনেকদিন ধরে ডিউটিতে আসি না। তবুও অনেকেই চিনতে পারলো আমাকে, আর (বলতে অদ্ভুত লাগছে) আমিও খুশি হলাম তাদের পরিচিত চেহারা দেখে।

ক্যান্ডি নামের একটা মেয়ের দিকে এগিয়ে গেল স্কয়ার্স। ক্যান্ডি তার আসল নাম না, এটা ভালো করেই জানি। দরজার গোড়ায় দাঁড়ানো দুটো মেয়ের দিকে ইশারা করলো সে। কারো বয়সই ষোলোর বেশি না। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে বাচ্চা দুটো মেয়ে মায়ের রেখে যাওয়া মেক-আপ কিট খুঁজে পেয়েছে। পরনের শর্টসগুলো অতিরিক্ত খাটো, পায়ে স্টিলেটো হিল। কাঁধে কৃত্রিম পশমের মাফলার। এই পোশাকগুলো তারা কোথায় পায়, সেটা নিয়ে প্রায় সময়ই ভেবেছি আমি। এসবের জন্যে আলাদা কোন দোকান আছে নাকি?

"নতুন মাল," ক্যান্ডি বললো। আপনাদের অনেকেই হয়তো ভাষার এরকম 'শৈল্পিক' ব্যবহারে বিরক্ত হবেন, কিন্তু নাচতে নেমে ঘোমটা দেয়া সাজে না।

ভ্রু কুঁচকে মাথা নাড়লো স্কয়ার্স। এই পুরনো পাপীদের কাছ থেকেই অনেক ক্ষেত্রে বড়সড় সাহায্য পেয়ে থাকি আমরা। এর পেছনে দুটো কারণ আছে। প্রথমত, প্রতিযোগীতা কমে যায়। রাস্তায় এরকম পরিবেশে থাকলে চেহারার অবস্থা খুব দ্রুত অবনতি হয়। ক্যান্ডির কথাই ধরুন। ভদ্রভাবে বললে, তার চেহারার দিকে দুবার তাকাতে চাইবে না অনেকেই। বয়সও তাড়াতাড়ি বেড়ে যায় এসব লাইনে। নতুন মেয়েরা আসলে খদ্দেররা তাদের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই আকৃষ্ট হবে। আর দ্বিতীয় কারণ, মন থেকে তাদের সাহায্য করতে চায় ওরা। বাড়িয়ে বলছি না। সেই সময়টায় ফিরে যায়, যখন তাদের সামনে দুটো রাস্তা খোলা ছিল। নিজেরা বাধ্য হয়ে বা অন্য কোন কারণে ভুল পথ বেছে নিলেও অন্যদের রেহাই দিতে চায়। তাদের ফিরে যাবার উপায় নেই। এটা নিয়ে ক্যান্ডির মতো আরো অনেকের সাথে কম বচসা হয়নি আমার। আমি সবসময়ই জোর দিয়ে বলতাম যে চাইলে যেকোন সময় ফিরে আসা যায়।

ভুল বলতাম। একটা নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে ফেলার পর ফেরার পথটা আর থাকে না। তখন এই দুনিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে যায় তারা। সেজন্যেই দ্রুততার সাথে কাজ করতে হয় আমাদের। সেই সীমা পর্যন্ত পৌঁছুবার আগেই তাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। হারিয়ে যাবার আগেই। নতুবা তাদের গন্তব্য হবে অবধারিত ভাবেই জেলখানা বা কবরস্থান।

"র‍্যাকেল কোথায়?" স্কয়ার্স জিজ্ঞেস করলো।

"একটা কার জবে গেছে।" ক্যান্ডি বললো (কিছুক্ষণ আগে বললাম না? গাড়িতেই সুবিধা)।

"ফিরবে এখানে?"

"হ্যাঁ।"

মাথা নেড়ে নতুন মেয়ে দুটোর দিকে তাকালো স্কয়ার্স। একজন ইতিমধ্যে একটা বুইকের সামনে উবু হয়ে পড়েছে। আমার ভেতরে কী চলছে সেটা আপনাদের বলে বোঝাতে পারবো না। পারলে মেয়ে দুটোকে গাড়িতে উঠিয়ে ফিরে যেতাম এখনই। বুইক গাড়িটার ড্রাইভিং সিটে বসে থাকা হতচ্ছাড়ার জিহ্বা হাত দিয়ে টেনে ছিঁড়তে পারলে খুবই ভালো লাগতো। জায়গামতো দুএকটা লাথি কষাতেও ইচ্ছে করছে। নিদেনপক্ষে একটা ছবি তুলে বা...বা কিছু একটা। কিন্তু এগুলোর কোনটাই করা সম্ভব না। করলেই আস্থা হারাবে এখানকার অন্যান্য অধিবাসীরা। একবার তাদের আস্থা হারালে, কাজ ছেড়ে দেয়াই উত্তম।

কিছু না করে দাঁড়িয়ে থাকাও কঠিন। তবে স্বভাবগতভাবেই একটু সাবধানী আমি, তাই অন্যদের তুলনায় নিজেকে সামলাতে কষ্টটা একটু কম হয়।

বুইকের প্যাসেঞ্জার সিটের দরজাটা খুলে গেল এসময়। একটা মেয়ে ঢুকে পড়লো ভেতরে। এতটা অসহায় বোধ করিনি আগে কখনো। স্কয়ার্সের দিকে তাকিয়ে দেখি গাড়িটা দেখছে সে। চলে গেল বুইকটা। এখন মনে হচ্ছে, ওটার কোন অস্তিত্বই ছিল না।

সদ্য একা হয়ে পড়া মেয়েটার দিকে এগোলো স্কয়ার্স। আমিও চললাম ওর পিছু পিছু। মেয়েটার নিচের ঠোঁটটা পাখির বুকের মতো কাঁপছে, যেন কান্না চাপার চেষ্টা করছে। তবে চোখের দৃষ্টি অন্যরকম। নিপাট ঔদ্ধত্য সেখানে। ইচ্ছে করছে ওকে হাত ধরে ভ্যানের কাছে নিয়ে যাই, দরকার হলে একটু শক্তও হতে হবে। কিন্তু সেটা মস্ত বড় ভুল হবে। সেজন্যেই স্কয়ার্স সবচেয়ে দক্ষ এসব কাজে। মেয়েটা থেকে প্রায় এক হাত দূরে থামলো সে। "হ্যালো," বললো শান্তস্বরে।

"হ্যালো," ওর দিকে তাকিয়ে ক্ষীণস্বরে জবাব দিলো মেয়েটা।

"একটু সাহায্য দরকার আমার," বলে পকেট থেকে একটা ছবি বের করলো স্কয়ার্স। "এই মেয়েটাকে দেখেছো?"

"কাউকে দেখিনি আমি," ছবিটার দিকে না তাকিয়েই জবাব দিল মেয়েটা।

"একবার দেখো ভালোমতো, প্লিজ," স্কয়ার্স অনুনয় করলো। "পুলিশের লোক না আমি।"

"সেটা আগেই বুঝেছি," গম্ভীর স্বরে বলার চেষ্টা করলো তরুণী। "ক্যান্ডির সাথে কথা বলছিলেন একটু আগে।"

আরেকটু সামনে এগোলো স্কয়ার্স। "আমরা, মানে আমি আর আমার বন্ধু-" হেসে হাত নাড়লাম একবার-"এই মেয়েটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি।"

"বাঁচানোর চেষ্টা করছেন মানে?" এবারে কৌতূহল ভর করলো তার দুই চোখে।

"খারাপ লোক লেগেছে ওর পেছনে।"

"কে?"

"এক দালাল। আমরা কোভেন্যান্ট হাউজের হয়ে কাজ করি। শুনেছো নাম?"

জবাবে কাঁধ ঝাঁকালো মেয়েটা।

"ওখানে মাঝেসাঝে সময় কাটায় অনেকে," স্কয়ার্স যতটা সম্ভব নির্বিকার ভঙ্গিতে বলার চেষ্টা করছে। "ইচ্ছে করলে তুমিও আসতে পারো একদিন। রান্না খুব একটা খারাপ না। ঘুমানোর জন্যে ভালো জায়গাও আছে, ফোন ব্যবহার করতে পারবে, পরিষ্কার জামাকাপড়...যাইহোক, এই মেয়েটা—" আবারো ছবিটা দেখালো স্কয়ার্স। "ওর নাম অ্যাঞ্জি," নাম ব্যবহার করলে আরো বিশ্বাসযোগ্য শোনায় ব্যাপারটা। "আমাদের সাথে কয়েকদিন ধরে থাকছিল ও। কিছু কোর্সেও নাম লিখিয়েছে। খুবই মজার একটা মেয়ে। জীবনের ছকটাকে নিজ হাতে পাল্টে দিচ্ছে।"

মেয়েটা কিছু বললো না।

"সবাই স্কয়ার্স বলে আমাকে," বলে হাত বাড়িয়ে দিল স্কয়ার্স।

লম্বা একটা শ্বাস ফেললো মেয়েটা, তবে সে-ও হাত বাড়িয়ে দিল। "আমি জেরি।"

"পরিচিত হয়ে ভালো লাগলো।"

"আচ্ছা। কিন্তু এই মেয়েটাকে দেখিনি আমি। একটু ব্যস্ত আছি এখন।"

এই মুহূর্তটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যদি বেশি জোরাজুরি করেন, তাহলে ওদের হারিয়ে ফেলতে হবে চিরতরে। গর্তের একদম গভীরে ঢুকে যাবে, আর মুখ দেখাবে না। এখন একটাই কাজ, ভরসার বীজ রোপণ করে কেটে পড়তে হবে। তাকে জানিয়ে দিলেন যে একটা নিরাপদ জায়গা আছে, যেখানে চাইলেই আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে সে। আর একবার যদি সে মুখ দেখায় শেল্টারে, আদর যত্নের জালে আটকে ফেলতে হবে। কিন্তু এখন কিছু করা যাবে না, তাহলে ভয় পাবে।

কষ্ট লাগবে হয়তো, কিন্তু এটাই নিয়ম।

স্কয়ার্সের এই কাজটা খুব বেশিদিন করতে পারে না কেউই। যারা আসলেও টিকে যায়, তারা আমার আপনার থেকে আলাদা। আসলেও আলাদা।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করলো স্কয়ার্স। এই 'মেয়েটাকে কোথাও দেখেছেন?' পদ্ধতিটা শুরু থেকেই ব্যবহার করে আসছে সে। ছবির মেয়েটা, অ্যাঞ্জি, মারা গেছে পনেরো বছর আগে। একটা ডাস্টবিনের পেছনে তার লাশটা খুঁজে

পেয়েছিল সে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানে অ্যাঞ্জির মা ছবিটা দেয় তাকে। সেই থেকে ওটা স্কয়ার্সের পকেটে থাকে সবসময়।

"ঠিক আছে, ধন্যবাদ," বলে একটা কার্ড বের করে তার হাতে দিল স্কয়ার্স। "যদি ওকে কোথাও দেখো, তাহলে প্লিজ জানাবে। যে কোন সময় ফোন দিতে পারো।"

"ঠিক আছে," বলে কার্ডটা রেখে দিল জেরি।

আবারো কিছুক্ষণের ইতস্ততা। "দেখা হবে," বলে কথোপকথনের ইতি টানলো স্কয়ার্স।

"আচ্ছা।"

এরপর সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত কাজটা করলাম আমরা। সরে আসলে ওখান থেকে।

র‍্যাকেলের আসল নাম রসকো। সত্য বলেছিল কিনা সে ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত নই আমি, হবার উপায়ও নেই।

একটা বন্ধ কারখানার দরজার পাশে গাড়িটা খুঁজে পেলাম আমরা। এধরনের কাজের জন্যে যথার্থ জায়গা। গাড়ির জানালাগুলো ভেতরের কিছু দেখা যায় না। তবুও নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখলাম। ভেতরে কী চলছে সেটা প্রত্যক্ষ করার কোন ইচ্ছে নেই কারোই।

কয়েক মিনিট পর দরজা খুলে বেরিয়ে এলো র‍্যাকেল। আপনারা নিশ্চয়ই নাম দুটোর ধরনের পার্থক্য দেখে বুঝে গেছেন ইতিমধ্যে। র‍্যাকেল একজন ক্রস-ড্রেসার[৩]। সেজন্যেই তাকে কারো সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার সময় ঠিক নারী বলবো নাকি পুরুষ, সেটা নিয়ে বিভ্রান্তিতে ভুগতে হয়।

ট্রান্সসেক্সুয়ালরা নিজেদের নারীই বলে। কিন্তু ক্রস ড্রেসিংয়ের ব্যাপারটা একটু জটিল। লিঙ্গের পরিচয় নিজেদের মর্জিমাফিক ঠিক করে তারা।

গাড়ি থেকে বের হয়ে পার্স খুঁজে একটা বিনাকা স্প্রে বের করে আনলো র‍্যাকেল। মুখের সামনে নিয়ে তিনবার চাপ দিল। এরপর কি ভেবে আরো তিনবার চাপলো। চলে গেল গাড়িটা। আমাদের দিকে ফিরলো র‍্যাকেল।

ট্রান্সভেস্টাইটদের [৩] অনেকেই সুন্দর। কিন্তু র‍্যাচেল ঠিক সেই দলে পড়বে না। সে কৃষ্ণাঙ্গ, ছয় ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা, ওজন তিনশো পাউন্ডের কাছে। মুষ্টিযোদ্ধাদের মতো হৃষ্ট বাহুর পেশিগুলো দেখলে ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক। গলার স্বর শুনে মাইকেল জ্যাকসনও লজ্জা পাবে।

র‍্যাকেল দাবি করে তার বয়স উনত্রিশ। তবে এই কথা গত ছয় বছর ধরেই বলে আসছে। সপ্তাহে পাঁচদিন নিয়ম করে কাজ করে সে। এই মহলে বেশ জনপ্রিয়। চাইলেই কাজ থামিয়ে দিতে পারে। অনেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট

---

[৩] ক্রস-ড্রেসার–ইচ্ছেকৃতভাবে বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরিধান করে যারা

নিয়ে দেখা করতেও রাজি হবে তার সাথে। কিন্তু র‍্যাকেলের এমনটাই পছন্দ। অনভিজ্ঞরা ঠিক বুঝতে পারবে না ব্যাপারটা। এই জগতের পদে পদে বিপদ থাকলেও এর অন্যরকম একটা আকর্ষণও আছে। এখানকার অধিবাসীদের দেখলেই সেটা বোঝা যায়। আমাদের শেল্টারে যে ছেলেমেয়েরা আসে তাদের কাছে এই জগতের আকর্ষণের বিকল্প হিসেবে থাকে কোন রেস্তোরাঁয় কম বেতনে বাসন মাজার কাজ করা বা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে খদ্দের আকর্ষণ করা। কোনটা বেছে নেয় তারা, সেটা বুঝতেই পারছেন আশা করি।

আমাদের দেখে স্টিলেট্টো হিলের খটখট শব্দ তুলে এগিয়ে এলো র‍্যাকেল। এই মাপের স্টিলেট্টো যে পাওয়া যায়, সেটা দুনিয়ার অষ্টমাশ্চর্য মনে হয় আমার কাছে। ছেলেদের অন্তত ১৪ সাইজের জুতো লাগবে র‍্যাকেলের। বাড়িয়ে বলছি না। ওর সম্পর্কে গুজব আছে যে একসময় নাকি পেশাদার রাগবি লিগে খেলতো। আরেকবার শুনেছিলাম স্যাটে (SAT) ভালো নম্বরের জন্যে বৃত্তি পেয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। কয়েকজন তো এটাও বলাবলি করে যে গালফ যুদ্ধে লড়েছে সে। আপনারাই বেছে নিন পছন্দ মতো, কিংবা নতুন একটা বান্যাতেও পারেন।

স্কয়ার্সকে দেখে জড়িয়ে ধরে গালে আলতো করে চুমু খেলো র‍্যাকেল। এরপর আমার দিকে মনোযোগ দিল।

"যা লাগছে না তোমাকে, উইল," বললো সে।

"ধন্যবাদ, র‍্যাকেল," একই স্বরে জবাব দিলাম।

"মনে হচ্ছে এখানেই খেয়ে ফেলি।"

"ওয়ার্ক আউট করছি নিয়মিত," বললাম। "খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে হওয়াটাই স্বাভাবিক।"

আমাকেও জড়িয়ে ধরল র‍্যাকেল। "তোমার মতো কারো প্রেমে পড়তে পারলে ভালোই হতো।"

"আর লজ্জা দিও না, র‍্যাকেল"

"তোমার মতো কেউই পারবে আমাকে এখান থেকে উদ্ধার করতে।"

"কিন্তু কতজনের হৃদয় ভাঙবে, চিন্তা করে দেখো।"

"তা ঠিক," হেসে বললো র‍্যাকেল।

ওকে শিলার ছবি দেখালাম। এই একটা ছবিই আছে আমার কাছে। আসলেও অদ্ভুত ব্যাপারটা। আগে অবশ্য অদ্ভুত লাগেনি। আমরা কেউই ঘনঘন ছবি তুলি না। *তাই বলে একটা মাত্র ছবি?*

"চেনো ওকে?" জিজ্ঞেস করলাম।

কিছুক্ষণ ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকলো র‍্যাকেল। "এটা তো তোমার গার্লফ্রেন্ড," কিছুক্ষণ পরে বললো। "শেল্টারে একবার দেখেছিলাম।"

"হ্যাঁ। কিন্তু অন্য কোথাও দেখেছো?"

"না। কেন?"

মিথ্যে বলার কোন কারণ নেই। "ওকে খুঁজে পাচ্ছি না।"

আবারো ছবিটা মনোযোগ দিয়ে দেখলো র‍্যাকেল। "এটা রেখে দেই আমার কাছে?"

অফিসে আগেই কয়েকটা কালার কপি করে রেখেছি। তাই দিয়ে দিলাম ছবিটা।

"খোঁজ নিয়ে দেখবো।"

"ধন্যবাদ।"

জবাবে মাথা নাড়লো সে।

"র‍্যাকেল?" স্কয়ার্স বললো পাশ থেকে। "লুইস কাস্টম্যান নামের একটা দালালের কথা মনে আছে?"

ফ্যাকাসে হয়ে গেল র‍্যাকেলের চেহারা। ইতস্তত করতে লাগলো।

"র‍্যাকেল?"

"আবারো কাজে নেমে পড়তে হবে আমাকে, স্কয়ার্স। যাই এখন।"

ওর পথ আগলে দাঁড়ালাম আমি। এমন ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকালো যেন কাঁধের খুশকির দিকে তাকাচ্ছে।

"ও আগে এই লাইনেই কাজ করতো," বললাম।

"তোমার গার্লফ্রেন্ড?"

"হ্যাঁ।"

"কাস্টম্যানের হয়ে কাজ করতো?"

"হ্যাঁ।"

উদ্বিগ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো র‍্যাকেল। "খুবই খারাপ মানুষের পাল্লায় পড়েছিল। খুব বেশি খারাপ।"

"কেন?"

কিছুক্ষণ নিচের ঠোঁট কামড়ালো র‍্যাকেল। "এখানকার মেয়েদের দিয়ে অনেকেই ব্যবসা করায়, সেটা তো জানো? ওদের ইনকাম থেকে একটা অংশ রেখে দেয়। সে হিসেবে বলতে পারো মেয়েগুলো ওদের কাছে বিক্রয়সামগ্রী বৈ কিছু নয়। যতদিন টাকা কামাতে পারবে, ততদিন কদর আছে। টাকা কামাতে না পারলে কোন দাম নেই।"

এসব জানি আমি।

"কিন্তু কাস্টম্যান," এমনভাবে নামটা ফিসফিস করে বললো র‍্যাকেল, যেন কোন খারাপ রোগের নাম বলছে। "অন্যরকম ছিল।"

"কীরকম?"

"নিজের বিক্রয় সামগ্রীর ক্ষতি নিজেই করতো। মাঝে মাঝে কোন কারণ ছাড়াই, মজার জন্যে।"

"করতো, মানে এখন আর করে না?" স্কয়ার্স জিজ্ঞেস করলো।

"কারণ গত প্রায় তিন বছর ধরে মাঠে নেই সে।"

"বেঁচে আছে?"

আবারো চুপ হয়ে গেল র‍্যাকেল। অস্বস্তিতে ভুগছে, বোঝাই যাচ্ছে। একবার দৃষ্টিবিনিময় করলাম আমি আর স্কয়ার্স।

"হ্যাঁ," র‍্যাকেল বললো। "যতদূর জানি বেঁচে আছে।"

"মানে? হেঁয়ালি করছো কেন?"

মাথা ঝাঁকালো র‍্যাকেল।

"ওর সাথে কথা বলতে হবে আমাদের," বললাম। "কোথায় পাবো জানো?"

"গুজব শুনেছি কিছু।"

"কীরকম গুজব?"

আবারো মাথা ঝাঁকালো র‍্যাকেল। "রাইট স্ট্রিট, অ্যাভিনিউ ডি, সাউথ ব্রনক্স। শুনেছি ওখানে থাকতে পারে।"

এটুকু বলে আর অপেক্ষা করলো না র‍্যাকেল। হেঁটে চলে গেল অন্যদিকে। একটা গাড়ি এগিয়ে এলো এসময়, থামলো কিছুক্ষণের জন্যে।

আরেকজন মানুষকে হারিয়ে যেতে দেখলাম রাতের অন্ধকারে।

নয়

বেশিরভাগ এলাকায় রাত একটার সময় কাউকে ঘুম থেকে জাগাবার আগে বেশ কয়েকবার ভাবতে হবে। কিন্তু এই এলাকাটা ব্যতিক্রম। জানালাগুলো সব বোর্ড দিয়ে আটকানো। দরজা বলতে প্লাইউডের মস্ত একটা পাহাড়। বাড়িটার আসল রঙ কী ছিল সেটা দিনের বেলাতেও বোধহয় বলা যাবে না।

স্কয়ার্স দরজায় টোকা দেয়ার সাথে সাথে ভেতর থেকে একটা নারীকণ্ঠ ভেসে এলো। "কী চাই?"

"লুইস কাস্টম্যানকে খুঁজছি আমরা," স্কয়ার্সই কথাবার্তা চালাচ্ছে।

"ভাগো এখান থেকে।"

"ওর সাথে কথা বলা জরুরী।"

"ওয়ারেন্ট আছে?"

"পুলিশের লোক না আমরা।"

"তাহলে কাদের লোক?" মহিলা জিজ্ঞেস করলো।

"কোভেন্যান্ট হাউজ।"

"এখানে ঘরপালানো কেউ নেই," গলার স্বর আগের চেয়ে এক ডিগ্রী চড়েছে। "ভাগো।"

"কাস্টম্যান আমাদের সাথে এখন ভালোয় ভালোয় কথা বলতে পারে," স্কয়ার্স হুমকি দিল। "নতুবা কাল কয়েকজন পুলিশ বন্ধুকে নিয়ে আসবো।"

"আমি কিছু করিনি।"

"কিছু একটা বানিয়ে বলবো," স্কয়ার্স বললো। "দরজা খুলুন।"

সিদ্ধান্ত নিতে খুব বেশি দেরি করলো না মহিলা। একটু ফাঁক হলো দরজা। আমি সামনে এগোতে গেল হাত বাড়িয়ে থামালো স্কয়ার্স। দরজা পুরোপুরি খোলার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে–উত্তেজনায় এই প্রাথমিক নিয়মটা ভুলেই গিয়েছিলাম।

"তাড়াতাড়ি," ব্যানখ্যানে কণ্ঠে বললো সে। "কেউ দেখে ফেলবে।"

দরজাটা ধাক্কা দিয়ে পুরোপুরি খুললো স্কয়ার্স। আমরা ভেতরে ঢোকার পর ছিটকানি লাগিয়ে দিল মহিলা। দুটো জিনিস খেয়াল করলাম সাথে সাথে। এক, ভেতরে ভীষণ অন্ধকার। একটা অল্প ওয়াটের বাতি জ্বলছে ডানদিকে। আসবাব বলতে জীর্ণ একটা রিডিং চেয়ার আর একটা কফি টেবিল, ব্যস। দুই, ভীষণ বাজে গন্ধ। আপনার নাকে আসা সবচেয়ে সুন্দর গন্ধটার কথা কল্পনা করুন একবার। তার একদম বিপরীত এখানকার অবস্থা। ঘন হয়ে আছে ভেতরের বাতাস। হাসপাতালে গেলে নানারকম অ্যান্টিসেপ্টিক আর মানুষের অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে এরকম গন্ধ পাওয়া যায়, তবে সেটাও এর চেয়ে অনেক ভালো। জানালাগুলো কতদিন খোলা হয় না, কে জানে। হয়তো কোনদিনই খোলা হয়নি।

মহিলার দিকে ফিরলো স্কয়ার্স। কোনায় চলে গেছে সে। অন্ধকারে তার অবয়বটা দেখা যাচ্ছে কোনমতে।

"আমি স্কয়ার্স।"

"জানি আমি।"

"আমাদের আগে কোথাও দেখা হয়েছে।"

"সেটা জরুরী না।"

"কোথায় সে?" স্কয়ার্স জিজ্ঞেস করলো।

"এই বাড়িতে আর একটা ঘরই আছে," বলে অন্য দিকটায় দেখালো মহিলা। "তবে ঘুমোতেও পারে এখন।"

অন্ধকার ধীরে ধীরে সয়ে আসছে আমাদের চোখে। তার দিকে এগিয়ে গেলাম। আগের জায়গা থেকে নড়লো না সে। আরেকটু কাছে এগোলাম। এবারে মাথা তুললো। দম আটকে আসার যোগাড় হলো আমার। বিড়বিড় করে ক্ষমাপ্রার্থনাসুলভ কিছু একটা বলে পেছাতে লাগলাম দ্রুত।

"না, দেখো," বললো মহিলা। "ভালো করে দেখো।"

এক লাফে বাতিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে। এবারে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চেহারা। আমি বা স্কয়ার্স কেউই চমকালাম না। কিন্তু সেজন্যে কসরত করতে হচ্ছিল। তার চেহারার এই দশা যে করেছে, সে বেশ সময় দিয়েছে কাজটায়। একটা সময় হয়তো সুন্দরী ছিল সে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ইচ্ছেকৃত ভাবে প্লাস্টিক সার্জারির মাধ্যমে চেহারার মধ্যে যতটা সম্ভব কুৎসিত ভাব আনা হয়েছে। নাকটা আচ্ছা মতন পাড়িয়েছিল নিশ্চয়ই কেউ। চামড়া জায়গায় জায়গায় উঠে গেছে। ঠোঁটের দুধারে এমন ভাবে কাটা যে প্রায় বোঝাই যায় না কোথায় শুরু, কোথায় শেষ। পুরো চেহারায় অন্তত দুই ডজন ক্ষতচিহ্ন। রেজার দিয়ে ফালি ফালি করা হয়েছে যেন। বাঁ পাশের চোখটা বুজে আছে। আর ডান চোখটা দেখছে আমাদের ফ্যালফ্যাল করে।

"আপনি তো আগে রাস্তায় কাজ করতেন," স্কয়ার্স বললো।

মাথা নাড়লো মহিলা।

"আপনার নাম?"

"তানিয়া," কসরত করে উচ্চারণ করলো সে।

"আপনার এই দশা কে করেছে?"

"কী মনে হয়?"

জবাবে বলার মতো কিছু খুঁজে পেলাম না কেউই।

"দরজার ওপাশে আছে ও," কিছুক্ষণ পর বললো তানিয়া। "আমিই খেয়াল রাখি। *ওকে কখনো আঘাত করিনি আমি*। বুঝতে পারছো কী বলছি? একবারও হাত তুলিনি।"

মাথা নাড়লাম দুজনই। কেন এসব বলছে সে জানি না। স্কয়ার্সও কিছু বুঝছে বলে মনে হয় না। দরজার কাছে চলে আসলাম আমরা। কোন শব্দ হচ্ছে না ভেতর থেকে। হয়তো আসলেও ঘুমাচ্ছে কাস্টম্যান। এসব ভাবার সময় নেই। দরকার হলে আমাদের শব্দ শুনে জেগে উঠবে। স্কয়ার্স নবে হাত রেখে আমার দিকে তাকালো একবার। মাথা নাড়লাম জবাবে। দরজা খুলে গেলো।

ভেতরে আলো জ্বলছে। একটু বেশিই পাওয়ারের লাইট লাগান এখানে। চোখের সামনে হাত তুলতে বাধ্য হলাম। একটা মেশিনের শব্দ কানে এলো। খুব সম্ভবত মেডিক্যাল মেশিন। তবে সেটার দিকে তাকালাম না প্রথমে। অন্য কিছু নজর কেড়ে নিয়েছে আমার।

চারপাশের দেয়ালে।

যে কারো সেটাই প্রথমে চোখে পড়বে। দেয়ালের এক মাথা থেকে আরেক মাথা অবধি শত শত ছবি সাঁটানো। কতগুলো পোস্টার সাইজের, কতগুলো তিন-বাই-পাঁচ আর বাকিগুলো এর মাঝামাঝি। পুশপিন দিয়ে আটকানো দেয়ালের সাথে।

সবগুলো ছবি তানিয়ার। তার মুখের ওরকম বীভৎস দশা হওয়ার আগে তোলা হয়েছে। আসলেও খুবই সুন্দরী ছিল সে একসময়। ছবিগুলো দেখে মনে হচ্ছে কোন হবু মডেলের পোর্টফলিও থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সিলিংয়েও তানিয়ার ছবি।

"সাহায্য করো আমাকে, প্লিজ।"

বিছানা থেকে এলো কণ্ঠটা। আমি আর স্কয়ার্স এগিয়ে গেলাম সেদিকে। তানিয়া পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। একবার গলা পরিষ্কার করলো সে। আমরা ঘুরে তাকালাম। তার মুখের ক্ষতগুলো আরো জীবন্ত মনে হচ্ছে এই আলোতে। সবমিলিয়ে অপার্থিব একটা দৃশ্য। যেন একই সাথে কারো অতীত আর বর্তমান সত্তা একসাথে দেখতে পাচ্ছি।

আবারো কাতর শব্দ করলো বিছানার লোকটা।

আমরা চুপচাপ অপেক্ষা করছি। তানিয়া তার ভালো চোখটা দিয়ে প্রথমে আমার দিকে, এরপর স্কয়ার্সের দিকে তাকালো। তার চোখের দৃষ্টিটা যেন চ্যালেঞ্জ করছে আমাদের। মগজে গেঁথে নিতে বলছে এই ভীষণ বৈপরীত্য।

"একটা ক্ষুর," বললো তানিয়া। "তাও মরিচা ধরা। সেটা দিয়ে কয়েক ঘণ্টা ধরে আমার এই দশা করেছে। চেহারার অবস্থাটা শুধু দেখতে পাচ্ছো তোমরা।"

আর একটা কথাও না বলে ঘর থেকে চলে গেল তানিয়া। দরজাটা ঠেলে দিল বাইরে থেকে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলাম আমরা। এরপর স্কয়ার্স প্রশ্ন করলো, "তুমিই লুইস কাস্টম্যান?"

"তোমরা পুলিশের লোক?"

"তুমি কাস্টম্যান?"

"হ্যাঁ। আমিই ওর ঐ হাল করেছি। ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে উদ্ধার করো এখান থেকে। দরকার হলে আরো হাজার বার জবানবন্দি দেব। শুধু এখান থেকে বের করার ব্যবস্থা করো আমাকে।"

"পুলিশের লোক না আমরা।"

বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে আছে কাস্টম্যান। বুকের সাথে একটা টিউব জুড়ে দেয়া। মেশিনটা চলছে অনবরত, অ্যাকর্ডিয়নের মতো দেখতে একটা জিনিস ফুলছে আবার চুপসে যাচ্ছে। কাস্টম্যান শ্বেতাঙ্গ, কিছুদিন আগেই শেভ করা হয়েছে গাল। চুল পরিষ্কার। বিছানাটায় কিছু কন্ট্রোল দেখতে পাচ্ছি। যাতে পড়ে না যায় সেজন্যে রেলিংও আছে। কোনায় একটা সিঙ্ক আর বেডপ্যান। এছাড়া গোটা ঘরে আর কিছু নেই। ওয়ার্ড্রোব, আলমারি, টিভি, রেডিও, ঘড়ি, বই, খবরের কাগজ, পত্রিকা, কিছু না। জানালার পর্দাগুলো টেনে দেয়া।

কিছুটা অসুস্থবোধ করতে লাগলাম আমি।

"আপনার সমস্যাটা কী?" জিজ্ঞেস করলাম।

"দেখে বুঝতে পারছো না?" খেঁকিয়ে উঠলো কাস্টম্যান। "প্যারালাইজড, ঘাড়ের নিচ থেকে," চোখ বন্ধ করে বললো সে।

কীভাবে কথা শুরু করবো বুঝতে পারছি না। স্কয়ার্সও বিভ্রান্ত।

"প্লিজ," অনুনয় করলো কাস্টম্যান। "আমাকে এখান থেকে বের করার ব্যবস্থা করো। নাহলে-।"

"নাহলে কী?"

আবারো চোখ খুললো কাস্টম্যান। "গুলি লেগেছিল আমার। তিন কি চার বছর আগে। এখন আর হিসেব নেই। আজকে কয় তারিখ, কী বার, কোন মাস, কোন সাল–কিচ্ছু জানি না। সারাদিন আলো জ্বলে, তাই রাতদিনের পার্থক্যও বুঝি না। কে প্রেসিডেন্ট এখন সেটা জানি না," বলে

একবার ঢোক গিললো সে। এই সামান্য কাজটাতেও কষ্ট হচ্ছে তার। "ও একটা পাগল। সাহায্যের জন্যে কত চেঁচাই। কোন লাভ হয় না। শোলা দিয়ে ঘিরে রেখেছে সব দেয়াল। সারাদিন এভাবেই শুয়ে থাকি, দেয়ালের দিকে তাকিয়ে।"

কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি আমি। তবে স্কয়ার্সকে দেখে মনে হচ্ছে না কাস্টম্যানের কথাবার্তা তার ওপর কোন প্রভাব ফেলেছে। "তোমার জীবন কাহিনি শুনতে এখানে আসিনি আমরা," বললো ও। "তোমার হয়ে কাজ করা একটা মেয়ে সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন ছিল।"

"ভুল লোকের কাছে এসেছো," বললো কাস্টম্যান। "শেষ কবে কাজ করেছি জানি না।"

"সেটা না জানলেও চলবে। যার সম্বন্ধে খোঁজ নিতে এসেছি, সে-ও অনেকদিন ধরে কাজ করছে না।"

"কে?"

"শিলা রজার্স।"

"ওহ," একটা হাসি ফুটলো কাস্টম্যানের মুখে। "কী জানতে চাও?"

"সবকিছু।"

"আর আমি যদি বলতে অস্বীকৃতি জানাই?"

"চলো যাই," আমার কাঁধে হাত রেখে বললো স্কয়ার্স।

"কী?" কাস্টম্যানের কণ্ঠে স্পষ্ট আতঙ্ক।

তার দিকে ফিরে তাকালো স্কয়ার্স। "তুমি যদি আমাদের সাহায্য না করতে চাও, তাহলে সেটা তোমার ব্যাপার। আমরাও বিরক্ত করবো না।"

"দাঁড়াও!" চেঁচিয়ে উঠলো কাস্টম্যান। "আমি এখানে আসার পর থেকে এখন অবধি কতজনের সাথে দেখা হয়েছে, জানো?"

"জানতেও চাই না," স্কয়ার্স জবাব দিল।

"ছয়জন। সব মিলিয়ে মাত্র ছয় জন। গত প্রায় এক বছরে কেউ আসেনি। আর ঐ ছয়জনই ছিল আমার জন্যে কাজ করা মেয়েরা। এখানে এসেছিল আমার অবস্থা দেখে হাসতে। কিন্তু এই একঘেয়েমির মধ্যে সেটাও পরম আরাধ্য এখন। বুঝতে পারছো কী বলছি?"

স্কয়ার্সকে দেখে মনে হচ্ছে ধৈর্যে আর কুলাচ্ছে না তার। "শিলা রজার্স," গম্ভীর কণ্ঠে বললো সে।

কাস্টম্যানের বুকে লাগানো টিউবটা শব্দ করে উঠলো এসময়। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রাখলো। "ওর সাথে আমার দেখা হয়েছিল প্রায় দশ কি পনেরো বছর আগে। তখন পোর্ট অথরিটির ওখানে কাজ করতাম আমি। আইওয়া না আইডাহো–কোত্থেকে জেনে এসেছিল বাসে চেপে।"

পোর্ট অথরিটির ওখানে আমিও কাজ করেছি, তাই এই রুটিনটা জানা আছে আমার। কাস্টম্যানের মতো বেশ্যার দালালগুলো ওখানে দাঁড়িয়ে

অপেক্ষা করে ঘরপালানো মেয়েদের জন্যে। অনেকে ছোট শহর বা গ্রাম থেকে অভিনেত্রী, গায়িকা হবার লোভে পা রাখে এই শহরে। অনেকে আবার অত্যাচারী বাবা-মায়ের কাছ থেকেও পালায়। ফাঁদ পাতে দালালেরা, আর সেই ফাঁদে পা দিয়ে জীবন নষ্ট করে নিরীহ ছেলেমেয়েগুলো।

"আমার একটা বাড়তি সম্মান ছিল কাজের ক্ষেত্রে," কাস্টম্যান বললো। "প্রথমত আমি সাদা চামড়ার। সবসময় স্যুট পরে যেতাম। এতে অন্যদের থেকে আলাদা চোখে দেখতো সবাই। যাইহোক, সেদিন ব্রিফকেস হাতে ১২৭ নম্বর গেটের কাছে অপেক্ষা করছিলাম। ওটাই আমার সবচেয়ে পছন্দের জায়গা। একসাথে প্রায় ছয়জনকে নামতে দেখি। শিলা রজার্সকে দেখেই চোখ আটকে যায়, দারুণ ফিগার। বয়স কতই বা হবে, ষোলোর আশেপাশে। তখনও কুমারী ছিল সে, তবে এই তথ্যটা পরে জানতে পারি।"

পেশী টানটান হয়ে গেল আমার। সাবধানে আমার আর বিছানার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো স্কয়ার্স।

"আমি আমার কাজ শুরু করে দিলাম। মিষ্টি মিষ্টি কথায় ভোলানোর চেষ্টা করতে লাগলাম ওকে। তোমরা তো জানো এসব কাজ কীভাবে হয়?"

আসলেও জানি।

"বলি যে বড় বড় ফ্যাশন হাউজের সাথে যোগাযোগ আছে আমার। কয়েক দিনের মধ্যে বড় মডেল হয়ে যাবে ও। তবে অন্যান্যদের মতো তাড়াহুড়ো করি না। কিন্তু শিলা অনেক চালাক। আমার কথা যে সে বিশ্বাস করছে না তা বুঝতে পারি। কিন্তু এখানেই আসল চালাকিটা। ওদের কখনো জোর করতে হয় না। আসলে তো বিশ্বাস করতেই চায় ভেতরে ভেতরে। সবাই শুনেছে যে বড় শহরে কীভাবে রাতারাতি বদলে যায় অনেকের ভাগ্য। সেজন্যেই তো এসেছে।"

মেশিনের শব্দ বন্ধ হয়ে গেল এক পর্যায়ে। কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবারো চালু হলো।

"তো শিলা বুকের ওপর হাত ভাঁজ করে বলে যে কখনো পার্টি-টার্টিতে যেতে পারবে না। আমিও বলি যে কোন সমস্যা নেই। আমি হচ্ছি একজন ফটোগ্রাফার-কাম-স্কাউট। শুধু পোর্টফলিওর জন্যে ছবি তুলতে হবে। পার্টি, মাদক বা নগ্নতার কোন বালাই নেই আমার লাইনে। তার ইচ্ছেতেই হবে সবকিছু। আমি আসলেও ভালো ছবি তুলতাম কিন্তু। তানিয়ার এই ছবিগুলো আমারই তোলা।"

এক সময়কার সুন্দরী তানিয়ার ছবিগুলোর দিকে তাকালাম। বিষাদে ছেয়ে উঠলো মনটা। আবার বিছানার দিকে ফিরে দেখি কাস্টম্যান তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

"তুমি," বললো সে।

"আমি...কী?"

"শিলা," শয়তানটার মুখে হাসি। "তোমার খুব কাছের কেউ, তাই না?"

জবাব দিলাম না।

"তুমি *ভালোবাসো* ওকে।"

ভালোবাসো কথাটা ব্যঙ্গাত্মক স্বরে উচ্চারণ করলো কাস্টম্যান। নড়লাম না আমি।

"তোমাকে অবশ্য দোষ দিয়ে লাভ নেই। শিলা মাল ছিল একখান। হাঁটু গেড়ে বসে এমনভাবে–"

সামনে বাড়লাম আমি। হেসে উঠলো কাস্টম্যান। সাথে সাথে স্কয়ার্স থামালো আমাকে। সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো। পিছিয়ে গেলাম। উল্টোপাল্টা কিছু করা উচিত হবে না এই মুহূর্তে।

হাসি থামালো কাস্টম্যান, দৃষ্টি এখনও আমার দিকে। "তুমি জানতে চাও যে ওকে কীভাবে আমার জন্যে কাজ করতে রাজি করালাম?"

এবারো কোন জবাব দিলাম না।

"ঠিক যেভাবে তানিয়াকে রাজি করিয়েছিলাম। ধীরে ধীরে টোপ ফেলে আমার স্টুডিওতে নিয়ে আসি ওকে একদিন। ততদিনে বেশ ভালো পরিচয় হয়ে গেছে আমার সাথে। এটুকুই দরকার ছিল। একবার গেঁথে ফেললেই কাজ শেষ।"

"কীভাবে?" জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"আসলেও শুনতে চাও?"

"কীভাবে?"

চোখ বন্ধ করে ফেললো কাস্টম্যান। মুখে হাসি লেগেই আছে। স্মৃতিচারণ করে মজা পাচ্ছে হারামিটা।

"প্রথমে ওর সুন্দর কয়েকটা ছবি তুলে দেই। কাজ শেষ হবার সাথে সাথে গলায় ছুরি ধরি। এরপর একটা ঘরে নিয়ে বিছানার সাথে আটকে ফেলি হ্যান্ডকাফ দিয়ে," এটুকু বলে থামে সে, "সেই ঘরটার চারপাশের দেয়ালেও এটার মতো শোলা ছিল। ড্রাগ ইনজেক্ট করি ওর শরীরে। অর্ধেক হুঁশ ফিরলে এমনভাবে ভিডিও করি যেন ওর অনুমতি নিয়েই সব করছি। আর এভাবেই তোমার শিলা কুমারীত্ব হারায়। ভিডিও ক্যামেরার সামনে। তাও কার কাছে? তোমার সামনেই শুয়ে আছে সেই মহান ব্যক্তি। দারুণ অভিজ্ঞতা ছিল।"

রাগে কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। ওর গলা না টিপে ধরে আর কতক্ষণ থাকতে পারবো, জানি না। সেটাই চাইছে কাস্টম্যান। তাহলে মুক্তি পাবে সে।

"কতদূর বলেছি? ওহ হ্যাঁ, বিছানার সাথে হ্যান্ডকাফ দিয়ে আটকে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে নিয়মিত বিরতিতে ড্রাগটা ইনজেক্ট করি ওর শরীরে। খুবই দামী ড্রাগ। কিন্তু এসব বিনিয়োগ হিসেবে ধরে নিয়েছিলাম। ব্যবসা দাঁড় করাতে হলে খরচ তো করতেই হবে। এক পর্যায়ে নেশা ধরে যায় শিলার। আর একবার যদি এই নেশা ধরে, তাহলে আর সেটা থেকে নিস্তারের কোন

উপায় নেই। ওর হাত থেকে যখন হাতকড়া খুলি, তখন একটা হিটের জন্যে আমার পা-ও চাটতে রাজি ছিল। বুঝতে পারছো কী বলছি?"

যেন বাহবার অপেক্ষা করছে, এমন ভঙ্গিতে থামলো শয়তানটা। মনে হচ্ছে কেউ বুলডোজার চালাচ্ছে আমার হৃদয়ের ওপর দিয়ে।

স্কয়ার্সের কোন বিকার নেই অবশ্য। "এরপর ওকে কাজে নামিয়ে দিলে?"

"হ্যাঁ। কিছু বিশেষ কৌশলও শিখিয়ে দেই। কীভাবে খদ্দেরের সাথে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে হবে, কীভাবে একইসাথে দুইজনের সাথে কাজ করতে হবে-এসব। আমিই ছিলাম এই লাইনে ওর টিচার।"

বমি আসছে এখন।

"তারপর?"

"না," বললো কাস্টম্যান। "আগে তোমাদের-"

"তাহলে আর আমাদের থেকে কাজ নেই।"

"তানিয়া।"

"কী?"

একবার ঠোঁট ভেজালো কাস্টম্যান। "আমাকে একটু পানি দিতে পারবে?"

"না। তানিয়ার ব্যাপারে কী বলছিলে?"

"কুত্তিটা এখানে আটকে রেখেছে আমাকে। এটা ঠিক না। হ্যাঁ, ওকে কষ্ট দিয়েছি আমি। কিন্তু সেটার কারণও ছিল। আমাকে কাজ ছেড়ে দেয়ার হুমকি দেয়! এত বড় সাহস! গার্ডেন সিটির কোন খদ্দের নাকি ওকে বিয়ে করবে। তাকে ভালোবাসে। *প্রিটি ওম্যান* সিনেমা পেয়েছে আর কি! আমার সেরা কয়েকটা মেয়েকেও সাথে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। গার্ডেন সিটিতে ও আর ওর ভাতার নাকি তাদেরও খেয়াল রাখবে। নেশার ছোবল থেকে মুক্তি দিবে-কত বড় বড় কথা। কিন্তু আমি তো সেটা হতে দিতে পারি না।"

"তাই," স্কয়ার্স বললো, "ওকে শিক্ষা দিয়েছো।"

"হ্যাঁ, এটাই নিয়ম।"

"রেজর দিয়ে চেহারার ঐ অবস্থা করেছো।"

"শুধু চেহারা না। ভাতার শুয়োরটা মুখ ঢেকেও কাজ করতে পারতো। বুঝছো তো কী বলছি? অন্য মেয়েদেরও উচিত শিক্ষার ব্যবস্থা করি। গল্পের আসল অংশ তো এখনও বলিইনি। ওর বয়ফ্রেন্ড একদিন আসে গার্ডেন সিটি থেকে। তখনও জানে না যে আমি তানিয়ার কী হাল করেছি। গাধাটার বয়স ছিল বাইশ। বন্দুক নিয়ে প্রেমিকাকে উদ্ধার করতে এসেছে। আমাকে দেখেই গুলি করে। সময়মতো সরতে পারিনি। বগল দিয়ে ঢুকে শিরদাঁড়ায় গিয়ে লাগে .২২ ক্যালিবারের গুলি। অথর্ব হয়ে যাই সারাজীবনের জন্যে। বিশ্বাস

হয়? এরপরের ঘটনা তো আরো মজার। ছোকরা তানিয়াকে দেখে কী করে জানো?"

যান্ত্রিক শব্দটা ছাড়া আর কোন শব্দ নেই ঘরে।

"ফেলে রেখে চলে যায়। আমার হাতের কাজ এতটাই ভালো ছিল যে দৌড়ে পালায় হারামিটা। ওর *মহৎ ভালোবাসা* কই ছিল তখন? এরপর আর ওদের দেখা হয়নি।"

বদ্ধ উন্মাদের মতো হাসতে লাগলো কাস্টম্যান। নিজেকে শান্ত রেখেছি আমি খুব কষ্ট করে।

"হাসপাতালেই অনেক দিন থাকতে হয় আমাকে। ততদিনে একটু সেরে ওঠে তানিয়া। এরপর আমাকে সেখান থেকে ছাড়িয়ে এখানে নিয়ে আসে। যত্ন নেয় নিয়মিত। বুঝতে পারছো কী করছে ও? ইচ্ছে করে আমার জীবনটা লম্বা করছে। কোন কিছু খেতে অস্বীকৃতি জানাই আমি। কিন্তু ঐ নলের সাহায্যে খাওয়ায়। আমি তোমাদের সব বলবো, বদলে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।"

"কী?" স্কয়ার্স জিজ্ঞেস করলো।

"মেরে ফেলো আমাকে।"

"সেটা সম্ভব না।"

"তাহলে পুলিশকে বলো। ওরা গ্রেফতার করুক আমাকে। সব শিকার করবো।"

"শিলা রজার্সের কী হলো?" স্কয়ার্স জিজ্ঞেস করলো।

"কথা দাও সাহায্য করবে?"

আমার দিকে তাকালো স্কয়ার্স। "যথেষ্ঠ শুনেছি। চলো যাই।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, দাঁড়াও। বলছি। একবার শুধু ভেবে দেখো, ঠিক আছে?"

একবার স্কয়ার্সের দিকে, আরেকবার আমার দিকে তাকালো কাস্টম্যান। স্কয়ার্স এখনও চোখমুখ শক্ত করে রেখেছে। আর আমার চেহারায় কি অভিব্যক্তি খেলা করছে সেটা নিজেও জানি না। "আমি জানি না শিলা এখন কোথায়।"

"তোমার হয়ে কতদিন কাজ করেছে ও?"

"এই বছর তিনেক।"

"ছাড়া পেল কীভাবে?"

"কী?"

"তুমি তো তোমার শিকার করা কোন মেয়েকে এমনি এমনি ছেড়ে দিবে না," স্কয়ার্স বললো। "এজন্যেই জানতে চাচ্ছি কীভাবে তোমার বাঁধন থেকে মুক্ত হলো ও।"

"কাজ শুরু করার কিছুদিনের মধ্যেই কয়েকজন নিয়মিত খদ্দের জুটে যায় ওর। কাজে দক্ষ ছিল মেয়েটা। আর এভাবেই একসময় বেশ ভালো জানাশোনা হয়ে গেল। সবার ক্ষেত্রে এমনটা হয় না, কিন্তু ওর ভাগ্য ভালো ছিল বলতে হবে।"

"ভালো জানাশোনা বলতে কী বোঝাচ্ছো?"

"মাদক ব্যবসার সাথে জড়িয়ে যায়। একদম রাঘব বোয়াল পর্যায়ের লোকজনের সাথে পরিচয় ওর শুরু থেকেই। ওদের হয়ে মাদক সরবরাহও করে। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার, মাদক সেবন ছেড়ে দেয়। আমি চেষ্টা করেছিলাম ওকে আবারো ঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে, কিন্তু ওর বন্ধুরা আমার চেয়েও ক্ষমতাধর।"

"যেমন?"

"লেনি মিসলারের নাম শুনেছো?"

"অ্যাটর্নি লেনি মিসলার?" বিস্ময়মাখা কণ্ঠে জানতে চাইলো স্কয়ার্স।

"মাফিয়া অ্যাটর্নি," কাস্টম্যান সংশোধন করে দিল ওকে। "একবার মাদক নিয়ে ধরা পড়েছিল। তখন ওকে ছাড়ায় লেনি।"

"শিলার মতো সাধারণ একটা মেয়ের জন্যে লেনি মিসলার কেস লড়েছিল?" স্কয়ার্স ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো।

"রাঘব বোয়াল বলতে কী বুঝিয়েছি, বুঝতে পারছো তো এবারে? আমিও খোঁজ-খবর নেয়া শুরু করি একটু। দুই ষণ্ডা এসে হাজির হয় আমার বাড়িতে। নিজের চর্কায় তেল দিতে বলে। বোকা নই আমি, ছোঁকছোঁক থামিয়ে দেই। ভাত ছিটালে কাকের অভাব হবে না।"

"এরপর কী হয়?"

"আর কখনো ওর সাথে দেখা হয়নি আমার। শুনেছিলাম কোন ভার্সিটিতে যেন ভর্তি হয়েছে। বিশ্বাস হয়?"

"কোন ভার্সিটি?"

"জানি না। কথাটা সত্য নাকি সেটাও নিশ্চিত নই। গুজবও হতে পারে।"

"আর কিছু?"

"না।"

"কোন গুজবও না?"

চোখজোড়া ইতস্তত ঘরময় ঘোরাফেরা করছে কাস্টম্যানের। আমাদের এখানে আটকে রাখতে বেপরোয়া সে এখন। কিন্তু বলার মতো আর কিছু নেই। স্কয়ার্সের দিকে তাকালাম। মাথা নেড়ে ঘুরে দাঁড়ালো ও। আমি পিছু নিলাম।

"দাঁড়াও!"

কাস্টম্যানের কথায় আর কান দেয়ার দরকার নেই আমাদের।

"প্লিজ, আমাকে এখান থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করো। সবকিছু তো বললাম! এভাবে ফেলে রেখে যেও না।"

এরকম একটা পরিস্থিতি আসলেও অমানবিক। কিন্তু তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

"বেজন্মার দল!" এবার চেঁচিয়ে উঠলো কাস্টম্যান। "তুই! তুই আমার এঁটো খাবার খাচ্ছিলি এতদিন! যতবার তোর সাথে শুয়েছে, যা যা করেছে—সব আমার শেখানো। শুনছিস কী বলছি?"

গাল লাল হয়ে গেল আমার, কিন্তু ঘুরলাম না। দরজা খুললো স্কয়ার্স।

"এসব কিন্তু পিছু ছাড়ে না," এবারে আগের চেয়ে কোমল গলায় বললো কাস্টম্যান।

ইতস্তত করতে লাগলাম আমি।

"ওকে দেখলে হয়তো কিছু বোঝা যাবে না। কিন্তু ওর যা অবস্থা হয়েছিল, ওখান থেকে ফেরত আসে না কেউ।"

হাজার চেষ্টা করেও শব্দগুলো কানে ঢোকা থেকে আটকাতে পারলাম না। হাতুড়ির বাড়ির মতো আমার মস্তিষ্কে এসে আঘাত করছে প্রতিটা অক্ষর। ঘর থেকে বের হয়ে এসে দরজা আটকে দিলাম। আবারো অন্ধকার নেমে আসলো জায়গাটায়। আমাদের এগিয়ে দিল তানিয়া।

"তোমরা কী বলে দেবে?" জড়ানো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো ও।

ওকে কখনো আঘাত করিনি আমি। এটাই বলেছিল আমরা এখানে আসার পর। *একবারও হাত তুলিনি।* সত্য কথাই বলেছিল।

কোন জবাব না দিয়ে বাইরে চলে এলাম আমরা। ফুসফুস ভরে শ্বাস নিলাম। যেন হ্রদের গভীর থেকে ওপরে উঠে এসেছে দুজন ডুবুরি। ভ্যানে উঠে কেটে পড়লাম ওখান থেকে।

দশ

গ্রান্ড আইল্যান্ড, নেব্রাস্কা

অগস্ত্যযাত্রার পথটা একাই পাড়ি দিতে চায় শিলা।

অদ্ভুত হলেও ব্যাথাটা এখন কমতির দিকে। কেন? সেটা বলতে পারবে না। কোন আলোর রেখাও দেখতে পাচ্ছে না অবশ্য। কোন স্মৃতি চোখের সামনে ঘুরছে না। মৃত্যুতে কোন স্বান্তনা খুঁজে পাচ্ছে সে। দেবদূতেরা ঘিরে রাখেনি ওকে। অনেক আগে বিদায় নেয়া আত্মীয় বা বন্ধুরা–কেউই আসেনি ওর হাতটা ধরে স্বান্তনা দিতে। এমনকি ওর প্রিয় দাদীমাও না, ওকে সবসময় *সোনামণি* বলে ডাকতেন যিনি।

একা মারা যাবে ও। অন্ধকারে।

চোখ খুললো। এখন কি স্বপ্ন দেখছে? বলা কঠিন। কিছুক্ষণ আগে হ্যালুসিনেশন হচ্ছিল। চেতনা ফিরে পাচ্ছিল, আবার ডুবে যাচ্ছিল অতল অন্ধকারে। একবার কার্লির চেহারাও দেখেছিল। আকুতি করেছিল তাকে চলে যেতে। ঘটনাটা কি সত্যিই ঘটেছিল? নাকি সব ভ্রম?

ব্যাথাটা বাড়লে ঘুম আর জাগরণের সীমা ঘুচে যায়। কোনটা স্বপ্ন, কোনটা বাস্তব–সেটা পরিষ্কার করে বলা যায় না। লড়াই করা আগেই থামিয়ে দিয়েছে ও। এটা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

প্রথমে কষ্টটাকে রোখার চেষ্টা করে সবাই। কাজ হয় না। এরপর কষ্টটাকে কয়েক ভাগে ভাগ করে নেবার চেষ্টা করে। কিন্তু সেটাও কাজ করে না। শেষ পর্যন্ত একটা উপায়ই খোলা থাকে সামনে। বোধশক্তি বিসর্জন দেয়া।

কিন্তু আশপাশের সব কিছু যদি অনুভব করতেই পারে, তাহলে কি কিছু বিসর্জন দিয়েছে আদৌ?

দার্শনিক প্রশ্ন। জীবিতরা মাথা ঘামাবে এসব নিয়ে। এতকিছুর পর, সব আশা আর স্বপ্ন নিজ হাতে পুনঃনির্মাণের পরেও এত তাড়াতাড়ি মারা যাচ্ছে শিলা রজার্স।

একেই বোধহয় বলে পোয়েটিক জাস্টিস।

এখন সে যা অনুভব করছে, ভেতরটা গুঁড়িয়ে দিচ্ছে যে অনুভূতিটা, সেটাকেই বোধহয় অনুতাপ বলে। সবকিছু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে এখন। সত্যটা নগ্ন ওর সামনে।

একা মারা যেতে চায় শিলা রজার্স।

কিন্তু সে আছে ওর সাথে ঘরটায়, এটা নিশ্চিত। কপালে তার হাতের ছোঁয়া অনুভব করতে পারছে। জীবনিশক্তি ক্রমেই ক্ষয়ে যাওয়া সত্ত্বেও একটা অনুনয় করলো শেষবারের মত।

"চলে যাও," বললো অস্ফুট সুরে। "দয়া করে চলে যাও এখান থেকে।"

এগারো

যা দেখে এসেছি সেসব নিয়ে কোন আলোচনা করিনি আমি আর স্কয়ার্স। পুলিশেও ফোন দেইনি। লুইস কাস্টম্যানের ছবিটা ভেসে উঠলো একবার মনের পর্দায়। আজীবনের জন্যে বন্দী, পড়ার মতো কিছু নেই, শোনার মতো কিছু নেই, কথা বলার কেউ নেই। আছে শুধু তার তোলা ঐ ছবিগুলো। আমি যদি ভালো মানুষ হতাম, তাহলে কিছু একটা করতাম হয়তো।

গার্ডেন সিটি থেকে আসা তানিয়ার সেই প্রেমিকের কথাও ভাবলাম। তার প্রত্যাখান নিশ্চয়ই কাস্টম্যানের ক্ষুরের পোচগুলো থেকেও তীব্র হয়ে আঘাত করেছিল বেচারিকে। এখনও কি লোকটা তানিয়াকে নিয়ে ভাবে? নাকি ভুলেই গেছে এই নামের একজনের অস্তিত্ব ছিল কোনদিন। তানিয়ার চেহারা কি স্বপ্নে তাড়া করে বেড়ায়?

মনে হয় না।

এসব নিয়ে ভাবছি কারণ একই সাথে প্রচণ্ড ভয় আর কৌতূহল অনুভব করছি আমি। ভাবনাগুলো শিলাকে দূরে ঠেলে রাখছে কিছু সময়ের জন্যে। কাস্টম্যান তার সম্পর্কে যা যা বলেছে...

বারবার নিজেকে মনে করাচ্ছি যে শিলা এখানে ভিক্টিম। তাকে অপহরণের পর ধর্ষণ করে শুয়োরটা। এরপর সে যা করেছে তাতে তার কোন দোষ নেই। ওকে ভিন্ন চোখে দেখা উচিত না আমার। কিন্তু এই ভাবনাগুলো ধোপে টিকছে না।

আর সেজন্যে নিজের প্রতি ঘেন্নাবোধ হচ্ছে।

স্কয়ার্স যখন আমাকে অ্যাপার্টমেন্টের সামনে নামিয়ে দিল, তখন প্রায় চারটা বাজছে।

"কী বুঝলে?" জিজ্ঞেস করলাম ওকে।

কিছুক্ষণ দাড়িতে হাত বুলালো স্কয়ার্স। "কাস্টম্যানের শেষ কথাটা। মানে ওরকম অতীত কখনো পিছনে ছাড়ে না–সত্যিই বলেছে কিন্তু।"

"নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলছো?"
"হ্যাঁ, আসলেও অভিজ্ঞতা থেকে বলছি।"
"তো?"
"তো আমার ধারণা অতীতের কোন শ্বাপদ ফিরে এসেছে ওর জীবনে।"
"তাহলে ঠিকপথেই এগোচ্ছি আমরা?"
"মনে তো তাই হচ্ছে।"
"ও যা-ই করে থাকুক না কেন," কিছুক্ষণ পর বললো স্কয়ার্স, "তুমি যা-ই করে থাকো না কেন, কখনো তোমার পিছু ছাড়বে না। তার মানে এটা না যে সবসময় মাথা নিচু করে থাকতে হবে ওসবের সামনে।"
চলে গেল স্কয়ার্স।

আমার অনুপস্থিতিতে ফোনে একটা ভয়েস মেসেজ এসেছে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। এলসিডি মনিটরটায় মেসেজ জমা হওয়ার সময় দেখাচ্ছে রাত ১১টা ৪৭ মিনিট। এত রাতে! নিশ্চয়ই বাসা থেকে কেউ ফোন দিয়েছিল।
ভুল ভেবেছিলাম।
প্লে বাটনে চাপ দিতেই একটা নারীকণ্ঠ শুনতে পেলাম। "হ্যালো, উইল।"
কণ্ঠটা চিনতে পারছি না।
"আমি কেটি। কেটি মিলার।"
জমে গেলাম।
"অনেক দিন কোন যোগাযোগ নেই, তাই না? এত দেরিতে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। তুমি বোধহয় ঘুমাচ্ছো। যাইহোক, উইল, এই মেসেজটা পাওয়ার পর আমাকে একটা ফোন দিতে পারবে? যত দেরিই হোক না কেন। আমি অপেক্ষা করবো। কথা আছে তোমার সাথে।"
একটা নম্বর জানিয়ে মেসেজটা শেষ করে কেটি। হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। কেটি মিলার। জুলির ছোটবোন। শেষবার যখন ওকে দেখেছিলাম তখন ওর বয়স ছিল ছয় কি সাত। চার বছর বয়সে আমাকে আর জুলিকে বেশ বিব্রতকর অবস্থায় একবার চমকে দিয়েছিল। দ্রুত কম্বল দিয়ে নিজেদের ঢেকে নেই আমরা, প্যান্ট তোলার সময় ছিল না। কোনমতে হাসি আটকে কাজটা করতে হয়।
ছোট্ট কেটি মিলার।
ওর বয়স কত হবে এখন? সতেরো কি আঠারো। অবাকই লাগছে ভাবতে। জুলির মৃত্যু আমাদের পরিবারের ওপর কী প্রভাব ফেলেছিল তা ভালো করেই জানি। মি. মিলার এবং মিসেস মিলারকে যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে সেটাও বুঝি। কিন্তু কেটির ব্যাপারে কখনো গুরুত্ব দিয়ে

ভাবিনি। জুলি আর আমাকে যেখানে দেখে ফেলেছিল কেটি সেখানেই মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় জুলিকে। ওদের বেজমেন্টের কাউচে।

এতদিন পর হঠাৎ করে আমাকে কেন ফোন দিল কেটি?

হয়তো সমবেদনা জানানোর জন্যে ফোন দিয়েছে, নিজেকে প্রবোধ দিলাম। কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য শোনালো না কথাটা। তাহলে তো এত রাতে ফোন দেয়ার কথা নয়। মেসেজটার কোন লুকোনো অর্থ নেই তো? নাহ, আপাতদৃষ্টিতে সেরকম মনে হচ্ছে না। ও বলেছে যেকোন সময় ফোন দিতে। কিন্তু এখন চারটার বেশি বাজছে আর আমিও ক্লান্ত। যত জরুরী ব্যাপারই হোক না কেন, সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করাই যায়।

বিছানায় শুয়ে কেটি মিলারকে শেষ যেবার দেখেছিলাম, সেদিনকার কথা ভাবতে লাগলাম। আমার পরিবারের সদস্যদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল যাতে জুলির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় না যাই। কিন্তু দুদিন পর ২২ নং রুটের পাশে অবস্থিত কবরস্থানটায় একা একা যাই আমি। বসে থাকি জুলির কবরের পাশে। কান্নাকাটি করিনি সেদিন। কোন অনুভূতিই কাজ করছিল না। এসময় হঠাৎ সেখানে জুলির পরিবারের লোকেরা চলে আসায় গা ঢাকা দেই আমি। কিন্তু একবার চোখাচোখি হয়ে যায় কেটির সাথে। অদ্ভুত একটা ক্লান্তি খেলা করছিলো সেই ছোট্ট চোখজোড়ায়, ওর বয়সের সাথে বড্ড বেমানান। দুঃখের পাশাপাশি বোধহয় করুণার ছায়াও দেখেছিলাম সেদিন ওর দৃষ্টিতে।

এরপরেই বেরিয়ে যাই কবরস্থান থেকে। ওর সাথে আর কথা বা দেখা হয়নি কোনদিন।

বারো

বেলমন্ট, নেব্রাস্কা

শেরিফ বার্থ ক্যারোর কাছে এসব নতুন কিছু নয়। এর চেয়েও খারাপ দৃশ্য দেখে অভ্যাস আছে তার।

বিশেষ করে খুনের ঘটনাস্থলগুলো দেখে নতুন আগত অফিসারদের অনেকেই বমি করে দেয়। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা রক্ত, অদ্ভুত সব কোণে মুচড়ে থাকা হাত-পা অথবা পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা নাড়িভুঁড়ি দেখলে স্বাভাবিক যে কারো এরকম প্রতিক্রিয়া হবে। তবে সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে যাদের মৃত্যু হয়, সেইসব হতভাগা/হতভাগীদের লাশের অবস্থা থাকে আরো সঙ্গিন।

এত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আজকের ক্রাইম সিনটার অবস্থা বড়সড় একটা ধাক্কা দিল তাকে। মৃত মহিলার চারপাশে কিন্তু খুব বেশি রক্তের দাগ নেই। বরং চেহারা বিকৃত হয়ে আছে প্রচণ্ড ভয়ে। ভয়ানক কষ্ট পেয়ে মৃত্যু হয়েছে সেটাও স্পষ্ট। আঙুলগুলো মোচড়ানো, খালি চোখেই বোঝা যাচ্ছে যে পাঁজরের বেশ কয়েকটা হাড্ডি ভেঙে গেছে। না, ট্রাক বা গাড়ির সাথে ধাক্কা লাগেনি, কোন মানুষের হাতের কাজ এটা। ইচ্ছেকৃতভাবে এই দশা করা হয়েছে তার।

"কে খুঁজে পেয়েছে ওনাকে?" অধীনস্থ জর্জ ভকারকে জিজ্ঞেস করলো সে।

"র‍্যানডলফের ছেলেরা।"

"কারা?"

"জেরি আর রন।"

মনে মনে হিসেব করলো বার্থা। জেরির বয়স এখন হবে ষোলো আর রনের চৌদ্দ।

"জিপসিকে নিয়ে হাঁটতে বেরিয়েছিল," জর্জ বললো। জিপসি হচ্ছে র‍্যানডলফদের জার্মান শেফার্ড কুকুরদের নাম। "ও-ই ঘ্রাণ শুঁকে বের করেছে।"

"ছেলে দুটো কোথায় এখন?"

"ডেভ বাড়ি নিয়ে গেছে তাদের। অবস্থা খুব একটা ভালো মনে হচ্ছিলো না কারোই। প্রশ্ন করে ছেড়ে দিয়েছি। কিছু জানে না ওরা।"

মাথা নাড়লো বার্থা। ঘটনাস্থলে একটা স্টেশন ওয়াগন এসে থামলো এসময়। কাউন্টি মেডিক্যাল এক্সামিনার ক্লাইড স্মার্টের গাড়ি। কিছুক্ষণ পর শব্দ করে খুলে গেল দরজা। দ্রুত হেঁটে ওদের কাছে চলে এলো ক্লাইড। চোখের ওপর আপনাআপনি হাত চলে গেল বার্থার।

"তাড়াহুড়ার কিছু নেই, ক্লাইড। মৃতদেহ কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে না।"

মুচকি হাসলো জর্জ।

ক্লাইড অবশ্য এসব কথাবার্তা শুনে অভ্যস্ত। তার বয়স পঞ্চাশের কোঠায়, বার্থার মতোই। প্রায় দুই যুগ ধরে একসাথে কাজ করছে দুজনে। খোঁচাটা আমলে না নিয়ে মৃতদেহের পাশে গিয়ে বসে পড়লো সে। চেহারার অভিব্যক্তি বদলে গেল সাথে সাথে।

"ঈশ্বর!" লাশটা প্রথম দর্শনের পর এই কথাটাই বেরিয়ে এলো মেডিক্যাল এক্সামিনারের মুখ দিয়ে।

বার্থাও সামনে এগিয়ে বসলো তার পাশে।

"যীশু! মানে কীভাবে–" গ্লাভস পড়া হাতে লাশের মুখের ওপর এসে পড়া চুলগুলো একটু সরিয়ে আবারো বলে উঠলো ক্লাইড। মাথা ঝাঁকাচ্ছে বিষণ্ন ভঙ্গিতে।

ক্লাইডের এই প্রতিক্রিয়ায় বার্থা অবশ্য অবাক হলো না। বেশিরভাগ মেডিক্যাল এক্সামিনারই কাজে যোগ দেয়ার কিছুদিনের মধ্যে আশপাশের সবার সাথে মোটামুটি শীতল আচরণ করা শুরু করে। প্রতিদিন মৃতদেহ নিয়ে কাজ করতে করতে অনুভূতি বলতে কিছু থাকে না। কিন্তু ক্লাইডের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভিন্ন। প্রতিটা ভিক্টিমের কষ্ট যেন নিজেও অনুভব করে সে। কতবার লাশের পাশে তাকে কাঁদতে দেখেছে বার্থা! প্রতিটা ডিওএ (DOA) সম্মানের সাথে তৈরি করে। ময়নাতদন্তের সময় এমন ভাবে ছুরি চালায় যেন জীবন্ত কোন রোগীর অস্ত্রোপচার করছে। মৃতের আত্মীয়দের সাথে কথা বলার সময় তাদের বেদনা সে নিজেও অনুভব করে।

"কতক্ষণ আগে মারা গেছে বলে তোমার ধারণা?" বার্থা জিজ্ঞেস করলো।

"খুব বেশি আগে না," কোমল স্বরে বললো ক্লাইড। "রিগর মর্টিসের প্রাথমিক ধাপে আছে এখন। ছয় ঘণ্টার বেশি হবে না। লিভারের তাপমাত্রা

মেপে–" বলে হাতের মোচড়ানো একটা আঙুল দেখেই থেমে গেল সে। "ওহ ঈশ্বর!"

ডেপুটির দিকে তাকিয়ে একবার মাথা নাড়লো বার্থা। "কোন পরিচয় পত্র পেয়েছো?"

"না।"

"ছিনতাইয়ের ঘটনা হতে পারে?"

"সম্ভাবনা কম। লাশের এই অবস্থা করার কথা না," ক্লাইড বললো। "কেউ ইচ্ছেকৃতভাবে কষ্ট দিয়ে মেরেছে।"

এক মুহূর্ত কথা বললো না কেউ। ক্লাইডের চোখের কোনায় পানি দেখতে পেলো বার্থা। "আর কিছু?" জিজ্ঞেস করলো সে।

দ্রুত চোখ নামিয়ে নিল ক্লাইড। "ভবঘুরে জাতীয় কেউ নয়, এটা নিশ্চিত," বললো মেডিক্যাল এক্সামিনার। "পরনের সবকিছু যথেষ্ঠ রুচিশীল। দাঁতের অবস্থাও ভালো, চেক-আপ করাতো নিয়মিত।"

"ধর্ষণের সম্ভাবনা?"

"কাপড়-চোপড় তো সব যথাস্থানেই দেখতে পাচ্ছি," ক্লাইড বললো। "কিন্তু এ কী অবস্থা করেছে! রক্ত বেশি দেখছি না। হত্যাস্থল ভিন্ন হবার সম্ভাবনা বেশি। কেউ হয়তো গাড়িতে করে এনে লাশ ফেলে গেছে এখানে। পরীক্ষা করে আরো বলতে পারবো।"

"ঠিক আছে তাহলে," বার্থা বললো। "মিসিং পার্সন ডাটাবেজে হাতের ছাপ আপলোড করে দেখা যাক কিছু পাই কিনা।"

জবাবে আনমনে কেবল একবার মাথা নাড়লো ক্লাইড।

উঠে পড়লো বার্থা।

তেরো

কেটি নিজেই ফোন করলো আমাকে।

ফোনের রিং শুনে মনে হলো যেন কানের কাছে জোরে হর্ন বাজাচ্ছে কেউ। গভীর ঘুমে তলিয়ে ছিলাম। একবারও স্বপ্ন দেখিনি শোয়ার পর থেকে। তাই মনে হলো তীব্র অন্ধকার থেকে অকস্মাৎ টেনে আলোতে নিয়ে আসা হয়েছে আমাকে। চমকে উঠে বসলাম। বুকের ভেতরে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। ডিজিটাল ক্লকটায় সময় দেখাচ্ছে দেখি ৬ টা ৫৮।

গুঙিয়ে উঠে ফোনের দিকে হাত বাড়ালাম। কলার আইডি ব্লক করা নম্বরটার। এই কাজটার কোন মানে দেখি না আমি। শুধু শুধু টাকা নষ্ট।

"হ্যালো," বললাম রিসিভার কানে চাপিয়ে। কণ্ঠটা একটু বেশিই সজাগ লাগলো নিজের কাছে।

"উইল ক্রেইন?"

"জি?"

"আমি কেটি মিলার," বলে একটু থামলো কণ্ঠস্বরটা। "জুলির বোন।"

"হ্যালো, কেটি," বললাম।

"তোমার জন্যে একটা মেসেজ রেখে দিয়েছিলাম কালকে।"

"শুনতে শুনতে চারটা বেজে গিয়েছিলো, তাই আর ফোন দেইনি।"

"ওহ! তাহলে বোধহয় তোমার কাঁচা ঘুম নষ্ট করলাম।"

"সমস্যা নেই," বললাম।

ফোনে কণ্ঠটা শুনে মনে হচ্ছে একদম বাচ্চা একটা মেয়ে ফোন দিয়েছে। ওর জন্ম সাল মনে আছে আমার। মনে মনে হিসেব করে নিলাম। "হাইস্কুলের শেষ বর্ষে আছো, না?"

"এই সেমিস্টারে ভার্সিটির ক্লাস শুরু হবে।"

"কোথায়?"

"বোডোইন। ছোট্ট একটা ভার্সিটি।"

"মেইনে," বললাম। "চিনি আমি। খুব ভালো একটা প্রতিষ্ঠান। অভিনন্দন।"

"থ্যাঙ্কস।"

উঠে বসলাম। এই অস্বস্তিকর নীরবতাটা পূরণ করার জন্যে কী বলা যায়, ভাবছি। "অনেক দিন পর," বহুল ব্যবহৃত কথাটাই ব্যবহার করলাম শেষ পর্যন্ত।

"উইল।"

"হ্যাঁ?"

"তোমার সাথে দেখা করতে চাই আমি।"

"নিশ্চয়ই।"

"আজকে পারবে?"

"কোথায় আছো তুমি?" জিজ্ঞেস করলাম।

"লিভিংস্টোনে," বললো কেটি। "তোমাকে সেদিন আমাদের বাসার এখানে আসতে দেখেছিলাম।"

"আমি আসলেও দুঃখিত।"

"তুমি চাইলে আমি শহরে আসতে পারি।"

"দরকার নেই," বললাম। "আজকে এমনিতেও বাবার সাথে দেখা করতে যেতাম আমি। তার আগে কোথাও দেখা করি আমরা?"

"ঠিক আছে," জবাব দিল সে। "কিন্তু এখানে না। হাইস্কুলের পাশে বাস্কেটবল কোর্টটার কথা মনে আছে?"

"হ্যাঁ," বললাম। "দশটার দিকে ওখানে থেকো।"

"ঠিক আছে।"

"কেটি," রিসিভার অন্য কানে নিয়ে বললাম। "কিছু মনে করো না, কিন্তু তোমার ফোন পেয়ে একটু অবাক হয়েছি।"

"বুঝতে পারছি।"

"আমার সাথে দেখা করতে চাচ্ছো কেন?"

"তোমার কী মনে হয়?"

সাথে সাথে কোন জবাব দিতে পারলাম না, কিন্তু তাতে কোন সমস্যাও হলো না। লাইন কেটে দিয়েছে কেটি।

চৌদ্দ

উইলকে অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে বেরিয়ে যেতে দেখলো ঘোস্ট।

তবে পিছু নিল না। ওর গন্তব্য কোথায় সেটা জানা আছে তার। কিন্তু উইল যতক্ষণ দৃষ্টির সীমায় থাকলো, হাতের মুঠো বারবার খুললো আর বন্ধ করলো ঘোস্ট। সমস্ত পেশী টানটান হয়ে আছে। শরীর কাঁপছে রীতিমতো।

জুলি মিলারের কথা মনে হলো ঘোস্টের। বেইজমেন্টে মেয়েটার নগ্ন শরীর, দেহের উত্তাপ...কখনো ভুলবে না। স্পর্শের সেই নির্জীব অনুভূতি আজও তাড়া করে বেড়ায়। চেহারা প্রায় বেগুনি বর্ণ ধারণ করেছিল, চোখের সাদা অংশে রক্তের ঘন লাল ফুটকি–প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল মেয়েটা। মুখের এক পাশে জমে শক্ত হয়ে গেছিল লালা। গলাটা অস্বাভাবিক রকমের কাত হয়ে ছিল একপাশে। তারটা ইসোফ্যাগাস ভেদ করে ঢুকে গিয়েছিল ভেতরে, আরেকটু হলে ধড় থেকে আলাদা করে ফেলেছিল মাথাটা।

আর রক্ত!

শ্বাসরোধ করে হত্যা ওর প্রিয় পদ্ধতিগুলোর একটা। ঠগীদের কর্মপদ্ধতি বিস্তারিত জানার জন্যে ইন্ডিয়াতেও গিয়েছিল। রুমাল পেঁচিয়ে শ্বাসরোধে হত্যা করা তাদের কাছে রীতিমতো একটা শিল্প। পরবর্তীতে আগ্নেয়াস্ত্র বা ছুরি চালনার প্রশিক্ষণও নিয়েছে ঘোস্ট, কিন্তু তৃপ্তির দিক দিয়ে আদিম কিন্তু অব্যর্থ পদ্ধতিটার ধারেকাছেও যেতে পারেনি কোনটা।

দৃষ্টির বাইরে চলে গেল উইল।

দুই ভাই ওরা।

কুং ফু সিনেমাগুলোর কথা মনে হলো ঘোস্টের, যেখানে এক ভাইকে হত্যা করা হলে অন্য ভাই প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। উইল ক্রেইনকে যদি হত্যা করে সে, তাহলে এর পরিণাম কী হবে?

নাহ, সে যে কাজে নেমেছে তার সাথে প্রতিশোধের কোন তুলনা চলে না।

তবুও উইলের চিন্তা মাথা থেকে দূর হলো না তার। হাজার হলেও সে-ই মূল চাবিকাঠি। গত কয়েক বছরে কী বদলে গেছে ছেলেটা? তেমনটাই আশা করছে ঘোস্ট। খুব শীঘ্রই জানতে পারবে অবশ্য।

হ্যাঁ, সময় হয়েছে উইলের সাথে দেখা করার। কত কথা বাকি!

উইলের বিল্ডিংয়ের দিকে এগিয়ে গেল ঘোস্ট।

পাঁচ মিনিট পর অ্যাপার্টমেন্টটায় পা রাখলো সে।

বাসে চেপে লিভিংস্টোন অ্যাভিনিউয়ে এসে পড়লাম। পুরনো একটা এলিমেন্টারি স্কুলকে বদলে শপিং মলে রূপ দেয়া হয়েছে। যদিও খুব একটা চলে বলে মনে হয় না। শহর থেকে আসা কয়েকজন কর্মীর সাথে বাস থেকে নামলাম আমি। ছোট থেকেই এই ব্যাপারটা চোখে লাগতো। সকাল সকাল লিভিংস্টোন থেকে নিউ ইয়র্কের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যায় এখানকার অধিবাসীরা। আর শহর থেকে লিভিংস্টোনে লোক আসে এখানকার সবকিছু পরিষ্কার করতে এবং বাচ্চাদের খেয়াল রাখতে। ভারসাম্য।

লিভিংস্টোন অ্যাভিনিউ থেকে লিভিংস্টোন হাইস্কুলের দিকে হাঁটতে লাগলাম। পাশেই লিভিংস্টোন পাবলিক লাইব্রেরি, লিভিংস্টোন মিউনিসিপাল কোর্ট বিল্ডিং এবং লিভিংস্টোন পুলিশ স্টেশন। অবাক হচ্ছেন? সবগুলো দালান একই রকম দেখতে। যতদূর জানি, তৈরিও করা হয়েছে একই সময়ে।

এখানেই বড় হয়েছি আমি। ছোট থাকতে *সি.এস. লুইস* আর *ম্যাডেইলিন লে'ঙ্গলের* বই ধার করেছি লাইব্রেরি থেকে। মিউনিসিপাল কোর্টে একবার গাড়ি জোরে চালানোর মামলায় হাজিরা দিয়েছি। হাইস্কুল বিল্ডিংটায় আমার ক্লাসের অন্য ছয়শো জন ছেলেমেয়ের সাথে লম্বা একটা সময় কাটিয়েছি। ওটাই সবচেয়ে বড়।

বিল্ডিংগুলো পেছনে ফেলে ডানে মোড় নিলাম। বাস্কেটবল কোর্ট এখানেই। একটা মরচে ধরা খুটির নিচে গিয়ে দাঁড়ালাম। বাঁ দিকে দুটো টেনিস কোর্ট। হাইস্কুলে থাকার সময় টেনিস খেলতাম আমি। খেলায় অবশ্য খুব একটা ভালো ছিলাম না। আসলে কোন খেলাই সেরকম ভাল লাগতো না আমার। প্রতিযোগীতা জিনিসটা কখনোই উপভোগ করিনি। হারতে ভালো লাগতো না, কিন্তু জেতার ইচ্ছেও ছিল না।

"উইল?"

ঘুরেই মেয়েটাকে দেখার সাথে সাথে রক্ত হিম হয়ে গেল আমার। পরনের কাপড়-চোপড় অবশ্য ভিন্ন–টাইট জিন্স, ছোট শার্ট, নাভিতে পিয়ার্সিং–কিন্তু চেহারা আর চুল...মনে হচ্ছে যেন স্বপ্ন দেখছি। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। *জুলিকে দেখতে পাচ্ছি।*

"জানি আমি," কেটি মিলার বললো। "ভূত দেখেছো মনে হচ্ছে, তাই না?"

ওর দিকে ফিরে তাকালাম।

"আমার বাবা," পকেটে হাত দিয়ে বললো কেটি, "এখনও আমার দিকে তাকাতে পারে না।"

এর জবাবে বলার মতো কিছু খুঁজে পেলাম না। আমার পাশে এসে দাঁড়ালো ও। এখন দুজনই হাইস্কুলে দিকে তাকিয়ে আছি।

"এখানেই তো পড়তে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"গত মাসে পাস করেছি।"

"ভালো লাগতো?"

"বের হয়ে এসে আরো বেশি ভালো লাগছে," কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো কেটি।

বিল্ডিংটার পেছন দিক থেকে সূর্য উঁকি দেয়ায় বিশাল একটা ছায়ার মতো দেখাচ্ছে ওটাকে। ক্ষণিকের জন্যে মনে হলো একটা জেলখানার দিকে তাকিয়ে আছি। হাইস্কুলে থাকাকালীন সময়ে বেশ জনপ্রিয় ছিলাম আমি। ছাত্র পরিষদের সভাপতিও হয়েছিলাম। টেনিস দলের সহকারী অধিনায়কও হয়ে যাই কীভাবে যেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও একটা ভালো স্মৃতির কথা মনে করতে পারলাম না। একটা পর্যায়ে গিয়ে মনে হয় হাইস্কুলের বছরগুলোতে আমাদের এখানে সবাই কেবল টিকে থাকার লড়াই করে। দেখতে দেখতে একসময় শেষ হয়ে যায়। আমার হাইস্কুল জীবন খুব একটা হাসিখুশির ছিল না। বোধহয় ওরকমটা হবার কথাও নয়।

"তোমার মায়ের কথা শুনেছি আমি," কেটি বললো। "দুঃখিত।"

"ধন্যবাদ।"

পেছনের পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে আমাকে সাধলো কেটি। মাথা ঝাঁকিয়ে মানা করে দিলাম। দক্ষ হাতে সিগারেট মুখে দিয়ে ধরালো সে। সিগারেট খাওয়ার কুফল সম্পর্কে লেকচার দিতে গিয়েও দিলাম না। "আমার জন্মটা কিন্তু হঠাৎ। জুলি ততদিনে হাইস্কুলে উঠে গেছে। বাবা-মায়ের আর সন্তান নেয়ার ইচ্ছেও ছিল না। কিন্তু..."

"আমরা সবাই যে খুব পূর্ব-পরিকল্পিত ছিলাম, সেটাও না," বললাম।

কথাটা শুনে হেসে উঠলো ও। হাসিটা কিছুক্ষণের জন্যে অনুরণিত হলো আমার ভেতরে। একদম জুলির হাসির মতো শোনাচ্ছে।

"সেদিন বাবা তোমার সাথে ওরকম করার জন্যে দুঃখিত," কেটি। "তোমাকে দেখে ভড়কে গেছিল।"

"আমারো কাজটা করা উচিত হয়নি।

সিগারেটে লম্বা একটা টান দিল কেটি। "তাহলে করেছিলে কেন?" জিজ্ঞেস করলো।

"জানি না," কিছুক্ষণ ভেবে বললাম।

"আমিও দেখেছিলাম তোমাকে, মোড়টা ঘোরার পরপরই। অদ্ভুত লেগেছিলো, জানো? ছোটবেলায় তো অনেকবার তোমাকে আমাদের বাসা

থেকে বের হয়ে যেতে দেখেছি। ছোট থেকে একই ঘরে থাকি আমি। তাই মনে হচ্ছিল অতীতে ফিরে গেছি। খুবই অদ্ভুত।"

ডান দিকে তাকালাম। ড্রাভিং লটটা একদম খালি। স্কুল খোলা থাকলে সাধারণত এখানেই গাড়িতে বাচ্চাদের জন্যে অপেক্ষা করে অভিভাবকেরা। খুব বেশি ভালো স্মৃতি না থাকলেও, এটা মনে আছে যে মা তার পুরনো লাল ভক্সওয়াগনে চেপে আমাকে নিতে আসতো। গাড়িতে বসে পত্রিকা পড়তে পড়তে অপেক্ষা করতো বেল বাজার। ভিড়ের মধ্যে আমাকে যখন দেখতে পেতো, মুখে যে হাসিটা ফুটতো তার, নিঃস্বার্থ ভালোবাসার উজ্জ্বল সেই হাসি!–কখনো ভুলবো না। আমার দিকে তাকিয়ে আর কেউ বোধহয় ওভাবে হাসবে না কখনো।

আনন্দের স্মৃতিটা বড্ড বেশি কষ্টের এখন। দাঁড়িয়ে থাকতে আর ভালো লাগছে না। কেটির চেহারায় জুলির প্রতিবিম্ব স্মৃতির পাহাড়ে আলোড়ন তুলছে।

"খাবে কিছু?" জিজ্ঞেস করলাম।

"খাওয়া যায়।"

সাথে গাড়ি এনেছে ও, একটা পুরনো হোন্ডা সিভিক। রিয়ারভিউ মিরর থেকে বড্ড বেশি চকমকে জিনিস ঝুলছে। বাবল গাম আর শ্যাম্পুর গন্ধ ভেতরে। স্পীকারে যে গানটা বাজছে সেটা না চিনতে পারলেও, খারাপ লাগছে না।

ডাইনারটায় যাবার গোটা পথে কেউ কথা বললাম না। ভেতরে প্রতিটা কাউন্টারের পেছনে বিখ্যাত লোকদের অটোগ্রাফ সম্বলিত ছবি ঝুলছে। সবগুলো বুথে একটা করে মিনি জ্যুকবক্স। আর মেন্যুটা দৈর্ঘ্যে টম ক্ল্যান্সির উপন্যাসগুলোর সাথে ভালো প্রতিযোগীতা করতে পারবে।

ঘন দাড়িঅলা একজন লোক জিজ্ঞেস করলো আমরা কয়জন। ভুরভুর করে ডিওড্র্যান্টের গন্ধ আসছে তার শরীর থেকে। বললাম যে দুইজন। কেটি জানিয়ে দিল ধূমপান করা যাবে এরকম অংশে বসতে চায় সে। আলাদা স্মোকিং-জোন এখন আর দেখা যায় না, তবে এই ডাইনারটা পুরনো রীতি মেনে চলে দেখা যাচ্ছে। বসার সাথে সাথে অ্যাশট্রেটা নিজের দিকে টেনে নিল কেটি।

"তুমি সেদিন আমাদের বাসায় আসার পর," বললো ও কিছুক্ষণ পর, "কবরস্থানে গিয়েছিলাম।"

একটা ছেলে এসে পানি দিয়ে গেল আমাদের টেবিলে। সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে মাথা পেছনে নিয়ে আয়েশ করে ধোঁয়া ছাড়লো কেটি। "শেষ গিয়েছিলাম কয়েক বছর আগে। কিন্তু তোমাকে সেদিন দেখার পর মনে হলো যাওয়া উচিত।"

এখন পর্যন্ত সরাসরি আমার দিকে একবারও তাকায়নি ও। আমাদের শেল্টারের অনেক ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটতে দেখেছি। সবসময়

অন্য দিকে তাকিয়ে কথা বলে। আমিও কিছু বলি না এ সম্পর্কে। তাছাড়া এই চোখে চোখ রেখে কথা বলার ব্যাপারটা সেরকম গুরুত্বপূর্ণ কিছু মনে হয় না আমার কাছে।

"জুলির কথা আর মনেই পড়ে না এখন। ছবিগুলো দেখে প্রায়ই নিজেকে জিজ্ঞেস করি যে এগুলো আসলেও আমার নিজের স্মৃতি কিনা। বুঝতে পারছো কী বলছি?"

"মনে হয়।"

"তাছাড়া তুমি চলে যাওয়ার পর বাসায় থাকাটা রীতিমতো অসম্ভব ছিল। বাবা রাগে ফুঁসছিলো। মায়ের কান্না থামার কোন লক্ষণ দেখছিলাম না। বের হতেই হতো আমাকে।"

"কাউকে কষ্ট দেয়াটা উদ্দেশ্য ছিল না আমার।"

হাত নেড়ে আমার কথাটা উড়িয়ে দিল কেটি। "ভালোই হয়েছিল বরং এক দিক দিয়ে। বেশিরভাগ সময়ে এই ব্যাপারে কোন কথা বলি না আমরা। চেপে রাখি যে যার মতো। হয়তো অদ্ভুত শোনাচ্ছে তোমার কাছে কথাটা। মাঝে মাঝে মনে হয়, যদি খুব জোরে চিৎকার করতে পারতাম ওদের উদ্দেশ্যে! জুলি মারা গেছে! আরেকটা অদ্ভুত কথা শুনবে?" বলে সামনের দিকে ঝুঁকে আসলো সে।

মাথা নেড়ে বলার ইশারা করলাম।

"বেইজমেন্টটা এখনও আগের মতোই আছে। সেই পুরনো কাউচ, পুরনো টিভি। ছেড়া কার্পেট, ট্রাঙ্ক-কিছুই বদলানো হয়নি। ট্রাঙ্কটার পেছনে প্রায়ই লুকোতাম আমি, মনে আছে তোমার? কেউ এখন আর ব্যবহার করে না ওসব। কিন্তু ফেলে দেয়া হয়নি। আমাদের লন্ড্রি ঘরটাও ওখানে। তাই যেতেই হয়। তখন দেখেও না দেখার ভান করি। বুঝতে পারছো কেন চেপে যাওয়ার কথা বললাম? সবসময় মনে হয় যেন হ্রদের ওপর জমা বরফে বাস করছি আমরা। যে কোন সময় ফেটে যেতে পারে। আর আমরা গিয়ে পড়বো বেইজমেন্টে।"

এমন ভাবে সিগারেট টানছে কেটি, যেন ওটার ওপর জীবন-মরণ নির্ভর করছে। সোজা হয়ে বসলাম। আগেই বলেছি, কেটি মিলারের ব্যাপারে খুব বেশি একটা কোনদিনই ভাবিনি আমি। জুলির খুন হওয়ার ঘটনাটা তার ওপর কেমন প্রভাব ফেলেছে সে চিন্তাও মাথায় আসেনি। ওর বাবা-মায়ের কথা ভেবেছি অবশ্যই। তারা কীভাবে ভেঙে পড়েছিল তা মনে পড়লে এখনও মুষড়ে উঠি। বাসাটা কেন ছেড়ে দেয় না, সেটাও ভেবেছি। আমার বাবা-মা'ও কিন্তু বাসা পাল্টায়নি। স্বস্তি আর নিজের ওপর স্বেচ্ছায় আরোপিত বেদনার সম্পর্কে আপনারা নিশ্চয়ই জানেন। ভুলে যাওয়ার চাইতে অনেকে কষ্ট ভোগ করতে রাজি। বাসা না পাল্টানোর ব্যাপারটা ঠিক ওরকমই।

কিন্তু কেটি মিলারের পরিস্থিতি কি হয়েছিল সেটা কেন যে আমার মাথায় আসেনি। ওরকম একটা বাসায়, মৃত বোনের ছায়ায় বড় হওয়া চাট্টিখানি

ব্যাপার নয়। বিশেষ করে দুই বোনের চেহারা যখন প্রায় একইরকম। এমন ভাবে কেটির দিকে তাকালাম যেন প্রথমবার দেখছি ওকে। এক অর্থে সেটাই তো সত্যি, নাকি? চোখের কোনায় মুক্তোদানার মতো চকচক করতে থাকা অশ্রুবিন্দুগুলো এবারে ঠিকই চোখে পড়লো। সামনে ঝুঁকে ওর হাত ধরলাম, একদম বড় বোনের মতো সবকিছু।

অতীতের সেই মুহূর্তগুলো এভাবে ফিরে আসবে, তা কখনো ভাবিনি।

"খুবই অদ্ভুত লাগছে সবকিছু," বললো ও।

"আমারও।"

"এসবের ইতি টানতে হবে, উইল। আমার পুরো জীবন...সে রাতে আসলে যা ঘটেছিল, তা পুরোপুরি চুকে না যাওয়া পর্যন্ত শান্তি পাবো না কেউই। মাঝে মাঝে টিভিতে যখন অপরাধীদের ধরা হয়, তখন বলতে শুনি–এতে করে হারানো মানুষটাকে তো আর ফিরে পাবো না। মনে হয় *'এটা কি আবার বলতে হবে নাকি?'* কিন্তু অপরাধী ধরা পড়লে আলাদা একটা শান্তি লাগে। এর দরকার আছে।"

কেটির মতিগতি ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে মনে ভাবার চেষ্টা করলাম যে ও আমার শেল্টারে আসা ছেলেমেয়েদের একজন। সাহায্য আর ভালোবাসা দরকার। চুপচাপ এমন ভঙ্গিতে বসে থাকলাম যেন ভরসা পায়।

"তোমার ভাইকে আমি কি পরিমাণ ঘৃণা করতাম, সেটা কল্পনাও করতে পারবে না। শুধু জুলিকে খুন করার জন্যে নয়। পালিয়ে গিয়ে আমাদের প্রত্যেকের সাথে সে যা করেছে...প্রায়ই কল্পনা করতাম যে পুলিশ ঘিরে ধরেছে ওকে, গুলি করে ঝাঁজরা বানিয়ে ফেলেছে। আমি জানি তোমার হয়তো এসব শুনতে ভালো লাগছে না, কিন্তু বুঝতে তো পারছো কী বলছি?"

"সবকিছুর শেষ চাচ্ছিলে তুমি," বললাম।

"হ্যাঁ, কিন্তু..."

"কিন্তু কি?

এই প্রথম আমার চোখের দিকে তাকালো কেটি। আবারও জমে গেলাম। হাত সরিয়ে নিতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু নড়তে পারছি না। "তার সাথে দেখা হয়েছে আমার।"

মনে হলো যেন ভুল শুনছি।

"তোমার ভাই। তাকে দেখেছি আমি।"

"কখন?" কিছুক্ষণ পর কোনমতে বললাম।

"গতকাল। কবরস্থানে।"

ওয়েটার অর্ডার নিতে এলো এসময়। কান থেকে পেন্সিল হাতে নিয়ে জানতে চাইলো কি খাবো আমরা। এক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বললাম না। শব্দ করে গলা পরিষ্কার করলো সে। কী একটা সালাদের কথা বললো কেটি। আমি চিজ-অমলেট আছে কিনা জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে ওয়েটার পাল্টা জানতে চাইলো যে কেমন চিজ চাই, অ্যামেরিকান, সুইস নাকি শেডার।

বললাম শেডার চিজ হলেই ভালো হবে। সাথে কি ফ্রেঞ্চ ফ্রাই নাকি স্পেশাল ফ্রাই? স্পেশাল ফ্রাই। হোয়াইট টোস্ট, রাই টোস্ট নাকি হুইট টোস্ট? রাই, আর কিছু না। ধন্যবাদ।

অবশেষে বিদায় নিল ওয়েটার।

"বলো।"

সিগারেট নেভালো কেটি। "যেমনটা বলছিলাম–কবরস্থানে যাই আমি। আসলে বাসা থেকে বের হওয়াই মূল উদ্দেশ্য ছিল। তুমি তো জানো কেটির কবর কোথায়, তাই না?"

মাথা নাড়লাম।

"ওহ, তোমাকে তো একবার দেখেছিলাম। ওর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দুইদিন পর।"

"হ্যাঁ," বললাম।

সামনে ঝুঁকে এলো কেটি। "ওকে ভালোবাসতে?"

"জানি না।"

"তোমার হৃদয় ভেঙেছিল ও।"

"হয়তো। বাদ দাও, অনেক বছর আগের কথা।"

নিজের হাতের দিকে তাকালো কেটি।

"কী হয়েছিল সেদিন?"

"একদম অন্যরকম দেখাচ্ছিল তোমার ভাইকে। আগে কেমন ছিল দেখতে, সেটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। ছবি দেখেছি অবশ্য," বলে থামলো ও।

"তুমি কী বলতে চাচ্ছো যে ও জুলির কবরের ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল?"

"উইলো গাছটার নিচে।"

"কী?"

"একটা গাছ আছে ওখানে। কবরটা থেকে একটু দূরে। আমি সামনের গেট দিয়ে না ঢুকে বেড়া ডিঙিয়ে ঢুকেছিলাম। তাই সে আশা করেনি যে কেউ হয়তো এসে পড়বে। জুলির কবরের কাছাকাছি পৌঁছে দেখি একটা লোক উইলো গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে জুলির ফলকটার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার পায়ের শব্দও কানে যায়নি তার। কাঁধে যখন টোকা দেই, আমার দিকে তাকিয়ে ভূত দেখার মতো চমকে উঠেছিল...বুঝতেই তো পারছো, কেন। আরেকটু হলেই চিৎকার করে উঠতো।"

"তুমি কি নিশ্চিত যে ওটা কেইনই ছিল?"

"শতভাগ নিশ্চিত, এটা বলতে পারবো না। সেটা তো সম্ভবও না, তাই না?" আরেকটা সিগারেট বের করে বললো, "হ্যাঁ, আমি জানতাম যে ওটা কেইন।"

"কীভাবে?"

"লোকটা বলছিল যে সে করেনি কাজটা।"

মাথা চক্কর দিয়ে উঠলো আমার। শক্ত করে পাশের চেয়ারটা চেপে ধরলাম। "ঠিক কী বলেছিল?" একটু ধাতস্থ হবার পর ক্ষীণস্বরে জানতে চাইলাম।

"প্রথমে শুধু ওটুকুই বলেছিল–'আমি তোমার বোনকে খুন করিনি।'।"

"শুনে কী করলে তুমি?"

"তাকে বললাম যে সে বড় একটা মিথ্যাবাদী। চিৎকার করে লোক ডাকার হুমকি দিলাম।"

"চিৎকার করেছিলে?"

"না।"

"কেন?"

হাতের সিগারেটটা এখনও ধরায়নি কেটি। ঠোঁট থেকে সেটা বের করে টেবিলের ওপরে রাখলো। "কারণ তার কথা বিশ্বাস হয়েছিল আমার। কণ্ঠে কিছু একটা ছিল। কী সেটা জানি না। অনেক দিন ধরেই তাকে প্রচণ্ড ঘৃণা করতাম আমি। আসলে প্রচণ্ড বললেও কম বলা হবে। কিন্তু এখন..."

"এরপর কী করলে?"

"সরে দাঁড়িয়ে আবারো ভাবতে লাগলাম চিৎকার করবো কিনা। তখন আমার কাছে এসে মুখ চেপে ধরলো সে। এরপর চোখে চোখ রেখে বললো, 'খুনিকে খুঁজে বের করবো আমি, কথা দিচ্ছি'–ব্যস এটুকুই। আরো কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে চলে গেল ওখান থেকে।"

"কাউকে বলেছো–"

মাথা ঝাঁকালো কেটি। "কাউকে না। মাঝে মাঝে তো মনে হয় গোটাটাই আমার কল্পনা ছিল বুঝি। জুলিকে নিয়ে আমার বেশিরভাগ স্মৃতিগুলোর মতো ," এটুকু বলে আবারো আমার দিকে তাকালো ও। "তোমার কি মনে হয় যে কেইন খুন করেছে জুলিকে?"

"না," বললাম।

"তোমাকে খবরে দেখেছি আমি," বললো কেটি, "তুমি সবসময়ই ভেবে এসেছো যে কেইন মারা গেছে। কারণ বেইজমেন্টে ওর রক্তও পাওয়া গিয়েছিল কিছুটা।"

মাথা নাড়লাম।

"এখনও বিশ্বাস করো সেটা?"

"না," বললাম। "এখন আর বিশ্বাস করি না।"

"মত বদলানোর কারণ?"

এটার জবাব কীভাবে দেব আসলেও জানি না। "ধরতে পারো, আমিও খুঁজছি ওকে," বললাম।

"সেই কাজে আমি সাহায্য করতে চাই।"

কেটি যদিও বলেছে 'আমি সাহায্য করতে চাই'। কিন্তু আসলে বোঝাতে চেয়েছে, 'আমারো দরকার তাকে খুঁজে বের করা'।

"প্লিজ, উইল। আমাকে সাহায্য করতে দাও?"

মানা করতে পারলাম না।

পনেরো

বেলমন্ট, নেব্রাস্কা

“বিরক্ত লাগে এসব জঞ্জাল,” ভকারের উদ্দেশ্যে ভ্রু কুঁচকে বললো শেরিফ বার্থা ফ্যারো।

“বিরক্ত লাগলে তো হবে না,” জবাবে বললো ভকার। কী-বোর্ডে হাত চলছে তার। “কম্পিউটার আমাদের বন্ধু।”

“তা এখন আমাদের বন্ধু কী করছে শুনি?” জিজ্ঞেস করলো বার্থা।

“আঙুলের ছাপ স্ক্যান করছে।”

“স্ক্যান করছে?”

“আপনি তো শুধু শিখেছেন ‘আপলোড’ কথাটা। কিন্তু আপলোডের জন্যে আগে আমাদের আঙুলের ছাপটা স্ক্যান করতে হবে না? কীভাবে যে বোঝাই আপনাকে। ধরুন স্ক্যানার অনেকটা ফটোকপি মেশিনের মতো। প্রথমে সেটা আঙুলের ছাপের একটা কপি তৈরি করবে, এরপর আমরা সেটা ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার সিজেআইএসে (CJIS) পাঠাবো।”

CJIS হচ্ছে Criminal Justice Information Service. সব পুলিশ স্টেশন এখন নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হওয়ায়, ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোন ঝামেলা ছাড়াই ভিক্টিম বা কালপ্রিটের আঙুলের ছাপ সনাক্ত করার জন্যে পাঠানো হয়। ন্যাশনাল ক্রাইম ইনফর্মেশন সেন্টারের বিশাল ডাটাবেজে যদি সেই ছাপের তথ্য থেকে থাকে তাহলে কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়।

“আমি তো ভেবেছিলাম CJIS ওয়াশিংটনে,” বার্থা বললো।

“আগে ছিল। এখন সিনেটর বার্ড সেটা সরিয়ে ফেলেছেন।”

“চমৎকার একজন সিনেটর দেখছি!”

“সন্দেহ নেই সে ব্যাপারে।”

হোলস্টারে হাত রেখে করিডোরের দিকে এগিয়ে গেল বার্থা। তার পুলিশ স্টেশনের পাশেই ক্লাইডের মর্গ। স্বাভাবিক ভাবেই সেখান থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায় মাঝে মাঝে। বাতাস সঞ্চালনের ব্যবস্থা খুব একটা সুবিধার নয় মর্গটায়। ফর্মালডিহাইডের ঝাঁঝে টেকা দায় হয়।

খানিকটা ইতস্তত বোধ করে মর্গের দরজাটা টান দিয়ে খুলে ফেললো বার্থা ফ্যারো। টিভিতে যেরকম সারি সারি চকচকে ড্রয়ার বা যন্ত্রপাতি দেখা যায়, এখানে সেরকম কিছু নেই। ক্লাইডের মর্গটা কোনমতে জোড়াতালি দিয়ে তৈরি করা হয়েছে যেন। অবশ্য এরকম একটা স্টেশনের জন্যে এটুকুই যথেষ্ঠ। সড়ক দুর্ঘটনাই এখানকার সবচেয়ে নিয়মিত ঘটনা। গত বছর মদ খেয়ে নিজের মাথায় ভুল করে বন্দুক চেপে ট্রিগার টেনে দিয়েছিল ডন টেইলর। তার স্ত্রী মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলে যে আয়নায় নিজেকে দেখে হরিণ ভেবেছিল সে। তাদের সম্পর্ক কেমন ছিল সেটা বোঝার জন্যে এই উক্তিটাই যথেষ্ঠ। এই মর্গটায় কোনমতে দুটো মৃতদেহ রাখা যায়। ক্লাইডের যদি কখনো আরো বেশি জায়গার দরকার হয়, তখন সে ওয়ালিদের ফিউনারেল হোমের সাহায্য নেয়।

নাম-পরিচয়হীন মহিলার লাশটা টেবিলে রাখা। ক্লাইড দাঁড়িয়ে আছে পাশে। একটা নীল অ্যাপ্রন আর গ্লাভস পরনে তার। কাঁদছে বেচারা। বুম বক্সটা থেকে অপেরা ভেসে আসছে। ভেতরের পরিবেশের সাথে একদম খাপে খাপে মিলে গেছে গানটা।

"কাটাকাটি শুরু করেছো?" জিজ্ঞেস করলো বার্থা (যদিও উত্তরটা জানে সে)।

"না," দুই আঙুল দিয়ে চোখ মুছে বললো ক্লাইড।

"কারো অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করছো?"

লাল চোখজোড়া বড় করে ওর দিকে তাকালো মেডিক্যাল এক্সামিনার। "এখনও বাহ্যিক অংশ পরীক্ষা করে দেখছি।"

"মৃত্যুর কারণ জানা গেছে, ক্লাইড?"

"ময়নাতদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত করে কিছু বলা সম্ভব না।"

তার আরো কাছে গিয়ে দাঁড়ালো বার্থা। ক্লাইডের কাঁধে হাত রেখে স্বান্তনা দেয়ার অভিনয় করে বললো, "কিছু অনুমান করতে পেরেছো?"

"পেটানো হয়েছে খুব খারাপভাবে। এখানটায় দেখো-" বলে বুকের পাঁজরের দিকে নির্দেশ করলো ক্লাইড। একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে ওখানে। ঠিক গর্তও না, একটা অংশ দেবে গেছে। হাড্ডি ভেতরে ঢুকে যাওয়ার ফলে এমনটা হয়েছে।

"কালশিটের কারণে তো চামড়ার স্বাভাবিক রঙই দেখা যাচ্ছে না," বার্থা মন্তব্য করলো।

"হ্যাঁ, কেন এমনটা হয়েছে বুঝতে পারছো?" পেটের কাছটায় ঠেলে বের হয়ে থাকা একটা অংশ দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো ক্লাইড।

"পাঁজর ভেঙে গেছে?"

"থেঁতলে গেছে," ওকে শুধরে দিল মেডিক্যাল এক্সামিনার।

"কীভাবে?"

কাঁধ ঝাঁকালো ক্লাইড। "ভারি হাতুড়ি ব্যবহার করেছে হয়তো। আমার ধারণা, পাঁজরের একটা ভাঙা অংশ ভেতরের কোন অঙ্গে গিয়ে বিঁধেছে। হয়তো ফুসফুস ভেদ করে ঢুকে গেছে বা পেটের ভেতরে নাড়িভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিয়েছে। অথবা ভাগ্য ভাল ছিল ওনার, প্রথমেই হৃৎপিণ্ড ফুটো হয়ে গেছে।"

মাথা ঝাঁকালো বার্থা। "দেখে তো মনে হচ্ছে না ভাগ্যবতী কেউ।"

অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল ক্লাইড। আবারো কাঁদতে শুরু করেছে সে। কান্নার দমকে কাঁদছে ভারি শরীরটা।

"স্তনের ওপর এই দাগগুলো?" বার্থা বললো।

"সিগারেটের ছ্যাঁকা," না তাকিয়েই বললো ক্লাইড।

এটা আগেই অনুমান করেছিল সে। মোচড়ানো আঙুল, সিগারেটের ছ্যাঁকা। মৃত্যুর আগে যে টর্চার করা হয়েছিল তাকে সেটা বুঝতে শার্লক হোমস হতে হবে না।

"যা যা করা সম্ভব, করে দেখো ক্লাইড। ব্লাড স্যাম্পল, টক্স স্ক্রিন, সবকিছু।"

"ঠিক আছে, বার্থা," নাক টেনে অবশেষে ঘুরে বললো ক্লাইড।

পেছনের দরজা খুলে গেল এসময়। হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকলো জর্জ ভকার। "পেয়ে গেছি," বললো বার্থার দিকে তাকিয়ে।

"এত তাড়াতাড়ি?"

মাথা নাড়লো জর্জ। "NCIC এর লিস্টে উপরের দিকেই ছিল।"

"উপরের দিকেই ছিল মানে?"

"ওকে এফবিআই হন্য হয়ে খুঁজছে," লাশটার দিকে ইঙ্গিত করে বললো ডেপুটি।

ষোলো

বাসা থেকে তিন ব্লক দূরে গাড়ি থামালো কেটি। কেউ আমাদের একসাথে দেখে ফেলুক, এটা চাইছিলাম না। হয়তো এত সাবধানতার কিছু নেই, কিন্তু কে জানে কার মনে কী আছে!

"এখন কী করবো আমরা?" জিজ্ঞেস করলো কেটি।

পুরো রাস্তা আমিও সেটা নিয়েই ভেবেছি। "জানি না আসলে," সত্যিটাই স্বীকার করলাম। "কিন্তু কেইন যদি আসলেই জুলিকে খুন না করে থাকে–"

"তাহলে অন্য কেউ করেছে।"

"আমরা খুব ভালো গোয়েন্দা হতে পারবো কিন্তু।"

হাসলো কেটি। "তাহলে আমাদের সন্দেহভাজন খুঁজে বের করতে হবে আগে।"

সন্দেহভাজন খুঁজে বের করতে হবে মানে? আমরা কি এফবিআই নাকি? কিছু না বলে মাথা নাড়লাম কেবল।

"আমি তাহলে খোঁজ খবর শুরু করে দেই।"

"কোন ব্যাপারে খোঁজ নেবে?"

কিশোরীসুলভ ভঙ্গিতে একবার কাঁধ ঝাঁকালো কেটি। "জানি না। অতীতের ব্যাপারে খোঁজ নেয়া যায়। এতে হয়তো বুঝতে পারবো ওকে খুন করলে কার লাভ হতো।"

"পুলিশ তো সে কাজ করেছে।"

"তারা শুধু তোমার ভাইয়ের ব্যাপারেই খোঁজ খবর করেছে, উইল।"

যুক্তি আছে কথাটায়। "ঠিক আছে," অগত্যা বললাম।

"আজকে রাতে আবার দেখা করো।"

মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে বেরিয়ে গেলাম গাড়ি থেকে। বিদায় না জানিয়েই চলে গেলেন আমাদের ন্যান্সি ড্রিউ। নির্জন পরিবেশে দাঁড়িয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। নড়তে ইচ্ছে করছে না।

মফস্বলের রাস্তাঘাট খালি হলেও, ড্রাইভওয়েগুলো পূর্ণ। তবে আমার ছোটবেলায় দেখা স্টেশন ওয়াগনগুলোর জায়গা দখল করে নিয়েছে নানা মডেলের এসইউভি, মিনিভ্যান, ফ্যামিলি ট্রাক। বাসাগুলোর ষাটের দশকের নকশায় অবশ্য তেমন পরিবর্তন আসেনি। তবে বর্ধিত অংশ দেখা যাবে অনেকগুলোয়।

আমাদের বাড়িতে পৌছে অবশ্য কোন গাড়ি দেখলাম না বাইরের ড্রাইভওয়েতে। ভেতরেও কোন অতিথি নেই। শোক প্রকাশ করতে আসেনি কেউ, অবাক হলাম না।

বাবাকে ডাকলাম জোরে। কোন উত্তর নেই। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর একটা বড় ছুরি হাতে বেইজমেন্টে আবিষ্কার করলাম তাকে। চারপাশে অনেকগুলো ওয়ার্ড্রোব বক্স। টেপ খুলে ফেলা হয়েছে ওগুলোর। আমার পদশব্দ শুনেও ঘুরে তাকালো না বাবা।

এই বক্সগুলো ছিল আমার মায়ের। একটার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে ভেতর থেকে রুপোলী রঙের হেডব্যান্ড বের করে আনলো বাবা। ঘুরে আমাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "মনে আছে এটার কথা?"

হাসলাম দুজনই। পুরো জীবনে সবারই ফ্যাশন আর স্টাইলের অদল-বদল ঘটে। তবে আমার মায়ের ক্ষেত্রে কথাটা একটু বেশিই প্রযোজ্য। বরং বলা যায় অনেক ফ্যাশনের চল শুরু হয় তাকে দিয়েই। যেমন একসময় হেডব্যান্ডের নেশা পেয়ে বসে মাকে। ইন্ডিয়ান রাজকুমারীদের মতো করে চুল বাঁধতো তখন। টানা একবছর অগণিত হেডব্যান্ড ব্যবহারের পর শেষ হয় সেই যুগ। এরপর আসে জিমি হেনড্রিক্স গ্রুপি যুগ, আমার সবচেয়ে অপছন্দের। মনে হতো জলজ্যান্ত একটা বেগুন মাথায় গুঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছে মা।

অন্যান্য অনেক জিনিসের মতোই জুলি মিলার খুন হবার পর মায়ের ফ্যাশনের পালা-বদল থেমে যায়। আমার মা–সানি, তার সব জামাকাপড় এসব বক্সে ভরে পাঠিয়ে দেয় বেইজমেন্টে।

হেডব্যান্ডটা আবারো বক্সে ঢুকিয়ে রাখলো বাবা। "আমরা এখান থেকে চলে যাবার কথা ভাবছিলাম, জানো।"

জানতাম না।

"তিন বছর আগে সিদ্ধান্তটা নিয়েছিলাম। কথা ছিল ওয়েস্ট অরেঞ্জে একটা কনডোর ব্যবস্থা করবো অথবা স্কটসডেলে ছোটখাটো একটা বাড়ি কিনবো। আমার দুই চাচাতো ভাই, এস্থার আর হ্যারল্ডও আছে ওখানে। কিন্তু তখনই জানতে পারি যে তোমাদের মা অসুস্থ। তাই পরিকল্পনা আপাতত বাদ দেই," বলে আমার দিকে তাকালো বাবা। "তেষ্টা পেয়েছে?"

"ওরকম না।"

"ডায়েট কোক খাও একটা? আমার ড্রিঙ্কস না হলে চলবে না এখন।"

দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল বাবা। পুরনো বাক্সগুলোর দিকে তাকালাম, মা মার্কার দিয়ে গোটা গোটা হরফে লিখে রেখেছে কোনটায় কী আছে। পেছনের শেলফে কেইনের দুটো টেনিস র‍্যাকেট রাখা এখনও। একটা ওর প্রথম র‍্যাকেট, তিন বছর বয়সে কেনা। মা সাবধানে রেখে দিয়েছিল। আর সহ্য হলো না, ওপরতলায় চলে আসলাম। রান্নাঘরে গিয়ে ফ্রিজের দরজা খুললো বাবা।

"গতকাল কী হয়েছিল, বলবে?"

"কী হবে আবার?"

"তোমার আর তোমার বোনের মধ্যে," ডায়েট কোকের দুই লিটারের একটা বোতল বের করলো বাবা। "কী নিয়ে ঝগড়া করছিলে?"

"ওরকম কিছু না," বললাম।

মাথা নেড়ে কেবিনেট থেকে দুটো গ্লাস নামিয়ে ফেললো সে। ফ্রিজার থেকে কিছু বরফ তুলে নিল। "তোমার মা সবসময় তোমার আর মেলিসার কথাবার্তা আড়াল থেকে শুনতো।"

"জানি আমি।"

হাসি ফুটলো বাবার মুখে। "কখনোই ঠিকমতো লুকোতে পারতো না। আমি মানা করতাম, কিন্তু আমাকে ধমক দিয়ে বলতো ওটাই নাকি মায়েদের কাজ।"

"শুধু আমার আর মেলিসার কথা শুনতো মা?"

"হ্যাঁ।"

"কেইনেরটা শুনতো না কেন?"

"হয়তো ওর সম্পর্কে জানার ইচ্ছে ছিল না," গ্লাসে কোক ঢেলে বললো। "ইদানীং ভাইয়ের সম্পর্কে বড্ড কৌতূহলী দেখছি তুমি।"

"সাধারণ একটা প্রশ্ন করেছি।"

"হ্যাঁ, আসলেই সাধারণ। সেদিন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরে তোমার ভাই বেঁচে আছে কিনা সে ব্যাপারে আমার মতামত জানতে চাইছিলে। এর পরদিন মেলিসার সাথে তাকে নিয়ে ঝগড়া করলে। এজন্যেই আরেকবার জানতে চাচ্ছি, হচ্ছেটা কী?"

কেইনের ছবি এখনও আমার পকেটে। কেন যে মূল ছবিটার কয়েকটা রঙিন কপি করেছি, আমি নিজেও জানি না।

এসময় হঠাৎ কলিং বেলের শব্দে চমকে উঠলাম দুজনই। দুজনের চোখেই অবাক চাহনি। কাঁধ ঝাঁকালো বাবা। কোকের গ্লাসে একবার চুমুক দিয়ে দরজা খুলতে বেরিয়ে এলাম রান্নাঘর থেকে। দরজা খুলেই অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো চমকে উঠলাম।

জুলির মা, মিসেস মিলার দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে। হাতে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে মোড়ানো একটা ট্রে। ওনার মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গি

দেখে মনে হচ্ছে কোন বেদিতে অর্ঘ নিবেদন করছেন। জমে গেলাম কিছুক্ষণের জন্যে। কী বলবো বুঝে উঠতে পারছি না (গত কয়েক দিনে বেশ কয়েকবার এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে আমাকে)। মাথা উঁচিয়ে আমার দিকে তাকালেন তিনি। দুদিন আগের ঘটনাটার পুনরাবৃত্তি ঘটছে যেন। সময় যে তার বেদনার সাগরে সামান্যতম ছিদ্রও করতে পারেনি, তা স্পষ্ট। আমার চোখের দিকে তাকালেও কি সেটা বোঝা যায়?

"আমার মনে হচ্ছিল..." কথা শুরু করলেন তিনি। "না, মানে..."

"ভেতরে আসুন," বললাম। "প্লিজ।"

"ধন্যবাদ, উইল," হাসার চেষ্টা করলেন মিস মিলার।

"কে এসেছে?" পেছন থেকে জিজ্ঞেস করলো বাবা।

সরে দাঁড়িয়ে তাকে দেখার সুযোগ করে দিলাম। এখন হাতের ট্রে-টা এমন ভঙ্গিতে ধরে আছেন মিসেস মিলার যেন ঢাল হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়োজন হতে পারে। বাবার চোখে রাগ স্পষ্ট। "তুমি এখানে কী করছো?" প্রায় ফিসফিসিয়ে বললো সে।

"বাবা," সাবধানী সুরে বললাম।

পাত্তাই দিল না বাবা। "তোমাকে একটা প্রশ্ন করেছি আমি, লুসিল। এখানে কী চাও তুমি?"

মাথা নামিয়ে নিলেন মিসেস মিলার।

"বাবা," আগেরবারের চেয়ে একটু জোরে বললাম এবারে।

"এই বাড়িতে তোমার কোন জায়গা নেই।" এমনভাবে কথাটা বললো বাবা যেন আমার কোন অস্তিত্বই নেই ওখানে।

"বাবা, মিসেস মিলার–"

"বেরিয়ে যাও।"

"বাবা!"

পিছিয়ে গেলেন মিসেস মিলার। ট্রে'টা আমার হাতে দিয়ে বললেন। "আমি বরং যাই, উইল।"

"না," বললাম।

"আসলে আমার আসাটাই উচিত হয়নি।"

"একশোবার উচিত হয়নি!" বাবা চিল্লিয়ে উঠলো এবারে।

কড়া চোখে তার দিকে তাকালাম আমি। কিন্তু বাবার দৃষ্টিতে মিসেস মিলার ছাড়া আর কেউ নেই এখন। দৃষ্টি না বলে অগ্নিদৃষ্টি বলা ভালো।

"সানির মৃত্যুতে আমি আসলেও কষ্ট পেয়েছি," মাথা নিচু করেই বললেন মিস মিলার।

কিন্তু বাবার কথা এখনও শেষ হয়নি। "সানি মারা গেছে, লুসিল। এসবে কিছু যায় আসে না এখন।"

চলে গেলেন মিসেস মিলার। ট্রে-টা হাতে নিয়ে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম আমি। চোখে অবিশ্বাস নিয়ে বাবাকে দেখছি।

"ফেলে দাও ওগুলো ডাস্টবিনে।"

কী করবো বুঝতে পারছি না। একবার মনে হচ্ছে তার পেছন পেছন দৌড়ে যাই। ক্ষমা চেয়ে আসি বাবার পক্ষ থেকে। কিন্তু এতক্ষণে আধা ব্লক পার হয়ে গেছেন নিশ্চিত। অগত্যা রান্নাঘরে ফিরে এসে ট্রে-টা শব্দ করে কাউন্টারের ওপর নামিয়ে রাখলাম।

"এটা কী হলো?"

"ওর চেহারা দেখতে চাই না আমি," কোকের গ্লাসটা তুলে নিয়ে বললো বাবা।

"প্রতিবেশী হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করতে এসেছিলেন মিসেস মিলার।"

"দায়িত্ব না ছাই। সব লোক দেখানো।"

"কী বলছো এসব?"

"তোমার মা মারা গেছে, উইল। এখন এসে কী লাভ?"

"কেমন শোনাচ্ছে কথাগুলো বুঝতে পারছো?"

"তোমার মা ফোন দিয়েছিল লুসিলকে। এটা জানো তুমি? ঘটনার কয়েক দিন পর। স্বান্তনা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু লুসিল ওকে গালাগালি করে। বলে আমরা নাকি পেলে পুষে একটা খুনিকে বড় করেছি। সব দোষ আমাদের।"

"সেটা এগারো বছর আগের কথা, বাবা।"

"তোমার মায়ের কি অবস্থা হয়েছিল কথাটা শুনে, জানো?"

"নিজের সন্তানকে হারিয়েছিলেন তিনি। তার মানসিক অবস্থাও ভালো ছিল না।"

"তো এতদিন পর ভুল বুঝতে পেরেছে? কী লাভ এখন এসব করে?" গোঁয়ারের ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালো বাবা। "আমি এসব ফালতু প্যাঁচাল শুনতে চাই না। আর তোমাদের মা চাইলেও শুনতে পারবে না।"

সামনের দরজা খুলে গেল এসময়। মুখে শোকাতুর হাসি ঝুলিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো সেলমা খালা আর মারে খালু। রান্নাঘরের কাজে হাত লাগালো খালা। খালু ব্যস্ত হয়ে গেল খুলে আসা একটা ওয়াল প্লেট নিয়ে।

বাবার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিলাম সেদিন থেকে।

সতেরো

কড়া নাড়ার আগে মনে মনে সবকিছু একবার ঝালিয়ে নিল স্পেশাল এজেন্ট ক্লডিয়া ফিশার। এরপর লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে দুবার টোকা দিল দরজায়।

"ভেতরে এসো।"

নব ঘুরিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ইন চার্জ (ADIC) জোসেফ পিস্টিলোর অফিসে পা রাখলো সে। পদটার সংক্ষিপ্ত রূপের উচ্চারণের সাথে ডিরেক্টর মহাশয়ের কাজের ধরনের মিল থাকায় আড়ালে তাই 'ডিক' নামেই সুপরিচিত তিনি। নিউ ইয়র্ক অফিসের যাবতীয় কার্যকলাপ তার অধীনেই পরিচালিত হয়। ওয়াশিংটনস্থ অফিসের ডিরেক্টরের পরে ADIC-ই এফবিআইয়ের সবচেয়ে ক্ষমতাধর এজেন্ট।

চোখেমুখে বিরক্তি নিয়ে ক্লডিয়ার দিকে তাকালেন পিস্টিলো। "কী?"

"শিলা রজার্সের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে," রিপোর্ট দিলো ক্লডিয়া।

বিড়বিড় করে কিছুক্ষণ অজানা ব্যক্তির উদ্দেশ্যে গালি দিলেন পিস্টিলো। "শুধু এটুকুই জেনেছো?"

"নেব্রাস্কায় রাস্তার পাশে পাওয়া যায় তার মৃতদেহ। সাথে কোন পরিচয় পত্র ছিল না। NCIC ডাটাবেজের সাথে আঙুলের ছাপ মেলানোর পর পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছে।"

"ধুর।"

আনমনে কিছুক্ষণ নখ কামড়ালো পিস্টিলো। অপেক্ষা করছে এজেন্ট ক্লডিয়া ফিশার।

"না দেখে নিশ্চিত হওয়া যাবে না," বললেন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর।

"আমি শেরিফ ফ্যারোর ইমেইল অ্যাড্রেসে আমাদের ডাটাবেজ থেকে ছবি আগেই মেইল করে দিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ আগে তিনি এবং কর্তব্যরত মেডিক্যাল এক্সামিনার ছবিগুলো দেখে নিশ্চিত হয়ে জানিয়েছেন। উচ্চতা এবং ওজনও মিলে গেছে।"

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন পিস্টিলো। টেবিল থেকে একটা কলম তুলে নিয়ে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্লডিয়া। ওকে বসার নির্দেশ দিলেন তিনি।

"শিলা রজার্সের বাবা-মা তো বোধহয় ইউটাহতে থাকে?"

"আইডাহো।"

"যাই-হোক। তাদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।"

"ওখানকার স্থানীয় পুলিশ স্ট্যান্ডবাইতে আছে। পুলিশ চিফ রজার্স পরিবারকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন।"

মাথা নাড়লেন পিস্টিলো, "বেশ। কীভাবে মারা গেছে?"

"খুব সম্ভবত উপর্যুপরি আঘাতের কারণে আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হয়েছে। এখনও ময়নাতদন্ত চলছে।"

"ঈশ্বর!"

"টর্চার করা হয়েছে মৃত্যুর আগে। হাতের আঙুল সবগুলো মোচড়ানো। প্লায়ার্স ব্যবহার করেছে বোধহয়। শরীরের উপরিভাগে সিগারেটের ছ্যাঁকার সম্ভাব্য আলামত পাওয়া গেছে।"

"কতক্ষণ আগে মারা গেছে?"

"গতকাল রাতে অথবা আজ ভোরে।"

এজেন্ট ফিশারের দিকে তাকালেন পিস্টিলো। ঠিক এই চেয়ারটাতেই কালকে বসে ছিল উইল ক্লেইন। "তাড়াতাড়ি," বললেন তিনি।

"সরি?"

"প্রেমিক মশাই বলছিল না যে গতকাল থেকেই পাওয়া যাচ্ছে না তাকে? সেই হিসেব তাড়াতাড়িই খোঁজ মিলেছে।"

"এটাও হতে পারে যে," ক্লডিয়া বললো, "স্বেচ্ছায় তাদের কাছে গিয়েছে।"

"কিংবা হয়তো পালায়ইনি।"

"বুঝলাম না..."

আরো কিছুক্ষণ কলমটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন পিস্টিলো। "আমরা তো শুরু থেকেই ধরে নিয়েছিলাম যে শিলা রজার্স অ্যালবাকার্কির খুনের ঘটনায় গ্রেফতার এড়ানোর জন্যে গা ঢাকা দিয়েছে, তাই না?"

মাথা একদিকে কাত করে কিছুক্ষণ ভাবলো ক্লডিয়া। "হ্যাঁ এবং না। মানে, পালাতেই যদি হয় তাহলে নিউ ইয়র্কে আবার ফিরবে কেন?"

"উইলের মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যাওয়ার জন্যে বোধহয়, জানি না আমি," বললেন পিস্টিলো। "আমার ধারণা কোথাও ভুল করছি আমরা। হয়তো এফবিআই যে তার পিছে লেগেছে এটা জানতোই না সে। আমার কথা বুঝতে পারছো, ক্লডিয়া? কেউ হয়তো অপহরণ করেছিল শিলাকে।"

"মিলছে না তো," ক্লডিয়া বললো।

"উইল ক্রেইনের ভাষ্যমতে সকাল ছয়টার দিকে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে যায় সে, তাই না?"

"পাঁচটা।"

"আচ্ছা, পাঁচটা। তাহলে আমরা একটা দৃশ্যকল্প তৈরি করার চেষ্টা করি। পাঁচটার সময় অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বের হয়ে কোথাও গিয়ে গা ঢাকা দেয় শিলা রজার্স। কিন্তু কেউ পিছু নিয়ে খুঁজে বের করে তাকে। এরপর তুলে নিয়ে গিয়ে টর্চার করে মেরে ফেলার পর লাশটা ফেলা আসে নেব্রাস্কায়। ভুল বলেছি কিছু?"

মাথা ঝাঁকালো ক্লডিয়া। "এখন আমার কাছেও বড্ড 'তাড়াতাড়ি' ঠেকছে সবকিছু।"

"বেশি তাড়াতাড়ি?"

"হ্যাঁ।"

"এটাও হতে পারে যে বাসা থেকে বের হওয়া মাত্র কেউ ধরে নিয়ে যায় তাকে।"

"এরপর নেব্রাস্কায় ছোটে?"

"দ্রুত গাড়ি চালিয়েছিল হয়তো।"

"অথবা...?" বলতে গিয়েও থেমে যায় ক্লডিয়া।

"অথবা?"

"আমার ধারণা," বসের দিকে তাকিয়ে বলে ক্লডিয়া, "আমরা দুজন একই উপসংহারে উপনীত হচ্ছি। এত কিছু ঘটার জন্যে সময় খুব অল্প। হয়তো আগের রাতেই উধাও হয় সে।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ উইল ক্রেইন মিথ্যে বলেছে আমাদের।"

"ঠিক," হেসে বললেন পিস্টিলো।

"আরেকটা সম্ভাবনা," কথার ফুলঝুরি ছুটছে এখন ক্লডিয়ার মুখ দিয়ে। "উইল ক্রেইন আর শিলা রজার্স শেষকৃত্য অনুষ্ঠান থেকে তাদের লিভিংস্টোনের বাড়িতে যায়। মি. ক্রেইন আমাদের জানায় যে সেখান থেকে নিউ ইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্টে ফেরে তারা। কিন্তু সেটা নিশ্চিত করার মতো আর কেউ নেই। হয়তো নিউ ইয়র্কে ফেরার পথেই কারো হাতে শিলা রজার্সকে তুলে দেয় উইল ক্রেইন। সে-ই রাতভর টর্চারের পর খুন করে তাকে। সকালে যখন আমি আর উইলকক্স মি. ক্রেইনের অফিসে যাই, তখন বানিয়ে বানিয়ে বলে যে ভোরবেলা অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে গেছে শিলা রজার্স।"

সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন পিস্টিলো। "ভালো বলেছ। কী মোটিভ থাকতে পারে?"

"মুখ বন্ধ করাতে চেয়েছিল।"

"কেন?"

"অ্যালবাকার্কির ঘটনার জন্যে।"

দুজনই চুপচাপ কিছুক্ষণ গোটা বিষয়টা নিয়ে ভাবলো।

"বেশি বেশি হয়ে যাচ্ছে।"

"আমারো তাই মনে হচ্ছে।"

"কিন্তু উইল ক্রেইন যে কিছু একটা লুকাচ্ছে সে ব্যাপারে তো আমরা একমত?"

"হ্যাঁ।"

লম্বা শ্বাস ফেললেন পিস্টিলো। "যাইহোক, মিস রজার্সের মৃত্যুর কথা তাকে জানাতে হবে।"

"হ্যাঁ।"

"ইউটাহ'র স্থানীয় পুলিশ চিফকেও ফোন দাও।"

"আইডাহো।"

"ঐ একই কথা। তাকে বলো পরিবারের লোকের সাথে যোগাযোগ করতে। যত দ্রুত সম্ভব আনুষ্ঠানিক সনাক্তকরণের জন্যে কেউ যেন চলে আসে।"

"আর উইল ক্রেইন?"

"আমি স্কয়ার্সের সাথে যোগাযোগ করছি," কিছুক্ষণ ভেবে বলল পিস্টিলো। "ও হয়তো এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে আমাদের।"

আঠারো

আমার অ্যাপার্টমেন্টের দরজাটা খোলা।

খালা-খালু আসার পর বাবার সাথে কোন কথা বলিনি আমি। তার জন্যে আমার ভালোবাসায় কোন কমতি নেই, সেটা আশা করি বুঝতে পারছেন। কিন্তু আমার ভেতরে একটা অংশ মায়ের মৃত্যুর জন্যে সবসময় তাকে দোষ দিয়ে যাবে। যদিও এর পেছনে যুক্তিসংগত কোন কারণ নেই। মা যখন থেকে অসুস্থ হলো, হঠাৎই বাবার প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যায়। মায়ের যত্নে কখনো অবহেলা করেনি বাবা, তবুও।

অথবা জুলি মিলারের মৃত্যুর পর ঠিকভাবে মাকে সামলায়নি সে, এটাই আমার অভিযোগের মূল কারণ। তখন যেরকম শক্ত হাতে সবকিছু সামাল দেয়ার কথা ছিল তার, ততটা দিতে পারেনি। স্বামী হিসেবে দায়িত্বে অবহেলা করেছে। একমাত্র প্রকৃত ভালোবাসাই পারতো মাকে তখন শান্তি দিতে।

যেমনটা বললাম, কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই তার প্রতি আমার এই রাগের।

দরজা পুরোপুরি খোলা না অবশ্য, কিন্তু এটুকুই আমাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ঠ। সবসময় তালা দিয়ে যাই। ম্যানহ্যাটানের বেশিরভাগ দালানের মতো আমার বিল্ডিংয়েও ডোরম্যান বা দারোয়ানের কোন বালাই নেই। হয়তো কেটি মিলারের সাথে দেখা করার তাড়াহুড়োয় তালা দিতে ভুলে গেছি। ডেডবোল্টটাও আটকে যায় মাঝে মাঝে।

নাহ, এরকম কিছু ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম।

দরজায় হাত দিয়ে আলতো ধাক্কা দিলাম। সাধারণত ক্যাঁচ করে শব্দ করে ওঠে। কিন্তু আজকে শব্দটা শুনলাম না। বরং অন্য একটা শব্দ কানে এলো, বেশ আস্তে যদিও। দরজার ফাঁকা দিয়ে মাথা ঢুকিয়ে উঁকি দিলাম। ভেতরটা জমে গেল যেন সাথে সাথে।

অস্বাভাবিক কিছু দেখিনি অবশ্য, বাতি নেভানো। পর্দাও টেনে দেয়া, তাই খুব বেশি আলো আসছে না বাইরে থেকে। সুতরাং অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়লো না। করিডোর থেকেই আরেকটু ঝুঁকলাম ভেতরে।

গানের শব্দ কানে আসছে।

এমনটা নয় যে আগে কখনো সিডি প্লেয়ার বন্ধ করতে ভুলে যাইনি। কিন্তু সেটাও খুব কমই হয়েছে। একসাথে এরকম দুটো বড় ভুল করার সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায়। তবে গানের শব্দে জমে যাইনি। যে গানটা বাজানো হচ্ছে, সেটা অবাক করেছে আমাকে। শেষ কবে শুনেছিলাম গানটা মনে করার চেষ্টা করলাম।

'ডোন্ট ফিয়ার দ্য রিপার'—হেভি মেটাল *ব্যান্ড ব্লু অয়স্টার কাল্টের* একটা গান। তাদের অন্য গানগুলোর তুলনায় জনপ্রিয়তার দিক থেকে অনেক এগিয়ে ছিল এটা। রেডিওতে গানটা শুনলেই টেনিস ব্যাট হাতে গিটার বাজাতে শুরু করতো কেইন। গানটা যে আমার সংগ্রহে ছিল না ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত আমি। ইচ্ছে করেই রাখিনি।

হচ্ছেটা কী?

ঘরে পা রাখলাম। অন্ধকারে খুব বেশি বোকা বোকা লাগছে। বাতি দিলেই তো সব দেখা যাবে। সমস্যা কী আমার?

সুইচে হাত দিতে যাবো এসময় মাথার ভেতরে কে যেন বলে উঠলো, 'লাইট না জ্বালিয়ে পালাচ্ছো না কেন? হরর সিনেমায় এসব ক্ষেত্রে কি হয় দেখোনি?'

আসলেও নিজেকে হরর সিনেমার নায়কের বোকা বন্ধুর মতো মনে হচ্ছে। যেন এখনই খুনি তাড়া করবে আমাকে, তারস্বরে চেঁচাতে চেঁচাতে পালাবো।

গানের গিটার সলোর অংশটুকু বাজছে এখন। শেষ হয়ে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। অপেক্ষা করতে থাকলাম আমি। আবারো প্রথম থেকে চালু হলো গানটা।

নাহ, বড্ড বেশি অস্বাভাবিক।

এখানে থাকার বিকল্প হিসেবে চিৎকার করতে করতে পালানো খুব একটা খারাপ মনে হচ্ছে না এখন। কিন্তু পালিয়ে যাবো কোথায়? পুলিশকে ফোন দিব? ফোন দিয়েই বা কী বলবো? 'সিডি প্লেয়ারে আমার ভাইয়ের পছন্দের গানটা বাজছে, এজন্যে ফোন দিয়েছি'?

নিজের কানেই তো শুনতে কেমন লাগছে।

আর এটা যদি সত্যি হয়ে থাকে যে কেউ আমার অ্যাপার্টমেন্টে আসলেও ঢুকেছে...খুব ভালো সম্ভাবনা আছে তার এখনও এখানে থাকার। সাথে করে গানের সিডিটাও নিয়ে এসেছে সে।

কে হতে পারে সেটা?

চোখে অন্ধকার কিছুটা সয়ে এসেছে আমার। হৃৎস্পন্দন আগের চেয়ে অনেক দ্রুত। বাতি না জ্বালানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। কেউ যদি এসেই থাকে, তাকে সাবধান করার কোন কারণ দেখছি না। নাকি বাতি জ্বালালেই আমার সুবিধা হবে?

নাহ, আমাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না।

বাতি নেভানোই থাক, দেখি কী হয়।

গানের শব্দ আসছে আমার বেডরুম থেকে। ওদিকে ঘুরলাম। দরজা বন্ধ। সাবধানে পা টিপে এগোতে লাগলাম। অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বাইরে বের হবার দরজা ইচ্ছে করেই খোলা রেখেছি, হঠাৎ পালাতে হতেও পারে।

স্কয়ার্সের ইয়োগা ক্লাসে একবার একটা বিশেষ ভঙ্গির কথা শুনেছিলাম। সেই বিশেষ ভঙ্গিটায় হাত-পা যেদিকে এগোবে, চেতনাকে তার বিপরীত দিকে প্রবাহিত করার চেষ্টা করতে হবে। আমার অবস্থা এখন হয়েছে সেরকম।

দরজার কাছাকাছি প্রায় পৌঁছে গেছি এখন। ব্লু অয়স্টার কাল্টের বাক ধার্মা (আসল নাম ডোনাল্ড রোসার, বুঝতেই পারছেন কতবার শুনেছি গানটা) রোমিও আর জুলিয়টের পরিণতি নিয়ে গেয়ে চলেছে।

পরিণতি কী? মৃত্যু।

দরজা ঠেলা দিলাম, খুললো না। নব ঘোরাতেই হবে। ধাতব নবটায় হাত রেখে একবার পেছনে তাকালাম। মূল দরজা এখনও পুরোপুরি খোলা। যতটা সম্ভব ধীরে নব ঘুরালাম, তবুও শব্দটা গুলির আওয়াজের মতো শোনালো আমার কানে।

একটু ঠেলা দিয়ে নব ছেড়ে দিলাম। গানটা এখন আরো জোরে শোনা যাচ্ছে। একদম পরিষ্কার। দুই বছর আগে স্কয়ার্সের তরফ থেকে উপহার পাওয়া বোস সিডি প্লেয়ারটা চলছে মনে হচ্ছে।

উঁকি দেয়ার জন্যে মাথা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলাম। আর ঠিক তখন কেউ আমার চুলে হাত রাখলো।

মুখ দিয়ে কোন শব্দ করারও সময় পেলাম না। এত জোরে টেনে ভেতরে ঢোকানো হলো আমাকে যে তাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম মাটিতে। পেট থেকে সব বাতাস বেরিয়ে গেল মুহূর্তে। ওঠার চেষ্টা করলাম, কিন্তু ততক্ষণে আমার ওপর চড়ে বসেছে আততায়ী। মোচড়া-মোচড়ি করেও লাভ হলো না, আমার চেয়ে অনেক শক্তিশালী লোকটা।

নড়াচড়ার কোন সুযোগ নেই। এ মুহূর্তে পুরোপুরি তার দয়ার ওপর নির্ভর করছে সবকিছু। কানের কাছে দ্রুত লয়ে শ্বাস ফেলার শব্দ পাচ্ছি। আততায়ীর অন্য হাতটা এবারে চেপে বসলো আমার গলায়। এভাবে শ্বাস নেয়া অসম্ভব।

চোখজোড়া যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে কোটর থেকে। গলা থেকে হাতটা সরানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু এই বজ্র আঁটুনি ছাড়ানোর সাধ্য আমার নেই। নখ দিয়ে আচড়ে দিতে চাইলাম হাতটা। হাত তো নয়, যেন মেহগণি কাঠ। মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে বিস্ফোরিত হবে আমার খুলি। এসময় কণ্ঠটা কানে এলো।

"হ্যালো, উইলি।"

সেই কণ্ঠস্বর।

চিনতে এক মুহূর্তও লাগলো না। শেষবার কবে শুনেছি? দশ নাকি পনেরো বছর আগে? জুলির মৃত্যুর পর শুনিনি এটা নিশ্চিত। কিছু কণ্ঠ থাকে যা আমরা কখনো ভুলি না। মস্তিষ্কে বিশেষ অংশে গেঁথে যায়। শোনা মাত্র কর্টেক্স সিগন্যাল দিতে থাকে–বিপদ!

আমার গলা ছেড়ে দিলো সে, পুরোপুরি। মেঝেতে মুখ থুবড়ে পড়লাম। হাঁপরের মতো শ্বাস টানার চেষ্টা করছি। "এ কি অবস্থা তোমার, উইলি," আমার ওপর থেকে উঠে হেসে বললো আততায়ী।

কোনমতে ঘুরে তাকালাম। না, ভুল শুনছি না। আসলেও সে দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে। চেহারায় কিছু পরিবর্তন এসেছে, তবে আমি ঠিকই চিনতে পারলাম।

"জন?" কোনমতে বললাম। "জন অ্যাসেন্টা?"

শীতল ভঙ্গিতে হাসলো সে। ছোটবেলার সেই পুরনো ভয়টা টের পাচ্ছি আবারো। ঘোস্ট, এই নামেই সবাই ডাকতো ওকে। যদিও সামনাসামনি বলার সাহস ছিল না কারোই। ওকে দেখলে গলা শুকিয়ে যাবে না, এমন লোক খুব কমই আছে। তবে আমাকে কখনো কিছু করেনি সে। হাজার হলেও কেন ক্রেইনের ভাই আমি। আর ঘোস্টের জন্যে এই তথ্যটুকুই যথেষ্ঠ।

ছোটবেলা থেকেই ভীতু গোছের ছিলাম আমি। মারামারি, হাতাহাতি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতাম যতটা সম্ভব। অনেকে হয়তো বলবে সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ করেছি। কিন্তু সত্যটা তো আমি জানি। স্কুলে যদি কাপুরুষদের কোন তালিকা করা হতো, তাহলে প্রথম দিকে থাকতো আমার নাম। সহিংসতা বরাবরই প্রচণ্ড ভয় পাই। বেঁচে থাকার তাগিদ সবারই আছে–এটা বলতে পারেন, তবুও ব্যাপারটা নিয়ে লজ্জিত আমি। কিন্তু আমার ভাই এর একদম উল্টো। ঘোস্টের সবচেয়ে কাছে বন্ধু সে। নিছক লোক দেখানো সাহসী আর তাদের মধ্যে পার্থক্যের দাগটা ছিল বেশ মোটা। টেনিস খেলার সময় জানপ্রাণ দিয়ে লড়তো। আগ্রাসী মনোভাবটা আরো ভালোভাবে বোঝা যেত তখন। লড়াইয়ে আপনাকে তো হারাবেই, মাটিতে পড়ে যাবার পরও আঘাত থামাবে না। আমি কখনো ওরকম ছিলাম না।

হাচড়ে পাচড়ে উঠে দাঁড়ালাম। অ্যাসেন্টা সটান দাঁড়িয়ে আছে সামনে। "পুরনো বন্ধুকে জড়িয়ে ধরবে না, উইলি?"

কোন প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগেই সামনে এগিয়ে এসে আমাকে আলিঙ্গন করলো অ্যাসেল্টা। শক্ত-পোক্ত শারীরিক গঠনের তুলনায় বেশ খাটো সে। আমার বুক স্পর্শ করছে তার ডান গাল। "অনেক দিন পর।"

"ভেতরে ঢুকলে কীভাবে?" প্রথমে যেটা মনে এলো সেটাই জানতে চাইলাম।

"কী?" আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললো সে। "ওহ! দরজা খোলাই ছিল। এভাবে চমকে দেয়ার জন্যে দুঃখিত, কিন্তু..." বলে হাসলো সে একবার, "তুমি একটুও বদলাওনি, উইলি।"

"এভাবে না বলে–"

মাথা একদিকে কাত করলো অ্যাসেল্টা। মানুষের ওপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ার বদভ্যাসটার কথা মনে পড়ে গেলো। আমার চেয়ে দুই বছরের বড় সে, লিভিংস্টোন হাই স্কুলে কেইনের সহপাঠী ছিল। রেসলিং দলের অধিনায়কত্ব করেছে অনেকদিন। এসেক্স কাউন্টির লাইওয়েটে বিভাগে চ্যাম্পিয়নও হয়েছিল দুইবার। জাতীয় পর্যায়ে ভালো অবস্থানে যেত নিশ্চিত, কিন্তু ইচ্ছেকৃতভাবে প্রতিপক্ষের কাঁধের জয়েন্ট স্থানচ্যুত করায় বহিষ্কার করা হয় তাকে। ছেলেটার চিৎকার এখনও কানে বাজে আমার। অনেকেই অসুস্থবোধ করছিল ওভাবে ঝুলতে থাকা নির্জীব হাতটা দেখে। অ্যাসেল্টার চেহারায় একটা হাসি লেগে ছিল পুরোটা সময়।

বাবা বলতো যে নেপোলিয়ন কমপ্লেক্সে ভোগে সে। কিন্তু আমার মনে হয় না ব্যাপারটা এত সহজ। এসব আচরণের মাধ্যমে নিজের পৌরুষ জাহির করতে চাইতো নাকি অন্য কোন তাড়না থেকে ওরকম করতো, তা একটা রহস্য বটে।

তবে সে যে একটা বদ্ধ উন্মাদ, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এক কথায় বললে–সাইকো।

এছাড়া অন্য কোনভাবে বলার সুযোগ নেই। চোখের সার্বক্ষণিক শত্রুভাবাপন্ন দৃষ্টির কারণে পারতপক্ষে কেউই ঘাঁটাতো না তাকে। হঠাৎ কীসে রেগে উঠবে, কে জানে। নাক ফাটিয়ে দিতে পারে। দুপায়ের ফাঁকে লাথি কষাতে পারে। চোখ উপড়ে নিতে পারে। পেছন থেকেও আক্রমণ করতে পারে। এসবের উদাহরণও কম নেই। তার জন্যে হাসপাতালের জরুরী বিভাগে ভর্তি হয়েছে অনেকেই।

গুজব আছে চৌদ্দ বছর বয়সে প্রতিবেশীর কুকুরের পায়ুপথে আতশবাজি ঢুকিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল ঘোস্ট। তবে সবচেয়ে ভয়ংকর গুজবটা হচ্ছে–দশ বছর বয়সে ড্যানিয়েল স্কিনার নামের একটা ছেলের বুকে নাকি ছুরি বসিয়েছিল সে। দুই বছরের বড় ছেলেটা জ্বালাতন করতো তাকে, তাই এই শাস্তি। কেইনকে এসব ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে সবসময়ই এড়িয়ে যেত। বাবাকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে হ্যাঁ-ও বলেনি, না-ও বলেনি।

অতীতের স্মৃতিগুলো মাথা থেকে দূর করার চেষ্টা করলাম। "কী চাই তোমার, জন?"

কেইনের সাথে তার বন্ধুত্বটা সবসময়ই অস্বাভাবিক ঠেকেছে আমার কাছে। আমার বাবা-মাও খুব একটা খুশি ছিল না ব্যাপারটা নিয়ে। তবে বয়স্কদের সামনে ভদ্র সেজে থাকতো জন। অতিরিক্ত ফর্সা হলেও (গায়ের রঙ থেকেই 'ঘোস্ট' ডাকনামটার উৎপত্তি) দেখতে খারাপ বলা যাবে না তাকে। অনেকেই বলাবলি করতো যে গ্র্যাজুয়েশনের পর আর্মির 'স্পেশাল অপস' বা 'গ্রিন বেরেট'-এর মতো সংস্থায় যোগ দিয়েছে সে। তবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

"কেইন কোথায়?" আবারও মাথা একদিকে কাত করে জানতে চাইলো ঘোস্ট।

কোন জবাব দিলাম না।

"অনেক দিন এখানে ছিলাম না আমি, উইলি। দেশের বাইরে গিয়েছিলাম।"

"কেন?"

"ফিরেই পুরনো বন্ধুর কথা মনে পড়লো," আমার প্রশ্নটা যেন কানেই ঢোকেনি তার।

কী বলবো বুঝে উঠতে পারলাম না। হঠাৎই মনে পড়ে গেল যে কালকে রাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে একজনকে বাইরে থেকে আমার ওপর নজর রাখতে দেখেছিলাম।

"বলো উইলি, কোথায় পাবো কেইনকে?"

"জানি না।"

"সরি?" কানের কাছে হাত নিয়ে বললো সে।

"আমি জানি না কেইন কোথায় আছে।"

"সেটা কীভাবে সম্ভব? তুমি তো ওর ভাই। তোমাকে পছন্দ করতো ও।"

"এখানে কেন এসেছো, জন?"

আচ্ছা," আবারো হাসি ফুটলো ওর মুখে। "জুলির কী খবর? বিয়ে করেছো তোমরা?"

ইচ্ছে করে এসব বলছে, বুঝতে পারছি। অদ্ভুত হলেও সত্যি, জুলির সাথে বেশ খাতির ছিল ঘোস্টের। এটার কারণটাও কখনো বুঝিনি আমি। একবার কৌতুক করে বলেছিলাম যে ফাঁদে আটকা পড়া সিংহকে যেরকম একটা ইঁদুর বাঁচিয়েছিল, জুলিও সেরকম কিছু করেছিল নিশ্চয়ই। জুলির মতে ঘোস্টের এই হিংস্র খোলসের আড়ালে নাকি কোমল একটা রূপ আছে। ফালতু কথা। আবারো পালানোর কথা ভাবলাম। কিন্তু লাভ হবে না।

হ্যাঁ, ভয় পাচ্ছি প্রচণ্ড।

"অনেক দিন দেশে ছিলে না?" জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ, উইলি।"

"কেইনের সাথে শেষ কবে দেখা হয়েছিল।"

জন এমন ভান করলো যেন মনে করার চেষ্টা করছে। "বারো বছর তো হবেই। বাইরে ছিলাম তো, হিসাব রাখিনি।"

"ওহ।"

"তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমাকে সন্দেহ করছো?" চোখ সরু করে বললো ঘোস্ট। এগিয়ে এলো এক পা। মুখে স্বাভাবিক অভিব্যক্তি ধরে রাখতে বেগ পেতে হচ্ছে। "ভয় পাচ্ছো নাকি?"

"না।"

"রক্ষা করার জন্যে বড় ভাই নেই কিন্তু।"

"আমরাও কিন্তু আর হাইস্কুলে ছাত্র না, জন।"

কটমট করে আমার চোখের দিকে তাকালো ঘোস্ট। "তোমার ধারণা সব বদলে গেছে?"

যেখানে ছিলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম ঠায়।

"দেখে মনে হচ্ছে ভয় পেয়েছো, উইলি।"

"বেরিয়ে যাও," বললাম।

তাৎক্ষণিক জবাব পেলাম। তবে মুখ দিয়ে কিছু বললো না সে। সেকেন্ডেরও ভগ্নাংশের মধ্যে নিচু হয়ে ল্যাং মেরে মেঝেতে ফেলে দিল আমাকে। সরে যাবার আগেই ডান কনুই দিয়ে চেপে ধরলো গলাটা। বাম হাত মুচড়ে ধরেছে তার অন্য হাত দিয়ে। বিপজ্জনকভাবে বেঁকে যেতে দেখছি সেটাকে। সেখান থেকে ব্যাথার হলকা ছড়িয়ে পড়লো পুরো শরীরে।

একচুল নড়ার মতো অবস্থানে নেই আমি। চাপ আরো বাড়ছে।

"ওকে বলে দিও লুকিয়ে কোন লাভ নেই, উইলি। নাহলে অন্যরা কষ্ট পাবে। যেমন তুমি, তোমার বাবা কিংবা তোমার বোন। এমনকি আজকে যে মিলার ছুঁকড়িটার সাথে দেখা করতে গিয়েছিল, সে-ও নিরাপদ নয়। পরিষ্কার করে বলে দিও।"

অবিশ্বাস্য গতিতে আমার হাত ছেড়ে দিয়ে নাক বরাবর ঘুষি চালিয়ে দিল ঘোস্ট। রক্ত বেরিয়ে এলো গলগল করে। মনে হচ্ছে পুরো ঘরটা দুলছে। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম বোধহয়।

জ্ঞান ফেরার পর দেখি ঘোস্ট নেই।

উনিশ

বরফের একটা প্যাকেট আমার হাতে দিল স্কয়ার্স। "লোকটাকে দেখতে ইচ্ছে করছে আমার।"

"একদম হারকিউলিস," ব্যাগটা নাকে চেপে ধরে বললাম।

কাউচে বসে কফি টেবিলে পা উঠিয়ে দিল স্কয়ার্স। "খুলে বলো।"

বললাম।

"পুরোই জেমস বন্ড দেখি," স্কয়ার্স মন্তব্য করলো।

"এটা তো মনে হয় বলেছি যে নিরীহ পোষা প্রাণীদের টর্চার করতো সে?"

"হ্যাঁ।"

"করোটির সংগ্রহ ছিল রুমে।"

"সেটা নিশ্চয়ই মেয়েদের ইমপ্রেস করার জন্যে করতো।"

"বুঝতে পারছি না," ব্যাগটা নামিয়ে বললাম। মনে হচ্ছে যেন কেউ হাতুড়ি দিয়ে বাড়িয়ে দিয়েছে নাকে। "আমার ভাইয়ের খোঁজ করছে কেন ঘোস্ট?"

"ভালো প্রশ্ন।"

"পুলিশে ফোন দেয়া উচিত আমার?"

কাঁধ ঝাকালো স্কয়ার্স। "পুরো নামটা যেন কী বললে?"

"জন অ্যাসেন্টা।"

"কোথায় থাকে, সেটা তো বোধহয় জানো না?"

"না।"

"কিন্তু বড় হয়েছে লিভিংস্টোনে?"

"হ্যাঁ," বললাম। "৫৭, উডল্যান্ড টেরেস–ওর আগের ঠিকানা।"

"ঠিকানা মুখস্থ?"

এবার আমার কাঁধ ঝাঁকানোর পালা। লিভিংস্টোন ওরকমই ছিল। কে কোথায় থাকে সবার মুখস্থ। "ওর মায়ের ব্যাপারে যতদূর শুনেছি, ঘোস্ট ছোট থাকতেই চলে যায় সে। বাবা ছিল পাঁড় মাতাল। বড় দুই ভাইয়ের একজন, শন বোধহয় নাম, ভিয়েতনাম যুদ্ধে গিয়েছিল। ঝাঁকড়া চুল আর বড় দাড়ি নিয়ে শহরময় ঘুরে বেড়াতো সে, একা একা কথা বলতো। সবাই পাগল ধরে নিয়েছিল তাকে। ওদের উঠোনটা দেখে মনে হতো কোনদিন ঘাস ছাঁটার চেষ্টা করেনি কেউ। লিভিংস্টোনবাসীর জন্যে এটা অনেক বড় একটা অপরাধ। পুলিশের লোকেরা বেশ কয়েকবার জরিমানাও করেছে সেজন্যে।"

তথ্যগুলো টুকে নিল স্কয়ার্স। "আচ্ছা, আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি।"

মাথা দপদপ করছে। "তোমার স্কুলেও কি এরকম কেউ ছিল? মানুষকে কষ্ট দিয়ে মজা পেতো?"

"হ্যাঁ," স্কয়ার্স বললো। "আমি।"

বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো কথাটা। স্কয়ার্সের অন্ধকারাচ্ছন্ন অতীতের ব্যাপারে অনেক কিছুই কানে এসেছে, কিন্তু সে আসলেও ঘোস্টের মতো কিছু করবে, এটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না। অন্তত কারো খুলি ফাটিয়ে, সেই শব্দ শুনে হাসার মতো মানুষ না স্কয়ার্স।

আবারো নাকে চেপে ধরলাম বরফের ব্যাগটা। ব্যাথায় চেহারা কুঁচকে গেল।

"চকলেট খাবে, বাবু?" মাথা ঝাঁকিয়ে বললো স্কয়ার্স।

"ভাগ্যিস হাসপাতালে কাজ করো না তুমি।"

"নাক তো ভেঙেছে মনে হচ্ছে," বললো ও।

"সেটা বেশ বুঝতে পারছি।"

"হাসপাতালে যাবে?"

"নাহ, আমি বাচ্চা না।"

এবারে হেসে উঠলো স্কয়ার্স। "ওরাও খুব একটা সাহায্য করতে পারবে বলে মনে হয় না," এটুকু বলে অন্য দিকে তাকিয়ে গাল চুলকাতে শুরু করলো সে। "তোমার সাথে একটু কথা ছিল।"

বলার ভঙ্গিটা ভালো ঠেকলো না আমার কাছে।

"জোয়ি পিস্টিলোর কাছ থেকে একটা ফোন পেয়েছি আমি।"

আবারো নামিয়ে ফেললাম ব্যাগটা। "শিলার খোঁজ মিলেছে?"

"জানি না।"

"তাহলে কী চায়?"

"ফোনে শুধু বলেছে তোমাকে নিয়ে যেতে।"

"কখন?"

"এখন।"

"আমি ক্লাইড স্মার্ট," লোকটা বললো তার দিকে তাকিয়ে।

এরকম শান্ত গলা আগে কমই শুনেছে এডনা রজার্স।

"এখানকার কাউন্টি মেডিক্যাল এক্সামিনার।"

এডনার স্বামী, নিল রজার্স হাত মেলালো লোকটার সাথে। সে শুধু মাথা নাড়লো একবার আনমনে। মহিলা শেরিফটা দাঁড়িয়ে আছে পাশে। তার ডেপুটিরাও উপস্থিত। সবার চেহারাতেই স্পষ্ট অস্বস্তি। ক্লাইড নামের লোকটা কিছু বলার চেষ্টা করছে। তার কথা শোনা বাদ দিল এডনা।

অবশেষে টেবিলের দিকে এগোলো ক্লাইড স্মার্ট। বেয়াল্লিশ বছরের বিবাহিত জীবন পার করে আসা নিল আর এডনা রজার্স পাশাপাশি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। তবে কেউ কিন্তু কাউকে ধরে নেই। পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক গত হয়েছে অনেক আগেই।

শেষ অবধি পর্যাপ্ত সাহস জোগাড়ে সক্ষম হলো মেডিক্যাল এক্সামিনার। নামিয়ে দিল চাদরটা।

শিলার চেহারাটা দেখে আহত জন্তুর মতো পিছিয়ে গেল নিল রজার্স। বুকের একদম ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা কান্নার শব্দটা নেকড়ের ডাকের কথা মনে করিয়ে দিল। স্বামীর আর্তনাদ শুনেই বুঝতে পারছে যে শেষ মুহূর্তে অলৌকিক কিছু ঘটার সম্ভাবনা নেই। লম্বা শ্বাস টেনে মেয়ের দিকে তাকালো। আপনা আপনি একটা হাত উঠে গেল স্নেহের ভঙ্গিতে। হাজার হোক, মায়ের মন। কিন্তু মাঝপথেই থেমে গেল সে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে টেবিলটার দিকে। বড় মেয়েকে প্রথমবার কোলে নেয়ার কথা মনে পড়ছে ভীষণ। আর আজ সে কিনা–

আর আটকানো সম্ভব হলো না। দুচোখে বান ডাকলো এডনা রজার্সের।

বিশ

"আপনার নাকে কী হলো আবার?" পিস্টিলো জানতে চাইলেন।

আবারো তার অফিসে এসেছি আমরা। স্কয়ার্স অবশ্য ওয়েটিং রুমে। পিস্টিলোর ডেস্কের সামনে রাখা আর্মচেয়ারটায় বসলাম। খেয়াল করে দেখলাম, অ্যাসিট্যান্ট ডিরেক্টর সাহেবের চেয়ারটা আমার চেয়ার থেকে বেশ খানিকটা উঁচু। হয়তো ব্যাপারটা ইচ্ছেকৃত। হাত ভাঁজ করে আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে এজেন্ট ক্লডিয়া ফিশার।

"পড়ে গিয়েছিলাম," জবাব দিলাম।

আমার কথা বিশ্বাস করলো বলে মনে হয় না, তবে তাতে কিছু যায় আসে না।

"কষ্ট করে আবারো একটু সবকিছু খুলে বলতে হবে আপনাকে," ডেস্কে হাত রেখে বললেন এজেন্ট পিস্টিলো।

"কোন ব্যাপারে?"

"মিস রজার্স কীভাবে উধাও হলেন।"

"ওকে পেয়েছেন আপনারা?"

"আপাতত সব বলুন আমাদের, প্লিজ," মুখের সামনে হাত নিয়ে একবার কাশলেন তিনি। "কয়টার সময় অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে বেরিয়ে যান শিলা রজার্স?"

"কেন?"

"আপনাকে আবারো অনুরোধ করছি, মি. ক্লেইন। সহযোগিতা করুন আমাদের।"

"সম্ভবত পাঁচটার দিকে।"

"আপনি নিশ্চিত?"

"আমি বলেছি 'সম্ভবত'," বললাম।

"নিশ্চিত নন কেন?"

"ঘুমিয়ে ছিলাম। ওর বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ কানে এসেছিল বোধহয়।"

"পাঁচটার দিকে?"

"হ্যাঁ।"

ঘড়ি দেখেছিলেন?"

"এগুলো কেমন প্রশ্ন? জানি না।"

"তাহলে বুঝলেন কি করে যে তখন পাঁচটা বাজছে?"

"অভ্যাসের খাতিরে। আর কিছু জানতে চান?"

মাথা নেড়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন এজেন্ট পিস্টিলো। "মিস রজার্স তো বোধহয় একটা চিরকুট রেখে গিয়েছিলেন আপনার জন্যে?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায় ছিল নোটটা?"

"মানে, অ্যাপার্টমেন্টের কোথায়?"

"হ্যাঁ।"

"এটা জেনে কী হবে?"

আমার দেখে সবচেয়ে কৃত্রিম হাসিটা মুখে ফুটলো তার। "প্লিজ, বলুন।"

"রান্নাঘরের কাউন্টারে," বললাম। "ওটা ফরমিকার তৈরি, কোম্পানির নাম জানতে চান?"

"চিরকুটটায় কী লেখা ছিল?"

"সেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার।"

"মি. ক্রেইন-"

"লেখা ছিল সবসময় ভালোবেসে যাবো তোমাকে," দীর্ঘশ্বাস চেপে বললাম।

"আর?"

"আর কিছু না।"

"এটুকুই?"

"হ্যাঁ।"

"আপনার কাছে কি নোটটা এখনও আছে?"

"হ্যাঁ।"

"দেখতে পারি?"

"আপনি কি এবারে দয়া করে বলবেন যে কেন আমাকে ডেকে এনেছেন এখানে?"

"লিভিংস্টোনের বাসা থেকে বের হয়ে আপনি এবং মিস রজার্স কি সরাসরি আপনাদের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে গিয়েছিলেন?"

বিষয়ের এরকম পরিবর্তনে অবাক না হয়ে পারলাম না। "এসব কী জিজ্ঞেস করছেন?"

"আপনার মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় তো দুজনই ছিলেন, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"এরপর আপনি এবং শিলা রজার্স আপনাদের অ্যাপার্টমেন্টটায় ফিরে আসেন। এটাই তো বলেছিলেন আমাদের?"

"হ্যাঁ, এটাই বলেছিলাম।"

"সত্যি বলেছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"অ্যাপার্টমেন্টে ফেরার পথে কোথাও থেমেছিলেন?"

"না।"

"সেটা প্রমাণ করতে পারবেন?"

"কোথাও থামিনি, সেটা প্রমাণ করতে পারবো কিনা?"

"প্রমাণ করতে পারবেন যে সন্ধ্যায় সরাসরি অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে গিয়ে বাকিটা সময় সেখানেই ছিলেন?"

"এটা আবার প্রমাণ করার মতো কিছু হলো নাকি?"

"প্লিজ, মি. ক্রেইন।"

"আমি জানি না এসব কারো পক্ষে আদৌ প্রমাণ করা সম্ভব কিনা।"

"কারো সাথে কথা হয়েছিলো?"

"না।"

"কোন প্রতিবেশী দেখেছিল আপনাদের?"

"জানি না আমি," ঘাড় ঘুরিয়ে ক্লডিয়া ফিশারের দিকে তাকালাম। "আপনি গিয়ে আমার অ্যাপার্টমেন্টের পাশে খোঁজ খবর নিচ্ছেন না কেন?"

"শিলা রজার্স নিউ মেক্সিকোতে গিয়েছিলেন কেন?"

"ও যে সেখানে গিয়েছে, তা আমি আপনাদের কাছ থেকে শুনেছি," পিস্টিলোর দিকে ফিরে বললাম।

"যাওয়ার ব্যাপারে আপনাকে কিছু বলেননি?"

"না।"

"আপনি নিউ মেক্সিকোতে কাউকে চেনেন?"

"ওখানে কীভাবে যেতে হয় সেটাই জানি না আমি।"

"আপনার ফোনের ইনকামিং কলের একটা তালিকা আছে আমাদের কাছে।"

"চমৎকার!"

"সবই প্রযুক্তির খেলা," কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন পিস্টিলো।

"এটা কি বৈধ? আমার ফোন রেকর্ড এভাবে খতিয়ে দেখা?"

"আমাদের কাছে ওয়ারেন্ট আছে।"

"তা তো থাকবেই। কী জানতে চাইছেন এসব থেকে?"

রুমে প্রবেশের পর এই প্রথম নড়তে দেখলাম ক্লডিয়া ফিশারকে। আমার হাতে একটা কাগজ ধরিয়ে দিল সে। তাকিয়ে দেখি ফোন বিলের ফটোকপি। একটা অপরিচিত নম্বররের ওপর হাইলাটার দিয়ে দাগানো।

"আপনার মায়ের শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের আগের দিন নিউ মেক্সিকোর প্যারাডাইজ হিলের একটা ফোন বুথ থেকে কল আসে আপনাদের নম্বরে," বলে সামনে দিকে ঝুঁকে এলেন পিস্টিলো। "কে দিয়েছিল ফোনটা?"

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে নম্বরটা দিকে তাকালাম আবারো। ফোনটা এসেছিল সন্ধ্যা সোয়া ছয়টায়। কথোপকথনের সময় আট মিনিট। পিস্টিলোর কথাবার্তার আগামাথা কিছুই ধরতে পারছি না, কিন্তু তার কথা বলার ধরন আমার ভালো লাগছে না। মাথা উঁচিয়ে তাকালাম তার দিকে।

"আমি কি আমার আইনজীবির সাথে যোগাযোগ করবো?"

দৃশ্যতই কিছুটা দমে গেলেন পিস্টিলো। ক্লডিয়া ফিশারের দিকে আড়চোখে তাকালেন একবার। "আইনজীবির সাথে যে কোন সময় যোগাযোগ করতে পারেন আপনি," এবারে কিছুটা সাবধানী শোনাল তার কথাটা।

"স্কয়ার্সকে ডাকুন।"

"ও তো আইনজীবী নয়।"

"না হোক। আপনাদের ভাবগতিক সুবিধার মনে হচ্ছে না। এই প্রশ্নগুলোও পছন্দ হচ্ছে না আমার। আমি এখানে আসতে রাজি হয়েছিলাম এই ভেবে যে আমাকে হয়তো কিছু জানাতে চান। উল্টো জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে!"

"জিজ্ঞাসাবাদ?" দুহাত ছড়িয়ে বললেন পিস্টিলো। "আমরা তো এমনি গল্প করছি।"

এসময় একটা ফোন বেজে উঠলো আমার পেছনে। "ফিশার বলছি," ক্লডিয়ার কণ্ঠ শুনতে পেলাম। খানিকক্ষণ ওপাশের কথা শোনার পর কিছু না বলেই ফোন কেটে দিল সে। এরপর পিস্টিলোর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লো কিছু একটা নিশিচত করার ভঙ্গিতে।

"যথেষ্ট হয়েছে," বলে উঠে দাঁড়ালাম।

"বসুন, মি. ক্লেইন।"

"আপনার এসব ফালতু প্রশ্ন শুনতে আর ভালো লাগছে না, মি. পিস্টিলো। ফালতু–"

"ঐ ফোনটা," আমার কথা শেষ হবার আগেই বললেন তিনি।

"ফোনটা কী?"

"বসুন, উইল।"

'উইল' নামটা তার মুখে বড্ড বেমানান শোনালো। দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করতে থাকলাম।

"আমরা আসলে ভিজ্যুয়াল কনফার্মেশনের অপেক্ষা করছিলাম।"

"কীসের?"

আমার প্রশ্নের জবাব দিলেন না তিনি। "শিলা রজার্সের বাবা-মাকে আইডাহো থেকে নিয়ে এসেছি আমরা। তারাই নিশ্চিত করেছেন। কিন্তু আঙুলের ছাপ মিলে যাওয়ায় আমরা আরো আগেই শনাক্ত করেছিলাম।"

চেহারার ভঙ্গি কোমল হয়ে এলো তার। আমার হাঁটু কাঁপছে, তবুও দাঁড়িয়ে রইলাম। ভারি দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন এজেন্ট পিস্টিলো। মাথা ঝাঁকাতে শুরু করে দিয়েছি ততক্ষণে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ঠিকই জানি যে লাভ নেই কোন।

"আপনাকে সমবেদনা জানানোর কোন ভাষা আমার জানা নেই, উইল। শিলা রজার্স মারা গেছেন।"

একত্রিশ

কোন ঘটনা সত্য জেনেও সেটাকে প্রত্যাখান করার বেশ কয়েকটা সুবিধাজনক দিক আছে।

আমি কিন্তু ঠিকই টের পাচ্ছি যে হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেছে, পেটের ভেতরে থেকে থেকে মোচড় দিচ্ছে, চোখের কোনায় পানি জমেছে—তবুও বাস্তবতা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললাম। পিস্টিলোর কথাগুলোর প্রেক্ষিতে যান্ত্রিক ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে যাচ্ছি। তবে এসবের মধ্যেও কয়েকটা তথ্য কর্ণকুহর হয়ে ঠিকই প্রবেশ করলো আমার মস্তিষ্কে। তিনি বলছেন, নেব্রাস্কায় রাস্তার পাশে ফেলে যাওয়া হয় ওর লাশ। রোবটের মতো মাথা ওপর নিচ করছি। 'বেশ নৃশংস ভাবে মারা হয়েছে'—এই কথাটা বুঝতে পারলাম। কোন পরিচয়পত্র ছিল না। শিলার বাবা-মা লাশ সনাক্ত করেছে। আবারো মাথা নাড়লাম।

এখনও দাঁড়িয়েই আছি। কয়েক মুহূর্ত পর বুকের ভেতরে ভারি কিছু একটার অস্তিত্ব টের পেলাম। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এখন মনে হচ্ছে অনেক দূর থেকে কথা বলছে এফবিআইয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। সাধারণ একটা ছবি ভেসে উঠলো আমার মনের পর্দায়—কাউচে পা ভাঁজ করে বসে একটা বই পড়ছে শিলা। পৃষ্ঠা ওল্টানোর জন্যে ওর উদগ্রীবতা টের পাচ্ছি দূর থেকেই। যখন বুঝতে পারলো আমি তাকিয়ে আছি, মুখে সেই স্বর্গীয় হাসিটা ফুটলো একবার।

মারা গেছে শিলা।

আমি এখনও আমাদের অ্যাপার্টমেন্টেই আছি। চেষ্টা করছি ধোঁয়াশায় মিলিয়ে যাওয়া মুহূর্তগুলো আঁকড়ে ধরার। এসময় পিস্টিলোর কথায় ঘোর কেটে গেল আমার।

"আপনার উচিত ছিল আমাদের সহায়তা করা, উইল।"

যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলাম। "কী?"

"আপনি যদি সত্যি কথাটা বলতেন, তাহলে হয়তো তাকে বাঁচাতে পারতাম আমরা।"

কীভাবে ভ্যানে উঠলাম, মনে নেই।

স্টিয়ারিং হুইলের ওপর রাগ ঝারছে আর গালিবর্ষণ করে চলেছে স্কয়ার্স। এতটা উত্তেজিত আগে কখনো দেখিনি ওকে। আমার প্রতিক্রিয়া এর সম্পূর্ণ বিপরীত। যেন কেউ একজন টান দিয়ে আমার অনুভূতির প্লাগটা খুলে দিয়েছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছি। সত্যটা বারেবারে প্রত্যাঘাত হচ্ছে হৃদয়ের দ্বারে। কিন্তু দরজাটা খুব বেশিক্ষণ আর টিকবে না। শক্তি সঞ্চয় করে কিছুক্ষণের মধ্যেই চূড়ান্ত ছোবলটা হানবে বাস্তবতা।

"শুয়োরটাকে খুঁজে বের করবো আমরা," আবারো বললো স্কয়ার্স।

এ মুহূর্তে এসব স্বান্তনা বাণী এক কান দিয়ে ঢুকে আরেক কান দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর আমার অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের সামনে থেমে গেল ভ্যানটা। লাফিয়ে ভেতর থেকে বের হলো স্কয়ার্স।

"আমার সমস্যা হবে না," বললাম।

"তবুও ওপর পর্যন্ত যাই," বললো সে। "তোমাকে একটা জিনিস দেখাতেও হবে।"

আনমনে মাথা নাড়লাম।

অ্যাপার্টমেন্টে পা দিয়েই পকেট থেকে একটা বন্দুক বের করে আনলো স্কয়ার্স। সেটা হাতে নিয়ে সবগুলো ঘরে তল্লাশি চালালো কয়েকবার। কেউ নেই। আমার হাতে অস্ত্রটা তুলে দিল একটু পর।

"দরজা আটকে দাও। যদি কুকুরটা আসে, তাহলে গুলি চালিয়ে দেবে।"

"এটা লাগবে না," বললাম।

"সরাসরি গুলি চালিয়ে দেবে," আবারো বললো।

বন্দুকটার দিকেই তাকিয়ে থাকলাম।

"আমি থেকে যাবো?" জিজ্ঞেস করলো স্কয়ার্স।

"একা থাকাটাই বোধহয় ভালো হবে।"

"ঠিক আছে। কিন্তু কোন দরকার হলে সাথে সাথে ফোন দেবে।"

"আচ্ছা, ধন্যবাদ।"

আর কিছু না বলে চলে গেল ও। বন্দুকটা টেবিলে রেখে দিলাম। গোটা অ্যাপার্টমেন্টটায় চোখ বুলালাম একবার। এখন আর শিলার কোন অস্তিত্ব নেই এখানে। ওর শরীরের ঘ্রাণটাও মুছে গেছে। বুক ভরে শ্বাস নিতে পারছি না, ভেতরে বাতাস পাতলা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। ইচ্ছে করছে সবগুলো

দরজা জানালা বন্ধ করে দেই। তাহলে হয়তো ওর অস্তিত্বের কিছুটা হলেও সংরক্ষণ করতে পারবো।

আমার ভালোবাসার মানুষটাকে খুন করেছে কেউ।

দ্বিতিয়বারের মতো ?

না। জুলির মৃত্যুর পর এরকম লাগেনি। এবারের কষ্টটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। মনে হচ্ছে নিজের একটা অংশ জোর করে কেটে নেয়া হয়েছে। এবার আর সবকিছু ভুলে আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারবো না কখনোই। কিছু কিছু আঘাত সহ্য করে আবারো মাথা তুলে দাঁড়ানো যায়-যেমন জুলি আর কেইনের ব্যাপারটা। এটা ওরকম নয়। একসাথে অনেকগুলো অনুভূতি অস্থির হয়ে ছোটাছুটি করছে মনের ভেতরে। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রবল হচ্ছে হতাশা।

আর কখনো শিলাকে আমার পাশে পাবো না। কেউ আমার ভালোবাসার মানুষটাকে খুন করেছে।

দ্বিতীয় বাক্যটাই কাঁটার মতো বিঁধলো হৃদয়ের দেয়ালে। খুন করেছে। ওর অতীত সম্পর্কে ভাবলাম। কেমন পরিস্থিতির মোকাবেলা করে আজকে অবস্থানে এসেছিল, সেটা কল্পনা করাও সম্ভব নয় আমার পক্ষে। সেই অতীতেরই কেউ একজন আজ ছিনিয়ে নিয়েছে সবকিছু।

হতাশার পাশাপাশি রাগও জায়গা করে নিচ্ছে চিত্তে।

ডেস্কের সামনে গিয়ে নিচু হয়ে একদম নিচের ড্রয়ারটা খুললাম। ভেতরে হাত দিয়ে বের করে আনলাম ছোট বক্সটা। লম্বা একটা শ্বাস টেনে ঢাকনা খুললাম।

আঙটির হীরেটা ১.৩ ক্যারট, ভি-১ রেটিংয়ের। দুই সপ্তাহ আগে ফোরটি সেকেন্ড স্ট্রিটের ডায়মন্ড ডিস্ট্রিক্ট থেকে কিনেছিলাম। শুধুমাত্র মা জানতো এটার সম্পর্কে। ভেবেছিলাম সে বেঁচে থাকতে থাকতেই শিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেব। কিন্তু সেদিনের পর অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে তার। অপেক্ষার সিদ্ধান্ত নেই। তবুও একটা ভাবনা শান্তি দিত আমাকে, এমন একজনকে জীবনসঙ্গী হিসেবে পছন্দ করেছি, যাকে আমার মায়েরও পছন্দ। পরবর্তী কয়েকদিনের ব্যস্ততায় একরকম ভুলেই যাই আঙটিটার কথা।

শিলা আর আমি পরস্পরকে ভালোবাসতাম। দেখা যেত ওকে কোন একটা সাধারণ জায়গায় হাঁটু গেড়ে বসে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছি। কিন্তু তাতেই ওর চোখের কোণে জলের দেখা মিলতো, আমি নিশ্চিত। এরপর হ্যাঁ বলে শক্ত করে জড়িয়ে ধরতো আমাকে। বিয়ের পর সম্পর্কটা আলাদা মর্যাদা পেতো। সারাজীবনের জন্যে আমার হয়ে যেত ও।

কিন্তু কেউ একজন সেই সুন্দর সম্ভাবনাটা তছনছ করে দিয়েছে।

সত্যকে প্রত্যাখান করতে থাকা হৃদয়ের দেয়ালটায় ফাটল ধরতে শুরু করেছে। আমার প্রতিটা রক্তবিন্দুতে টের পাচ্ছি বেদনার অস্তিত্ব। ধপ করে

একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। বুকের এদকম গভীর থেকে বেরিয়ে এলো কান্না। সত্যিকারের হৃদয়চেরা কান্না।

জানি না কতক্ষণ কেঁদেছি। কিন্তু কিছুক্ষণ পর জোর করে কান্না থামালাম। ঠিক সেই মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিলাম অবর্ণনীয় কষ্টটার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করবো। কষ্ট চাপা দেয়া গেলেও ক্রোধ দমানো যায় না। আর আমার হৃদয়ে কষ্টের পাশাপাশি ক্রোধও জড়ো হচ্ছিল এতক্ষণ। সুযোগ খুঁজছিল বাইরে বেরিয়ে আসার।

সেই সুযোগ দিতে এখন আর কোন বাধা নেই।

বাইশ

বাবাকে চড়া গলায় কথা বলতে শুনতে দরজার কাছেই থেমে গেল কেটি মিলার।

"ওখানে কেন গিয়েছিলে তুমি?" চিৎকার করে জানতে চাইছে সে।

বাবা আর মা দুজনেই লিভিং রুমে। বাড়ির অন্যান্য ঘরগুলোর মতো এই ঘরটাও কৃত্রিমতায় ঠাসা বলে মনে হয় কেটির কাছে। চকচকে, দামী সব ফার্নিচার-কিন্তু আন্তরিকতার উষ্ণ ছোঁয়া খুঁজে পাওয়া যাবে না কোথাও। কোন ছবি নেই, ছুটি কাটাতে গিয়ে স্মৃতি হিসেবে কিনে আনা স্যুভনির নেই।

"আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে গিয়েছিলাম," ওর মা বললো।

"সেটারই বা কী দরকার ছিল?"

"আমার কাছে এটাই ঠিক মনে হচ্ছিল।"

"ঠিক? ওর ছেলে খুন করেছে আমাদের মেয়েকে।"

"হ্যাঁ, ওর ছেলে," স্বামীর কথার পুনরাবৃত্তি করলো লুসিল মিলার। "কিন্তু সে তো কিছু করেনি।"

"এসব ফালতু প্যাঁচাল বন্ধ করো। ছেলেটাকে তো বড় করেছে ওরাই।"

"সেটাতেও দোষের কিছু দেখছি না আমি।" পিঠ সোজা করে দাঁড়িয়ে কথা বলছে কেটির মা। "অনেক আগেই সত্যটা স্বীকার করে নিয়েছি। কিন্তু এতদিন কিছু বলিনি।"

ওয়ারেন মিলার পায়চারি শুরু করলো ঘরের মধ্যে। "আর গর্দভটা ধমকে তাড়িয়ে দিল তোমাকে?"

"ওর মানসিক অবস্থা ভালো নেই এখন।"

"আর কখনো যাবে না," আঙুল নেড়ে বললো কেটির বাবা। "শুনতে পাচ্ছো কী বলছি? ঐ মহিলা এতদিন ধরে জানতো তার ছেলে কোথায় আছে, আমি নিশ্চিত।"

"তো?"

দম আটকে যাবার যোগাড় হলো কেটির। চকিতে মাথা ফেরালো মি. মিলার। "কী?"

"সানি কেইনের মা। ওর জায়গায় আমরা থাকলেও একই কাজ করতাম, তাই না?"

"কী বলছো এসব?"

"ভালো করেই বুঝতে পারছো কী বলছি। যদি এমনটা হতো যে জুলি খুন করেছে কেইনকে। তখন আমরা কী করতাম?"

"তোমার কাণ্ডজ্ঞান কি ক্রেইনদের ওখানে পুঁতে রেখে এসেছো?"

"কাণ্ডজ্ঞান ঠিকই আছে আমার, ওয়ারেন। আমি আসলেও জানতে চাই। ওদের জায়গায় আমরা হলে কী করতাম? তুলে দিতাম পুলিশের হাতে জুলিকে? নাকি ওকে বাঁচানোর চেষ্টা করতাম?"

অন্য দিকে ঘুরতেই কেটির সাথে চোখাচোখি হলো মি. মিলারের। সবসময়ের মতো এবারো ছোট মেয়ের দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে দুড়দাড় করে ওপর তলার 'কম্পিউটার রুমে' চলে গেল সে। 'কম্পিউটার রুম' হচ্ছে মূলত জুলির পুরনো বেডরুম। জুলির মৃত্যুর পর টানা নয় বছর একই ভাবে রেখে দেয়া হয়েছিল ঘরটা। এরপর একদিন আগে থেকে কাউকে কিছু না জানিয়েই ওখানকার সবকিছু বাক্সে ভরে স্টোররুমে পাঠিয়ে দেয় মি. মিলার। পুরো ঘরটা নতুনভাবে সাদা রঙ করে আইকিয়া শো-রুম থেকে কম্পিউটার ডেস্ক কিনে আনে নিজেই। অনেকে ধরে নেয় যে শেষ পর্যন্ত হয়তো মেয়ে হারানোর শোক কাটিয়ে উঠতে পেরেছে সে। কিন্তু সত্যটা পুরোপুরি উল্টো। কাজটা যে জোর করে ইচ্ছের বিরুদ্ধে করেছে সে-তা ঠিকই বুঝতে পারে কেটি। এখন যেহেতু ঘরটায় জুলির দৃশ্যমান কোন চিহ্ন নেই, তার অনুপস্থিতি আরো নগ্ন হয়ে ধরা দেয় পরিবারের সবার কাছে। কেটি একবারের বেশি দুবার যায়নি সেখানে। চামড়ার চোখের চেয়ে মনের চোখ অনেক বেশি অনিশ্চিত। এমন কিছু দেখতে হতে পারে যার হয়তো কোন অস্তিত্বই নেই।

নীরবে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল লুসিল মিলার। তাকে অনুসরণ করলো কেটি। এঁটো বাসন ধুতে শুরু করলো ওর মা, পাশে দাঁড়িয়ে চুপচাপ দেখতে লাগলো সে। আজ অবধি বলার মতো এমন কিছু খুঁজে পায়নি ও, যেটায় কষ্টটা একটু কমবে তার। ওর সাথে জুলির ব্যাপারে কখনো আলোচনা করে না তারা। কখনো না। বাসায় যতবার খুনের ঘটনাটা সম্পর্কে কথা উঠেছে, ঠিক এভাবে চোখের পানি আর নীরবতায় শেষ হয়েছে।

"মা?"

"বাদ দাও, মা।"

তার আরো কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো কেটি। আগের চেয়ে জোরে জোরে বাসন ঘষছে এখন মিস মিলার। কেটি খেয়াল করলো যে ওর মায়ের চুলে

কালোর চেয়ে সাদার আধিপত্য বেশি এখন। দাঁড়ানোর ভঙ্গিটাও আগের চেয়ে বেশি কুঁজো মনে হচ্ছে। চেহারায় ফ্যাকাসে ভাব প্রবল।

"সাহায্য করতে?" জিজ্ঞেস করলো কেটি।

কোন জবাব দিল না ওর মা।

"তুমি জুলিকে পালাতে সাহায্য করতে?"

একবারের জন্যেও থামলো না লুসিল মিলার। কিছুক্ষণ পর ডিশওয়াসারে সব বাসন ঢুকিয়ে ডিটারজেন্ট ঢেলে দিলেন। সুইচে চাপ দিতেই যান্ত্রিক গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। কেটি অপেক্ষা করলো কিছুক্ষণ, কিন্তু কথা বললো না ওর মা।

নিঃশব্দে ওপরে উঠে এলো সে। কম্পিউটার রুম থেকে বাবার চাপা কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। দরজার কারণে শব্দের তীব্রতা কমে গেছে অনেকটাই, তবুও শোনা যাচ্ছে ভালোভাবেই। দরজায় হাত ছোঁয়ালো কেটি। মনে হচ্ছে যেন কম্পনটা অনুভব করতে পারছে। কান্নার সময় পুরো শরীর দুলে ওঠে মিস্টার মিলারের। "আর পারছি না, আর পারছি না," কোন এক অদৃশ্য শাস্তিদাতার উদ্দেশ্যে বলে চলেছে সে একটানা। কেটি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলো সেখানে, কিন্তু কান্নার আওয়াজ থামলো না।

কিছুক্ষণ পর নিজের ঘরে চলে এলো সে। একটা ব্যাগে প্রয়োজনীয় কাপড় চোপড় ভরে নিল।

এবারে শেষটা দেখেই ছাড়বে।

অন্ধকারে হাঁটু চেপে ধরে বসে আছি এখনও।

ঘড়িতে বারোটার কাছাকাছি। ফোন বেজে বেজে বন্ধ হয়ে গেল। টেলিফোন সেটটা একেবারেই বন্ধ করে দিতাম, কিন্তু মনের এক কোণে এখনও আশা জিইয়ে রেখেছি যে পিস্টিলো হয়তো ফোন করে বলবে গোটা ব্যাপারটা বড়সড় কোন ভুল বোঝাবুঝি। হ্যাঁ, মন মাঝে মাঝে এতটাই বোকার মতো আচরণ করতে বাধ্য করে আমাদের। বিশ্বাস করাতে চায় যে এরকম অবস্থা থেকেও উত্তরণ সম্ভব।

শুধু স্কয়ার্সের ফোন ধরেছিলাম একবার। কোভেন্যান্ট হাউজ শেল্টারের ছেলেমেয়েরা শিলার স্মৃতির উদ্দেশ্যে একটা মেমোরিয়াল সার্ভিসের আয়োজন করতে চায়। অনুমতি না দেয়ার কোন কারণ নেই।

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। ভ্যানটা আরেকবার চক্কর দিচ্ছে গোটা ব্লক। হ্যাঁ, স্কয়ার্স। পাহারা দিচ্ছে আমাকে। সারারাত ধরেই আশেপাশে ঘুরছে ভ্যানটা। জানতাম যে এমন কিছুই করবে ও। হয়তো আশায় আছে আসলেও কোন কালপ্রিটকে ধরে রাগ ঝারতে পারবে। স্কয়ার্সের নিজেকে ঘোস্টের সাথে তুলনা করার কথাটা নিয়ে ভাবলাম কিছুক্ষণ। তাকে এবং

শিলাকে অতীতের সব দুঃস্মৃতির সাথে লড়াই করে আজকের এই অবস্থানে আসতে হয়েছে।

আবারো ফোন বেজে উঠলো।

বিয়ারের বোতলটার দিকে তাকালাম। অনেকেই আছে কষ্ট দূর করতে অ্যালকোহলের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। আমি ওরকম নই, কিন্তু হলেই ভালো হতো। অনুভূতিগুলো ভোঁতা হয়ে যেত কিছুক্ষণের জন্যে। বরং এখন এর উল্টোটা হচ্ছে আমার সাথে। সবকিছু অনুভব করতে পারছি। হাত-পা অনেক ভারি ঠেকছে। যেন বিশাল কোন জলাশয়ের গভীর থেকে গভীরে ডুবে যাচ্ছি।

অ্যান্সারিং মেশিনে নিজের কণ্ঠ শুনতে পেলাম। তিনবার বিপ হবার পর মেসেজ রেকর্ড করে রাখতে অনুরোধ করছি। কিছুক্ষণ পর একটা আধ-পরিচিত কণ্ঠ কানে এলো।

"মি. ক্রেইন?"

সোজা হয়ে বসলাম তৎক্ষণাৎ। খুব কষ্ট করে কান্না চেপে আছেন লাইনের অন্য প্রান্তের মহিলা।

"আমি এডনা রজার্স বলছি। শিলার মা।"

সাথে সাথে হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলে নিলাম। "শুনছি," এটুকুই বলতে পারলাম কোনমতে।

জবাবে ওপাশ থেকে কান্নার শব্দ ভেসে এলো। আমিও কাঁদতে শুরু করলাম আবার।

"আমি কল্পনাও করতে পারিনি যে এতটা খারাপ লাগবে আমার," বেশ কিছুক্ষণ পর বললেন তিনি।

অন্ধকারে সামনে পেছনে দুলছি আমি।

"আমাদের সাথে ওর সম্পর্ক ছিল না বেশ অনেক বছর," লম্বা একটা নীরবতার পর বললেন মিস রজার্স। এতক্ষণ নিশ্চয়ই স্মৃতিচারণ করছিলেন মেয়েকে নিয়ে। "ওকে নিজের মেয়ে স্বীকার করাই বাদ দিয়েছিলাম। চিরতরে চলে গিয়েছিল আমাদের জীবন থেকে। আমি কিন্তু কখনো আশা করিনি যে এমনটা হোক। কিন্তু নিয়তি...চিফ যখন বাসায় এসে কথাটা জানালেন আমাদের, কোন প্রতিক্রিয়া দেখাইনি। একবার মাথা নেড়েছিলাম কেবল, জানেন?"

জানি না আমি। কিছু বললামও না। শুধু শুনছি।

"এরপর আমাকে এখানে নিয়ে এলো ওরা। নেব্রাস্কায়। আঙুলের ছাপ মিলে গেলেও পরিবারের একজন সদস্যের নাকি লাশ শনাক্ত করতে হয়। তাই নিল আর আমি বোস বিমানবন্দরে যাই গাড়ি চালিয়ে, এরপর উড়ে আসি এখানে। আমাদের একটা ছোট্ট স্টেশনে নিয়ে গিয়েছিল ওরা।

"টিভিতে সবসময় দেখেছি কাচে ঘেরা একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় আত্মীয়দের। এরপর স্ট্রেচারে করে নিয়ে আসা হয় লাশটা। কিন্তু ওখানে

একটা স্ট্রেচারও ছিল না। বদ্ধ একটা ঘরে, টেবিলের ওপর চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছিল আমার মেয়েটাকে। লোকটা যখন চাদরটা টান দেয়...চোদ্দ বছর পর প্রথম শিলার মুখটা দেখি।"

আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না তিনি। অঝোর ধারায় কাঁদলেন কিছুক্ষণ। এপাশে রিসিভার হাতে অপেক্ষা করছি আমি।

"মি. ক্রেইন।"

"দয়া করে আমাকে উইল বলে ডাকবেন।"

"ওকে ভালোবাসতেন আপনি, তাই না?"

"অনেক।"

"ওকে খুশি রেখেছিলেন।"

"সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করেছি," হীরার আঙটিটার কথা মনে হলো।

"আজকে লিংকনেই থাকবো। কালকে সকালে নিউ ইয়র্কে আসতে চাচ্ছি।"

"ভালো হবে তাহলে," তাকে মেমোরিয়াল সার্ভিসটার কথা বললাম।

"অনুষ্ঠানের পর কি আমরা কথা বলতে পারি?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"অবশ্যই।"

"কিছু ব্যাপার জানতে হবে আমার," বললেন মিসেস রজার্স। "আপনারও কিছু কথা জানা দরকার, হয়তো ভালো লাগবে না শুনতে–কিন্তু আমাকে বলতেই হবে।"

"বুঝতে পারছি না আসলে..."

"কালকে দেখা হবে, উইল। তখন বিস্তারিত বলবো।"

সেই রাতে আরেকজন এলো আমার বাড়িতে।

একটার দিকে কলিংবেলের শব্দ পেলাম। ধরেই নিয়েছি যে স্কয়ার্স। ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগোলাম। এসময় ঘোস্টের কথা মনে হলো। টেবিলে রাখা বন্দুকটার দিকে তাকালাম।

আবারো বেল বেজে উঠলো।

মাথা ঝাঁকালাম। না, এখনও এতটা খারাপ দশা হয়নি আমার। দরজার সামনে গিয়ে পিপহোলে চোখ রাখলাম। স্কয়ার্স বা ঘোস্ট, কাউকেই দেখলাম না।

আমার বাবা দাঁড়িয়ে আছে বাইরে।

দরজা খুললাম। কিছুক্ষণ এমন ভঙ্গিতে একে ওপরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম যেন অনেক দূর থেকে দেখছি। হাঁপাচ্ছে বাবা। রক্তবর্ণ চোখ দুটো ফুলে আছে। দাঁড়িয়েই থাকলাম আমি। ভেতরের সবকিছু গুঁড়িয়ে যাচ্ছে যেন। মাথা নেড়ে দুহাত বাড়িয়ে আমাকে ডাকলো বাবা। শক্ত করে চেপে ধরলাম তাকে। তার উলের সোয়েটারটা ভেজা ঠেকছে গালে। কাঁদতে শুরু করলাম। পরম স্নেহে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে সে। দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি নেই আমার, তবুও পড়ে গেলাম না। বাবা শক্ত করে ধরে রেখেছে আমাকে।

তেইশ

লাস ভেগাস

জুয়ার দানে মর্টির ভাগ্য আজকে ভালো যাচ্ছে। টানা আটবার জিতেছে। আর এতবার জিতলে যা হয়, খেলার নেশা পুরোপুরি পেয়ে বসেছে। জুয়া সবচেয়ে মোহিনী নারীর আকর্ষণকেও হার মানায়। বার বার তাকে নিজের করে পেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু প্রথমে ধরা দেয় না, তবুও হাল না ছেড়ে তার পিছু ছুটে চলে সবাই। প্রত্যাখানের কষ্ট তখন কোন কষ্টই মনে হয় না। এক সময় যখন সে পাল্টা হাসি দেয়, উষ্ণ হেসে এগিয়ে আসে–খুব ভালো লাগে। তখনকার অনুভূতির সাথে কিছুর তুলনা চলে না

ওর জেতা চিপগুলো এগিয়ে দিল টেবিলের ডিলার। ক্যাসিনো নিয়ে অনেকে অনেক কথাই বলে। এখানে নাকি কাউকে জিততে দেয়া হয় না। যতসব বুজরুকি! কাউকে না কাউকে তো জিততেই হবে! তবে বিজয়ীর সংখ্যা কম হতেই পারে। ভাগ্যের খেলায় খুব বেশি জয়ী হতে পারে না কেউ।

মর্টির খেলার প্রিয় জায়গা হচ্ছে লাস ভেগাস। কোন ছোট্ট শহরের স্বল্প পরিসরে বানানো ডামি লাস ভেগাস নয়, একদম আসল লাস ভেগাস। আরো নির্দিষ্ট করে বললে ডাউনটাউন লাস ভেগাস। আসল জুয়া খেলা তো হয় এখানে। আশপাশে কোন মেকি চাকচিক্য নেই, স্বল্পবসনা বারমেইডের আনাগোণা নেই। এখানে যারা আসে তাদের অনেকেরই পকেটে থাকে সেদিন সন্ধ্যাবেলায় পাওয়া বেতনের চেক। আবার অনেকে রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হবার চাইতে এখানে সময় কাটানোই পছন্দ করে বেশি। বাসায় ফিরে গেলে হয়তো বন্দি হতে হবে সেই একঘেয়ে জীবনে। ভাঙা সোফা, ভাঙা ট্রেইলার, স্ত্রীর ঘৃণাভরা চোখ–কি দরকার এসব সহ্য করার?

মর্টির এখানে নিয়মিত আসার পেছনে তাড়না হিসেবে কাজ কেবলমাত্র একটা ব্যাপার। আশা। অন্যান্য সব জুয়াড়ীদের মতোই ক্ষীণ হলেও তার মনে আশা কাজ করে যে বড় একটা দানই পারে তার জীবনকে বদলে দিতে। ভেতরে ভেতরে সে এটাও জানে যে আশাটা বাস্তবে রূপ নেয়ার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তবুও, এই হতাশার চক্র মেনে নিয়েই জুয়ার টেবিলে বসে তারা।

টেবিলের ডিলার বদলে গেল। পেছনে হেলান দিয়ে বসে নিজের জেতা চিপগুলোর দিকে চোখ পড়তেই পুরনো একটা ভাবনায় ছেয়ে উঠলো মন। লিয়াকে বড্ড মিস করে সে। মাঝে মাঝে সকাল বেলা ঘুম ভাঙার পর পাশ ফিরে যখন দেখে সে নেই, তীব্র বেদনা শেলের মতো বেঁধে বুকে। বিছানা ছেড়ে নামতেই ইচ্ছে করে না। আশপাশে বসে থাকা গম্ভীর দর্শন লোকগুলোর ওপর নজর বুলালো একবার। তরুণ বয়সে এদের দেখলে পরিহাসের ছাপ ফুটতো তার চেহারায়, কিন্তু এখন সে নিজেই তাদের অংশ হয়ে গেছে। মর্টির বাবা-মা পোল্যান্ড থেকে অনেক কিছু বিসর্জন দিয়ে পা রেখেছিল এই স্বপ্নের দেশে। এখানে আসার পরেও তাদের কষ্ট কমেনি। তবে তাকে ভালো একটা জীবন দেয়ার আশায় বিনা বাক্যব্যয়ে সেসব কষ্ট সয়ে গেছে তারা। এর ফলও ভোগ করতে হয়েছে তাড়াতাড়ি কবরস্থানের টিকেট কাটার মাধ্যমে। তাদের পরিশ্রম অবশ্য বিফলে যায়নি, মর্টি ডাক্তারি পাশ করেছে। তাই মনে শান্তি নিয়েই চিরনিদ্রায় চোখ বুজেছেন।

পরের দানেই হেরে গেল মর্টি। এর পরেরটাও। ধুর। এই টাকাটা দরকার ছিল তার। লোকানি, এক স্থানীয় বুকি পাওনা টাকার জন্যে বেশ বিরক্ত করছে কয়েকদিন ধরে। প্রতিবারই তথ্যের বিনিময়ে তার মুখ বন্ধ করে এসেছে মর্টি। কিছুদিন আগে চিকিৎসা নিতে আসা আহত মহিলা আর সেই আততায়ী সম্পর্কেও লোকানিকে জানিয়েছে সে। প্রথমদিকে অতটা পাত্তা না দিলেও কথাটা ছড়িয়ে পড়ার পর হঠাৎই কারা যেন বিস্তারিত জানতে চায় এই বিষয়ে।

মর্টি তাদের সব খুলে বলে। একটা তথ্য বাদে।

গাড়ির পেছনের সিটে আগে থেকে বসে প্যাসেঞ্জারের ব্যাপারে মুখ খোলেনি। যতটা অসহায়ই হোক না কেন তার অবস্থা, এই কাজটা সে কখনো করবে না।

দুটো এইস এখন তার হাতে। সেগুলো ভাগ করে দিল। এসময় একটা লোক এসে বসল তার পাশে। তবে মর্টির মনোযোগ বোর্ডের দিকে। তা সত্ত্বেও কেন যেন ভয় লাগছে, কারণটা ঠিক বোঝাতে পারবে না।

ডিলারের দুটো কার্ড হচ্ছে কিং আর জ্যাক।

"সুযোগ থাকতে থাকতে কেটে পড়ো, মর্টি।" তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো পাশের লোকটা।

ধীরে মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালো মর্টি। আরেকটু হলেই পড়ে যাচ্ছিলো চেয়ার ছেড়ে। এরকম ধবধবে সাদা কাউকে আগে দেখেনি সে। নীল শিরাগুলো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। মুখে একটা শীতল হাসি।

"চিপগুলো ভাঙিয়ে টাকা নিয়ে নাও," ফিসফিসে কণ্ঠে আবারো বললো লোকটা।

মর্টির খুব কষ্ট হচ্ছে স্বাভাবিক অভিব্যক্তি ধরে রাখতে। "কে আপনি? কী চান?"

"তোমার সাথে কথা আছে আমার," লোকটা বললো।

"কোন ব্যাপারে?"

"তোমার ওখানে সেবা নিতে আসা এক বিশেষ রোগির ব্যাপারে।"

ঢোক গিললো মর্টি। কেন যে লোকানির কাছে মুখ খুলেছিল সেদিন। এর থেকে অন্য কিছু বানিয়ে বললেও হতো। "যা জানি সব তো বলেছি।"

"আসলেই বলেছো, মর্টি?" ঘাড় একদিকে কাত করে জিজ্ঞেস করলো লোকটা।

শীতল চাহনিটা ওর ভেতরের সবকিছু দেখে নিচ্ছে যেন। জমে গেল একদম।

"আমার মনে হয় না সব বলেছো মর্টি, কিছু একটা লুকিয়েছো।"

চুপ করে থাকলো মর্টি।

"সেদিন গাড়িতে আর কে ছিল?"

চিপগুলোর দিকে তাকিয়ে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করলো সে। "কার কথা বলছেন?"

"অন্য একজন তো সেখানে ছিল, তাই না মর্টি?"

"আরে এখান থেকে যান তো, আমি ব্যস্ত। আজকে খেলায় আমার ভাগ্য ভালো মনে হচ্ছে।"

সিট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ঝাঁকালো ঘোস্ট। "না, মর্টি," বলে তার কাঁধে হাত রাখলো সে। "তোমার ভাগ্য মোটেও ভালো নয় আজকে।"

চব্বিশ

মেমোরিয়াল সার্ভিসটার আয়োজন করা হয়েছে কোভেন্যান্ট হাউজের অডিটরিয়ামে।

আমার ডান পাশে বসে আছে স্কয়ার্স এবং ওয়ান্ডা আর বাম দিকে বাবা। বাবার একহাত আমার চেয়ারের পেছনে, মাঝে মাঝে কাঁধে হাত রাখছেন স্বান্তনা দেয়ার ভঙ্গিতে। ঘরে বেশিরভাগই কিশোর-কিশোরী। কিছুক্ষণ পরপর তাদের একজন এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে, ছলছল চোখে শিলাকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করে কিছুক্ষণ। প্রায় দুঘণ্টা চললো অনুষ্ঠানটা। টেরেল নামের চৌদ্দ বছর বয়সী একটা ছেলে ট্রাম্পেট বাজিয়ে নিজের লেখা একটা গান গাইলো শিলার স্মৃতির উদ্দেশ্যে। করুণ সুরটা চোখ আর্দ্র করে তুললো উপস্থিত সবার। বাইপোলার ডিজঅর্ডারে ভোগা লিসা সবার সামনে গিয়ে বললো যে প্রেগন্যান্ট থাকাকালীন সময়ে শিলার সাথে বলা কথাগুলো কখনো ভুলবে না সে। স্যামি একটা মজার স্মৃতির কথা বলা সবাইকে হাসালো। ষোলো বছর বয়সী জিম বললো যে শিলা না থাকলে সে হয়তো আজকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকার মতো অবস্থানে থাকতো না। আত্মহত্যার দোড়গোড়া থেকে তাকে ফিরিয়ে এনেছিল শিলা।

বেদনাকে কিছুক্ষণ ছুটি দিয়ে সবার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলাম আমি। এই বাচ্চাগুলোর মনোযোগটুকু প্রাপ্য। গোটা শেল্টারটাই আমার জন্যে অনেক বড় কিছু। যখনই আমরা আমাদের কাজের ব্যাপারে সন্দিহান থাকি বা মনে হয় যে কী হবে এসব করে–এদের কথা ভাবলেই সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়। হ্যাঁ, অন্যান্য বাচ্চাদের মতো আপনাকে দেখলেই দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে না এরা, তবে নিজের মতো করে ঠিকই ভালোবাসবে। এখানে না এলে এদের বেশির ভাগেরই পরিণতি হলো জেলখানা বা কবরস্থান। তাই হাল ছাড়লে চলবে না। এরকম আরো শত শত ছেলে-মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের

আশেপাশে। একটু ভালোবাসাই পারে তাদের জীবনের মানচিত্র বদলে দিতে। তবে সেই ভালোবাসাটা হতে হবে নিঃশর্ত। আর শিলা সেটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতো। সেজন্যেই তো আজ এত শুভানুধ্যায়ী তার।

শিলার মা শেল্টারে পৌঁছুলেন অনুষ্ঠান শুরুর প্রায় বিশ মিনিট পরে (আশা করছি তাকে চিনতে ভুল হয়নি আমার)। বেশ লম্বা তিনি। চেহারায় সার্বক্ষণিক একটা ক্লান্ত ভাব। একবার চোখাচোখি হলো আমাদের। তার চোখের প্রশ্নের জবাবে একবার মাথা নাড়লাম। পুরো সার্ভিস চলাকালীন সময়ে কয়েকবার আড়চোখে দেখলাম তাকে। স্থির হয়ে বসে মেয়ের সম্পর্কে কথা শুনছেন। চোখেমুখে প্রশান্তি।

শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্যে সবাই যখন আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম, একজনকে দেখে অবাক হলাম ভীষণ। পরিচিত চেহারাগুলোর মাঝে মুখে স্কার্ফ জড়ানো এক নারী দাঁড়িয়ে আছে।

তানিয়া।

লুইস কাস্টম্যানের 'দেখাশোনা' বাদ দিয়ে এখানে এসেছে সে! চেহারা দেখা না যাওয়ার কারণে নিশ্চিতভাবে বলার কোন উপায় নেই, তবে উচ্চতা একই, শারীরিক গঠনেও মিল আছে। আগে কথাটা মাথায় আসেনি আমার, কিন্তু শিলা এবং সে হয়তো একজন আরেকজনকে চিনতো।

বসে পড়লাম আমরা।

সবার শেষে কথা বললো স্কয়ার্স। বরাবরই ভালো বক্তা সে। শিলাকে নিয়ে এমনভাবে কথা বললো যে ওকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক আঙ্গিকে আবিষ্কার করলো সবাই। শেল্টারে ওর প্রথম দিন সম্পর্কেও স্মৃতিচারণ করলো। তবে স্কয়ার্সের বক্তব্যের বেশিরভাগ জুড়ে ছিল আমাদের প্রেম।

ভেতরটা খালি খালি লাগছে ভীষণ। এই বেদনাটা জীবনভর বয়ে বেড়াতে হবে আমাকে। যত যা-ই করি না কেন, এই অনুভূতিটা বদলাবে না। কারণ সত্য কখনো বদলায় না। শিলার পরিবর্তে হতাশা জীবনের প্রতিটা পদক্ষেপে সঙ্গ দেবে আমাকে।

অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর প্রথমে কেউই বুঝে উঠতে পারলো না যে আসলে কী করা উচিত তখন। সবাই উসখুস করছে এমন সময়ে আবারো ট্রাম্পেট বাজানো শুরু করলো টেরেলো। শোকসভা শেষ। আরেকবার আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করলো অনেকেই। কতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম, তা বলতে পারবো না। সবার প্রতি কৃতজ্ঞ আমি, কিন্তু তাদের এই স্মৃতিচারণের কারণে শিলার অনুপস্থিতি আরো তীব্রভাবে অনুভব করছি। অনুভূতিগুলোকে জোর করে বিদায় দিলাম কিছুক্ষণের জন্যে। তা নাহলে এই কষ্ট সহ্য করা সম্ভব হবে না।

তানিয়াকে কোথাও দেখলাম না। কোন এক সুযোগে কেটে পড়েছে সে।

কেউ একজন বলে উঠল যে ক্যাফেটেরিয়াতে সামান্য কিছু খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে। ধীরে ধীরে সেদিকে এগিয়ে গেল জটলাটা। পার্স হাতে নিয়ে এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছেন শিলার মা। দেখে মনে হচ্ছে যেন তার ভেতর থেকে জীবনীশক্তি সব শুষে নেয়া হয়েছে।

"তুমিই উইল?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"হ্যাঁ।"

"আমি এডনা রজার্স।"

স্বাভাবিক কোন পরিস্থিতিতে সাক্ষাৎ হলে গালে চুমু খেতাম বা নিদেনপক্ষে করমর্দন করতাম আমরা। কিন্তু এখন ভগ্নহৃদয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলাম দুজনই।

"কোথাও বসে কথা বলা যাবে?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

তাকে সাথে করে করিডোর পার হয়ে সিঁড়ির দিকে এগোলাম। স্কয়ার্স বুঝতে পেরেছে যে নির্জনে কথা বলতে চাচ্ছি আমরা, তাই অন্যদের সেখান থেকে সরিয়ে নিল সে। নতুন মেডিক্যাল ফ্যাসিলিটি, সাইকিয়াট্রিস্টদের অফিস, ড্রাগ ট্রিটমেন্ট রুম পার করে এলাম আমরা। গর্ভবতী অবস্থাতেও অনেকে আসে এখানে, তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করা হয়। অনেকের আবার নানারকম মানসিক সমস্যা থাকে, তাদেরও চিকিৎসার ব্যবস্থা করি আমরা। তবে এখানে আগত বেশিরভাগেরই মূল সমস্যা একই–মাদকাসক্তি। সেটার জন্যেও দক্ষ লোক আছে আমাদের।

একটা খালি ডর্ম রুমের ভেতরে ঢুকে দরজা আটকে দিলাম। "অনুষ্ঠানটা খুব সুন্দর ছিল," ঘরে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন মিসেস রজার্স।

জবাবে মাথা নাড়লাম আমি।

"শিলা যে এরকম বদলে গেছে–" এটুকু বলে মাথা ঝাঁকালেন তিনি। "কোন ধারণাই ছিল না আমার। যদি দেখতে পেতাম একবার। ফোন করতে পারতো..."

এর জবাবে কিছু বলা সম্ভব নয়।

"বেঁচে থাকা অবস্থায় শিলাকে নিয়ে গর্ব করার কোন সুযোগ পাইনি কোনদিন," ব্যাগ থেকে একটা রুমাল বের করে বললেন এডনা রজার্স। দ্রুত একবার নাক মুছে সেটা ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখলেন। "আমি জানি, শুনতে হয়তো খারাপ শোনাচ্ছে। এলিমেন্টারি স্কুল পর্যন্ত সবকিছু ঠিকই ছিল। কিন্তু এর পরে কখন যেন–," বলে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে কাঁধ ঝাঁকালেন একবার। "বদলে গেল। সবার সাথে খারাপ ব্যবহার করতো, মেজাজ খিটখিটে থাকতো সবসময়। কোন বন্ধু ছিল না ওর। ছেলেদের মোহও কেটে যায়। স্কুলকে ঘৃণা করতে শুরু করে। ম্যাসন জায়গাটাকে ঘৃণা করতে শুরু করে। এরপর একদিন হঠাৎ করে লাপাত্তা হয়ে গেল বাসা থেকে।"

এমন ভঙ্গিতে তাকালেন আমার দিকে যেন কিছু একটা শোনার আশা করছেন।

"তার সাথে আর কখনো দেখা হয়নি?" জিজ্ঞেস করলাম।

"কখনো না।"

"ঠিক বুঝতে পারছি না," বললাম। "কেন?"

"কেন পালিয়ে গিয়েছিল?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার হয়তো মনে হচ্ছে বড় কোন ঘটনার পর নিরুদ্দেশ হয়ে যায় ও, তাই না?" আগের চেয়ে জোরে কথা বলছেন এখন মিসেস রজার্স। "ভেবেছো ওর বাবা নিশ্চয়ই নির্যাতন করতো কিংবা আমি অত্যাচার চালাতাম। এরকমটা ভাবাই স্বাভাবিক। সবকিছু ঘটার পেছনেই কোন না কোন কারণ থাকে। কিন্তু শিলার ক্ষেত্রে ওরকম কিছুই ঘটেনি। আমি আর ওর বাবা হয়তো একদম আদর্শ বাবা-মা নই, কিন্তু আমাদের কোন দোষ নেই এই ক্ষেত্রে।"

দেখা হবার পর থেকেই আমাকে তুমি করে বলছেন মিসেস রজার্স। সেটাই স্বাভাবিক ঠেকছে ওনার কণ্ঠে। "আসলে আমি ওরকম কিছু বোঝাতে–"

"তুমি কী বোঝাতে চেয়েছো আমি জানি।"

চোখ রীতিমতো জ্বলছে এখন তার। আমার দিকে তাকাতেও যেন কষ্ট হচ্ছে। বিষয় পরিবর্তনের জন্যে বললাম, "শিলা কি ফোন দিত আপনাকে?"

"হ্যাঁ।"

"কতদিন পরপর ফোন দিত?"

"শেষবার ফোন দিয়েছিল তিন বছর আগে," বলে উৎসুক চোখে আমার দিকে তাকালেন মিস রজার্স।

"কোথায় ছিল তখন ও?" জিজ্ঞেস করলাম।

"সেটা বলেনি।"

"তাহলে কী বলেছিল?"

এবারে জবাব দিতে সময় নিলেন মিসেস রজার্স। কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলেন ঘরের ভেতরে। বাঁকা হয়ে থাকা বালিশটা সোজা করে রাখলেন, চাদর টানটান করলেন। "প্রতি ছয় মাসে একবার কি দুবার বাসায় ফোন দিত শিলা। বেশিরভাগ সময়ই নেশার ঘোরে থাকতো তখন। দুজনই কান্নাকাটি করতাম কিছুক্ষণ। খুব খারাপ খারাপ কথা বলতো আমাকে।"

"কীরকম?"

মাথা ঝাঁকালেন "কপালে ট্যাটু যে লোকটার, সে বোধহয় তোমার বন্ধু? শিলা আর তোমাকে নিয়ে যা যা বললো, সব সত্যি? এখানেই পরিচয় হয় তোমাদের?"

"হ্যাঁ।"

এবারে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকালেন তিনি। ঠোঁটে হাসির আভাস। "তাহলে বলা যায়," কেমন যেন অন্যরকম শোনাচ্ছে তার কণ্ঠস্বর, "বসের সাথে নিয়মিত বিছানায় যেত সে।"

এখন আমার সামনে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তার সাথে কিছুক্ষণ আগের এডনা রজার্সের আকাশ-পাতাল তফাৎ।

"ও একজন স্বেচ্ছাসেবী," বললাম।

"ওহ্। তা তোমার জন্যে স্বেচ্ছায় কী কী করেছে সে, উইল?"

মাথায় রক্ত উঠে গেল।

"এখনও ওকে নিরীহ মনে হচ্ছে?"

"আপনি বরং এখন আসুন।"

"সত্যটা শুনতে ভালো লাগছে না, নাকি? তোমার ধারণা আমি খুবই খারাপ একজন মা? নিজের সন্তানকে সাহায্য করার কোন চেষ্টাই করিনি?"

"আমি এ ব্যাপারে মন্তব্য করার কেউ নই।"

"শিলা মেয়ে হিসেবে জঘন্য ছিল। মিথ্যে বলতো সব ব্যাপারে। চুরি করতো-"

"আমি বোধহয় বুঝতে পারছি এখন," বললাম।

"কী বুঝতে পারছো?"

"কেন বাসা ছেড়ে পালিয়েছিল ও।"

বিস্ময় ভর করলো মিসেস রজার্সের চেহারায়। "তুমি চিনতে ভুল করেছো ওকে।"

"শিলা সম্পর্কে একটু আগেও সবাই কী বললো, শোনেননি?"

"শুনেছি," কিছুটা নরম হলো তার কণ্ঠস্বর। "কিন্তু এই শিলা আমার কাছে অচেনা। নিজের এই দিকটা আমাকে কখনো দেখায়নি। যাকে আমি চিনতাম-"

"ওর সম্পর্কে আর একটাও বাজে কথা শুনতে চাই না আমি।"

চুপ করে গেলেন এডনা রজার্স। চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ বসে থাকলেন বিছানার ধারে। "সেজন্যে এখানে আসিনি আমি।"

"তাহলে কেন এসেছেন?"

"ভালো কিছু শুনতে এসেছিলাম।"

"তা তো শুনেছেন," বললাম।

"হ্যাঁ," মাথে নেড়ে বললেন শিলার মা।

"তাহলে আর কী চাইছেন?"

উঠে দাঁড়ালেন এডনা রজার্স। আমার দিকে এগিয়ে এলেন কয়েক পা। এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না আমার, তবুও নড়লাম না। "কার্লির ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।"

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তিনি যখন আর কিছু বললেন না, মুখ খুলতে বাধ্য হলাম, "এই নামটা ফোনেও বলেছিলেন আপনি।"

"হ্যাঁ।"

"কার্লি নামের কাউকে আগেও কখনো চিনতাম না আমি, এখনও চিনি না।"

আবারো সেই নিষ্ঠুর হাসিটা ফিরে এসেছে তার চেহারায়। "তুমি তো আমাকে মিথ্যে বলছো না?"

"না," কড়া স্বরে বললাম।

"শিলা কখনো কার্লি নামটা উল্লেখ করেনি?"

"না।"

"তুমি নিশ্চিত?"

"হ্যাঁ, কার্লি কে?"

"কার্লি হচ্ছে শিলার মেয়ে।"

বাকশক্তি হারিয়ে ফেললাম কিছুক্ষণের জন্যে। আমার এই প্রতিক্রিয়া উপভোগ করছেন মিসেস রজার্স।

"তোমার প্রিয় 'স্বেচ্ছাসেবী' কখনো বলেনি বোধহয় তার যে একটা মেয়ে আছে, তাই না?"

চুপ করে থাকলাম।

"কার্লির বয়স এখন বারো বছর। না, আমি জানি না ওর বাবা কে। শিলাও বোধহয় জানে না।"

"বুঝতে পারছি না আমি," বললাম।

পার্স থেকে একটা ছবি বের করে আমাকে দিলেন তিনি। হাসপাতালে সদ্যভূমিষ্ঠ এক বাচ্চার ছবি। কম্বলে আগাগোড়া মোড়ানো, চোখ ফোটেনি। ছবিটার উল্টোপাশে লেখা 'কার্লি'। নিচে জন্মতারিখ।

মাথা রীতিমতো ঘুরছে এখন আমার।

"শেষবার শিলা আমাকে ফোন দিয়েছিল কার্লির নবম জন্মদিনে," বললেন মিসেস রজার্স। "সেদিন কার্লির সাথেও কথা হয় আমার।"

"তো এখন সে কোথায় আছে?"

"জানি না," এডনা রজার্স বললেন। "সেজন্যেই এখানে এসেছি আমি, উইল। নাতনীকে খুঁজে বের করতে।"

পঁচিশ

আমার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে দেখি কেটি মিলার দরজার পাশে একটা ব্যাগ নিয়ে বসে আছে।

আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালো। "ফোন দিয়েছিলাম, কিন্তু..."

কিছু না বলে মাথা নাড়লাম কেবল।

"মা-বাবা যা শুরু করেছে–" বাক্যটা শেষ করলো না কেটি। "ঐ বাসায় আর এক দিনও থাকা সম্ভব না আমার পক্ষে। তাই ভাবছিলাম তোমার কাউচে যদি থাকা যায় ক'টা দিন।"

"আমার অবস্থা আসলে এখন ভালো না, কেটি।"

"ওহ।"

দরজায় চাবি ঢুকালাম।

"আমি সবকিছু নিয়ে ভাবছিলাম, মানে জুলির খুন হওয়ার ব্যাপারে। হঠাৎ মনে হলো তোমাদের সম্পর্কটা ভেঙে যাবার পর ওর জীবন সম্পর্কে কতটা জানতে তুমি?"

অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকলাম দুজন। "এখন এসব নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।"

এতক্ষণে আমার দিকে ভালো করে তাকালো কেটি। "কেন? কী হয়েছে?"

"আমার খুব কাছের একজন মারা গেছে।"

"মানে তোমার মা?"

মাথা ঝাঁকালাম। "না, অন্য কেউ। খুন করা হয়েছে তাকে।"

চমকে উঠে ব্যাগটা হাত থেকে ফেলে দিল কেটি। "কতটা কাছের?"

"অনেক।"

"গার্লফ্রেন্ড?"

"হ্যাঁ।"

"ভালোবাসতে ওকে?"

"প্রচণ্ড।"

এবার জবাবে কিছু বললো না ও।

"কী?" জিজ্ঞেস করলাম।

"তুমি যাদের ভালোবাসো তাদের সবসময় কেউ না কেউ খুন করে, উইল।"

এই চিন্তাটা আমার মাথাতেও এসেছে। তবে অন্য কারো মুখে শুনতে স্বাভাবিকভাবেই ভালো লাগলো না। "জুলি আর আমি ও খুন হবার এক বছর আগেই ব্রেক-আপ করে ফেলেছিলাম।"

"ভুলে গিয়েছিলে ওকে?"

এই ব্যাপারে আবারো আলোচনা করার কোন ইচ্ছে নেই আমার। "আমাদের ব্রেক-আপের পর জুলির জীবন নিয়ে যেন কী বলছিলে?"

আর দশজন টিনেজারদের মতোই এমন ভঙ্গিতে কাউচে বসলো কেটি যেন শরীরে হাড্ডি-গুড্ডির কোন বালাই নেই। আজকে ওর পরনে একটা ছেঁড়া জিন্স আর টপস। টপসটা বড্ড বেশি আঁটসাঁট। ব্রা হিসেবেও চালিয়ে দেয়া যাবে। চুলগুলো পনিটেইল স্টাইলে বাঁধা। অবাধ্য কয়েকটা চুল অবশ্য মুখের ওপরে এসে পড়েছে।

"আমি ভাবছিলাম," একবার আড়মোড়া ভেঙে বললো কেটি, "যদি কেইন ওকে না মেরে থাকে, তাহলে অন্য কেউ নিশ্চয়ই মেরেছে, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"তাই ঐ সময়ে ওর জীবন সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়া শুরু করি। মানে পুরনো বন্ধুদের ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করি যে তাদের কিছু মনে আছে কিনা।"

"কী জানতে পারলে?"

"বেশ খারাপ অবস্থায় ছিল জুলি।"

মনোযোগ ধরে রাখতে বেগ পেতে হচ্ছে আমাকে। "কীরকম?"

এবারে উঠে বসলো সে। "তখনকার ব্যাপারে তোমার কতদূর মনে আছে?"

"হেভারটনে শেষ বর্ষের ছাত্রী ছিল ও।"

"না।"

"না?"

"ভার্সিটি ছেড়ে দিয়েছিল ও।"

অবাক হলাম কথাটা শুনে। "তুমি নিশ্চিত?"

"চতুর্থ বর্ষের শুরুতে," বলে কেটি। "তুমি ওকে শেষ কবে দেখেছিলে, উইল?"

কিছুক্ষণ ভাবলাম। জুলি মারা যাবার আগে বেশ লম্বা একটা সময় দেখা হয়নি আমাদের। সেটাই বললাম।

"তাহলে ব্রেক-আপ কবে করেছিলে?"

মাথা ঝাঁকালাম। "ফোনেই কাজ সেরেছিল ও।"

"আসলেই?"

"হ্যাঁ।"

যেন হতাশ হয়েছে শুনে এমন ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো কেটি। "তুমিও মেনে নিলে?"

"ওর সাথে দেখা করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু রাজি হয়নি।"

চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আমার অজুহাতটা পছন্দ হলো না ওর। সত্যি কথা বললে, আসলেও খোঁড়া একটা অজুহাত। কেন হেভারটনে গিয়ে ওর সাথে সামনাসামনি দেখা করিনি আমি?

"আমার মনে হয়," কেটি বললো। "খুব খারাপ কিছুর সাথে জড়িয়ে গিয়েছিল জুলি।"

"মানে?"

"ঠিক জানি না। হয়তো বেশি বেশি বলে ফেলছি। তেমন কিছু মনেও নেই তখনকার সম্পর্কে, কিন্তু সেই সময় ও বেশ হাসিখুশিই ছিল। এর আগে অবশ্য লম্বা একটা সময় মুখ ফুলিয়ে রাখতো। ধীরে ধীরে ঠিক হচ্ছিল বোধহয়।"

কলিংবেল বেজে উঠলো এই সময়। উঠতে একদমই ইচ্ছে করছে না। কেটি বুঝলো ব্যাপারটা, কাউচ থেকে নেমে দরজা খুলতে চলে গেল সে।

ফলের ঝুড়ি নিয়ে একজন ডেলিভ্যারি ম্যান এসেছে। কেটি তার কাছ থেকে ঝুড়িটা নিল। টেবিলের ওপর রেখে বললো, "সাথে একটা কার্ডও আছে।"

"খোলো কার্ডটা।"

"কোভেন্যান্ট হাউজের ছেলেমেয়েরা পাঠিয়েছে। অনেকজনের নাম এখানে।"

লম্বা একটা সময় ধরে কার্ডটার দিকে তাকিয়ে রইলো কেটি।

"কোন সমস্যা?"

কার্ডটা আবারো পড়লো কেটি। এরপর আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "শিলা রজার্স?"

"হ্যাঁ।

"তোমার গার্লফ্রেন্ডের নাম শিলা রজার্স?"

"হ্যাঁ, কেন?"

মাথা ঝাঁকিয়ে কার্ডটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখলো কেটি।

"কী হয়েছে?"

"কিছু না," এবারে আগের চেয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললো কেটি। "বাদ দাও।"

ফোন বাজলো এসময়। ধরলাম না। রিং হয়ে হয়ে একসময় অ্যান্সারিং মেশিন চালু হলো। স্পিকারে স্কয়ার্সের কণ্ঠ শুনতে পেলাম "ফোন ধরো।"

ধরলাম।

"তোমার কি শিলার মায়ের কথা বিশ্বাস হয়? বাচ্চার ব্যাপারে যা বলছিল?" কোন প্রকার ভূমিকা ছাড়াই কথাটা বললো স্কয়ার্স।

"হ্যাঁ।"

"তাহলে এখন কী করবে এ ব্যাপারে?"

কথাটা শোনার পর থেকে আমিও সেটা নিয়েই ভাবছি। "কী ঘটতে পারে সে সম্পর্কে আন্দাজ করতে পারি।"

"বলো শুনি।"

"হয়তো শিলার এভাবে হঠাৎ চলে যাওয়ার সাথে ওর মেয়ের কোন সম্পর্ক ছিল।"

"কীভাবে?"

"হয়তো কার্লিকে খুঁজে বের করে নিজের কাছে নিয়ে আসতে চাইছিলো সে। অথবা কার্লি কোন বিপদে পড়েছিল। জানি না। যে কোন কিছু হতে পারে।"

"একটু হলেও যুক্তি আছে তোমার কথায়।"

"নিজেরা তদন্ত করে আমরা হয়তো কার্লিকে খুঁজে বের করতে পারি।"

"আমাদের অবস্থাও শিলার মতো হতে পারে সেক্ষেত্রে।"

"সেই ঝুঁকি তো আছেই।"

ইতস্তত করছে স্কয়ার্স। কেটির দিকে তাকিয়ে দেখি একমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে সে।

"তুমি তাহলে আরো খোঁজ খবর করতে চাও?" স্কয়ার্স বললো।

"হ্যাঁ, কিন্তু তোমাকে কোন বিপদে ফেলতে চাই না।"

"মানে এখন বলবে যে চাইলে যে কোন মুহূর্তে পিছু হটতে পারি আমি?"

"হ্যাঁ। আর তুমিও এখন বলবে যে এর শেষ না দেখে ছাড়বে না।"

"এসব আদিখ্যেতা বাদ দাও। র‍্যাকেল ফোন দিয়েছিল আমাকে। শিলার সেদিনকার কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছু একটা জানতে পেরেছে সে। আজকে রাতে বেরুবে?"

"এসে পড়ো," বললাম।

ছাব্বিশ

পুরনো শত্রুকে সিকিউরিটি মনিটরে দেখতে পাচ্ছে ফিলিপ ম্যাকগুয়ান। রিসিপশনিস্ট ফোন দিল ঠিক তখনই।

"মি. ম্যাকগুয়ান?"

"ভেতরে পাঠিয়ে দাও," বললো সে।

"জি, মি. ম্যাকগুয়ান। তার সাথে-"

"দুজনকেই।"

উঠে দাঁড়ালো ম্যাকগুয়ান। তার অফিসের পাশেই হাডসন নদী। গ্রীষ্মের মাসগুলোতে সন্ধ্যাবেলা প্রায়ই বড় বড় প্রমোদতরী দেখা যায় সেখানে। বেশ কয়েকটা ইয়টের মাস্তুল তো তার জানালার সমান উঁচু। কিন্তু আজকে একটা ছোট ডিঙ্গি নৌকাও নেই। সিকিউরিটি মনিটরে জো পিস্টিলো আর তার নারী সঙ্গীর গতিবিধির ওপর নজর রাখতে অবশ্য ভুললো না।

নিরাপত্তার পেছনে বেশ ভালো টাকা খরচ করেছে ম্যাকগুয়ান। এই বিল্ডিংটার আনাচে-কানাচে প্রায় তিরাশিটার মতো ক্যামেরা লাগানো। তার ব্যক্তিগত লিফটে যারা প্রবেশ করে তাদের সম্ভাব্য সকল কোণ থেকে খুঁটিয়ে দেখা হয় ক্যামেরার সাহায্য। কেউ যেন হ্যাক করে ভুয়া ফুটেজ জুড়ে দিতে না পারে, সে ব্যবস্থাও নেয়া আছে। অনেকের কাছে ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি মনে হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘদিন এসব কাজের সাথে জড়িত কারো জন্যে এটা একদম স্বাভাবিক একটা ঘটনা।

তার শত্রুরা অবশ্য এখানে এসে অস্বস্তিবোধ করে না। হাজার হলেও, এটা ফিলিপ ম্যাকগুয়ানের অফিস। নিজ ডেরায় অনেকেই নিরাপত্তার ব্যাপারে ঢিল দেয়। ডেরায় ঢুকে মাফিয়া লাইনের কাউকে হত্যা করার সাহস হবে না কারো, এটাই হয়তো কাজ করে তাদের মাথায়। ম্যাকগুয়ানের মতে এটা বড় একটা ভুল। আততায়ীদের দল ঠিক এই ভুলটারই সুযোগ নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না।

ওপরের ড্রয়ার থেকে পুরনো একটা ছবি বের করলো ম্যাকগুয়ান। অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছে যে কখনো কোন ব্যক্তি বা পরিস্থিতিকে খাটো করে দেখা উচিত নয়। এটাও বুঝতে পেরেছে যে শত্রুপক্ষ যদি তাকে খাটো করে দেখে, তাহলেই বরং সুবিধা। ছবিতে তিনজন সতেরো বছর বয়সী ছেলেকে দেখা যাচ্ছে–কেন ক্রেইন, জন অ্যাসেল্টা ওরফে ঘোস্ট এবং ম্যাকগুয়ান। নিউ জার্সির মফস্বল শহর লিভিংস্টোনে বড় হয়েছে তারা। যদিও ম্যাকগুয়ানের বাসা ছিল শহরের অন্য প্রান্তে। হাইস্কুলে পরিচয় হয়েছিল তিনজনের। কিছুদিনের মধ্যেই সেই পরিচয় রূপ নেয় বন্ধুত্বে।

কেন ক্রেইন স্কুলের টেনিস তারকা, জন অ্যাসেল্টা পাগলাটে রেসলার আর আকর্ষণীয় চেহারার ম্যাকগুয়ান ছাত্র পরিষদের সভাপতি। ছবিটার দিকে লম্বা একটা সময় তাকিয়ে থাকলো ম্যাকগুয়ান। সাধারণ কেউ ছবিটা দেখে কিছু বুঝতে পারবে না। মনে হবে হাইস্কুলের সবচেয়ে জনপ্রিয় তিন ছাত্রের ছবি। কিছুদিন আগে কলম্বিন হাইস্কুল শুটিংয়ে মারা যায় অনেক ছাত্রছাত্রী। পুরো দেশ কেঁপে উঠেছিল সেই ঘটনায়। গণমাধ্যম কর্মীদের ছোটাছুটি বিস্ময়ের সাথে খেয়াল করেছে ম্যাকগুয়ান। প্রত্যেকেই গোলাগুলির ঘটনার পেছনে সাধারণ সব অজুহাত খুঁজতে ব্যস্ত। যে ছাত্ররা গুলি চালিয়েছে তাদের ছোটবেলা থেকেই অন্যেরা জ্বালাতন করতো, সবকিছুতে অবহেলিত ছিল তারা, বাড়িতে বাবা বা মায়ের শাসন বলতে কিছু ছিল না, সারাদিন ভিডিও গেইমস নিয়ে পড়ে থাকতো–এসব। কিন্তু ম্যাকগুয়ান জানে যে এগুলো সবই খোঁড়া যুক্তি। আর কিছুদিন আগে হলে আততায়ীদের নামের তালিকায় ওদের নামও থাকতে পারতো। কারণ সত্যটা হচ্ছে, কেউ যতই বড়লোক হোক না কেন কিংবা তার পরিবারের লোকেরা যতই ভালো হোক না কেন–এসবে শেষমেষ কিছুই যায় আসে না।

যারা এসব কাজ করে, তাদের মানসিকতা সম্পূর্ণ আলাদা। সাধারণ কেউ বুঝবে না।

অফিসের দরজা খুলে গেল এসময়। জোসেফ পিস্টিলো তার কম বয়সী সহকারীকে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলো কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছাড়াই। হেসে ছবিটা আগের জায়গায় রেখে দিল ম্যাকগুয়ান।

"আরে, হাবার্ট দেখি," পিস্টিলোর উদ্দেশ্যে বললো সে। "এখনও স্বপ্নে আমাকে তাড়া করে বেড়াও নাকি?"

"হ্যাঁ," পিস্টিলো জবাব দিল একই সুরে। "তাড়া করে জেলেও ভরি।"

পিস্টিলোর সাথে আসা নারী এফবিআই এজেন্টের দিকে নজর দিল ম্যাকগুয়ান "তোমার সাথে সবসময় একজন সুন্দরী সহকর্মী থাকে কেন বলোতো?"

"ও স্পেশাল এজেন্ট ক্লডিয়া ফিশার।"

"পরিচিত হয়ে ভালো লাগলো," ম্যাকগুয়ান বললো। "বসুন, প্লিজ।"

"দাঁড়িয়ে থাকতেই ভালো লাগবে আমাদের।"

তোমার-যা-ইচ্ছা ভঙ্গিতে একবার কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজের আসনে বসে পড়লো ম্যাকগুয়ান। "কী করতে পারি তোমাদের জন্যে?"

"তোমার সময় ভালো যাচ্ছে না ম্যাকগুয়ান।"

"তাই?"

"হ্যাঁ।"

"আর সেজন্যে ভালো বন্ধুর মতো সাহায্য করতে ছুটে এসেছো?"

নাক দিয়ে অস্ফুট শব্দ করলো পিস্টিলো। "যতদিন ধরে তোমার পেছনে লেগে আছি, ততদিন কোন মেয়েরও পিছু নেইনি।"

"সেটা জানি আমি, কিন্তু আশা করতে দোষ কী বলো? পরেরবার সাথে গোলাপ ফুল নিয়ে আসতে পারো।"

"প্রায়ই ভাবি যে কেউ যদি তোমাকে জ্যান্ত খেয়ে ফেলতো, তাহলে দৃশ্যটা দেখার জন্যে পপকর্ন নিয়ে বসতাম আমি," ডেস্কে দুই হাত রেখে বললো পিস্টিলো। "কিন্তু এর চেয়ে বড় শান্তি পাবো তোমাকে জেলে পঁচতে দেখলে।"

"এভাবে কথা বললে ওকে খুব সেক্সি লাগে, তাই না?" ক্লডিয়া ফিশারের দিকে তাকিয়ে বললো ম্যাকগুয়ান।

"বলো দেখি কাকে খুঁজে পেয়েছি আমরা, ম্যাকগুয়ান?"

"আমি কীভাবে বলবো?"

"ফ্রেড ট্যানার।"

"কে?"

হাসি ফুটলো পিস্টিলোর চেহারায়। "সাধু সেজো না। তোমার হয়ে কাজ করতো গুন্ডাটা।"

"ও বোধহয় আমার নিরাপত্তাকর্মীদের দলে ছিল।"

"ওকে খুঁজে পেয়েছি আমরা।"

"হারিয়ে গিয়েছিল এটা তো জানতাম না।"

"তাই নাকি?"

"আমি তো ভেবেছিলাম সে ছুটি কাটাচ্ছে কোথাও, এজেন্ট পিস্টিলো।"

"চিরদিনের জন্যে ছুটি কাটাতে গেছে এবারে। ওর মৃতদেহ প্যাসায়েক নদী থেকে উদ্ধার করেছি আমরা।"

"এসব কারণেই পরিবেশ দূষণ বাড়ছে," ম্যাকগুয়ান ভ্রু কুঁচকে বললো।

"মাথায় দুবার গুলি করা হয়েছে তাকে। এছাড়াও পিটার অ্যাপল নামের আরেকজনের মৃতদেহ পেয়েছি আমরা। আর্মির প্রাক্তন স্নাইপার। শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে তাকে।"

"আহহা।"

শ্বাসরোধে একজন মারা গেছে। ঘোস্ট নিশ্চয়ই হতাশ ব্যাপারটা নিয়ে। দুজনকেই সেভাবে হত্যা করতে পারলে খুশি হতো সে।

"তাহলে নিউ মেক্সিকোর দুজন সহ চারে গিয়ে দাঁড়ালো সংখ্যাটা।"

"তোমার মতো ক্ষুরধার মস্তিষ্কের একজন এজেন্টকে কিনা এত কম বেতন দেয় ওরা?"

"কিছু বলার আছে তোমার এ ব্যাপারে?"

"নিশ্চয়ই," ম্যাকগুয়ান বললো। "ওদের সবাইকে আমিই খুন করেছি। খুশি?"

সামনের দিকে ঝুঁকে এলো পিস্টিলো। মাত্র কয়েক ইঞ্চি ব্যবধান এখন তাদের মধ্যে। "তোমার হাতে আর খুব বেশি সময় নেই ম্যাকগুয়ান।"

"লাঞ্চে রসুন খেয়েছো নাকি? দুর্গন্ধ।"

"শিলা রজার্স যে মারা গেছে সেটা জানো?"

"কে?"

সোজা হয়ে দাঁড়ালো পিস্টিলো। "ওহ, তাকেও নিশ্চয়ই চেনো না তুমি। তোমার হয়ে কাজ করতো না কখনো।"

"আমার জন্যে অনেকে কাজ করে। একজন ব্যবসায়ীর জন্যে সেটাই স্বাভাবিক।"

"চলো," ফিশারের দিকে তাকিয়ে বললো পিস্টিলো।

"এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছো?"

"অনেকদিন ধরে এর অপেক্ষায় ছিলাম আমি," পিস্টিলো বললো। "লোকে বলে না? প্রতিশোধ নিষ্ঠুর একটা শব্দ। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সেটা খুবই মধুর একটা শব্দে পরিণত হয়।"

"এটা কি মুখস্থ করে এসেছিলে বলার জন্যে?"

আবারো হাসলো পিস্টিলো। "সময় থাকতে থাকতে মুক্ত বাতাসের স্বাদ নিয়ে নাও, ম্যাকগুয়ান।"

তারা চলে গেলে ঠায় দশ মিনিট একই ভঙ্গিতে বসে রইলো ম্যাকগুয়ান। আজকে পিস্টিলোর এভাবে আসার উদ্দেশ্যটা কি ছিল? একদম সহজ উত্তর। তাকে ভয় দেখানো। আবারো তাকে খাটো করে দেখছে শত্রু। তিন নম্বর লাইনের ফোনটা টেনে নিল সে। ইতস্তত করছে। তার ব্যক্তিগত লাইন এটা। চাইলেও কেউ আড়ি পাততে পারবে না।

কী হতে পারে সেটা নিয়ে ভাবলো কিছুক্ষণ। শেষ পর্যন্ত ঝুঁকিটা নেবে বলেই সিদ্ধান্ত নিল।

একবার রিং হতেই ফোন ধরলো ঘোস্ট।

"কোথায় তুমি?"

"ভেগাস থেকে প্লেনে উঠলাম একটু আগে।"

"কিছু জেনেছো?"

"হ্যাঁ।"

"বিস্তারিত বলো।"

"গাড়িতে তৃতীয় একজন ছিল তাদের সাথে," ঘোস্ট বললো।

চেয়ারটায় নড়েচড়ে বসলো ম্যাকগুয়ান। "কে?"

"ছোট একটা মেয়ে," জবাব দিল ঘোস্ট। "এগারো কী বারো বছর বয়সী।"

সাতাশ

স্কয়ার্স ভ্যান নিয়ে আসলে সাথে সাথে প্যাসেঞ্জার সিটে উঠে পড়লাম আমি। একটু ঝুঁকে আমার গালে একটা চুমু খেলো কেটি। পাঁজরে স্কয়ার্সের গুঁতো টের পেলাম পাশ থেকে।

"আমি তো ভেবেছিলাম আজকে রাতটা আমার কাউচে কাটাবে তুমি," কেটির উদ্দেশ্যে বললাম।

সেই ফলের ঝুড়িটা আসার পর থেকেই অন্যমনস্ক লাগছে কেটিকে। "কালকে আসবো আবার," বললো সে।

"তোমার মনে কী চলছে সে ব্যাপারে কিছু খুলে বলবে না?"

"একটু খোঁজখবর করতে হবে আমাকে," পকেটে হাত দিয়ে বললো মেয়েটা। কালকে থেকে *খোঁজখবর* করেই যাচ্ছে সে।

"কার ব্যাপারে খোঁজখবর?"

জবাবে কেবল মাথা ঝাঁকালো। আমিও আর জোর করলাম না। হাসিমুখে আমাদের সাইডওয়াক থেকে বিদায় জানালো কেটি।

"আর ও হচ্ছে...?" স্কয়ার্স জিজ্ঞেস করলো কিছুদূর এগিয়ে।

ডাউনটাউনের দিকে যেতে যেতে সব খুলে বললাম ওকে। আজকে ব্যাগ ভর্তি করে কম্বল আর স্যান্ডউইচ নিয়ে এসেছে স্কয়ার্স। বাচ্চাদের দেয়ার জন্যে। '*এই মেয়েটাকে কোথাও দেখেছো?*'-পদ্ধতির মতো '*কম্বল আর স্যান্ডউইচ*' পদ্ধতিটাও বেশ কাজে দেয়। আর আমাদের সাথে আসতে রাজি না হলেও এগুলো বাচ্চাগুলোর আসলেও কাজে আসে।

স্কয়ার্সকে অনেকবার এগুলো নিয়ে কাজে নামতে দেখেছি আমি। প্রথম রাতে সাধারণত কোন সাহায্য গ্রহণ করতে রাজি হয় না বাচ্চাদের কেউ। অনেকে তো খারাপ ব্যবহারও করে বসে। এসবে কিছু মনে করলে কাজ করা যায় না। স্কয়ার্সের মতে, কাউকে যদি বারবার সাহায্য করার আশা দেয়া হয়,

এক সময় না এক সময় সে কোমল হতে বাধ্য। নিঃশর্তভাবে করতে হবে কাজগুলো।

কয়েক রাত পরে দেখা যাবে ঠিকই স্যান্ডউইচটা নিয়েছে প্রথম দিন খারাপ ব্যবহার করা ছেলে বা মেয়েটা। এর পরদিন হয়তো কম্বলটা নিয়ে হাসিমুখে কথা বলবে। একসময় নিজে থেকেই ভ্যানটা খুঁজে বের করবে।

পেছন থেকে একটা স্যান্ডউইচ তুলে নিলাম। "আজকে কাজ করবে আবারো?"

সানগ্লাসের ওপর দিয়ে আমার দিকে তাকালো স্কয়ার্স। "না," বললো শুকনো স্বরে, "সব একা খাবো।"

আরো কিছুদূর এগিয়ে গেলাম আমরা।

"এভাবে ওকে কতদিন এড়িয়ে চলবে, স্কয়ার্স?"

রেডিও চালু করে দিল স্কয়ার্স। কার্লি সাইমনের *'ইউ আর সো ভেইন'* বাজছে। গাইতে শুরু করলো সে। কিছুক্ষণ পর বললো, "এই গানটার কথা মনে আছে?"

মাথা নাড়লাম। "হ্যাঁ।"

"এটা নাকি ওয়ারেন বেটিকে নিয়ে লেখা। সত্যি?"

"জানি না," বললাম।

ভ্যান চলছে তো চলছেই।

"তোমাকে একটা প্রশ্ন করি, উইল," রাস্তার দিকে তাকিয়ে কথাটা বললো ও।

অপেক্ষা করতে লাগলাম আমি।

"শিলার যে একটা বাচ্চা আছে, এটা শুনে কতটা অবাক হয়েছিলে?"

"অনেক।"

"আর যদি এটা জানতে পারো যে আমারো একটা বাচ্চা আছে, তাহলে কতটা অবাক হবে?"

ওর দিকে তাকালাম।

"তুমি পরিস্থিতিটা বুঝতে পারছো না, উইল।"

"বুঝতেই তো চাই।"

"আপাতত একটা ব্যাপারে মনোযোগ দেই আমরা।"

সন্ধ্যা তুলনায় যানবাহন বেশ কম আজকে। কার্লি সাইমনের গানটা শুনতে খারাপ লাগছে না। গায়ক তার প্রেয়সীর কাছে অনুরোধ করছে তাদের সম্পর্কটাকে আরেকটু সময় দেয়ার জন্যে। খুবই সাধারণ একটা অনুরোধ, কিন্তু বড্ড মায়া।

শহরের অলিগলি পেরিয়ে হারলেম রিভার ড্রাইভে গিয়ে উঠলো ভ্যান। ওভারপাসের নিচে কয়েকটা ছেলেমেয়েকে দেখে গাড়ি থামালো স্কয়ার্স।

"কাজের বিরতি," বললো সে।

"আমি আসবো?"

মাথা ঝাঁকিয়ে না করে দিল স্কয়ার্স। "খুব বেশি সময় লাগবে না।"

"স্যান্ডউইচগুলা ব্যবহার করে ফেলবে?"

ছেলেমেয়েগুলোকে কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করে মাথা ঝাঁকালো স্কয়ার্স। "নাহ, এর থেকেও ভালো জিনিস আছে আমার কাছে।"

"কী?"

"ফোন কার্ড," আমার হাতে একটা দিয়ে বললো সে। "এক টেলিকম কোম্পানির কাছ থেকে অনেকগুলো যোগাড় করেছি। ওরা কার্ড পেলে সব ভুলে যায়।"

কথার সত্যতা টের পেলাম কিছুক্ষণের মধ্যে। স্কয়ার্সের হাতে কার্ডগুলো দেখামাত্র ওর চারপাশে ভিড় করলো সবাই। এই ভিড়ের মধ্যে থেকে প্রত্যেককে আলাদা করার চেষ্টা করছি আমি। স্বপ্নগুলোর মতো, মানুষগুলোর ধরনও তো আলাদা। শারীরিক নির্যাতন তাও কাটিয়ে ওঠা যায়, কিন্তু মানসিক নির্যাতন তার চেয়ে বড্ড বেশি ভয়ঙ্কর। একবার যদি ক্ষতটা বেশি গভীরে পৌঁছায়, আরোগ্য লাভ একদম অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

শিলাকে সেরকম অবস্থায় পৌঁছুনোর আগেই বাঁচানো হয়েছিল।

এরপর কেউ একজন খুন করে তাকে।

মাথা ঝাঁকিয়ে চিন্তাটা দূর করার চেষ্টা করলাম। এখন এসবের সময় নয়। বেদনা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে সামনে এগোতে হবে।

অন্তত শিলার জন্যে হলেও তেমনটা করতে হবে আমাকে। জানি সিনেমার লাইনের মতো শোনাচ্ছে।

কয়েক মিনিট পর ফিরে এলো স্কয়ার্স। "যাওয়া যাক তাহলে।"

"আমরা কোথায় যাচ্ছি, সেটা কিন্তু এখনও বলোনি।"

"১২৮ নম্বর সড়ক এবং সেকেন্ড এভিনিউয়ের মোড়ে।"

"আর ওখানে কী আছে?"

"সম্ভাব্য সূত্র," হাসি ফুটলো ওর মুখে।

বেশ কয়েকটা আবাসিক এলাকা ছেড়ে আসলাম আমরা। দুই ব্লক দূর থেকেই স্পষ্ট চিনতে পারছি র‍্যাকেলকে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে জলজ্যান্ত একটা আগ্নেয়গিরি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার মাঝখানে। তার পাশে গাড়ি থামালো স্কয়ার্স।

"কী?" আমাদের ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলো সে।

"সবুজ ড্রেসের সাথে গোলাপী পাম্পস?"

"এটাকে বলে কোরাল আর এটা টর্কুই," বরাবরের মতোই রঙের ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধিতে সাহায্য করলো র‍্যাকেল। "সাথে এই মেরুন পার্সের কারণে আরো ভালো লাগছে দেখতে।"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে 'গোল্ডবার্গ ফার্মেসি' লেখা সাইনবোর্ডটার সামনে গাড়ি পার্ক করলো স্কয়ার্স। আমি নামতেই এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলো র‍্যাকেল। "শুনে খুবই খারাপ লেগেছে," ফিসফিসিয়ে বললো।

জবাবে কোনমতে মাথা নাড়লাম একবার।

আমাকে ছেড়ে দিল ও কিছুক্ষণ পর। বুক ভরে শ্বাস টানতে সক্ষম হলাম আবারো। তবে র‍্যাকেলের চোখে পানি দেখে থমকে গেলাম। চোখের পানির কারণে কাজল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তবে সেদিকে খেয়াল নেই তার।

"এইব আর স্যাডি ভেতরে," নিজেকে কিছুটা সামলে বললো র‍্যাকেল। "অপেক্ষা করছে তোমাদের জন্যে।"

মাথা নেড়ে ফার্মাসির দিকে হাঁটা শুরু করলো স্কয়ার্স। পিছু নিলাম আমি। দরজায় ধাক্কা দেয়ার সাথে সাথে একটা ঘন্টা বেজে উঠলো। ভেতরে চেরি এয়ার ফ্রেশনারের গন্ধ। দোকানের সবগুলো শেলফ নানারকম জিনিসপত্রে ভর্তি। ব্যান্ডেজ, শ্যাম্পু থেকে শুরু করে ডিওড্র্যান্ট, কাশির ঔষধ সবকিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখা। গোছগাছের বালাই নেই।

কাউন্টারে বসে আছেন বয়স্ক একজন লোক, গলায় রিডিং গ্লাস ঝুলছে তার। পরনে সাদা শার্ট আর সোয়েটার। ইংরেজ ব্যারিস্টারদের পরচুলার মতো সাদা চুল মাথায়। ভ্রু দুটো একটু বেশিই ঘন। এতে খানিকটা প্যাঁচার মতো লাগছে তাকে।

"স্কয়ার্স! তুমি!"

একজনকে আরেকজনকে জড়িয়ে ধরলো তারা। স্কয়ার্সের পিঠে বেশ কয়েকবার চাপড় মারলো বয়স্ক লোকটা। "আজকে ভালো লাগছে তোমাকে দেখতে।"

"আপনাকেও, এইব।"

"স্যাডি," চিল্লিয়ে উঠলো এইব। "দেখো কে এসেছে।"

"কে?"

"ইয়োগা করে যে লোকটা। ট্যাটু আছে।"

"কপালে ট্যাটু?"

"হ্যাঁ।"

"এমন কেউ আছে, যাকে তুমি চেনো না?" মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম।

জবাবে কাঁধ ঝাঁকালো স্কয়ার্স। "বিখ্যাত মানুষদের জীবনটাই আলাদা।"

ফার্মাসির পেছন থেকে এসময় বেরিয়ে এলেন এক বয়স্কা মহিলা। "তুমি দেখি শুকিয়ে গেছো?" স্কয়ার্সের দিকে তাকিয়ে বললো সে। র‍্যাকেলের হিলটা পরার পরেও পাঁচ ফুট বলা যাবে না তাকে।

"রাখো তো এসব কথা," এইব বললো।

"তুমি চুপ করো। খাওয়া দাওয়া করো না নাকি?"

"করি তো," স্কয়ার্স বললো।

"হাড্ডি গোণা যাবে।"

"স্যাডি, ছাড়বে ওকে?"

"আবারো কথা বলছো?" বলে উদ্দেশ্যেপূর্ণ একটা হাসি দিল স্যাডি। "কুগেল আছে, খাবে নাকি?"

"পরে দেখা যাবে, ধন্যবাদ।"

"একটা বক্সে ভরে দেই।"

"সেটাই ভালো হবে বরং," বলে আমাকে দেখাল স্কয়ার্স। "ও আমার বন্ধু, উইল ক্রেইন।"

করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো দুজন। "এ বেচারার গার্লফ্রেন্ড?"

"হ্যাঁ।"

আমাকে আপাদমস্তক দেখলো দুই বুড়োবুড়ি।

"বুঝতে পারছি না," অবশেষে বললো এইব।

"ওকে ভরসা করতে পারেন," স্কয়ার্স বললো।

"হয়তো পারি, হয়তো পারি না। আমাদের কাজ অনেকটাই গীর্জার পাদ্রীদের মতো। মুখ খোলা যাবে না। সেটা ভালো করেই জানো তুমি। আর সে বিশেষ করে বলে দিয়েছিল যাতে কাউকে কিছু না বলি।"

"জানি আমি।"

"যদি বলেই দেই সবকিছু, তাহলে আমাদের আর মূল্য থাকলো কী?"

"বুঝতে পারছি।"

"মুখ খোলার কারণে মারাও যেতে পারি।"

"কেউ জানবে না। আমি কথা দিচ্ছি।"

একবার চোখাচোখি হলো বয়স্ক দম্পতির। "র‍্যাকেল," এইব বললো। "ছেলেটা ভালো। নাকি মেয়ে ও? জানি না, বিভ্রান্ত হয়ে যাই মাঝে মাঝে।"

স্কয়ার্স এগিয়ে গেল তাদের দিকে। "আপনাদের সাহায্য দরকার আমাদের।"

"মেয়েটা খুব সুন্দর ছিল, তাই না এইব?" স্বামীর হাতে হাত রেখে বললো স্যাডি। দৃশ্যটা এতটাই আন্তরিক যে মনে হলো চোখ ফিরিয়ে নেই।

"আর খুব ভালো," যোগ করলো এইব। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আমার দিকে তাকালো সে। দরজা খোলার শব্দ কানে এলো এসময়। এলোমেলো চুলের এক কৃষ্ণাঙ্গ লোক ভেতরে প্রবেশ করেছে। "টিরিয়ন পাঠিয়েছে আমাকে।"

স্যাডি এগিয়ে গেলো তার দিকে। "আমাকে বলো কী লাগবে," বললো সে।

এখনও একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে এইব। স্কয়ার্সের দিকে ফিরলাম। কি হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না।

সানগ্লাস খুলে নিল স্কয়ার্স। "প্লিজ, এইব," বললো সে। "ব্যাপারটা জরুরী।"

"ঠিক আছে, ঠিক আছে," বলে একটা হাত উঁচু করলো এইব। "চেহারা এরকম করতে হবে না। আমার সাথে এসো," শেষ কথাটা আমার উদ্দেশ্যে বললো বয়স্ক ভদ্রলোক।

দোকানের পেছন দিকে হেঁটে গেলাম আমরা। কাউন্টার ফ্ল্যাপটা উঠিয়ে ওটার নিচ দিয়ে ঢুকে পড়লাম। ট্যাবলেট, বোতল, প্রেসক্রিপশনের স্তূপ চারপাশে। একটা দরজা খুললো এইব। সিঁড়ি বেয়ে বেইজমেন্টে পৌঁছে গেলাম।

"এখানেই ঘটে সবকিছু," ঘোষণার সুরে বললো এইব। টিমটিমে একটা বাতি জ্বলছে একপাশ থেকে।

একটা কম্পিউটার, প্রিন্টার আর ডিজিটাল ক্যামেরা চোখে পড়লো ক্ষীণ আলোয়। এগুলো ছাড়া আর কিছু নেই। এইব আর স্কয়ার্সের দিকে তাকালাম বিস্মিত চোখে।

"কেউ কি কিছু বলবে আমাকে?"

"আমাদের ব্যবসাটা একদম সাধারণ," এইব বললো। "কোন রেকর্ড রাখি না। পুলিশ যদি কম্পিউটারটা নিয়ে যায়, কিছুই পাবে না। সব তথ্য জমা হয় এখানে," বলে কপালে হাত দিয়ে দেখালো সে। "আর সেই তথ্যগুলো একটু একটু করে হারিয়ে যেতে শুরু করেছে। তাই না স্কয়ার্স?"

তার উদ্দেশ্যে মুচকি হাসলো স্কয়ার্স।

আমার বিভ্রান্তি টের পেলো এইব। "এখনও বুঝতে পারোনি?"

"না।"

"জাল পরিচয়পত্র," এইব বললো।

"ওহ্।"

"কম বয়সী ছেলেমেয়েরা যেসব আইডি কার্ড দেখিয়ে মদ কেনে, সেসবের কথা বলছি না কিন্তু।"

"বুঝতে পারছি।"

"কিছু জানো এসব ব্যাপারে?" নিচু স্বরে জানতে চাইলো এইব।

"বেশি কিছু না।"

"আমাদের কাছে এমন ব্যক্তিরা আসে, যারা পুরোপুরি উধাও হয়ে যেতে চায়। নতুন করে শুরু করতে চায় সবকিছু। কোন বিপদে পড়েছো? এক চুটকিতে উধাও করে দেব তোমাকে। যাদুকরদের মতো। আসলেও গা ঢাকা দিতে চাও? তাহলে ট্রাভেল এজেন্ট না, আমাকে দরকার হবে তোমার।"

"আচ্ছা," বললাম। "আর আপনার এই–" কী বলবো সেটা ভাবলাম কিছুক্ষণ। "সেবার দরকার হয় অনেকের?"

"সংখ্যাটা শুনলে অবাক হয়ে যাবে। তবে বড়সড় কোন অপরাধী আসে না সচরাচর। প্যারোল বা জামিনে থাকা আসামী। কিংবা গ্রেফতার এড়াতে চায় যারা। অনেক অবৈধ অভিবাসীদেরও সাহায্য করেছি আমরা। এই দেশে

থেকে যেতে চায়, তাই তাদের এখানকার নাগরিক বানিয়ে দেই," বলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো সে। "আর মাঝে মাঝে ভালো কেউও এসে পড়ে।"

"যেমন শিলা," বললাম।

"ঠিক ধরেছো। জানতে চাও কীভাবে কাজ করি আমরা?"

মুখ খুলতে গিয়েও থেমে গেলাম। নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই দিতে শুরু করেছে এইব। "টিভিতে বড্ড জটিল করে দেখায় সবকিছু, তাই না? মৃত কারো খোঁজ বের করে তার জন্মসনদ আর অন্যান্য কাগজপত্র জাল করা। ভীষণ জটিল।"

"এভাবে হয় না সবকিছু?"

"না," কম্পিউটারটা চালু করে দিয়েছে সে ইতিমধ্যে। "প্রথমত, সেটায় অনেক বেশি সময় লাগে। দ্বিতীয়ত, ইন্টারনেটের জনপ্রিয়তার কারণে, মৃত ব্যক্তির খবর খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ফলে জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বরটাও বাতিল করে দেয়া হয়। নাহলে তো আমি মৃত কারো পরিচয় পত্র সহজেই ব্যবহার করতে পারতাম, তাই না? বিশেষ করে যারা কম বয়সে মারা গেছে। বুঝতে পারছো?"

"মনে হয়," বললাম। "তাহলে কারো জন্যে নকল পরিচয় তৈরি করেন কীভাবে?"

"আসলে, তৈরি করি না। আসল পরিচয়ই ব্যবহার করি," দরাজ হাসি ফুটলো তার মুখে।

"বুঝলাম না।"

স্কয়ার্সের দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকালো এইব। "তুমি না বলেছিলে ও তোমার লাইনের লোক?"

"এখন অফিসে বসে।"

"আচ্ছা, যাইহোক," আবারো আমার দিকে ফিরলো এইব গোল্ডবার্গ। "ওপরে একজন এসেছে, দেখেছো না?"

"হ্যাঁ।"

"তাকে দেখে বেকার মনে হচ্ছিলো। খুব সম্ভবত উদ্বাস্তু।"

"সেটা বলতে পারবো না।"

"এসব কূটনৈতিক কথা বোলো না। দেখে তো ভবঘুরে ধরনের মনে হচ্ছিলো তাকে, নাকি?"

"হ্যাঁ বোধহয়।"

"কিন্তু তারও আলাদা একটা পরিচয় আছে। নাম আছে। এই দেশেই জন্ম। আর-" বলে নাটকীয় ভঙ্গিতে হাত নাড়ল এইব, "আছে একটা জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর। হয়তো কোন ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই, থাকলেও মেয়াদ উত্তীর্ণ। তাতে কিছু যায়-আসে না। যতক্ষণ তার পরিচয় পত্র আছে, ততক্ষণ তার অস্তিত্বও আছে। বুঝেছো?"

"বুঝেছি।"

"তো ধরা যাক তার এখন টাকা দরকার। কী জন্যে? সেটা আমি জানি না, জানতেও চাই না। কিন্তু টাকা তো তার আসলেই দরকার। আর দরকার নেই কোন জিনিসটার? পরিচয়। এমন তো না তার দশটা ক্রেডিট কার্ড আছে কিংবা খুব শীঘ্রই জমি কিনতে যাচ্ছে। তাই তার নামটা তখন এই কম্পিউটারে টাইপ করি আমরা। দেখি তার বিরুদ্ধে কোন মামলা আছে কিনা। যদি না থাকে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই থাকে না, তখন তার পরিচিয়টা কিনে নেই। ধরা যাক তার নাম জন স্মিথ। আর তুমি, উইল, ছদ্মনামে কোন হোটেলে থাকতে চাইছো।"

সবকিছু মোটামুটি পরিষ্কার এখন। "আপনি আমার কাছে তার জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর বিক্রি করবেন। ফলে তখন থেকে আমার নাম হবে জন স্মিথ।"

"এই তো বুঝে গেছো," তুড়ি মেরে বললো এইব।

"কিন্তু আমাদের চেহারা যদি একই রকম না হয়?"

"জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বরের সাথে শারীরিক বর্ণনার কোন যোগসাজশ নেই। একবার নতুন পরিচয় পত্রটা পাওয়ার পর চাইলে যে কোন দাপ্তরিক কাজ করতে পারবে। তোমার যদি তাড়া থাকে, তাহলে আমি ওহাইও রাজ্যের একটা ড্রাইভিং লাইসেন্সও তৈরি করে দিতে পারবো। কিন্তু কেউ যদি ভালো করে খেয়াল করে দেখে, তাহলে ধরা পড়ে যেতে পারে সেটা। জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বরটা কিন্তু ঠিকই থাকবে।"

"ধরুন কিছুদিন পর জন স্মিথ এসে তার পরিচয় ফেরত চাইলো, তখন?"

"সে-ও ঐ একই নম্বর ব্যবহার করবে। একসাথে পাঁচজন পর্যন্ত একই পরিচয় ব্যবহার করতে পারে। নকল না আসল, সেটা কেউ তো জানবে না।"

"আসলেও সহজ ব্যাপারটা," বললাম। "শিলা এসেছিলো আপনার কাছে?"

"হ্যাঁ।"

"কখন?"

"দুই কি তিন দিন আগে। যেরকমটা বলেছি, আমাদের সাধারণ খদ্দেরদের চাইতে ব্যতিক্রম ছিল সে। খুবই ভালো একটা মেয়ে, সুন্দরীও।"

"কোথায় যাচ্ছে সে সম্পর্কে কিছু বলেছে?"

হেসে আমার হাতে একটা টোকা দিল এইব। "আমাকে দেখে কি মনে হয় যে খুব বেশি প্রশ্ন করি? ওরাও কিছু বলতে চায় না, আমিও জানতে চাই না। বেশিরভাগ সময় কোন কথাই হয় না। স্যাডি আর আমার বিশেষ সুনাম আছে এই ব্যাপারে। শুনেছোই তো, মুখ খুললে মারাও যেতে পারি। বুঝেছো?"

"হ্যাঁ।"

"র‍্যাকেল যখন প্রথমবার আমাদের কাছে এসেছিল, তখনও কিছু বলিনি। মুখ বন্ধ রাখতে হবে সবসময়। এটাই ব্যবসার মূলমন্ত্র। র‍্যাকেলকে কিন্তু খুবই পছন্দ করি আমরা।"

"তাহলে মত বদলালেন কেন?"

এইবকে দেখে মনে হলো কথাটায় কষ্ট পেয়েছে। স্কয়ার্সের দিকে একবার তাকিয়ে ফের আমার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধন করলো সে। "তোমার কি আমাদের পাষণ্ড মনে হয়? কোন দয়া-মায়া নেই?"

"আমি সেটা বোঝাতে-"

"খুনের ঘটনাটা।" আমার কথা শেষ হবার আগেই বললো সে। "আমরা শুনেছি বেচারির করুণ পরিণতির কথা। খুবই খারাপ লেগেছে শুনে," বলে দুই হাত উঁচু করলো সে। "কিন্তু কী করবো বলো? আমার দুই হাত তো বাঁধা। চাইলেও পুলিশের কাছে যেতে পারবো না। র‍্যাকেল আর স্কয়ার্সকে ভরসা করি আমরা। দুজনেই ভালো মানুষ। অন্ধকারে বাস করলেও তাদের হৃদয় থেকে আলোটুকু মুছে যায়নি। আমার আর স্যাডির মত।"

ঠিক সেই সময় ওপরের দরজা খুলে সিঁড়িতে পা রাখলো স্যাডি। "বন্ধ করে দিয়েছি।"

"ভালো করেছো।"

"কী বলছিলে?" এইবকে জিজ্ঞেস করলো তার স্ত্রী।

"বলছিলাম যে মুখ খুলতে রাজি আমরা।"

"ঠিক আছে।"

প্যাঁচার মতো চোখজোড়া আবারো আমার দিকে ফেরালো এইব গোল্ডবার্গ। "স্কয়ার্স বলছিল একটা ছোট্ট মেয়ে নাকি জড়িত এই ঘটনায়?"

"ওর মেয়ে," বললাম। "বয়স খুব সম্ভবত বারো।"

আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো স্যাডি। "তুমি জানো না বাচ্চাটা কোথায়।"

"ঠিক ধরেছেন।"

স্ত্রীর গা ঘেঁষে দাঁড়ালো এইব। ওখানেই মানাচ্ছে তাকে। তাদের বিবাহিত জীবন কত দিনের, বাচ্চা-কাচ্চা আছে কিনা, কতদিন ধরে এই ব্যবসা করছে, আসল ঠিকানা কোথায়-সব জানতে ইচ্ছে করছে।

"একটা কথা শুনবে?" স্যাডি বললো আমার উদ্দেশ্যে।

মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"তোমার শিলা, একদম অন্যরকম একটা মেয়ে। সুন্দর তো বটেই। কিন্তু সেই সৌন্দর্যের পাশাপাশি অপূর্ব একটা ব্যক্তিত্বও আছে তার। আমাদের

এখানে যখন এসেছিল, দেখে মনে হচ্ছিলো অনেক ভয়ে ভয়ে আছে কোন কারণে। হয়তো আমরা যে পরিচয়টা দিয়েছিলাম তাকে, সেটা কাজে আসেনি। এজন্যেই মারা গেছে।"

"তো, তাকে সাহায্য করি আমরা," বলে একটা কাগজে কিছু লেখে আমার দিকে এগিয়ে দিলো এইব। "ডোনা হোয়াইট নামটা দিয়েছিলাম। এটা হচ্ছে তার জাতীয় পরিচয় পত্রের নম্বর। তোমার কোন কাজে আসবে নাকি জানি না।"

"আর আসল ডোনা হোয়াইট?"

"একজন হিরোইনখোর।"

কাগজের টুকরোটার দিকে তাকালাম।

সামনে এগিয়ে এসে আমার গালে হাত রাখলো স্যাডি। "তোমাকে দেখে ভালো ছেলে মনে হচ্ছে।"

তার দিকে তাকালাম।

"মেয়েটাকে খুঁজে বের করো।"

"করবো," কয়েকবার মাথা নেড়ে বললাম অবশেষে।

আটাশ

কেটির পুরো শরীর কাঁপছে। কিছুক্ষণ আগেই বাসায় পা রেখেছে সে।

এটা হতেই পারে না, ভাবলো সে। কোথাও ভুল হয়েছে। নামটা ভুল শুনেছি।

"কেটি?" তার মা ডাক দিল।

"বলো।"

"আমি রান্নাঘরে।"

"আসছি এক্ষুনি, মা।"

বেইজমেন্টের দরজার দিকে এগিয়ে গেলো সে। কিন্তু নবে হাত দিয়েই থমকে দাঁড়ালো।

বেইজমেন্ট। এখানে যেতে একদমই ভালো লাগে না তার।

অনেকে হয়তো ভাবতে পারে যে এতগুলো বছর কেটে যাওয়ায় নিচের সেই কাউচ কিংবা পুরনো টেলিভিশনটার প্রতি সেরকম কোন অনুভূতি কাজ করে না। কিন্তু ভাবনাটা ভুল। জুলির আত্মা এখনও সেখানে ঘুরে বেড়ায়। লাশটাও পড়ে আছে। মৃত্যুর গন্ধ থকথক করে প্রতিটা আনাচে-কানাচে।

ওর বাবা-মা বোঝে ব্যাপারটা। কেটিকে কখনো লন্ড্রির কাজ করতে হয় না। বাবাও তাকে কখনো সেখান থেকে তার যন্ত্রপাতির বাক্সটা এনে দিতে বলেনা। বেইজমেন্টে যদি কোন কাজে যেতেই হয়, বাবা কিংবা বা মা সেটা করে দেয়।

কিন্তু এবারের ব্যাপারটা ভিন্ন। নিজেকেই করতে হবে সবকিছু।

সিঁড়িতে পা দিয়েই সুইচ টিপে বাতি জ্বালিয়ে দিল। একটা মাত্র বাল্ব। হোল্ডারের ওপরের কাঁচের আচ্ছাদনটা ভেঙে গিয়েছিল খুনের ঘটনার দিনটায়। পা টিপে টিপে নিচে চলে এলো কেটি। ইচ্ছে করে টিভি বা কাউচটার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে রেখেছে।

এই বাসা ছেড়ে চলে যায়নি কেন ওরা?

ব্যাপারটা এখনও বোঝে না সে। জন বেনেট খুন হবার পর পুরো রামসে পরিবার দেশের অন্য প্রান্তে চলে যায়। তবে প্রতিবেশীদের অনেকের ধারণা ছিল তারাই মেরেছে মেয়েটাকে। তাই লোকের শ্যেনদৃষ্টি এড়াতে তল্পিতল্পা গুটিয়ে পালিয়েছে। মিলারদের ক্ষেত্রে এই কথাটা খাটে না।

তবুও, এই শহরে কি যেন একটা আছে। ক্রেইন পরিবারের মতো ওর বাবা-মাও থেকে গেছে। কেউই আত্মসমর্পণ করতে রাজি নয়।

এর অর্থ কী?

কোনার দিকে রাখা জুলির ট্রাঙ্কটা খুঁজে পেল সে। বাবা ওটার নিচে একটা কাঠের পাটাতনের ব্যবস্থা করেছেন যাতে এখানে কখনো পানি জমলেও ভেতরের জিনিসগুলো ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। ভার্সিটিতে যাওয়া উপলক্ষে কেটির গোছগাছ করার কথা মনে পড়ে গেল তার। ওটার ভেতরে ঢুকে বসে থাকতো সে, যেন ছোটখাটো একটা দুর্গ। আবার এমনটাও মনে হতো যে কেটি হয়তো তাকে সাথে করে নিয়ে যাবে ভার্সিটিতে।

ট্রাঙ্কটার ওপরে অনেকগুলো বাক্স। এক এক করে সেগুলো নামালো কেটি। ট্রাঙ্কে তালা দেয়া, তবে সেটা খোলা কোন ব্যাপার না। একটা পুরনো ছুরি দিয়ে খোঁচা দিতেই কাজ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ট্রাঙ্কের আঁকড়া দুটো খুললো। ভ্যান হেলসিংয়ের ড্রাকুলার কফিন খোলার কথা মনে পড়ছে।

"কী করছো?"

মায়ের কণ্ঠ শুনে চমকে উঠলো কেটি। কখন যে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে তা বুঝতেই পারেনি।

আরো কাছে এসে দাঁড়ালো লুসিল মিলার। "এটা জুলির ট্রাঙ্ক না?"

"ভয় পাইয়ে দিয়েছো তুমি আমাকে!"

"জুলির ট্রাঙ্ক নিয়ে কী করছো?" তার মা জিজ্ঞেস করলো।

"আমি...আমি দেখছি।"

"কী?"

সোজা হয়ে তার দিকে তাকালো কেটি। "ও আমার বোন।"

"আমি জানি সেটা, মা।"

"আমার কি ওর কথা মনে হতে পারে না?"

লম্বা একটা সময় ওর চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকলো মা। "সেজন্যেই এখানে এসেছো?"

মাথা নাড়লো কেটি।

"সবকিছু ঠিকঠাক আছে তো?"

"হ্যাঁ।"

"আগে কখনো জুলিকে নিয়ে তোমাকে এভাবে ভাবতে দেখিনি, কেটি।"

"সেই সুযোগটা দেয়া হয়নি আমাকে," বললো ও।

কথাটা নিয়ে কিছুক্ষণ ভাবলো মা। "তা-ও ঠিক।"

"মা?"

"হ্যাঁ?"

"এখান থেকে চলে যাইনি কেন আমরা?"

কেটির মনে হলো এই বুঝি মা কিছু না বলে চলে যাবে, সবসময়ের মতো। কিন্তু উইল সেদিন ওভাবে বাসার সামনে আসার পর থেকে মিলারদের বাসার হালচালই বদলে গেছে। একটা বাক্সের ওপরে বসে পরনের স্কার্টটা ঠিক করলো লুসিল।

"যখন আমাদের জীবনে খুব খারাপ কিছু ঘটে," শান্তগলায় বললো সে। "তখন প্রথম প্রথম মনে হয়, সবকিছু বোধহয় শেষ হয়ে যাচ্ছে। যেন প্রচণ্ড ঝড়ে মধ্যে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হয়েছে তোমাকে। স্রোতের তোড়ে কোন হুঁশ থাকে না। কোনমতে ভেসে থাকার চেষ্টা করতে হয়। তোমার মনের বড় একটা অংশ সেটাও করতে চায় না। মনে হয় হাল ছেড়ে দেয়াই সবচেয়ে উত্তম বলে। কিন্তু সেটা সম্ভব না। বেঁচে থাকার তাগিদ তেমনটা করতে দেয় না। আমার ক্ষেত্রে হয়তো ছোট মেয়েটাকে বড় করার তাগিদ কাজ করেছে, ঠিক জানি না। কিন্তু যেমন করেই হোক, ভেসেই থাকতে হয়।"

এটুকু বলে এক আঙুল দিয়ে চোখে পানি মুছলো মা। এরপর সোজা হয়ে বসে জোর করে মুখে হাসি টেনে বললো, "আমার কথা হয়তো দুর্বোধ্য লাগছে তোমার কাছে।"

"না," বলে মায়ের হাতটা ধরলো কেটি।

"কিছুদিন পরে কিন্তু ঝড়টা শেষ হয়ে যায়। তখন পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে গড়ায়। ততদিনে তীরেও ভেসে আসতে পারো অবশ্য। তবে ঝড় চলাকালীন সময়ের হুটোপুটির কারণে যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে। সার্বক্ষণিক একটা কষ্টকে সঙ্গী করে টিকে থাকতে হবে। এখানেই শেষ নয়। দুর্ঘটনার পরে বাস্তবতার যে অসহ্য পরিবর্তন, সেটাও মেনে নিতে হবে।"

এখনও মায়ের হাত ধরে আছে কেটি।

"কষ্টটাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারো। সব ভুলে ব্যস্ত হয়ে উঠতে পারো জীবন নিয়ে। কিন্তু তোমার বাবা আর আমার পক্ষে–" বলে চোখ বন্ধ করে মাথা ঝাঁকালো লুসিল মিলার। "ভুলে যাওয়াটা অসম্ভব। তোমার বোনের সাথে এভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না আমরা। কষ্টটা খুব গভীর হতে পারে, কিন্তু জুলিকে ভুলে কীভাবে থাকবো আমরা? ওর অস্তিত্বটা তো একসময় আমাদের বাস্তবতার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। জানি এসব কথার কোন মানে নেই।"

কেটির অবশ্য সেরকম কিছু মনে হচ্ছে না।

চুপচাপ বসে থাকলো দুজন। একসময় কেটির হাত ছেড়ে উরুতে চাপড় মেরে উঠে দাঁড়ালো লুসিল। "তুমি তোমার কাজ করো।"

তার পদশব্দ মিলিয়ে গেল কিছুক্ষণ পর। আবারো ট্রাঙ্কের সামনে এসে বসেছে কেটি। ভেতরের জিনিসগুলো বের করতে শুরু করলো এক এক করে। প্রায় আধাঘণ্টা সময় লাগলেও অবশেষে কাঙ্ক্ষিত জিনিসটা খুঁজে পেল সে।

আর সেটা বদলে দিল সবকিছু।

উনত্রিশ

ভ্যানে ফিরে আসার পর স্কয়ার্সকে আমাদের আগামী পদক্ষেপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম।

"একটা সোর্স আছে আমার," বললো সে। সংখ্যাটা অনেক কমিয়ে বলছে। এক এর পরে একটা বা দুইটা শূন্যও হতে পারে। "ডোনা হোয়াইট নামটা দিয়ে কিছু খুঁজে বের করা যায় নাকি দেখবো আমরা। কোথায় আছে এখন বা দূরে কোথাও গিয়েছে কিনা, এসব।"

এরপর বেশ খানিকক্ষণ কেউ কিছু বললাম না।

"কাউকে না কাউকে কথা বলতেই হবে," স্কয়ার্স বললো কিছুক্ষণ পর।

"শুরু করো তাহলে," আমার হাতের দিকে তাকিয়ে বললাম।

"কী করতে চাচ্ছো তুমি, উইল?"

"কার্লিকে খুঁজে বের করতে," সাথে সাথে জবাব দিলাম।

"এরপর? নিজের মেয়ে হিসেবে বড় করবে?"

"জানি না।"

"বারবার জানি না বলে এড়িয়ে যাচ্ছো।"

"তুমিও একই কাজ করছো।"

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। এখন যে এলাকাতে আছি আমরা, তার চারপাশে বেশিরভাগই একতলা বাড়ি। খুব একটা অবস্থাসম্পন্ন লোকেরা থাকে না এখানে। কান পাতলে চাপা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ কানে আসবে। ভালো কিছু চোখে পড়লো না।

"শিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার কথা ভাবছিলাম আমি," বললাম।

রাস্তা থেকে চোখ ফেরালো না স্কয়ার্স। তবে কথাটা একটু হলেও প্রভাবিত করেছে তাকে, এটা বুঝতে পারছি।

"একটা আঙটিও কিনেছিলাম। মাকে দেখিয়েছি। ভেবেছিলাম কিছুদিন পর ভালো একটা সময় বেছে কাজটা করবো।"

একটা সিগন্যালে থামলাম আমরা। স্কয়ার্স এখনও একদৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে।

"খোঁজ চালু রাখতেই হবে আমাকে," বললাম। "কারণ সেটা না করলে কখন উল্টোপাল্টা কী করে বসি, কে জানে। আত্মহত্যা না। কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে–" কথাটা ঠিক সাজিয়ে বলতে পারছি না, "ওর শূন্যতাটা পেয়ে বসবে আমাকে।"

"সেটা এড়ানোর কোন উপায় নেই," স্কয়ার্স বললো।

"জানি আমি, কিন্তু ততদিনে হয়তো ভালো কিছু করে ফেলবো আমি। হয়তো ওর মেয়েকে উদ্ধার করবো। এতে মৃত্যুর পরেও তাকে সাহায্য করা হবে।"

"কিংবা," পাল্টা যুক্তি দেয়ার ভঙ্গিতে বললো স্কয়ার্স, "এমন কিছু জানতে পারো যেটা জানার জন্যে তুমি প্রস্তুত নও। হয়তো তুমি শিলাকে যেরকম মানুষ ভাবতে, তা পুরোপুরি ভুল। আমাদের সবাইকে হয়তো বোকা বানিয়েছে সে।"

"বানাক," বললাম। "তুমি তো আছো আমার সাথে?"

"একদম শেষ পর্যন্ত, কমরেড।"

"বেশ। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে।"

গম্ভীর চেহারাটায় হাসি ফুটলো এতক্ষণে। "চুপ করে না থেকে বলো সেটা'।

"একটা ব্যাপার ভুলে যাচ্ছি আমরা।"

"কী?"

"নিউ মেক্সিকো। শিলার হাতের ছাপ নিউ মেক্সিকোর একটা মার্ডার সিনে পাওয়া গিয়েছিল।"

"তুমি কী বলতে চাও যে খুনের ঘটনাটার সাথে ক্লার্লির কোন সম্পর্ক আছে?"

"থাকতেও পারে।"

মাথা নাড়লো স্কয়ার্স। "কিন্তু আমরা তো এটাও জানি না যে নিউ মেক্সিকোতে কে মারা গিয়েছে। এমনকি খুনগুলো ঠিক কোথায় হয়েছে সেটা পর্যন্ত জানি না।"

"সেটা নিয়েই ভেবেছি আমি," বললাম। "আমাকে বাড়ি পৌছে দাও। ইন্টারনেটে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হবে।"

হ্যাঁ, আসলেও একটা পরিকল্পনা আছে আমার।

এফবিআইয়ের লোকেরাই যে প্রথমে লাশগুলোর হদিস পেয়েছে এমন ভাবাটা ভুল হবে। বরং স্থানীয় পুলিশের কেউ হয়তো জেনেছে প্রথমে। আর

তাদের জানিয়েছে প্রতিবেশী বা কোন নিকটাত্মীয়। ঘটনাটা যদি ছোট কোন শহরে ঘটে থাকে, যেখানে সচরাচর খুন-খারাবি হয় না, তাহলে স্থানীয় খবরের কাগজে সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই প্রতিবেদনও বেরিয়েছে।

Refdesk.com ওয়েবসাইটে ঢুকে জাতীয় পত্রিকা অপশনটায় ক্লিক করলাম। নিউ মেক্সিকোর তেত্রিশটা খবরের কাগজের নাম ভেসে উঠলো। এগুলোর মধ্যে থেকে অ্যালবাকার্কি অঞ্চলের পত্রিকাগুলো বাছাই করে নিলাম। এরপর আর্কাইভে ঢুকে সার্চবক্সে 'মার্ডার' লিখে সার্চ দিলাম প্রথমে। অনেক বেশি হিট হলো। 'ডাবল মার্ডার' লিখতেই হিটের পরিমাণ কমে আসলো। প্রথম পত্রিকায় অবশ্য কিছুই পেলাম না। একই কাজের পুনরাবৃত্তি করতে থাকলাম। পেইজগুলো লোড হতে অনেক সময় নিচ্ছে।

আধ-ঘণ্টা পর ফল পেলাম অবশেষে।

মফস্বলে দুই খুন, এলাকাবাসী স্তব্ধ। প্রতিবেদক—ভন স্টার্নো।

গত রাতে অ্যালবাকার্কির স্টোনপয়েন্ট অঞ্চলের এক আবাসিক এলাকা থেকে অজ্ঞাত পরিচয়ের দুইজনের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গুলির একাধিক দাগ দৃশ্যমান তাদের শরীরে। তবে এ ব্যাপারে পাশের দালানের বাসিন্দা ফ্রেড ডেভিসনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি বলেন, "আমি কিছুই শুনিনি। আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না যে আমাদের এলাকায় এরকম কিছু একটা ঘটতে পারে।" তদন্ত চলমান হওয়ায় পুলিশ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। যে বাসা থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, সেটির মালিক ওয়েন এনফিল্ড। আজ সকালে ময়নাতদন্ত হবে স্থানীয় মেডিক্যাল এক্সামিনারের অফিসে।

ব্যস, এটুকুই। পরদিনের পত্রিকাগুলোতেও সময় নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলাম। আর কিছু নেই। প্রতিবেদকের অন্যান্য প্রতিবেদনগুলোও দেখলাম। কিন্তু জোড়া খুনের ঘটনার ব্যাপারটা নিয়ে আর কোথাও কিছু ছাপানো হয়নি।

চেয়ারে সোজা হয়ে বসলাম।

থাকবে না কেন?

সেটা জানার একটাই উপায় আছে। ফোন উঠিয়ে নিউ মেক্সিকো স্টার বিকনের নম্বরটা ডায়াল করলাম। ভাগ্য ভালো হলে হয়তো ভন স্টার্নোর সাথে কথা বলার সুযোগ পাবো। সে নিশ্চয়ই কিছু বলতে পারবে এ ব্যাপারে।

ভাগ্য ভালোই বলতে হবে। সরাসরি প্রতিবেদককে না পেলেও তার নম্বরটা ঠিকই পেলাম। কিন্তু সেই নম্বরে ডায়াল করতেই অ্যান্সারিং মেশিনে রেকর্ড করা বার্তা ভেসে এলো, *"স্টার বিকন থেকে ভন স্টার্নো বলছি। এ মুহূর্তে হয়তো কোন কাজে ব্যস্ত আছি, দয়া করে বিপ হবার পর মেসেজ রেকর্ড করুন।"*

রেখে দিলাম ফোন। Switchboard.com ওয়েবসাইটটায় লগ-ইন করে স্টার্নোর নাম আর অ্যালবাকার্কি লিখে সার্চ দিলাম। খুব বেশি কষ্ট করতে হলো না। মাত্র দুটো হিট থেকে সঠিক জনকে বেছে নিলাম। ঠিকানাও দেখাচ্ছে। ২৫, ক্যান্টারবারি ড্রাইভ।

নম্বরটায় ডায়াল করলাম। একজন মহিলা ফোন ধরলো পাঁচবার রিং হবার পর।

"হ্যালো?" বলার পরেই বাসার কারো উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠলো সে, "শব্দ করো না, মা ফোনে কথা বলছে।"

তবে বাচ্চাদের ছুটোপুটির শব্দ কমলো না।

"ভন স্টার্নো?"

"কিছু বিক্রির জন্যে ফোন দিয়েছেন?"

"না।"

"আচ্ছা, তাহলে ভন স্টার্নোর সাথেই কথা বলছেন।"

"আমার নাম উইল ক্রেইন–"

"কথার সুর শুনে তো মনে হচ্ছে কিছু বিক্রির ধান্ধায় আছেন।"

"না," আবারো বললাম। "আপনিই কি স্টার বিকনের প্রতিবেদক?"

"আপনার নামটা যেন কী বললেন?" আমি জবাব দেয়ার আগেই আবার চিল্লিয়ে উঠলো সে, "তোমাদের দুইজনকে না শব্দ করতে মানা করলাম! টমি, ওকে গেম বয়টা দিয়ে দাও। এক্ষুনি!" এরপর আমার উদ্দেশ্যে বললো, "হ্যালো?"

"আমার নাম উইল ক্রেইন। আপনি কিছুদিন আগে জোড়া খুনের ব্যাপারে একটা প্রতিবেদন লিখেছেন।"

"হ্যাঁ। সেটা নিয়ে আপনার আগ্রহের কারণ?"

"আমার কিছু প্রশ্ন ছিল।"

"এটা কোন লাইব্রেরি না, মি. ক্রেইন।"

"দয়া করে উইল বলুন আমাকে। আপনার খুব বেশি সময় নষ্ট করবো না। স্টোনপয়েন্টে কি খুব বেশি এরকম ঘটনা ঘটেছে এর আগে?"

"একদমই না। এখানে সচরাচর কোন খুনই হয় না।"

"জোড়া খুনের ব্যাপারটা–"

"এরকম প্রথম কেস।"

"তাহলে," বললাম। "এত ছোট প্রতিবেদন কেন ছাপানো হলো?"

পেছন থেকে আবারো বাচ্চাদের ঝগড়ার শব্দ ভেসে এলো। রিসিভার শব্দ করে নামিয়ে রেখে উধাও হয়ে গেলেন কিছুক্ষণের জন্যে। "অনেক হয়েছে! টমি তোমার ঘরে যাও। এসব বলে লাভ নেই। আর তুমি, গেইম বয়টা আমাকে দাও। নাহলে ওটা কিন্তু ডাস্টবিনে ফেলে দেব।" আবারো

ফোনটা তুলে নিলেন এরপর। "আবারো আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, কেসটার ব্যাপারে আপনার আগ্রহের কারণ কী?"

বেশ কয়েকজন রিপোর্টারকে চেনার সুবাদে জানি যে ঠিক কী বলতে হবে। "আমার কাছে এই কেসের সাথে সম্পর্কযুক্ত তথ্য থাকতে পারে।"

"*সম্পর্কযুক্ত তথ্য*," পুনরাবৃত্তি করলো সে। "ভালো বলেছেন।"

"আমি যা বলবো তা হয়তো আপনার কাজে আসতেও পারে।"

"কোত্থেকে ফোন দিয়েছেন?"

"নিউ ইয়র্ক।"

"ঘটনাস্থল থেকে অনেক দূরে," কিছুক্ষণ পর জবাব পেলাম।

"হ্যাঁ।"

"বলুন তাহলে। কী এমন কেসের সাথে 'সম্পর্কযুক্ত তথ্য' আছে আপনার কাছে যেটা আমার কাজে আসতে পারে?"

"আমার কিছু কথা জানতে হবে আগে।"

"এসব জোচ্চুরি চলবে না।"

"আপনার অন্যান্য প্রতিবেদনগুলো দেখেছি আমি, মিসেস স্টার্নো।"

"মিসেস না, মিস। আর এখানে সবাই আমাকে ভন বলেই ডাকে, আপনিও সেটাই করুন নাহয়।"

"বেশ," বললাম। "আপনি তো সাধারণত বিয়ে, বার মিটজবাহ–এসব সামাজিক অনুষ্ঠান নিয়ে প্রতিবেদন লেখেন।"

"ওখানে ভালো খাওয়া দাওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। তাছাড়া কালো ড্রেসে আমাকে ভালো দেখায়। কী জানতে চাচ্ছেন, সেটা বলুন।"

"এরকম কেস তো সচরাচর পান না আপনারা।"

"দয়া করে আসল কথা বলুন, উইল।"

"আসল কথা হচ্ছে, আমার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলেই দেখুন। হয়তো আসলেও আপনার লাভ হবে সেটায়।"

এবারে তৎক্ষণাৎ কিছু বললো না সে। মৌনতা সম্মতির লক্ষণ।

"আপনারা এত বড় একটা জোড়া খুনের খবর প্রকাশ করলেন। কিন্তু ভিক্টিমদের নাম বা সন্দেহভাজন সম্পর্কে কিছুই বলা হলো না প্রতিবেদনে।"

"কারণ সে বিষয়ে কিছু জানি না আমরা," বললো ভন। গভীর রাতে স্ক্যান করে কেউ রিপোর্টটা পাঠায়। কোনমতে প্রভাত সংস্করণে খবরটা ছাপাই আমরা।"

"তাহলে কোন ফলো-আপ নেই কেন? এটা তো আপনাদের ওখানে বেশ আলোচিত একটা ঘটনা হবার কথা!"

নীরবতা।

"হ্যালো?"

"একটু দাঁড়ান। বাচ্চারা আবারো বিরক্ত করছে।"

কোন শব্দ পাচ্ছি না যদিও।

"আমাকে থামিয়ে দেয়া হয়," আগের তুলনায় নরম সুরে বললো সে।

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ পেপারে যে ওটুকু ছাপাতে পেরেছি সেটাই আমাদের ভাগ্য। পরদিন সকালে এফবিআইয়ের লোক দিয়ে ভরে যায় জায়গাটা। আমার বসকে ফোন করে মানা করা হয় এ বিষয়ে কিছু ছাপাতে।"

"কে ফোন দিয়েছিল?"

"স্থানীয় এফবিআইয়ের স্পেশাল ইন চার্জ। নিষেধ সত্ত্বেও আমি চেষ্টা করি তথ্য জোগাড়ের। কিন্তু 'মন্তব্য নেই'-এর বেশি কিছু জানা সম্ভব হয়নি।"

"ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত না?"

"আমি জানি না, উইল। এর আগে কখনো কোন খুনের প্রতিবেদন লিখিনি আমি। একটু অদ্ভুত তো বটেই।"

"আপনার কী মতামত এ ব্যাপারে?"

"আমার বসের ওরকম অদ্ভুত আচরণ থেকে কি মনে হচ্ছে তা জানতে চাইছেন?" বলে লম্বা একটা শ্বাস টানলো ডন। "বড়সড় কোন ব্যাপার। গভীর কোন চক্রান্ত হলেও অবাক হবো না। এবার আপনার পালা, উইল।"

কতদূর বলা উচিত হবে সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। "আপনি কি ঘটনাস্থলে প্রাপ্ত কোন আঙুলের ছাপ সম্পর্কে কিছু জানেন?"

"না।"

"আমার জানামতে এক নারীর আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে'।"

"আচ্ছা।"

"কালকে সেই নারীর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।"

"খোদা! খুন হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায়?"

"নেব্রাস্কার ছোট একটা শহরে।"

"নাম?"

"বাড়ির মালিক ওয়েন এনফিল্ড সম্পর্কে কিছু বলুন।"

"ওহ, আমি বললে আপনি বলবেন, একরকম নাকি ব্যাপারটা?"

"অনেকটা। এনফিল্ড কি ভিক্টিমদের একজন?"

"জানি না আমি।"

"কী জানেন আপনি তার সম্পর্কে?"

"তিন মাস ধরে এখানে আছে সে।"

"একা?"

"প্রতিবেশিদের মতে একাই এখানে এসেছিল সে। তবে গত কয়েক সপ্তাহে একটা বাচ্চা আর এক মহিলাকেও দেখেছে তারা।"

বাচ্চা।

বুকে কাঁপুনি অনুভব করলাম। সোজা হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "বাচ্চাটার বয়স কত?"

"জানি না। স্কুলে যাওয়ার বয়স খুব সম্ভবত।"

"বারো?"

"হ্যাঁ, হতে পারে।"

"ছেলে না মেয়ে?"

"মেয়ে।"

জমে গেলাম একদম।

"উইল, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো?"

"মেয়েটার নাম জানতে পেরেছেন?"

"না। আসলে তাদের ব্যাপারে কিছুই জানি না আমি।"

"এখন কোথায় আছে তারা?"

"আমি জানি না।"

"সেটা কীভাবে সম্ভব?"

"জগতে রহস্যের কোন শেষ নেই। তারা কোথায় গিয়েছে এ বিষয়ে খোঁজ রাখতে পারিনি। আমাকে তো এই কেসটা থেকে সরিয়েও দেয়া হয়েছে। তাই আর জোর দেইনি।"

"আপনি কি খোঁজ নিতে পারবেন যে তারা কোথায় আছে এখন?"

"চেষ্টা করতে পারি।"

"আর কিছু? ভিক্টিম বা সন্দেহভাজন কারো নাম শুনেছেন?"

"বললামই তো, খুব বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করিনি। আসলে বিকনে পার্ট-টাইম চাকরি করি আমি, সেটা নিশ্চয়ই বুঝতেই পেরেছেন। বাসায় বাচ্চাদের সামলাতে হয়। প্রতিবেদনটা আমাকে লিখতে হয়েছে কারণ সে মুহূর্তে অফিসে আর কেউ ছিল না। তবে ভালো কিছু সোর্স আছে আমার।"

"এনফিল্ডকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের," বললাম। "অন্তত ছোট মেয়েটা আর মহিলাকে তো বটেই।"

"হ্যাঁ, সেটা করা যেতে পারে," একমত প্রকাশ করে বললো ভন। "আপনি হঠাৎ এই ব্যাপারে আগ্রহী হলেন কেন?"

কিছুক্ষণ ভাবলাম বিষয়টা নিয়ে। "আপনি কি একটু খোঁজ খবর নিতে পারবেন, ভন?"

"পারবো, উইল।"

"আপনার তো এসব বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে?"

"উদাহরণ চান?"

"নিশ্চয়ই।"

“আপনি নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে ফোন দিয়েছেন, কিন্তু আপনার আসল বাড়ি নিউ জার্সিতে। তাছাড়া, ওখানে আরো অনেক উইল ক্রেইন থাকলেও, আমি মোটামুটি নিশ্চিত আপনি একজন বিখ্যাত খুনির ভাই।”

“একজন *সন্দেহভাজন* বিখ্যাত খুনি,” তাকে সংশোধন করে দিলাম। “কীভাবে জানলেন এসব?”

“আমার বাসার কম্পিউটারে ইন্টারনেটের সংযোগ আছে। লেক্সিস-নেক্সিসে আপনার নাম লিখে সার্চ দিতেই অনেকগুলো প্রতিবেদন পেলাম। এর মধ্যে একটায় লেখা যে আপনি এখন ম্যানহ্যাটানে থাকছেন।”

“আমার ভাইয়ের সাথে এসবের কোন সম্পর্ক নেই।”

“আর আপনার প্রতিবেশীর খুন হবার ঘটনার সাথেও তার কোন সম্পর্ক নেই নিশ্চয়ই?”

“আমি বোঝাতে চেয়েছি, আজকে আপনাকে ফোন দেয়ার সাথে আমার ভাইয়ের ঘটনাটার কোন যোগসাজশ নেই।”

“তাহলে কার জন্যে এই কেস নিয়ে আগ্রহী হয়েছেন আপনি?”

“আমার খুব কাছের কেউ,” দীর্ঘশ্বাস চেপে বললাম।

“কে?”

“আমার গার্লফ্রেন্ড। ঘটনাস্থলে ওর আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে।”

বাচ্চাদের হুটোপুটির শব্দ ভেসে এলো আবারো। তবে এবারে তাদের চুপ করালো না ভন স্টার্নো। “নেব্রাস্কায় তাহলে আপনার গার্লফ্রেন্ডের মৃতদেহ পাওয়া গেছে?”

“হ্যাঁ।”

“সেজন্যেই কেসটার ব্যাপারে আগ্রহী আপনি?”

“অংশত।”

“পুরো কারণটা?”

এখনও কার্লির ব্যাপারে তাকে কিছু বলার জন্যে তৈরি নই আমি। “এনফিল্ডকে খুঁজে বের করুন,” বললাম।

“ওনার নাম কী, উইল? আপনার গার্লফ্রেন্ডের।”

“আপাতত এনফিল্ড সম্পর্কে খোঁজ নিন।”

“আপনি যদি চান যে আমরা একসাথে কাজ করবো, তাহলে কোন তথ্য গোপন করা চলবে না। নামটা খুঁজে বের করতে কিন্তু পাঁচ সেকেন্ডও লাগবে না আমার। আপনিই বলুন।”

“রজার্স,” বললাম। “ওর নাম ছিল শিলা রজার্স।” *ছিল* শব্দটা বলতে এর আগে কখনো এতটা খারাপ লাগেনি আমার।

টাইপিংয়ের শব্দ ভেসে এলো রিসিভারে। “আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো, উইল,” অবশেষে বললো ভন। “একটু ধৈর্য ধরুন, আমার ফোন পাবেন।”

ত্রিশ

অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলাম। অবশ্য আধো ঘুম, আধো জাগরণে আদৌ স্বপ্ন দেখা যায় কিনা সেটা নিয়ে আপনারা প্রশ্ন তুলতে পারেন। সেক্ষেত্রে এটাকে কী বলবো? আধা-স্বপ্ন?

অন্ধকারে বিছানায় মাথার নিচে হাত দিয়ে শুয়ে আছি। একটু তন্দ্রামত আসতেই নিজেকে আবিষ্কার করলাম ওয়েস্ট অরেঞ্জের কমিউনিটি সেন্টারে। আগেই বলেছি যে নাচতে ভীষণ পছন্দ করতো শিলা। এতটাই যে আমাকে সহ ওয়েস্ট অরেঞ্জের একটা ড্যান্স ক্লাবে নাম লিখিয়েছিল। কমিউনিটি সেন্টারটা মা যে হাসপাতালে ছিল তার একদম পাশে হওয়াতে প্রতি বুধবার মাকে দেখে ফেরার পথ সেখানে ঢুঁ মেরে আসতাম আমরা।

ক্লাবের জুটিদের মধ্যে আমরা দুজনই ছিলাম সবচেয়ে কম বয়স্ক। অন্যান্যদের বয়স ন্যূন্যতম পঁচাত্তর, বানিয়ে বলছি না। তবে বয়স শুনে ভুলেও এটা ভাববেন না যে নাচে কোন অংশে কম তারা। বরং আপনার-আমার মতো অনেকের তুলনায় অনেক বেশি দক্ষ। যাইহোক, নাচ শুরু হলে অস্বস্তিতে ভুগতাম আমি। এতজনের সামনে নেচে অভ্যাস নেই। কিন্তু শিলা পুরো উল্টো। মিউজিক কানে যাওয়া মাত্র চোখ বন্ধ করে নাচ শুরু করে দিত। মাঝে মাঝে তো আমার হাত ছেড়ে নিজেই এক চক্কর নেচে আসতো অন্যদের সাথে। সেই মুহূর্তগুলোয় একদম হারিয়ে যেত সে।

মি. এবং মিসেস সেগাল দম্পতির সাথে বেশ ভালো পরিচয় হয়ে যায় আমাদের। চল্লিশের দশক থেকে একসাথে নেচে আসছেন তারা। মি. সেগালের পরনে থাকতো সাদা জ্যাসকট আর মিসেস সেগাল পরতেন নীল রঙের ড্রেস, গলায় মুক্তোর চোকার। তাদের নাচ মুগ্ধ চোখে দেখতো সবাই। আক্ষরিক অর্থেই দুই দেহ এক মন যাকে বলে। কখনো তাল ছুটে যেত না।

বিরতির সময় অন্য সবার সাথে হাসিমুখে কথা বললেও নাচ শুরু হলে সবকিছু ভুলে যেত দুজনে।

গত ফেব্রুয়ারীর এক তুষারাচ্ছন্ন রাতে আমরা ভেবেছিলাম দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে সেদিন বোধহয় আর নাচ হবে না। কিন্তু বেশিরভাগ সদস্য উপস্থিত হওয়াতে শেষ পর্যন্ত আর বাতিল হয়নি। কিন্তু শ্বেতশুভ্র অ্যাসকট পরিহিত মি. সেগালকে একা আসতে দেখে সবাই অবাক হয়ে যায়। তার চেহারা দেখেই যা বোঝার বুঝে যাই আমরা। শিলা শক্ত করে চেপে ধরে আমার হাত। খেয়াল করে দেখি যে ছলছল করছে অর চোখজোড়া। মিউজিক শুরু হলে মি. সেগাল কিন্তু একাই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। যেন মিসেস সেগাল সেখানে উপস্থিত আছেন, এমন ভঙ্গিতে হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে দিয়ে নেচেছিলেন পুরোটা সময়। কেউ বিরক্ত করেনি তাকে।

পরের সপ্তাহে মি. সেগাল আর আসেননি। অন্যদের কাছ থেকে শুনেছিলাম যে ক্যান্সার সাথে দীর্ঘদিনের লড়াই শেষে অবশেষে হার মেনেছেন মিসেস সেগাল। জীবনের একদম শেষ মুহূর্ত অবধি নেচে গিয়েছেন তিনি। কিছুক্ষণ পরে মিউজিক শুরু হলে শিলাকে শক্ত করে ধরে যখন নাচ শুরু করলাম, একটা কথাই মনে হলো–সেগালদের ভালোবাসার গল্পটা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সেই ইতিহাস হয়তো খুব বেশি মানুষ জানবে না, কিন্তু তাতে সত্যিই কিছু যায়-আসে না।

স্বপ্নে ঠিক এরকম একটা মুহূর্তে কমিউনিটি সেন্টারে পৌছাই আমি। মি. সেগালকে দেখি চোখ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকতে। অপরিচিত আরো কয়েকজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারপাশে। কারো সাথেই তাদের সঙ্গী নেই। মিউজিক শুরু হলে একা একাই নাচতে শুরু করি আমরা। পাশে তাকিয়ে বাবাকেও খুঁজে পাই। নাচতে নাচতেই আমার উদ্দেশ্যে একবার মাথা নাড়েন তিনি।

অন্যদের নাচতে দেখি আমি। সবাই তাদের অনুপস্থিত সঙ্গীর উপস্থিতি অনুভব করছে। এমন দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে আছে যেন তাদের দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু আমি চাইলেও সেরকমটা করতে পারছি না। শিলা কেন যেন আমার কাছে ধরা দিচ্ছে না।

ফোনের শব্দে তন্দ্রা ছুটে গেল এসময়। তবে অনেকক্ষণ ধরেই বাজছিলো নিশ্চয়ই, অ্যান্সারিং মেশিনে একজনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। "লিভিংস্টোন পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে লেফটেন্যান্ট ড্যানিয়েলস বলছি। সম্ভব হলে মি. উইল ক্রেইনের সাথে কথা বলতে চাই।"

তবে লেফটেন্যান্ট ড্যানিয়েলসের কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে কম বয়সী এক তরুণীর হাসির শব্দ ভেসে এলো স্পিকারে। তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসলাম। রিসিভারটা উঠিয়ে কানে দিয়েও দেখি হেসে চলেছে মেয়েটা।

কেটি মিলারের মতো শোনাচ্ছে কণ্ঠটা।

"তোমার বাবা-মাকেই বোধহয় ফোন দেয়া উচিত আমার," হাসতে থাকা তরুণীর উদ্দেশ্যে বললো লেফটেন্যান্ট ড্যানিয়েলস।

"না।" মেয়েটা আসলেও কেটি। "আমার বয়স আঠারো। জোর করে আমাকে–"

"হ্যালো," বললাম আমি এই সময়ে। "উইল ক্রেইন বলছি।"

"হ্যালো, উইল। আমি টিম ড্যানিয়েলস। একই ক্লাসে পড়তাম আমরা, মনে আছে?"

টিম ড্যানিয়েলস। স্থানীয় হেইস স্টেশনে কাজ করতো সে। মাঝে মাঝে তেলে জবজবে ইউনিফর্ম পরে স্কুলে আসতো, বুক পকেটের ওপর খোদাই করে তার নাম লেখা ছিল সেই ইউনিফর্মে। এখনও তাহলে তার ইউনিফর্মের নেশাটা কাটেনি।

"অবশ্যই মনে আছে," বিভ্রান্ত স্বরে বললাম। "কেমন আছো তুমি?"

"এইতো, চলছে।"

"ফোর্সে যোগ দিয়েছো নাকি?"

"হ্যাঁ, এখনও লিভিংস্টোনেই থাকি। বেটি স্টেটসনকে বিয়ে করেছি। দুই মেয়ে।"

অনেক চেষ্টা করেও বেটি স্টেটসনের চেহারাটা মনে করতে পারলাম না। "বাহ্, অভিনন্দন।"

"ধন্যবাদ, উইল," এবারে খানিকটা গম্ভীর মনে হলো ওর কণ্ঠস্বর। "তোমার মায়ের ব্যাপারে ট্রিবিউনে পড়েছি। আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।"

"ধন্যবাদ, টিম।"

আবারো কেটি মিলারের হাসির শব্দ ভেসে এলো।

"আচ্ছা শোনো, যে জন্যে ফোন দিয়েছি তোমাকে। কেটি মিলারকে তো চেনো?"

"হ্যাঁ।"

এক মুহূর্তের নীরবতা। কেটির বড় বোনের সাথে আমার সম্পর্কের কথা নিশ্চয়ই ভালো করেই জানে টিম। এটাও জানে যে শেষ অবধি কি ঘটেছে জুলির ভাগ্যে। "সে বললো তোমাকে ফোন দিতে।"

"কোন সমস্যা?"

"কেটিকে মাউন্ট প্লিজেন্ট প্লেগ্রাউন্ডে ভদকার বোতল সহ পেয়েছি আমি। অর্ধেকটা খালি করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। ওর বাবা-মাকেই ফোন দিতে যাচ্ছিলাম–"

"না!" কেটি বলে উঠলো। "আমার বয়স আঠারো বছর!"

"যাইহোক। সে বারবার বলছে তোমাকে ফোন দিতে। ছোটবেলায় তো আমরাও কত পাগলামি করেছি, তাই না?"

"হ্যাঁ," বললাম।

ঠিক সেই সময়ে কেটি পেছন থেকে এমন কিছু একটা বললো যে জমে গেল আমার পুরো শরীর। একবার ভাবলাম ভুল শুনেছি, কিন্তু কথাটা বারবার বলতেই থাকলো সে।

"আইডাহো! তাই না উইল? আইডাহো!"

রিসিভার শক্ত করে চেপে ধরলাম। নিশ্চয়ই ভুল শুনছি। "কী বলছে ও?"

"জানি না। সেই কখন থেকে আইডাহোর ব্যাপারে কী যেন বলছে। মাতাল হয়ে প্রলাপ বলছে।"

"আইডাহো! আমি জানি! সব জানি! আইডাহো!"

শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠেছে আমার।

"উইল, আমি জানি অনেক রাত হয়েছে। কিন্তু ওকে নিয়ে যেতে পারবে এখান থেকে?"

"হ্যাঁ, আসছি এখনই," কোনমতে বললাম কথাটা।

একত্রিশ

ইচ্ছে করে লিফটে চড়লো না স্কয়ার্স। ওয়ান্ডা জেগে যেতে পারে শব্দে।

অনেকেই জানে না, কিন্তু ইয়োগা স্কুলটা যে বিল্ডিংয়ে, সেটার মালিকানা স্কয়ার্সের নামে। ইয়োগা স্টুডিওর দুই তলা ওপরের ফ্ল্যাটটায় থাকে সে আর ওয়ান্ডা। ঘড়িতে তিনটার মতো বাজছে। দরজা খুলে ভেতরে পা রাখলো সে। বাতি নেভানো। বাইরের ল্যাম্পপোস্টের মৃদু আলোয় কোনমতে অবয়ব বোঝা যাচ্ছে আসবাবপত্রগুলোর।

তবে কাউচে বসে থাকা ওয়ান্ডাকে ঠিকই খেয়াল করলো স্কয়ার্স।

"হ্যালো," এমনভাবে কথাটা বললো স্কয়ার্স, যেন কেউ ঘুমিয়ে আছে পাশে।

"তুমি কি চাও আমি বাচ্চাটা নষ্ট করে ফেলি?" কোনরকম ভূমিকা ছাড়া জিজ্ঞেস করলো ওয়ান্ডা।

সানগ্লাসটা খুলে ফেলেছে দেখে মনে মনে নিজেকে গালি দিল স্কয়ার্স। "আমি খুবই ক্লান্ত, ওয়ান্ডা। ঘুমোতে চাই এখন।"

"না।"

"কী বলবো আমি?"

"এখনও তিন মাস হয়নি। শুধু একটা পিলেই কাজ হয়ে যাবে। তাই জানতে চাচ্ছি, তুমি কি চাও যে আমি বাচ্চাটা নষ্ট করে ফেলি?"

"এখন সবটা আমার ওপর নির্ভর করছে?"

"তোমার জবাবের অপেক্ষা করছি আমি।"

"নারীবাদ নিয়ে তোমাকে তো কম সোচ্চার হতে দেখিনি আমি, ওয়ান্ডা। তাদের মতামতের ব্যাপারটা কী হলো?"

"এসব বলে কথা ঘোরাবার চেষ্টা করবে না।"

পকেটে হাত ঢোকালো স্কয়ার্স। "কী চাও তুমি?"

অন্য দিকে মুখ ফেরালো ওয়ান্ডা। আলো-আঁধারিতে তার সুন্দর দেহাবয়বটা আরো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। সার্বক্ষণিক আত্মবিশ্বাসী ভাবটাও পরিষ্কার। ওয়ান্ডাকে ভালোবাসে সে। এতটা কাউকে কখনো ভালোবাসেনি। তাকেও এতটা কেউ কোনদিন ভালোবাসেনি। ছোটবেলায় স্কয়ার্সের মা বেশ কয়েকবার চুল সোজা করার আয়রন দিয়ে ছ্যাঁকা দিয়েছিল তাকে। যেদিন সে কাজটা থামায়, সেদিনই স্কয়ার্সের বাবা পিটিয়ে হত্যা করে তাকে এবং পরবর্তীতে নিজের গলায় ফাঁস দেয়।

"তুমি তোমার অতীত কপালে নিয়ে ঘোরো," ওয়ান্ডা বললো। "আমাদের সবার সেই সুযোগটা নেই।"

"তোমার কথা বুঝতে পারছি না।"

কেউই বাতি জ্বালেনি। চোখে অন্ধকার এখন বেশ সয়ে এসেছে। এরকম আলোচনার জন্যে বোধহয় আঁধারই ভালো।

"আমি হাইস্কুলের আমার ক্লাসের ভ্যালেডিক্টরিয়ান ছিলাম," ওয়ান্ডা বললো।

"জানি আমি।"

"আমাকে কথা বলতে দাও, প্লিজ।"

মাথা নাড়লো স্কয়ার্স।

"একটা বেশ বনেদি এলাকায় বড় হয়েছি আমি। খুব কম কৃষ্ণাঙ্গ পরিবার ছিল সেখানে। আমার ক্লাসে আমি একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রী ছিলাম। সবার থেকে ভালো ফলাফল করেছি। নিজের পছন্দ অনুযায়ী ভার্সিটি পছন্দ করেছি। প্রিন্সটন।"

এসবই জানা আছে স্কয়ার্সের, কিন্তু কিছু বললো না সে।

"কিন্তু ওখানে যাবার পর আমার মনে হয় যে অন্য সবাই আমার চাইতে অনেক বেশি যোগ্য এবং সুন্দর। এতটা হতাশ হয়ে যাই যে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেই প্রায়। অ্যানোরেক্সিয়া। ওজন এসে দাঁড়ায় নব্বই পাউন্ডে। তবুও আয়নায় তাকালে মনে হতো মোটা কেউ সেখান থেকে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।"

সামনে এগোলো স্কয়ার্স। এখন চাইলেই ছুঁতে পারে ওয়ান্ডার হাতটা, কিন্তু তা করলো না সে। বড় একটা গর্দভ যে, এইজন্যে।

"না খেয়ে থাকতে থাকতে শরীর এতটা ভেঙে পড়ে যে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়। পুরো শরীর ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেসময়। আমার লিভার, হার্ট–এখনও ডাক্তাররা এগুলো নিয়ে চিন্তিত। কখনো কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়নি, কিন্তু বেশ কাছাকাছি চলে গিয়েছিলাম। কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন হয়। কীভাবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত বলছি না। ডাক্তাররা আমাকে বলেছিল যে জীবনে মা হবার সম্ভাবনা খুব কম। ডেলিভারির সময় জটিলতা দেখা দিতে পারে।"

"আর এখন তোমার ডাক্তার কী বলে?" স্কয়ার্স পাশ থেকে জিজ্ঞেস করলো।

"কিছু নিশ্চিত করে বলেনি," তার দিকে তাকিয়ে বললো ওয়ান্ডা। "এতটা ভয় আগে কখনো পাইনি, বিশ্বাস করো।"

স্কয়ার্সের মনে হচ্ছে তার হৃদয়টা কেউ শক্ত করে চেপে ধরে আছে। ওয়ান্ডার পাশে বসে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু কেন যেন সেটা করতে পারছে না। সেজন্যে নিজের প্রতি ঘেন্না লাগছে তার। "ঝুঁকি আছে জানার পরেও যদি-" বলতে শুরু করলো সে।

"ঝুঁকিটা আমার," তার কথা শেষ হবার আগেই বললো ওয়ান্ডা।

"এই তো আমাদের নারীবাদী ওয়ান্ডা," হেসে বললো স্কয়ার্স।

"আমার কী হবে সেটা নিয়ে ভীত না আমি।"

স্কয়ার্স জানে।

"স্কয়ার্স?"

"কী?"

"এভাবে দূরে ঠেলে দিও না আমাকে, প্লিজ," ওয়ান্ডার কণ্ঠে স্পষ্ট আকুতি।

"আমাদের সম্পর্কের জন্যে বেশ বড় একটা ধাপ," বলার মতো কিছু খুঁজে না পেয়ে শেষমেষ এটাই বললো স্কয়ার্স।

"জানি আমি।"

"আমার মনে হয় না," পরবর্তী কথাটা ধীরে ধীরে বললো স্কয়ার্স। "আমি তৈরি।"

"তোমাকে ভালোবাসি আমি।"

"আমিও তোমাকে ভালোবাসি।"

"তোমার থেকে সাহসী কাউকে দেখিনি কোনদিন।"

মাথা ঝাঁকালো স্কয়ার্স। নিচ থেকে এক মাতালের বেসুরো গলার গান ভেসে আসছে। ওয়ান্ডা অপেক্ষা করছে ওর উত্তরে জন্যে।

"হয়তো," বলতে শুরু করে স্কয়ার্স। "তোমার শরীরের খাতিরেই ব্যাপারটা বাদ দেয়া উচিত আমাদের।"

নীরবে ওকে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে দেখলো ওয়ান্ডা। জবাবে কিছু বলার সুযোগও পেলো না।

৩৭ নং সড়কের চব্বিশ ঘণ্টা খোলা একটা রেন্ট-এ-কার থেকে গাড়ি ভাড়া করে লিভিংস্টোন পুলিশ স্টেশনে চলে আসি আমি। ছোটবেলায় এলিমেন্টারি স্কুল থেকে শিক্ষা সফরে একদিন এসেছিলাম এখানে, এছাড়া আর কখনো আসতে হয়নি। সেবার অবশ্য ভেতরের ছোট্ট হাজতটা দেখার অনুমতি পাইনি। আজ সেটাও দেখে ফেললাম কেটির কল্যাণে।

ডিটেক্টিভ টিম ড্যানিয়েলস উষ্ণ ভঙ্গিতে করমর্দন করলো আমার সাথে। কিছুক্ষণ পরপর কোমরে হাত দিচ্ছে সে, হাঁটার সময় চাবির ঝনঝন শব্দ কানে লাগছে। আগে থেকে আরো পোক্ত হয়েছে তার শরীর, তবে চেহারা খুব বেশি বদলায়নি।

কিছু ফর্মে সই করার পর কেটিকে আমার জিম্মায় ছেড়ে দেয়া হলো। আমি আসতে আসতে মাতাল অবস্থা কেটে গেছে তার। এখন আর হাসছে না। মুখ নিচু করে রেখেছে।

টিমকে আবারো ধন্যবাদ জানালাম। কেটি ভদ্রতার খাতিরেও কিছু বললো না। বিল্ডিংয়ের বাইরে পা দেয়া মাত্র আমার হাত ধরলো সে।

"একটু হাঁটাহাঁটি করি।"

"ভোর চারটা বাজছে। আমি ক্লান্ত।"

"এখন গাড়িতে উঠলে বমি করে দেবো।"

গাড়ির উদ্দেশ্যেই হাঁটছিলাম, কিন্তু থেমে গেলাম ওর কথা শুনে। "ফোনে আইডাহোর ব্যাপারে চেঁচাচ্ছিলে কেন?"

কেটি ইতিমধ্যে লিভিংস্টোন এভিনিউ পার হওয়া শুরু করে দিয়েছে। ওর পেছন পেছন গেলাম আমি।

"তোমার বাবা-মা চিন্তা করবে তোমাকে নিয়ে।"

"ওদের বলেছি যে এক বন্ধুর বাসায় থাকবো, সমস্যা নেই।"

"একা একা মদ খাচ্ছিলে কেন, বলবে?"

চুপচাপ হাঁটছে কেটি। টের পাচ্ছি যে দ্রুত হয়ে উঠছে ওর শ্বাস প্রশ্বাস। "খুব তেষ্টা পেয়েছিল।"

"তাই? আইডাহোর ব্যাপারে চেঁচাচ্ছিলে কেন?"

আমার দিকে তাকালো ও, কিন্তু হাঁটা থামালো না। "আমার মনে হয় তুমি জানো।"

ওর হাত ধরে থামালাম এই সময়ে। "ফাজলামো করছো আমার সাথে?"

"আমি কোন ফাজলামো করছি না, উইল।"

"পরিষ্কার করে বলো সবকিছু।"

"আইডাহো, উইল। তোমার শিলা রজার্সের বাড়ি তো আইডাহোতে, তাই না?"

আবারো জমে গেলাম। "সেটা তুমি কীভাবে জানলে?"

"পড়ে জেনেছি।"

"পেপারে?"

"তুমি আসলেও জানো না?" হেসে বললো কেটি।

এবার ওর কাঁধে হাত রাখলাম। "কী বলতে চাও তুমি?"

"তোমার শিলা কোন ভার্সিটিতে পড়েছে?"

"জানি না।"

"খুব তো বলছিলে যে ভালোবাসো তাকে।"

"তুমি বুঝবে না।"

"এখন তো তা-ই বলবে।"

"আমি কিন্তু কিছু বুঝতে পারছি না, কেটি।"

"শিলা রজার্সও হেভারটনে পড়তো, উইল। জুলির সাথে। তারা একই ডর্মে থাকতো।"

মনে হলো কেউ যেন সপাটে চড় মেরেছে আমাকে। "এটা অসম্ভব।"

"তুমি জানো না দেখে অবাক হচ্ছি, শিলা কখনো তোমাকে কিছু বলেনি?"

মাথা ঝাঁকালাম। "তুমি নিশ্চিত?"

"শিলা রজার্স সেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পড়তো। জুলির ডর্মের বুকলেটে এটুকুই দেখেছি আমি। আমাদের বেইজমেন্টে ওর ট্রাঙ্কে রাখা ছিল বুকলেটটা।"

"এতদিন আগের কথা ঠিকই মনে ছিল তোমার?"

"হ্যাঁ।"

"কীভাবে? মানে জুলির হোস্টেলের সবার নাম মনে আছে তোমার?"

"না।"

"তাহলে শিলা রজার্সের নাম মনে আছে কেন?"

"কারণ," কেটি বললো, "শিলা আর জুলি ছিল রুমমেট।"

বত্রিশ

রয়্যাল ব্যাগেল হাউজের একটা প্যাকেট হাতে সকাল দশটার দিকে আমার বাসায় হাজির হলো স্কয়ার্স। কেটি এখনও কাউচে ঘুমাচ্ছে। খেয়াল করলাম গত রাতের পোশাকটা পাল্টায়নি আমার বন্ধু। অন্য কেউ হলে হয়তো বুঝতে পারবে না, কিন্তু আমি ঠিকই ধরতে পারছি–আজকে তুলনামূলক বেশি বিধ্বস্ত লাগছে স্কয়ার্সকে। রান্নাঘরের কাউন্টারের পাশে বসলাম দুজনে।

"আমি জানি যে রাস্তার ওদের সাথে একদম মিশে যেতে চাও তুমি, তাই বলে..." শুরু করলাম বলা।

কেবিনেট থেকে একটা প্লেট বের করে নিল সে। "খালি ফালতু বকবকই করবে নাকি আমাকে খুলে বলবে যে কী জানতে পারলে?"

"দুটো একসাথে করতে সমস্যা কি?"

মাথা নিচু করে আবারো সানগ্লাসের ওপর দিয়ে আমার দিকে তাকালো স্কয়ার্স। "খুব বেশি খারাপ অবস্থা?"

"খারাপের চেয়েও খারাপ।"

এসময় কাউচে কেটির নড়া-চড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। বিড়বিড় করে কী যেন বলছে মেয়েটা। টাইলেনল হাতের কাছে রেখে দিয়েছিলাম। ও উঠে বসা মাত্র পানিসহ এগিয়ে দিলাম দুটো ওষুধ। ওগুলো গিলে নিয়ে শাওয়ারের দিকে চলে গেল সে। আবারো কাউন্টারের পাশে এসে বসলাম।

"তোমার নাকের কী অবস্থা?" স্কয়ার্স জিজ্ঞেস করলো।

"মনে হচ্ছে কেউ আমার হৃৎপিণ্ডটা এখানে এনে বসিয়ে দিয়েছে। দপদপ করছে একটু পরপর।"

মাথা নেড়ে হাতের ব্যাগেলটায় কামড় দিলো সে। ধীরে ধীরে চিবুচ্ছে। ওর কাঁধ ঝুলিয়ে বসে থাকার ভঙ্গিটা ভালো লাগলো না। আমি নিশ্চিত রাতটা

বাসায় কাটায়নি। ওয়ান্ডার সাথে কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়ই। আর সেই বিষয়ে আমার সাথে কথা বলতে চাচ্ছে না।

"কী জেনেছো বললে না তো।"

"শিলা মিথ্যা বলেছে আমাকে," বললাম।

"সেটা তো আমরা আগে থেকেই জানতাম।"

"পুরোটা শোন আগে।"

কিছু বললো না স্কয়ার্স।

"জুলি মিলারকে চিনতো ও। ভার্সিটিতে পড়ার সময় একই হোস্টেলে থাকতো দুজনে। রুমমেট ছিল।"

মুখে ব্যাগেল নিয়ে ভ্রু উঁচু করে আমার দিকে তাকালো স্কয়ার্স। "কী?"

যা জেনেছি সব খুলে বললাম ওকে। পুরোটা সময় পেছন থেকে শাওয়ারের শব্দ ভেসে এলো। কালকে রাতে আধ বোতল ভদকা খাওয়ার 'উপকারিতা' এখন টের পাচ্ছে নিশ্চয়ই কেটি। তবে খুব শীঘ্রই কেটে যাবে ভাবটা।

সবটা শোনার পর সোজা হয়ে বসলো স্কয়ার্স। বুকের ওপর হাত ভাঁজ করে রেখেছে। "অবিশ্বাস্য," বললো সে।

"হ্যাঁ, আমার মাথাতেও ঠিক এই শব্দটাই এসেছিল।"

"বুঝতে পারছি না বন্ধু," আরেকটা ব্যাগেল হাতে তুলে নিয়ে বললো সে। "এগারো বছর আগে খুন হওয়া তোমার পুরনো গার্লফ্রেন্ড আর তোমার বর্তমান গার্লফ্রেন্ড রুমমেট ছিল? পরেরজনও আবার খুন হয়েছে!"

"হ্যাঁ।"

"আর প্রথম খুনটার জন্যে তোমার ভাইকে দোষ দেয়া হয়।"

"আবারো, হ্যাঁ।"

"আচ্ছা," বলে আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো স্কয়ার্স। "তবুও কিছু বুঝতে পারছি না।"

"গোটা ব্যাপারটাই সাজানো," বললাম।

"কী সাজানো?"

"শিলা আর আমার ব্যাপারটা," নির্বিকার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাকানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু অভিনয়টা বিশ্বাসযোগ্য হলো বলে মনে হয় না। "পুরোটাই সাজানো নিশ্চয়ই। মিথ্যে।"

'হতেও পারে-না'ও হতে পারে' ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো স্কয়ার্স। মুখের ওপর এসে পড়া লম্বা চুলগুলো সরিয়ে বললো। "কতটা মিথ্যে?"

"জানি না আমি।"

"ভেবে দেখো।"

"ভেবেছি," বললাম। "সারারাত'।

"আচ্ছা, ধরলাম তোমার কথা ঠিক। শিলা তোমার সাথে মিথ্যে বলেছে বা অভিনয় করেছে।"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু কেন?" দুই হাত উঁচু করে বললো সে।

"আবারো, জানি না আমি।"

"তাহলে সম্ভাবনাগুলো যাচাই করে দেখি," বললো স্কয়ার্স। "এক, গোটা ব্যাপারটাই হয়তো কাককাতালীয়।"

ওর দিকে তাকালাম।

"শেষ করতে দাও আমাকে। তুমি আর জুলি মিলার তো প্রেম করতে প্রায় বারো বছর আগে?"

"হ্যাঁ।"

"হয়তো শিলা ভুলে গেছে। মানে, কয়জন বন্ধুর পুরনো প্রেমিক বা প্রেমিকার নাম মনে থাকে আমাদের? হয়তো জুলি তোমাকে নিয়ে কখনো কথাই বলেনি ওর সাথে। কিংবা শিলার আসলেই মনে ছিল না তোমার নাম। পরে যখন তোমাদের দেখা হলো..."

এখনও আগের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি ওর দিকে।

"নাহ, এরকম কিছু সম্ভাবনা কম," বলে মাথা ঝাঁকালো আনমনে। "দ্বিতীয় সম্ভাবনা-," বলে দুটো আঙুল দেখালো স্কয়ার্স। "-নাহ কিছু মাথায় আসছে না।"

"জানতাম।"

চুপচাপ পেটপূজো করলাম দুজনে কিছুক্ষণ। স্কয়ার্স অবশ্য ভেবেই চলেছে। "আচ্ছা, ধরে নিলাম যে শিলা শুরু থেকেই জানতো তুমি কে।"

"বেশ।"

"নাহ, কিচ্ছু মাথায় ঢুকছে না আমার।"

"অবিশ্বাস্য," ওর সুরেই বললাম।

শাওয়ারের শব্দ থেমে গেল এসময়। একটা পোস্ত দানা ছেটানো ব্যাগেল তুলে নিলাম আমি।

"পুরোটা রাত এসব নিয়েই ভেবেছি আমি," বললাম।

"আর?"

"ঘুরে ফিরে নিউ মেক্সিকোর কথাই মনে হয়েছে।"

"কেন?"

"এফবিআই অ্যালবাকার্কিতে ঘটে যাওয়া একটা জোড়া খুনের ঘটনার ব্যাপারে শিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়েছিল।"

"তো?"

"জুলি মিলারও কিন্তু খুন হয়েছিল।"

"সেটার রহস্যও আজ অবধি অমীমাংসিত," বললো স্কয়ার্স। "যদিও তোমার ভাইকে সন্দেহ করে ওরা।"

"হ্যাঁ।"

"এখন তোমার মনে হচ্ছে এ দুটো ঘটনার মাঝে সম্পর্ক আছে।"

"আলবত আছে।"

মাথা নাড়লো স্কয়ার্স। "আমারো সেরকমই মনে হচ্ছে এখন, কিন্তু কীভাবে সেটা সম্ভব, তা জানি না।"

"আমিও না," স্বীকার করে নিলাম।

নীরবতা নেমে আসলো রান্নাঘরে। এসময় কেটি উঁকি দিল দরজায়। চেহারায় খানিকটা অসুস্থ ভাব। একবার গুঙিয়ে উঠে বললো, "আবারো বমি হয়েছে।"

"উন্নতি হচ্ছে তাহলে অবস্থার," বললাম আমি।

"আমার কাপড়-চোপড় কোথায়?"

"বেডরুমের ক্লোজেটে।"

ধন্যবাদ জানিয়ে বেডরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল সে। কাউচের ডান দিকটায় চোখ গেল আমার। এখানে বসে বই পড়ত শিলা। এসব কী হচ্ছে? *'কখনো না ভালোবাসার চাইতে কাউকে ভালোবেসে হারিয়ে ফেলা ভালো'*–এই উক্তিটার কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু সবচেয়ে বাজে অনুভূতিটা হচ্ছে, ভালোবাসার মানুষটাকে হারাবার পর এটা জানতে পারা যে সে কখনো ভালোই বাসেনি আপনাকে।

ফোন বেজে উঠলো। তবে এবারে অ্যান্সারিং মেশিনের জন্যে অপেক্ষা না করে দ্রুত রিসিভার তুলে নিলাম।

"হ্যালো?"

"ভন স্টার্নো বলছি।"

"কিছু জেনেছেন?"

"পুরো রাত কাজ করেছি এটা নিয়ে।"

"আর?"

"যতই বেশি সময় দিচ্ছি, ততই অদ্ভুত ঠেকছে সবকিছু।"

"খুলে বলুন সবকিছু।"

"আমার সোর্স দলিল আর করের কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। এটা জেনে রাখুন যে সে একজন সরকারি চাকুরিজীবি। ডিউটির সময় পার হয়ে যাবার পরে তাকে দিয়ে সব করিয়েছি আমি। সহজ না কিন্তু ব্যাপারটা–"

"ভন?" তার কথার মাঝেই বললাম।

"হ্যাঁ?"

"আপনার কর্মদক্ষতা নিয়ে আমি ইতোমধ্যে মুগ্ধ। কী জানতে পেরেছেন সেটা বলুন।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে," বললো সে। কাগজ ওল্টানোর শব্দ শুনতে পেলাম। "যে বাড়িটায় খুন হয়েছে সেটা ক্রিপকো নামের একটা কর্পোরেশনের নামে ইজারা নেয়া।"

"কোম্পানিটা কী করে?"

"কিছু না। কোন তথ্য নেই তাদের ব্যাপার। একটা খোলস বলতে পারেন।"

ভাবলাম কিছুক্ষণ।

"ওয়েন এনফিল্ডের একটা গাড়িও ছিল। ধূসর হোন্ডা অ্যাকর্ড। সেটাও ক্রিপকো কর্পোরেশনের নামে ইজারা নেয়া।"

"হয়তো তাদের জন্যে কাজ করতো সে।"

"হয়তো। সেটাই জানার চেষ্টা করছি এখন।"

"গাড়িটা এখন কোথায়।"

"এটা আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার," ভন বললো। "পুলিশ গাড়িটা লাসিদায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পেয়েছে। এখান থেকে প্রায় দুশো মাইল দূরে জায়গাটা।"

"তাহলে ওয়েন এনফিল্ড কোথায়?"

"আমাকে যদি ধারণা করতে বলেন, তাহলে বলবো সে মৃত। খুব সম্ভবত ভিক্টিম দুজনের একজন সে।"

"বাড়িটায় এক মহিলা আর বাচ্চা মেয়েকে দেখা গিয়েছিল না? তারা কোথায়?"

"কোন সূত্র পাইনি এ বিষয়ে। এমনকি তাদের পরিচয়টাও জানি না।"

"প্রতিবেশীদের সাথে কথা বলেছেন?"

"হ্যাঁ। যেমনটা আগেই বলেছিলাম–কেউই তাদের ব্যাপারে বেশি কিছু জানে না।"

"তারা দেখতে কেমন, এটা জেনেছেন?"

"ওহ।"

"কী ওহ?"

"এটা নিয়েই আপনার সাথে কথা আছে আমার।"

স্কয়ার্স খাচ্ছে, তবে কান খাঁড়া করে রেখেছে বুঝতে পারছি। কেটি এখনও আমার ঘর থেকে বের হয়নি। বেশ সময় লাগিয়ে কাপড় বদলাচ্ছে।

"চেহারার বর্ণনা বেশ অস্পষ্ট," ভন বললো। "মহিলার বয়স পঁয়ত্রিশের আশপাশে, চুল বাদামি। এটুকুই বলতে পেরেছে প্রতিবেশীরা। ছোট মেয়েটার নাম কেউ শোনেনি। তার বয়স এগারো কী বারো। এক প্রতিবেশী অবশ্য বলেছে মেয়েটা খুবই কিউট, তবে এই বয়সের সব বাচ্চার ক্ষেত্রেই এই কথা প্রযোজ্য। মি. এনফিল্ড লম্বায় ছয় ফিট, চুলে ক্রু কাট দেয়া আর মুখে চাপদাড়ি।"

"তাহলে সে খুন হয়নি," বললাম।

"কীভাবে নিশ্চিত হচ্ছেন?"

"ক্রাইম সিনের একটা ছবি দেখেছি আমি।"

"কখন?"

"এফবিআই আমার গার্লফ্রেন্ডের ব্যাপারে খোঁজখবর করার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিল আমাকে।"

"ভিক্টিমদের চেহারা দেখেছেন?"

"নাহ, তবে এটা নিশ্চিত যে তাদের কারো চুলে ক্রু কাট দেয়া ছিল না।"

"আচ্ছা, তাহলে পুরো পরিবারই উধাও হয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ।"

"আরেকটা ব্যাপার, উইল।"

"কী?"

"খুনগুলো যেখানে হয়েছে সেটা তুলনামূলক নতুন একটা পাড়া। মোটামুটি সবকিছু আছে সেখানে।"

"অর্থাৎ?"

"কুইক-গো'র নাম শুনেছেন? চেইন সুপার শপ।"

"হ্যাঁ, আমাদের এখানেও কুইক-গো আছে কয়েকটা।"

সানগ্লাস খুলে চোখে প্রশ্ন নিয়ে আমার দিকে তাকালো স্কয়ার্স।

"স্টোনপয়েন্টেও আছে একটা। স্থানীয় সবাই কেনাকাটা করে সেখান থেকে," ভন বললো।

"তো?"

"একজন প্রতিবেশী হলফ করে বলেছে যে খুনের ঘটনার দিন তিনটার সময় সেখানে ওয়েন এনফিল্ডকে যেতে দেখেছে সে।"

"আপনার কথা বুঝতে পারছি না, ভন।"

"এখনও বোঝেননি? কুইক-গো'র সবগুলো আউটলেটে সিকিউরিটি ক্যামেরা থাকে নিরাপত্তার জন্যে।"

"ওহ আচ্ছা," এতক্ষণে ধরতে পারলাম।

"আমি ইতোমধ্যে খোঁজ নিয়েছি," বলেই চলেছে ভন। "এক মাস অবধি সিকিউরিটি ক্যামেরার টেপগুলো রেখে দেয় ওরা।"

"আমরা যদি সেই দিনের টেপটা পাই," বললাম। "তাহলে মি. এনফিল্ডের চেহারা দেখা যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে।"

"যদি পাই, এখানেও সমস্যা। দোকানের ম্যানেজার লোকটা বেশ ত্যাড়া। আমাকে মুখের ওপর না বলে দিয়েছে।"

"কোন না কোন উপায় তো আছেই।"

"আপনার কোন বুদ্ধি থাকলে বলতে পারেন, উইল।"

আমার কাঁধে হাত রাখলো স্কয়ার্স। "কী হয়েছে?"

মাউথপিস হাত দিয়ে ঢেকে ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "কুইক-গো'র সাথে জড়িত কাউকে চেনো?"

"হয়তো অবাক হবে শুনে। কিন্তু নাহ, চিনি না।"

ধুর। কিছুক্ষণ ভাবলাম। ভন কুইক-গো'র বিজ্ঞাপনের জিঙ্গেলটা গুণগুণ করছে। সুরটাই এমন যে আপনা-আপনি মাথায় ঢুকে যায়। এসময় হঠাৎ মনে হলো যে ওদের নতুন বিজ্ঞাপনে মডেল হয়েছে পপ তারকা, জেরেমি। জিঙ্গেলটা তারই সুর করা।

জেরেমি। হাসিমুখে স্কয়ার্সের দিকে তাকালাম।

"কী?"

"তোমার তারকাখ্যাতি এবারও কাজে আসবে বোধহয়," বললাম।

তেত্রিশ

শিলা আর জুলি থাকতো *শি গামা* নামের একটা হোস্টেলে। আমার সাথে এখনও ভাড়া করা গাড়িটা আছে, তাই কেটি আর আমি দুজনে সিদ্ধান্ত নিলাম যে কানেক্টিকাটের হেভারটন ইউনিভার্সিটি থেকে ঘুরে আসবো। দুই ঘন্টার পথ।

এর আগে অবশ্য হেভারটন রেজিস্ট্রার অফিসে ফোন দিয়ে কিছু ব্যাপার জেনে নিয়েছি। বারো বছর আগে শি গামা হোস্টেলের হাউজমাদার ছিলেন মিস রোজ বেকার। তিন বছর আগে অবসর গ্রহণ করেছেন তিনি, তবে ক্যাম্পাসের পাশেই একটা বাড়িতে থাকেন। আমাদের এই তদন্ত অভিযানের উদ্দেশ্য মূলত তার সাথেই দেখা করা।

শি গামা হোস্টেলের সামনে গাড়ি থামালাম আমি। বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলোতে আগেও এদিকটায় এসেছি। দেখেই বোঝা যায় এটা একটা মেয়েদের হোস্টেল।

রোজ বেকারের বাড়িটা অবশ্য সে তুলনায় বেশ সাধারণ। জানালার পর্দাগুলোয় বিড়ালের আঁচড়ের দাগ, লাল দেয়ালের জ্বলে যাওয়া রঙ কেইপ কড ঘরানার একতলা বাড়িটার বয়স নির্দেশ করছে।

অন্য কোন সময় হলে অবশ্যই আগে থেকে যোগাযোগ করে আসতাম আমি। টিভিতে প্রায়ই দেখা যায় কর্তব্যরত গোয়েন্দা হুট করে এসে হাজির হয়। ব্যাপারটা একই সাথে অবাস্তব এবং অসুবিধাজনক মনে হতো আমার কাছে, তবে এখন কিছুটা বুঝতে পারছি কেন অমন করে তারা।

রেজিস্ট্রার অফিসে যে মহিলা ফোন ধরেছিল তার বোধহয় হাতে তখন খুব বেশি কাজ ছিল না। সময় নিয়েই কথা বলেছে। তার কাছ থেকেই শুনেছি যে সাধারণত বাসা থেকে খুব একটা বের হন না রোজ বেকার। আর কোন কারণে বের হলেও, খুব বেশি দূরে যায় না। তাছাড়া, রোজ বেকারকে যদি

আসার আগে ফোন দিতামই, কী বলতাম? হ্যালো, কয়েকটা খুনের ঘটনা নিয়ে কথা বলতে চাই আপনার সাথে। নাহ, এর চেয়ে বরং কেটিকে নিয়ে চলে আসার সিদ্ধান্তটাই ঠিক ছিল। দেখা যাক কী জানতে পারি। রোজ বেকার যদি বাড়িতে না-ও থাকে, লাইব্রেরির আর্কাইভ ঘাঁটাঘাঁটি করতে পারবো বা সরোরিটি হাউজটা থেকে ঘুরে আসতে পারবো।

ক্যাম্পাসের মধ্যে দিয়ে রোজ বেকারের বাড়ির উদ্দেশ্যে হেঁটে আসার সময় কাঁধে ব্যাগ ঝোলানো ছাত্র-ছাত্রীদের দেখে কিছুটা ঈর্ষাই হচ্ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনটা আমি বেশ উপভোগ করেছি। সবকিছুই ভালো লাগতো তখন। বন্ধুদের সাথে আড্ডা, নিজের মতো থাকা, জামাকাপড় গাদি করে মেঝেতে ফেলে রাখা, মাঝরাতে পিজ্জা খাওয়া–এসব স্মৃতি এখনও ঠোঁটের কোণে হাসি নিয়ে আসে। মুক্তমনা অধ্যাপকদের সাথে আলাপ করতে ভালো লাগতো। আবার দেখা যেত মাঝে মাঝে একদম সাধারণ বিষয় নিয়ে বিশাল বিতর্ক জুড়ে দিয়েছি কোন বন্ধুর সাথে।

বাড়িটার ওয়েলক্যাম ম্যাটের সামনে দাঁড়াতে পরিচিত একটা গানের সুর শুনতে পেলাম। মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা দেয়ালের কারণে শব্দটা একটু ভোঁতা শোনাচ্ছে, তবুও এই গান যে কোন পরিস্থিতিতে চিনতে পারবো আমি। এলটন জনের 'ক্যান্ডল ইন দ্য উইন্ড'। দরজায় কড়া নাড়লাম।

ভেতর থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে এলো, "এক মিনিট।"

কয়েক সেকেন্ড পরে দরজা খুলে উঁকি দিলেন সত্তরের কাছাকাছি বয়সের এক মহিলা। খুব সম্ভবত মিস রোজ বেকার। তবে তার পরনে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে যাবার পোশাক দেখে অবাক হলাম। মাথা থেকে পা অবধি কালোয় মোড়ানো। গালের লালচে মেক-আপটা তাড়াহুড়ো করে করা হয়েছে মনে হচ্ছে। আমাদের দেখে তা মুখটা পুরো হাঁ হয়ে গেল, চোখে অবিশ্বাস।

"মিসেস বেকার?" বললাম।

"জি?" বিভ্রান্ত শোনাচ্ছে তার কণ্ঠ।

"আমার নাম উইল ক্রেইন। ও কেটি মিলার।"

কেটির দিকে নজর ঘুরে গেল তার। চোখ সরাতেই পারছে না।

"আমরা কি ভুল সময়ে এসে পড়েছি?"

প্রশ্নটা শুনে অবাক হলেন বলে মনে হলো। "না, মোটেও না।"

"কিছু কথা ছিল আমাদের, যদি আপনার সময় হয় আরকি।"

"কেটি মিলার," আমার কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন তিনি।

"জি, ম্যাম," বললাম।

"জুলির বোন।"

প্রশ্নের মতো করে কথাটা বলেননি মিস বেকার, তবে কেটি ঠিকই মাথা নাড়লো। দরজা পুরোপুরি খুলে দিলেন তিনি। "ভেতরে এসো তোমরা।"

তার পিছু পিছু লিভিংরুমে পা রাখলাম আমরা। সাথে সাথে থমকে গেলাম।

রাজকুমারী ডায়না।

সবখানে রাজকুমারী ডায়না। দেয়াল থেকে শুরু করে সিলিং পর্যন্ত। শুধু যে ছবি, তা নয়। নানা রকম শোপিস, টি সেট, এমব্রয়ডারি করা বালিশ, ল্যাম্প, পুতুল, বই এমনকি টুথব্রাশও আছে! বরং বলা যেতে পারে যে কী নেই? এখন বুঝতে পারছি, যে গানটা কিছুক্ষণ আগে শুনছিলাম সেটা আসলে রাজকুমারী ডায়নার স্মৃতির উদ্দেশ্যে গাওয়া এলটন জনের গানটার বিশেষ সংস্করণ।

"তোমাদের কি মনে আছে প্রিন্সেস ডায়না কবে মারা গিয়েছিলেন?"

কেটির সাথে চোখাচোখি হলো একবার। দুজনেই ওপর নিচে মাথা নাড়লাম।

"পুরো পৃথিবী কীরকম স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, মনে আছে?"

আবারো মাথা নাড়লাম আমরা।

"বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু কিছুদিন পর শোক ভুলে আবারো আগের জীবনে ফিরে গিয়েছিল। খুব বেশিদিন গুরুত্ব দেয়নি। এক পর্যায়ে-" বলে একবার ডান হাতে তুড়ি বাজালেন তিনি। "তার অস্তিত্বই ভুলে যায় সবাই।"

"কিন্তু আমাদের অনেকের জন্যে ডায়না, ওয়েলসের রাজকুমারি, একজন অ্যাঞ্জেল। এই কদাকার পৃথিবীর যোগ্যতা নেই তার মতো মানুষের কদর করার। তাই আমরা অল্প কয়েকজন তার স্মৃতি ধরে রেখেছি," বলে চোখ মুছলেন তিনি।

একটা মন্তব্য মুখে এসে গিয়েছিল প্রায়, কিন্তু শেষ মুহূর্তে আর কিছু বললাম না।

"প্লিজ, বসো তোমরা," একটু পর বললেন তিনি। "চা খাবে?"

আমি আর কেটি দুজনই ভদ্রভাবে মানা করে দিলাম।

"বিস্কুট খাও।"

বলে রান্নাঘরে গিয়ে একটা প্লেটে কিছু কুকি নিয়ে এলেন তিনি (হ্যাঁ, প্রিন্সেস ডায়নার মুখের আদলে তৈরি)। কেটি বা আমি ছুঁয়েও দেখলাম না, এই অসময়ে এরকম অরুচিকর কিছু খাওয়ার ইচ্ছে নেই কারো।

"মিসেস বেকার," কাজের কথা তুললাম। "কেটির বোন, জুলিকে কি আপনার মনে আছে?"

"হ্যাঁ, অবশ্যই," বলে কুকির প্লেটটা নামিয়ে রাখলেন তিনি। "আমার দায়িত্বে থাকা সব মেয়েকে মনে আছে। আমার স্বামী, ফ্র্যাঙ্ক এখানে ইংরেজির অধ্যাপক ছিল। ১৯৬৯ সালে মারা যায়। আমি নিঃসন্তান, তাই পরবর্তী ছাব্বিশ বছর হোস্টেলের মেয়েদের নিয়েই ছিল আমার জীবন।"

"আচ্ছা," বললাম।

"আর জুলির কথা সবথেকে ভালো করে মনে আছে। রাতে ঘুমোনোর সময় এখনও প্রায়ই স্বপ্নে দেখি ওকে। বিশেষ করে ওর সাথে ঘটে যাওয়া ঐ ঘটনাটার জন্যে।"

"খুনের ঘটনার কথা বলছেন?" জানি একদমই বোকার মতো একটা প্রশ্ন। কিন্তু আমি এই লাইনে নতুন, চাইছি না তিনি কোন কারণে কথা থামিয়ে দেন।

"হ্যাঁ," বলে হাত বাড়িয়ে কেটির মাথায় একবার হাত বুলিয়ে দিলেন তিনি। "বড্ড দুঃখজনক ঘটনা।"

কেটি কেবল মাথা নাড়লো চোখ নিচু করে।

জানি, বড্ড খেলো শোনাবে কথাটা, কিন্তু চারদিকে প্রিন্সেস ডায়নার এতগুলো ছবি থাকলেও, জুলির ছবি কিন্তু একটিও নেই। শোক কি তাহলে কেবল রাজপরিবারের লোকদের জন্যে বরাদ্দ?

"মিসেস বেকার, আপনার কি শিলা রজার্সের কথা মনে আছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ, মনে আছে," কেবল এটুকুই বললেন তিনি সোজা হয়ে।

তার প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট যে শিলার খুন হওয়া সম্পর্কে কিছু জানেন না এখনও। সিদ্ধান্ত নিলাম এ ব্যাপারে কিছু বলবো না। তাছাড়া শিলার নাম শোনার পর তার মুখে ক্ষণিকের জন্যে বিরক্তির ছাপ দেখেছি। সেটার কারণটাও জানতে হবে। এখন যদি বলে বসি শিলা রজার্স মারা গেছে, তাহলে হয়তো ইচ্ছে করে অনেক কিছু চেপে যেতে পারেন। মৃত কারো সম্পর্কে খারাপ কিছু বলা সহজ নয়।

"একটা প্রশ্ন করি?" আমি কিছু বলার আগেই মিস. বেকার হাত তুললেন।

"অবশ্যই।"

"এতদিন পর এসব কেন জিজ্ঞেস করছো?" বলে এক ঝলক কেটির দিকে তাকালেন তিনি।

"সত্যটা উদঘাটনের চেষ্টা করছি," এবারে কেটি জবাব দিল।

"সত্য?"

"এখানে আসার পর আমার বোন বদলে যায়।"

চোখ বন্ধ করে ফেললেন রোজ বেকার। "এসব শুনতে তোমার ভালো লাগবে না, মা।"

"না," শরীর টানটান হয়ে গেল কেটির, কণ্ঠে আকুতি। "শুনতেই হবে আমাদের।"

আরো কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রাখলেন রোজ বেকার। এরপর লম্বা একটা শ্বাস নিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন। পরনের জামাটা ঠিকঠাক করে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার বয়স কত?"

"আঠারো।"

"জুলি যখন এখানে প্রথমে এসেছিল, তখন এই বয়সেরই ছিল," হেসে বললেন তিনি। "তোমাকে একদম ওর মতো দেখা যায়।"

"এই কথাটা অনেকবার শুনেছি।"

"প্রশংসা হিসেবেই নিও। জুলির মতো প্রাণোচ্ছল মেয়ে খুব কমই দেখেছি আমি। চারপাশটা আলো করে রাখতো। ডায়নার সাথে বেশ মিল তার। দুজনেই-স্বর্গীয়," বেশ ভেবে 'স্বর্গীয়' শব্দটা উচ্চারণ করলেন। "আবার দুজনেই একদম দুধে ধোয়া তুলসী পাতা না। একটু একগুঁয়ে ধরনের। তবে জুলি মানুষ হিসেবে খুব ভালো ছিল। পড়াশোনার দিক দিয়েও।"

"তবুও," বললাম আমি। "বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে দেয় সে।"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"রাজকুমারী ডায়না চেষ্টা করেছিলেন নিজেকে সামলাতে, কিন্তু শেষ অবধি ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হননি। দৈব নিজের মর্জিতে চলে।"

"আপনার কথা বুঝতে পারছি না," কেটি বললো।

রাজকুমারী ডায়নার ছবি সম্বলিত ঘড়িটা বেজে উঠলো এসময়। বিগ বেনের সস্তা অনুকরণ। "বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে বদলে যায় মানুষ। অনেকেই জীবনে প্রথমবারের মতো বাইরে একা থাকতে আসে..." বাক্যটা শেষ করলেন না তিনি। ভাবছিলাম যে আমার কিছু বলতে হবে হয়তো, কিন্তু কিছু পর নিজেই আবার কথা বলে উঠলেন। "নাহ, বোধহয় বোঝাতে পারছি না। প্রথম দিকে জুলির সব ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু এরপরেই কী যেন একটা হয় ওর, নিজেকে গুটিয়ে নিতে থাকে সবকিছু থেকে। আমাদের সাথেও ঠিকমত কথা বলে না। তার পুরনো বয়ফ্রেন্ডের সাথে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলে। হাইস্কুলের প্রেম সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষেই ভেঙে যায়, কিন্তু ওরটা তৃতীয় বর্ষ অবধি টিকেছিল। আমার ধারণা ছেলেটাকে আসলেই ভালোবাসতো ও।"

ঢোক গিললাম শব্দ করে।

"একটু আগে," রোজ বেকার বললেন, "তোমরা শিলা রজার্সের ব্যাপারে কথা বলছিলে।"

"হ্যাঁ," কেটি বললো।

"ও অনেকটাই বাজে প্রভাব ফেলেছে।"

"কীরকম?"

"শিলাও সেই একই বছরে থাকতে আসে হোস্টেলে-" বলার পর গালে এক আঙুল রেখে মাথাটা দোলালেন মিস বেকার যেন নতুন কিছু মনে হয়েছে, "হয়তো সে-ই দুর্ভাগ্যের বেশে এসেছিল। পাপারাজ্জিদের পিছু নেয়ার কারণে যেমন প্রিন্সেস ডায়ানার গাড়ির গতি বেড়ে যায়। আর নচ্ছার ড্রাইভারটার রক্তে অ্যালকোহলের মাত্রা স্বাভাবিকের চাইতে তিনগুণ বেশি ছিল, জানো?"

"শিলা আর জুলির মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে," তাকে আবারো মূল বিষয়ে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করলাম।

"হ্যাঁ।"

"রুমমেট ছিল, তাই না?"

"কিছু সময়ের জন্যে, হ্যাঁ," চোখের কোণে জল চিকচিক করছে তার। "বড্ড নাটুকে শোনাবে হয়তো কথাটা, কিন্তু শিলা রজার্স আসার পরেই যেন আমার হোস্টেলে খারাপ বাতাস লাগে। শুরুতেই ওকে বের করে দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু তার কৃতকর্মের কোন প্রমাণ থাকতো না কখনোই।"

"কী করেছিল সে?"

আবারো মাথা ঝাঁকালেন মিস বেকার।

কিছুক্ষণের জন্যে সেই সময়টায় ফিরে গেলাম। তৃতীয় বর্ষে জুলি আমার সাথে দেখা করার জন্যে একবার অ্যামহার্স্টে এসেছিল। আমাকে কিন্তু সবসময় ও মানা করতো হেভারটনে আসতে, তাই একটু অবাকই হয়েছিলাম। তবে ক্যাম্পাসে না দেখা করে একটা সরাইখানায় গিয়েছিলাম আমরা। তখন ব্যাপারটা রোমান্টিক লেগেছিল, কিন্তু এখন আর সেরকমটা মনে হয় না।

এর তিন সপ্তাহ পরে জুলি ফোনেই ব্রেক-আপ করে। এখন মনে হচ্ছে যে তখন আমার সাথে দেখা করতে আসার পর গোটা সময়টাই বেশ অদ্ভুত আচরণ করেছিল সে। মিস্টিক নামের সেই সরাইটায় কেবল এক রাতের জন্যে ছিলাম আমরা। সেক্সের সময়েও অন্যমনস্ক মনে হচ্ছিল ওকে। টের পাচ্ছিলাম যে আমার থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। অবশ্য ও পড়াশোনার অতিরিক্ত চাপের অজুহাত দেখিয়েছিল। আমিও সরল মনে বিশ্বাস করে নিয়েছিলাম সেটা, কারণ মনে মনে চাচ্ছিলাম আসলেও সেরকম কোন কারণ থাকুক।

তবে এখন সবকিছু জানার পরে বুঝতে পারছি যে কতটা ভুল ছিলাম আমি। শিলা এখানে এসেছিল লুইস কাস্টম্যানের সাথে কাটানো সেই পাপের জীবনটাকে পিছে ফেলে। আর এরকম একটা জীবনের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাওয়া শক্ত। তাই শিলা যখন জুলির তৃতীয় বর্ষের শুরুতে ওর রুমমেট হিসেবে একসাথে থাকতে শুরু করে, ধীরে ধীরে বদলে যেতে থাকে সে।

সবকিছু মিলে যাচ্ছে।

"শিলা রজার্স কি গ্র্যাজুয়েশন পুরো করেছিল?"

"না, সে-ও ড্রপ-আউট।"

"জুলির সাথেই?"

"ব্যাপারটা তো প্রাতিষ্ঠানিক কিছু না। এমন না যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওদের বের করে দেয়া হয়েছিল। আমার মনে আছে যে শেষদিকে ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। দুপুর পর্যন্ত ঘুমোতো। আমি যখন এসব নিয়ে কথা বলি–" একটু ধরে আসলো তার কণ্ঠ, "হোস্টেল থেকে চলে যায় সে।"

"কোথায় যায়?"

"ক্যাম্পাসের বাইরে একটা অ্যাপার্টমেন্টে। শিলাও ওখানেই থাকতো।"

"শিলা ড্রপ-আউট করলো কবে?"

কিছুক্ষণ ভাবার অভিনয় করলেন মিসেস বেকার। 'অভিনয়' শব্দটা ব্যবহার করলাম কারণ উত্তরটা যে তার ভালো করেই জানা আছে সে বাপারে আমি নিশ্চিত। "জুলি মারা যাবার পর।"

"কত দিন পর?" জিজ্ঞেস করলাম।

"খুনের খবরটা শোনার পর ওকে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না," চোখ নিচু করে বললেন তিনি।

কেটির দিকে তাকালাম। তার দৃষ্টিও মেঝের দিকে। মুখে হাতচাপা দিলেন রোজ বেকার। খেয়াল করলাম যে হাতটা কাঁপছে প্রাক্তন হাউজমাদারের।

"শিলা কোথায় যায় সেটা জানা আছে আপনার?"

"না। একদম উধাও হয়ে যায় মেয়েটা। একদিক দিয়ে সেটাই ভালো হয়েছিল।"

ইচ্ছেকৃতভাবে আমাদের চোখ এড়িয়ে যাচ্ছেন তিনি। ব্যাপারটা অস্বস্তিদায়ক।

"মিসেস বেকার?"

এবারেও চোখ তুললেন না।

"মিসেস বেকার, আর কী হয়েছিল?"

"এখানে এসেছো কেন তোমরা?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"বললাম তো আপনাকে। জানতে চাই যে-"

"হ্যাঁ, কিন্তু এতদিন পর কেন?"

কেটির দিকে তাকালাম একবার। মাথা নাড়লো সে। মিসেস বেকারের দিকে ফিরে বললাম, "গত পরশু খুন হয়েছে শিলা রজার্স।"

প্রথমে মনে হলো আমার কথা কানে যায়নি তার। আবারো মেঝের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন। এতক্ষণে আরেকটা ব্যাপার খেয়াল করলাম, এই ঘরে প্রিন্সেস ডায়না বাদে আর কারো কোন ছবি নেই। এমনকি মিসেস বেকারের স্বামীর ছবিও না। হয়তো ব্যাপারটা ইচ্ছেকৃত। স্মৃতির উদ্রেক ঘটে এমন ছবিগুলো উদ্দেশ্যপূর্ণভাবেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

"মিসেস বেকার?"

"তাকেও কি অন্যদের মতো শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে?"

"না," বলেই থমকে গেলাম। কেটির দিকে তাকিয়ে দেখি তার চোখেও বিস্ময়। "অন্যদের মতো ?"

"হ্যাঁ।"

"মানে?"

"জুলিকে শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছিল," বললেন তিনি।

"হ্যাঁ।"

কাঁধ ঝুলে গেল তার। তার মুখের ভাঁজগুলো আগের তুলনায় স্পষ্ট। আমাদের আগমন তার স্মৃতির সাগরে ভালো আলোড়ন তুলেছে। "তোমরা লরা এমারসনের ব্যাপারে কিছু জানো না, তাই না?"

আরো একবার চোখাচোখি হলো আমার আর কেটির। "না," বললাম।

"তোমরা কি আসলেও চা খাবে না," আবারো ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছে মিসেস বেকারের দৃষ্টি।

"প্লিজ, মিস বেকার। সব বলুন আমাদের। লরা এমারসন কে?"

উঠে দাঁড়িয়ে ফায়ারপ্লেসের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। "হোস্টেলের আরেকজন," ক্ষীণস্বরে বললেন। "জুলির চেয়ে এক বছরের ছোট।"

"কী হয়েছিল তার সাথে?"

ফায়ারপ্লেসের ম্যান্টল থেকে হাত দিয়ে ধূলো পরিষ্কার করলেন তিনি। "নর্থ ডাকোটায় বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় লরাকে। তাকেও শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছিল।"

শীতল একজোড়া হাত যেন পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেছে আমাকে। ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেটির চেহারা। আমার দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাকালো সে, তার জন্যেও নতুন ব্যাপারটা।

"খুনি কে, সেটা কি জানা গিয়েছিল?" জিজ্ঞেস করলাম।

"না," বললো রোজ বেকার।

"মিসেস বেকার, জুলির হত্যাকাণ্ডের পর পুলিশ আপনার সাথে যোগাযোগ করেছিল?"

"পুলিশ না।"

"কেউ তো করেছিল?"

মাথা নেড়ে সায় জানালেন তিনি। "এফবিআই থেকে দুই এজেন্ট এসেছিল।"

"তাদের নাম মনে আছে আপনার?"

"না।"

"লরা এমারসনের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করেছিল তারা আপনাকে?"

"না, তবে আমি নিজ থেকেই বলেছি।"

"কী বলেছিলেন?"

"এটা মনে করিয়ে দিয়েছিলাম যে কিছুদিন আগে আরেকটা মেয়েকে একইভাবে খুন করা হয়েছে।"

"তাদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?"

"তারা বলেছিল খবরটা চেপে যেতে। নতুবা তাদের তদন্তে সমস্যা হবে।"

এতগুলো নতুন তথ্য সামলাতে হিমশিম খাচ্ছি আমি। বড্ড দ্রুত ঘটছে সবকিছু। একই হোস্টেলে থাকতো এমন তিনজন মেয়ে খুন হয়েছে। এর মধ্যে আবার দুটো খুনের ধরণ একইরকম। এফবিআইয়ের লোকেরা আমাদের বুঝিয়েছে যে জুলির খুনটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা।

যেখানে শুরু থেকেই সবটা জানতো তারা।

কিন্তু কেন?

চৌত্রিশ

রাগ সামলাতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে আমাকে। ইচ্ছে করছে পিস্টিলোর অফিসে ঢুকে কলার ধরে জিজ্ঞেস করি কেন ইচ্ছে করে এত বড় একটা বিষয় চেপে গেছে তারা। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্কদের একটা বড় সমস্যা, ইচ্ছে হলেই হুটহাট কিছু করে বসা যায় না। আসার পথে বেশ লম্বা একটা সময় জ্যামে বসে থাকতে হলো। হর্ন দিতে দিতে হাত ব্যাথা করে ফেললাম প্রায়। বারবার স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে এই রাস্তা-সেই রাস্তা করেও কোন লাভ হলো না।

কেটি তার মোবাইল ফোন থেকে রনি নামের এক বন্ধুকে ফোন দিল। কম্পিউটারে নাকি বেশ ভালো দখল ছেলেটার। সে ইন্টারনেট ঘেঁটে লরা এমারসন সম্পর্কে যা তথ্য জানালো আমাদের, তার বেশিরভাগই জানা। জুলি মারা যাবার আট মাস আগে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে তাকে। নর্থ ডাকোটার ফ্রেসেনডেনে কোর্ট ম্যানর মটর লজে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃত্যুর পরবর্তী দুই সপ্তাহ খুনের ঘটনাটা নিয়ে বেশ লেখালেখি হলেও একসময় গুরুত্ব হারায় অন্যান্য খবরের কাছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে পৌছে গেলাম ফেডারেল প্লাজায়। গাড়ি পার্ক করে বিল্ডিংটার দিকে প্রায় দৌড়ে চললাম আমরা। মাথা উঁচু করে সোজা ভেতরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করেও লাভ হলো না। সিকিউরিটি চেকপয়েন্টে আটকে গেলাম পকেটের চাবিটার জন্যে। বেশ কিছুটা সময় নষ্ট হলো তল্লাশিতে।

পিস্টিলোর অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে যতটা সম্ভব দৃঢ়কণ্ঠে বললাম যে তার সাথে দেখা করতে চাই। কিন্তু আমার কণ্ঠের দৃঢ়তা তার সেক্রেটারির ওপর তেমন প্রভাব ফেললো বলে মনে হয় না। মুখে হাসি ফুটিয়ে আমাদের বসতে বললো সে। কেটি আমার দিকে তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকালো একবার। কিন্তু আমি বসলাম না। বরং খাঁচায় আটকে পড়া সিংহের মতো পায়চারি করতে থাকলাম করিডোরে। রাগ ধীরে ধীরে পড়ে যাচ্ছে।

পনেরো মিনিট পর, সেক্রেটারি এসে বললো যে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জোসেফ পিস্টিলো এখন আমাদের সাথে দেখা করবেন। (হ্যাঁ, ঠিক এভাবেই বলেছে কথাটা)।

পিস্টিলো দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্যে। "উনি কে?" কেটির দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"কেটি মিলার," বললাম।

এবারে আর বিস্ময় গোপন করতে পারলেন না। "আপনি ওনার সাথে কী করছেন?" কেটিকে জিজ্ঞেস করলেন।

কিন্তু এসব ছাইপাশ শুনতে এখানে আসিনি আমি। "আপনারা কখনো লরা এমারসনের ব্যাপারে কিছু বলেননি কেন আমাদের?"

"কে?" আমার দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বললেন।

"এসব ফাজলামো আমার সাথে করবেন না, মি. পিস্টিলো।"

তৎক্ষণাৎ কোন জবাব দিলেন না অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। "আমরা বসে কথা বলি?"

"আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।"

আমার দিক থেকে চোখ না ঘুরিয়েই চেয়ারে বসলেন। ডেস্কটা চকচক করছে। বাতাসে লেমন এয়ার ফ্রেশনারের গন্ধ।

"এভাবে হুট করে এসে কোন কিছু জানতে চাইতে পারেন না আপনি।"

"লরা এমারসনকে জুলির মৃত্যুর আটমাস আগে শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়।"

"তো?"

"দুজনেই একই হোস্টেলে থাকতো।"

ডেস্কের ওপর দুহাত রেখে অপেক্ষা করার ভঙ্গিতে আমাদের দিকে তাকালেন পিস্টিলো।

"আপনি কি এখন এটা বলবেন যে এ ব্যাপারে কিছু জানতেন না?" বললাম।

"না, আমি জানতাম।"

"কিন্তু দুটোর মধ্যে কোন সংযোগ আছে বলে মনে হয়নি আপনার?"

"ঠিক বলেছেন।"

একবারের জন্যেও কাঁপছে না তার কণ্ঠ। এর আগেও এরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন নিশ্চয়ই।

"মজা করছেন?"

এখন দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। যদিও দেখার মতো কিছু নেই সেখানে। প্রেসিডেন্ট বুশের একটা ছবি এবং অ্যামেরিকার জাতীয় পতাকা ঝুলছে এক পাশে। "আমরা ঘাঁটাঘাঁটি করেছিলাম ব্যাপারটা নিয়ে।

স্থানীয় গণমাধ্যমগুলোও বেশ সরব হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুটো কেসের মধ্যে কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়নি।"

"অসম্ভব।"

"লরা এমারসনের ঘটনাটা ঘটেছিল সম্পূর্ণ অন্য একটা স্টেটে, অন্য একটা সময়ে। তাছাড়া ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতনের কোন আলামতও পাওয়া যায়নি। একটা মোটেল থেকে উদ্ধার করা হয় তার লাশ। জুলি–" বলে কেটির দিকে তাকালেন তিনি, "আপনার বোনকে পাওয়া যায় নিজের বাসায়।"

"তারা যে একই হোস্টেলে থাকতো, এই ব্যাপারটা?"

"কাকতালীয়।"

"মিথ্যে বলছেন," বললাম।

এতক্ষণে রাগের ছাপ দেখা যাচ্ছে তার চেহারায়। "সাবধানে কথা বলুন।"

"তাহলে আপনার মতে দুটো কেসের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল না?"

"না।"

"কিন্তু এখন?"

"এখন মানে?"

আবারো রাগ দানা বাঁধছে আমার ভেতরে। "শিলা রজার্সও সেই একই হোস্টেলে থাকতো। এটাকেও কাকতাল বলবেন?"

আমি যে এই ব্যাপারে কথা বলবো, তা আশা করেননি ভদ্রলোক। আসলেও জানতো না নাকি পুরোটাই অভিনয়? "একটা চলমান তদন্তের ব্যাপারে আপনাদের সাথে কোন আলোচনা করতে পারবো না আমি।"

"আপনি জানতেন," ধীরে ধীরে বললাম। "আর এটাও জানতেন যে আমার ভাই নির্দোষ।"

"আমি এরকম কিছু জানতাম না," বলে মাথা ঝাঁকালেন তিনি। "এখনও জানি না।"

কিন্তু তার কথা বিশ্বাস হলো না আমার। শুরু থেকেই মিথ্যে কথা বলে আসছেন। আমার পরবর্তী অভিযোগ শোনার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি, এমন সময় নরম কণ্ঠে বললাম, "আপনার কি ধারণা আছে যে আমার পরিবারকে কেমন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে? আমার বাবা, আমার মা..."

"এসবের সাথে আপনাদের কোন সম্পর্ক নেই, উইল।"

"একশোবার আছে।"

"আপনাদের দুজনকেই বলছি, এগুলো নিয়ে আর ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না।"

"না," তার চোখে চোখ রেখে বললাম।

"আপনাদের নিরাপত্তার জন্যেই বলছি, বিশ্বাস করুন।"

"নিরাপত্তা? কেন? কোন বিপদ হতে পারে নাকি আমাদের? কে ক্ষতি করবে, শুনি?"

জবাব দিল না সে।

"কে?" আবারো জিজ্ঞেস করলাম।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন পিস্টিলো। "এবারে আপনারা আসুন।"

"আমার ভাইয়ের পেছনে কেন লেগে আছেন আপনারা?"

"চলমান কোন তদন্তের ব্যাপারে আমি আর একটা কথাও বলবো না," বলে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। তার পথ আগলে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে পাশ কেটে চলে গেলেন। "এই কেস থেকে দূরে থাকবেন, নতুবা তদন্তে বাঁধা দেয়ার জন্যে গ্রেফতার করা হবে।"

"ওকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন কেন?"

থেমে ঘুরে দাঁড়ালেন পিস্টিলো। কিছু একটা বদলে গেছে তার অভিব্যক্তিতে। পিঠ টান করে দাঁড়িয়ে আছেন এখন। "আসলেও কথা বলতে চান এ বিষয়ে, উইল?"

তার কণ্ঠস্বরের এরকম হঠাৎ পরিবর্তন ভালো ঠেকলো না আমার কাছে। উত্তরে কী হবে জানা সত্ত্বেও ইতস্তত করে বললাম, "হ্যাঁ।"

"তাহলে আপনাকে দিয়েই শুরু করা যাক।"

"আমাকে দিয়ে?"

"আপনি তো এ ব্যাপারে বরাবরই খুব আত্মবিশ্বাসী যে আপনার ভাই নির্দোষ," আগ্রাসী হয়ে উঠছে তার ভঙ্গিমা। "কেন?"

"কারণ ওকে আমি খুব ভালো করে চিনি।"

"আসলেই? মিস জুলি মিলার খুন হবার আগ দিয়ে আপনাদের দুজনের ঘনিষ্ঠতা কেমন ছিল?"

"সবসময়ই ঘনিষ্ঠ ছিলাম আমরা।"

"প্রায়ই দেখা হতো?"

"দেখা না হলেই যে ঘনিষ্ঠতা থাকবে না, এমন তো কোন কথা নেই।"

"তাই? আচ্ছা এবার বলুন তাহলে, আপনার কি মনে হয়? কে খুন করেছে জুলি মিলারকে?"

"জানি না।"

"বেশ। তাহলে আমরা আপনার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সেরাতে কি হয়েছিল তা ভাবার চেষ্টা করি?" আমার দিকে এক পা এগিয়ে এলেন পিস্টিলো। পাশার দান উল্টে গেছে। তার মুখে কথার খই ফুটছে এখন, কেন তা জানি না। "আপনার প্রিয় ভাই, যার সাথে আপনি অনেক ঘনিষ্ঠ ছিলেন, আপনার প্রাক্তন প্রেমিকা সাথে খুনের রাতে মিলিত হয়েছিলেন। এটাই তো আপনার থিওরি?"

"হ্যাঁ," চোখমুখ কুঁচকে বললাম।

"আপনার প্রাক্তন প্রেমিকা আর ভাই উদ্দাম লীলাখেলায় মত্ত," মুখ দিয়ে আফসোস জাতীয় শব্দ করলেন পিস্টিলো। "প্রচণ্ড রাগ লাগছিলো নিশ্চয়ই?"

"কী আবোল তাবোল বকছেন?"

"সত্য বলছি, উইল। আপনি তো সত্যই শুনতে চান, তাই না? তাহলে আর রাখঢাকের দরকার কী?" একবারের জন্যেও আমার দিক থেকে শীতল দৃষ্টিটা সরাচ্ছেন না তিনি। "দুই বছরের মধ্যে প্রথমবার বাড়ি ফিরলো আপনার ভাই। আর ফিরেই কী করলো? আপনার ভালোবাসার মানুষটার সাথে তাদেরই বাসায় গিয়ে–"

"আমাদের সম্পর্ক আরো এক বছর আগেই ভেঙে গিয়েছিল," দুর্বল কণ্ঠে বললাম।

হাসি ফুটলো তার চেহারায়। "সবসময় তো এটা বলেই স্বান্তনা দিয়েছেন নিজেকে, নাকি? আচ্ছা, আপনার মতে খুনের রাতে মিলারদের বাড়ির আশেপাশে রহস্যজনক কাউকে ঘোরাফেরা করতে দেখেছিলেন।"

"হ্যাঁ।"

"কীভাবে দেখলেন?"

"মানে?" জিজ্ঞেস করলাম ঠিকই, কিন্তু আমি জানি তিনি কী বোঝাতে চাচ্ছেন।

"মিলারদের বাড়ির বাইরে কাউকে দেখেছিলেন, তাই তো?"

"হ্যাঁ।"

পিস্টিলো হেসে হাত দিয়ে আমার দিকে ইঙ্গিত করলেন। "কিন্তু আপনি সে রাতে কী করছিলেন, তা কখনো আমাদের বলেননি," তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে মজার কোন আলাপ করছেন। "আপনি, উইল। মিলারদের বাসার বাইরে। একা। গভীর রাত। ভেতরে আপনার ভাই আর প্রাক্তন..."

আমার দিকে তাকালো কেটি।

"হাঁটতে বেরিয়েছিলাম।"

ঘরের মধ্যেই পায়চারি শুরু করলেন পিস্টিলো। "নিশ্চয়ই। তাহলে ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াচ্ছে। ভেতরে আপনার ভাই আর আপনার প্রাক্তন প্রেমিকা যৌনতায় মত্ত। ঠিক তখনই আপনি হাঁটতে বের হলেন। আপনার ভাইয়ের রক্ত ক্রাইম সিনে পেলাম আমরা। কিন্তু আপনি, উইল, এটা নিশ্চিত যে খুনটা আপনার ভাই করেনি।"

থেমে আবারো আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন তিনি। "আপনি যদি তদন্ত অফিসার হতেন, তাহলে কাকে সন্দেহ করতেন?"

বুকের ওপর ভারী একটা পাথর চেপে বসেছে যেন।

"আপনি কী বলতে চাইছেন..."

"আমি বলতে চাইছি যে আপনারা এখন বাড়ি যান," পিস্টিলো বললেন। "এটুকুই। বাড়ি যান, আর দুজনই এই কেস থেকে দূরে থাকবেন।"

পঁয়ত্রিশ

কেটিকে বাসায় পৌঁছে দেয়ার প্রস্তাব দিলেন পিস্টিলো। কিন্তু সে মানা করে দিয়ে বললো আমার সাথেই থাকবে। ব্যাপারটা পছন্দ হলো না অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের, কিন্তু এইক্ষেত্রে কিছু করার নেই তার।

অ্যাপার্টমেন্টে আসার পথে কেউ কিছু বললাম না। ভেতরে ঢোকার পর আমার সংগ্রহের টেক-ওয়ে রেস্টুরেন্টের মেন্যুগুলো দেখালাম ওকে। চাইনিজ অর্ডার দিল কেটি। নিচে গিয়ে নিয়ে আসলাম সেটা। সাদা বক্সগুলো টেবিলের রেখে দু পাশে বসে পড়লাম আমরা। সবসময় যেখানটায় বসি, সেখানেই বসেছি আমি। আর কেটি বসলো শিলার চেয়ারে। চকিতে শিলার সাথে একসাথে বসে চাইনিজ খাওয়ার একটা স্মৃতি ভেসে উঠলো মানসপটে। সদ্য গোসল সেরে বের হয়েছিল, ওর দেহের সুগন্ধটা এখনও পাচ্ছি মনে হলো...

কত অদ্ভুত স্মৃতি মনে রাখে মানুষ।

আবারো বেদনার সাগরে পর্যদুস্ত হলাম কিছুক্ষণের জন্যে। চুপ করে কিছুক্ষণ কোথাও বসে থাকলেই এই অবস্থা হয়।

প্লেটে কয়েক চামচ ফ্রায়েড রাইস ঢেলে নিয়ে কিছুটা লবস্টার সস তুলে নিলাম। "আজরাতেও থেকে যাবে?"

কেটি ওপর নিচে মাথা নাড়লো।

"বেডরুমে থাকো তাহলে," বললাম।

"নাহ্, কাউচে সমস্যা হবে না।"

"আসলেই?"

"হ্যাঁ।"

কিছুক্ষণ খাওয়ার অভিনয় করলাম দুজনে।

"জুলিকে খুন করিনি আমি।"

"জানি।"

আবারো কিছুক্ষণ খাওয়ার অভিনয়।

"সে রাতে ওখানে এসেছিলে কেন?" অবশেষে জিজ্ঞেস করেই বসলো সে।

একবার হাসার চেষ্টা করলাম। "হাঁটতে বেরিয়েছিলাম এই কথাটা বিশ্বাস হয়নি?"

"না।"

চপস্টিক দুটো সাবধানে নামিয়ে রাখলাম। এরকম একটা ব্যাপার নিয়ে কীভাবে আমার প্রাক্তনের বোনের সাথে আলাপ করবো তা বুঝে উঠতে পারছি না। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, আমি যাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম, তারই চেয়ারে বসে আছে মেয়েটা। দুজনই খুন হয়েছে। দুজনের সাথেই আমার সম্পর্ক ছিল। মাথা তুলে বললাম, "আসলে আমি বোধহয় তখনও জুলিকে ভুলতে পারিনি।"

"ওর সাথে দেখা করতে চেয়েছিলে?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু?"

"কিন্তু আমি বেল বাজানোর পরেও কেউ দরজা খোলেনি," বললাম।

কিছুক্ষণ ব্যাপারটা নিয়ে ভাবলো কেটি। এরপর প্লেটের দিকে তাকিয়ে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রেখে বললো, "খুবই অদ্ভুত একটা সময়ে গিয়েছিলে।"

চপস্টিক দুটো তুলে নিলাম আবারো।

"উইল?"

মাথা নিচু করে রেখেছি।

"তুমি কি জানতে যে তোমার ভাইও ওখানে আছে?"

চুপচাপ খাবার নাড়াচাড়া করছি। এখন মুখ তুলে আমাকে দেখছে কেটি। আমার সামনের অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খোলার শব্দ কানে এলো। নিচে হর্ন বাজাচ্ছে একটা গাড়ি। রাস্তায় রাশিয়ান ভাষায় কে যেন চেঁচাচ্ছে।

"তুমি জানতে," কেটি বললো, "তুমি জানতে যে কেইন আমাদের বাসায় আছে। জুলির সাথে।"

"আমি তোমার বোনকে মারিনি।"

"কী হয়েছিল, উইল?"

বুকের ওপর হাত ভাঁজ করে রাখলাম। চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘাড় কাত করে তাকালাম ওর দিকে। এই স্মৃতিটা নিয়ে কখনো কথা বলিনি কারো সাথে। কিন্তু কেটি জানতে চাচ্ছে এখন। জানার অধিকার আছে তার।

"খুবই অদ্ভুত একটা উইকেন্ড ছিল," শুরু করলাম। "জুলি আর আমার ব্রেক-আপের প্রায় এক বছর হয়ে গেছে ততদিনে। ব্রেক-আপের পর ওর সাথে দেখাও হয়নি। চেষ্টা করেছিলাম দেখা করার, কিন্তু ও রাজি হয়নি।"

"অনেকদিন বাসাতেও ছিল না," কেটি বললো।

"কেইনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এজন্যেই আরো বেশি অদ্ভুত লাগছিলো সবকিছু। আমরা তিনজন একই সময়ে ফিরে এসেছি লিভিংস্টোনে। এরকম শেষ কবে হয়েছিল তা বলতে পারবো না। কেইনের ব্যবহার কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকছিলো শুরু থেকেই। সবসময় জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতো। বাড়ি থেকে বের হতো না। আমি বুঝতে পারি যে কোন একটা সমস্যা হয়েছে। একদিন হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করে যে জুলিকে ভুলে গেছি কিনা। জবাবে বলি 'হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে সব চুকে-বুকে গেছে'।"

"মিথ্যে বলেছিলে।"

"মানে কেমন যেন ছিল ব্যাপারটা..." সঠিক শব্দ খুঁজে পাচ্ছি না। "আমার ভাইকে প্রায় পূজো করতাম আমি। যেরকম সাহস, সেরকম শক্তি..." মাথা ঝাঁকালাম। ঠিক ভাবে বলছি না কথাটা, তাই শুরু করলাম আবারো, "আমার যখন ষোলো বছর বয়স, পরিবারের সবার সাথে স্পেনে ঘুরতে যাই। কোস্টা দেল সোল ছিল জায়গাটার নাম। ফ্লোরিডায় যেমন গ্রীষ্মের ছুটিতে ইউরোপিয়ানরা ছুটে আসে, ওখানেও সেরকমই ছিল ব্যাপারটা। কেইন আর আমি হোটেলের কাছেই অবস্থিত একটা ডিস্কোতে রোজ যেতাম। চতুর্থ দিন ড্যান্স ফ্লোরে নাচছি সবাই, এই সময় একটা ছেলে ইচ্ছে করে ধাক্কা দিল আমাকে। একবার তার দিকে তাকালেও কিছু বললাম না। কিছুক্ষণ পর আবার আরেকজন ধাক্কা দিল, এবারো চুপ থাকলাম। কিন্তু এর একটু পরে যখন প্রথম ছেলেটা ধাক্কা দিল, তাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাই," এটুকু বলে কেটির দিকে তাকালাম। "তখন কী করি জানো?"

মাথা ঝাকালো কেটি।

"চিৎকার করে কেইনকে ডাকি। উঠেও বসিনি বা ওদের কাউকে পাল্টা ধাক্কাও দেইনি। বরং বড় ভাইকে ডেকে উঠি।"

"ভয় পেয়েছিলে।"

"সবসময় এমনই হতো," বললাম।

"সেটাই স্বাভাবিক।"

আমার তা মনে হয় না।

"এসেছিল কেইন?" কেটি জানতে চাইলো।

"অবশ্যই।"

"আর?"

"মারামারি বেঁধে যায়। ওরা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান একটা দেশ থেকে এসেছিল, বেশ অনেকজন একসাথে। বেদম মার খেলো কেইন, ডান হাত ভেঙে গিয়েছিলো।"

"আর তুমি?"

"কিছুই করিনি, পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম গাধার মতো। বরং ওদেরকে থামানোর চেষ্টা করি। কেইনের ডান হাত ভেঙে যায় সেই ঘটনায়," বলে চুপ

করলাম কিছুক্ষণের জন্যে। কেইন সবসময় বলতো যে মারামারিতে ব্যাথা লাগলে কিছুক্ষণ পরেই ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু কাপুরুষের মতো আচরণ করলে সারাজীবন পস্তাতে হবে। "ডানহাতেই টেনিস খেলতো ও। এরপরে আর কখনো আগের মতো সার্ভ করতে পারেনি। খেলার কারণে স্ট্যানফোর্ড কলেজ আগ্রহ দেখিয়েছিল ওর প্রতি। কিন্তু শেষমেষ আর পড়তে পারিনি।"

"সেটা তো তোমার দোষ না।"

ভুল বলছে কেটি। "যাইহোক, আমি বোঝাতে চেয়েছি যে সবসময় আমাকে রক্ষা করতো কেইন। হ্যাঁ, ঝগড়াও হতো। কিন্তু বিপদের সময় আমার জন্যে লড়াই করতে বাঁধতো না ওর কখনো। আমার এই সাহসটা ছিল না।"

গালে হাত রাখলো কেটি।

"কী?" জিজ্ঞেস করলাম।

"ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত, এই যা।"

"কী অদ্ভুত?"

"এটাই যে জুলির সাথে শোয়ার আগে তোমার ভাই দুবার ভাবেনি।"

"ওর কোন দোষ ছিল না। আমাকে তো জিজ্ঞেসও করেছিলো জুলির ব্যাপারে।"

"অনুমতি দিয়েছিলে তুমি।"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু তার পিছুও নিয়েছিলে।"

"তুমি বুঝবে না," বললাম।

"না, বুঝেছি," কেটি বললো। "আমরা সবাই এরকম বোকার মতো কাজ করি।"

ছত্রিশ

এতটাই গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলাম যে তার আগমন টেরই পেলাম না।

কেটির জন্যে ধোয়া চাদর আর কম্বল বের করে দিয়ে গোসল সেরে বিছানায় উঠি আমি। কিছুক্ষণ বই পড়ার চেষ্টা করেও লাভ হয় না। সবগুলো অক্ষর কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছিলো। বারবার একই প্যারায় ঘুরপাক খেতে থাকি। কম্পিউটার চালু করে ইন্টারনেট ঘাঁটি কিছুক্ষণ। স্কয়ার্সের দেখানো পদ্ধতিতে ইয়োগার ভঙ্গিতে স্ট্রেচিং করি। ব্যস্ত থাকতে চাচ্ছিলাম, যাতে দুঃখটা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসতে না পারে আমার দিকে।

এক পর্যায়ে প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। স্বপ্নহীন গভীর ঘুম। হঠাৎ মনে হয় কে যেন আমার হাত ধরে টানছে। কিছু একটা আটকানো শব্দ কানে আসে কিছুক্ষণ পর। ঘুমের মধ্যেই হাত নাড়ানোর চেষ্টা করি, কিন্তু লাভ হয় না। ধাতব কী যেন লাগানো কব্জির সাথে।

চোখ খোলার সাথে সাথে আমার ওপর লাফিয়ে পড়ে সে। হাঁটু দিয়ে আমার দুই কাঁধ চেপে ধরে দ্রুত মুক্ত হাতটা ওপরের দিকে নিয়ে যায়। এবারে শব্দ না শুনলেও টের পাই যে ধাতব কিছু একটা লাগানো হলো সেই হাতেও।

এখন আমার দুই হাতই বিছানার সাথে আটকানো।

প্রথম কিছুক্ষণ মুখ দিয়ে কোন আওয়াজই বেরুলো না। এরকম পরিস্থিতিতে সবসময়ই এমন হয়ে আসছে আমার সাথে। কিছুক্ষণ পর একটু ধাতস্থ হয়ে যখন চিৎকার করতে যাবো, আমার মুখের চারপাশে শক্ত করে ডাক্ট টেপ পেঁচিয়ে দেয় আততায়ী। প্রায় দশ-বারোবার ঘোরায় সে টেপটা।

এখন আর চিৎকার করা বা কিছু বলা সম্ভব না আমার পক্ষে। শ্বাস নেয়াটাই কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাঙা নাক দিয়ে কোনমতে অক্সিজেন টানার

চেষ্টা করছি। নড়ার চেষ্টা করেও কোন লাভ হলো না। জিজ্ঞেস করতে চাইছি যে সে কি চায়, কিন্তু সেটা অসম্ভব।

ঠিক এসময় মনে হলো যে অন্য ঘরটায় কেটি একা আছে।

চারদিকে অন্ধকার। শুধু একটা ছায়াবয়ব চোখে পড়ছে। খুব সম্ভবত মুখোশে ঢাকা তার চেহারা। শ্বাস নেয়া আরো কষ্টকর হয়ে উঠছে ক্রমশ।

আমার মুখে টেপ পেঁচানো শেষে এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বিছানা থেকে নেম গেল সে। আতঙ্কিত চোখে দেখলাম দরজার দিকে হেঁটে যাচ্ছে হারামিটা। কেটি যেখানে ঘুমোচ্ছে সেই ঘরে পা দিয়ে দরজাটা আটকে দিল।

চোখ যেন কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে আমার। চিৎকার করার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম কিছুক্ষণ। মোচড়া-মোচড়ি, পা ছোড়াছুঁড়ি করলাম। সব বৃথা। থেমে কান পাতলাম। চারপাশে থকথক করছে নীরবতা।

এমন সময় কেটি চেঁচিয়ে উঠলো।

ঈশ্বর! এতটা অসহায় বোধ করিনি আগে কখনো। মাঝপথেই থেমে গেল চিৎকারটা। পাগলে মতো ছোটাছুটি করছি, হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করছি। বৃথা, সব বৃথা।

আবারো কানে এলো কেটির চিৎকার।

তবে এবারের আওয়াজ আগের চেয়ে ক্ষীণ, আহত জন্তুর মত। বাইরের কারো কানে যাবে না এই শব্দ। আর কেউ শুনতে পেলেও কোন লাভ নেই, এটা নিউ ইয়র্ক। রাতের এই সময়ে কেউ কাউকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। আর কেউ যদি পুলিশকে ফোনও দেয়, তাদের আসতে আসতে বড্ড দেরি হয়ে যাবে।

প্রচণ্ড অসহায় লাগছে। মৃগী রোগীদের মতো কাঁপছে পুরো শরীর। নাকে প্রচণ্ড ব্যাথা। ডাক্ট টেপের খানিকটা অংশ ছিড়ে আমার মুখের ভেতরে ঢুকে গেলো। কিন্তু এত ধস্তাধস্তি সত্ত্বেও লাভের খাতা শূন্য।

শান্ত হও, নিজেকেই বোঝানর চেষ্টা করলাম। ভাবো।

ডান দিকে হ্যান্ডকাফটার দিকে তাকালাম। অতটা শক্ত মনে হচ্ছে না। যদি ধীরে ধীরে আমার হাত বের করে আনার চেষ্টা করি, লাভ হতেও পারে। কিন্তু সেজন্যে সম্পূর্ণ শান্ত হতে হবে আগে।

এক মুহূর্ত পর কাজে লেগে পড়লাম। সবগুলো আঙুল একসাথে চাপিয়ে এনে হাতকড়াটা থেকে বের করে আনার চেষ্টা করছি। ধীরে ধীরে জোর বাড়ালাম। ছিলে যাচ্ছে কব্জির কাছটায়, কিন্তু সেদিকে নজর দিলে চলবে না। টানতেই থাকলাম।

কাজ হচ্ছে না।

অন্য রুমটা একদম চুপচাপ।

কান পেতে শব্দ শোনার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোন আওয়াজ নেই। কাত হয়ে বিছানা থেকে নামার চেষ্টা করলাম এরপর। আমি ওঠার চেষ্টা করলে

হয়তো বিছানাটা উল্টেই যাবে। যাক। আরো কিছুক্ষণ চেষ্টা করেও কোন লাভ হলো না। এখনও বন্দী আমি।

আবারো কেটির কণ্ঠ ভেসে এলো পাশ থেকে। তবে এবারে সে কী বলেছে তা পরিষ্কার। "জন–"

মাঝপথেই থেমে গেল আগেরবারের মতো।

জন, ভাবলাম আমি।

অ্যাসেন্টা?

ঘোস্ট!

ঈশ্বর! না! গোঙানোর শব্দ শুনতে পেলাম। আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন পাঁজর ভেঙে বেরিয়ে আসবে। ভয় অসাড় করে তুলছে আমাকে। ডানে-বামে তাকালাম, কিছুই কী নেই?

ফোন।

পারবো...? আমার পা দুটো এখনও মুক্ত। হয়তো পা দিয়ে তুলে এনে কোনভাবে হাতে রিসিভারটা নিতে পারলে ৯১১-এ ডায়াল করা সম্ভব হবে। পা উঠিয়ে চেষ্টা করা শুরু করলাম। পেটের পেশিতে চাপ পড়ছে। কিন্তু সেদিকে আমার আর কোন খেয়াল নেই। এসময় পায়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারালাম। ধাক্কা লেগে রিসিভারটা মেঝেতে পড়ে গেল।

ধুর।

এখন কী করবো? আমার মাথা আর কাজ করছে না। ফাঁদে আটকা পড়া পশুদের কথা মনে পড়ছে, যারা একটা পা বা হাত নিজেরাই কামড়ে ছিঁড়ে ফেলে মুক্তির আশায়। পাগলের মতো হাত দুটো নাড়িয়ে চলেছি, এমন সময় স্কয়ার্সের শেখানো একটা ইয়োগা আসনের কথা মনে পড়লো।

হালাসন।

কোথাও শুয়ে দুই হাত মাটিতে ঠেকিয়ে পা উঁচু করে মাথার দুপাশে নিয়ে এসে ঠেকানো। বেশ কঠিন। আমি করতে পারবো কিনা জানি না। কিন্তু এখন সেসব নিয়ে ভাবাই যাবে না। পেট চাপিয়ে ওপরের দিকে পা উঠিয়ে দিলাম। গোড়ালি দুটো মাথার কাছে দেয়ালে গিয়ে ঠেকলো। থুতনি বুক স্পর্শ করে আছে এখন। নিঃশ্বাস নিতে আরো কষ্ট হচ্ছে।

পা দিয়ে দেয়ালে ধাক্কা দিচ্ছি যতটা জোরে সম্ভব। অ্যাড্রেনালিনের কারণেই হোক আর অন্য যে কোন কারণেই হোক, গায়ে জোর বেড়ে গেছে। ধাক্কার ফলে কিছুটা দূরত্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম হলাম দেয়াল থেকে। পুরো বিছানাটাই সরে আসলো। যদি দুই হাতে হ্যান্ডকাফ বেশি শক্ত করে আটকানো থাকে, হাত যদি ওগুলোর ভেতরে না ঘুরতে পারে তাহলে সমূহ সম্ভাবনা আছে দুই পাশের ডানা সরে যাওয়ার। সরুক।

স্তব্ধ চারপাশ। কোন শব্দ কান আসছে না নিজের হুটোপুটি ছাড়া।

উল্টো দিকে ডিগবাজি দেয়ার চেষ্টা করছি। বেশ কিছুক্ষণ পর সফল হলাম। ভারের কারণে মেঝেতে গিয়ে ঠেকলো আমার দুই পা। ভাগ্য ভালো

বলতে হবে, হাত দুটো হ্যান্ডকাফের ভেতরেই ঘুরে যাওয়াতে সেরকম কোন অসুবিধে হলো না। তবে দুই উরু থেকে শুরু করে তলপেট অবধি ভালোরকম ছিলে গেল।

এখন আমি বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছি।

হাত দুটো এখনও আটকানো। মুখে টেপ পেঁচানো। কিন্তু আমি দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছি অবশেষে। শরীরের অ্যাড্রেনালিনের প্রভাব টের পেলাম আবারো।

এখন কী করবো?

সময় নেই। হাঁটু ভাঁজ করে কাঁধ দিয়ে বিছানার একপাশের হেডবোর্ডে ধাক্কা দিয়ে দরজার দিকে ঠেলতে লাগলাম। দেখে মনে হতে পারে বিশাল ভারি কোন জিনিস প্রাণপণে ঠেলছি। যন্ত্রের মতো কাজ করে চলেছে আমার পা দুটো। কিন্তু দ্বিধা দ্বন্দ্বের কোন বালাই নেই।

শব্দ করে দরজায় বাড়ি খেলো বিছানা। প্রচণ্ড জোরে। ব্যাথার একটা হলকা ছুটে গেল আমার কাঁধ থেকে পুরো শরীরে। মট করে একটা শব্দ হলো, চোখে আঁধার দেখলাম কিছুক্ষণ। কিন্তু মাথা ঝাঁকিয়ে নিজেকে সামলে নিলাম পরক্ষণেই, দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছি সবকিছু। পেছনে এগিয়ে এসে আবারো বিছানা সমেত ধাক্কা দিলাম সামনের দিকে। আবার। আবার। চতুর্থবারে সর্বশক্তিতে ধাক্কা দেয়ার পর ঠিক বিছানাটা দরজা ছোঁয়ার মুহূর্তে হাত দুটো হ্যান্ডকাফ থেকে ছুটিয়ে আনার চেষ্টা করলাম।

বিছানার দুই পাশের খুঁটি ছুটে গেল।

আমি মুক্ত।

দরজার সামনে থেকে সরিয়ে ফেললাম বিছানাটা। টেপগুলো খোলার চেষ্টা করতে গিয়ে মনে হলো বেশি সময় লাগবে। পরেও করা যাবে এই কাজ। দরজার খুলে পাশের ঘরে দৌড়ে গেলাম।

কেটি মেঝেতে পড়ে আছে।

চোখ বন্ধ। শরীর নিস্তেজ। লোকটা তার বুকের ওপর উঠে গলা চেপে ধরেছে।

শ্বাসরোধ করে মারবে।

কোন প্রকার ইতস্তত না করে রকেটের মতো ছুটে গেলাম তার দিকে। আততায়ী নিশ্চয়ই আমাকে দেখেছিল। তবুও আমাকে ঠেকানোর জন্যে হলেও কেটিকে ছেড়ে দিতে হবে তাকে। ঘুরে আমার মুখোমুখি হলো হারামিটা। অন্ধকারে এখনও তার চেহারা স্পষ্ট নয়। আমার কাঁধে হাত দিয়ে আমারই গতিবেগ ব্যবহার করে শুধু উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিল পা দিয়ে।

উড়ে ঘরের অন্য পাশে গিয়ে পড়লাম। ভাগ্য ভালো বলতে হবে, নরম চেয়ারের ওপরে পড়েছি। তবে বেশিক্ষণ ভালো থাকলো না ভাগ্য। ভার সইতে না পেরে উল্টে গেল চেয়ারটা। মেঝেতে পড়ার আগে টেবিলের কোনায় ধাক্কা খেল মাথার একপাশ।

তীব্র ব্যাথা আর ঝিম অনুভূতি উপেক্ষা করে হাঁটুতে ভর দিয়ে বসলাম। দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি এসময় একটা দৃশ্য দেখে জমে গেলাম সেখানেই।

আততায়ীও উঠে দাঁড়িয়েছে, তার হাতে এখন একটা ছুরি। কেটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

সময় যেন ধীর হয়ে এলো এই মুহূর্তে। পরবর্তীতে যা ঘটলো তার জন্যে বড়জোর দুই কি তিন সেকেন্ড দরকার, কিন্তু মনে হচ্ছে শ্লো মোশনে ঘটছে সবকিছু। সময় আসলেও আপেক্ষিক।

এত দূর থেকে তাকে আটকানো সম্ভব না আমার পক্ষে। তাছাড়া মাথা ঘোরাচ্ছে, সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারছি না। এমন সময় টেবিলে গুঁতো খেলাম...

টেবিল!

স্কয়ার্সের বন্দুকটা তো এখানেই!

কিন্তু এখন কি সময় আছে ওটা হাতে নিয়ে গুলি চালানোর? কেটি এবং আততায়ীর দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না। না, সময় নেই।

নিচু হয়ে কেটির চুল মুঠো করে ধরলো লোকটা।

বন্দুকটা খুঁজতে খুঁজতে মুখের টেপ ছিঁড়ে ফেরলাম খানিকটা। "থামো, নাহলে গুলি করবো।"

অন্ধকারেই মুখ ফিরিয়ে তাকালো সে আমার দিকে। মেঝেতে উবু হয়ে বসে পড়েছি ততক্ষণে, কমান্ডোদের মতো। যখন দেখলো আমার হাতে কোন বন্দুক নেই, কাজ শেষ করার জন্যে কেটির দিকে ফিরলো আবারো। আমার হাত ততক্ষণে খুঁজে পেয়েছে বন্দুকটা। তাক করার কোন সময় নেই। ট্রিগার টেনে দিলাম।

প্রচণ্ড শব্দে থমকে গেল আততায়ী।

সময় পেলাম কিছুটা। বন্দুকটা সামনে নিয়ে এসে আবারো ট্রিগারে চাপ দিলাম। দড়াবাজদের মতো ডিগবাজি দিয়ে সেখান থেকে সরে গেল আততায়ী। তার ছায়াবয়বটা এখনও দেখতে পাচ্ছি। চোখের আন্দাজে বেশ কয়েকবার গুলি ছুড়লাম। এই বন্দুকে একসাথে কতগুলো গুলি ধরে? জানি না।

একবার কেঁপে উঠলো তার শরীর, কিন্তু এখনও দরজার দিকে এগোচ্ছে। গুলি কি আদৌ একটা লেগেছে তার গায়ে?

দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল সে। চেঁচিয়ে থামতে বলছি তাকে। কিন্তু থামলো না। ভাবলাম পিঠ বরাবর গুলি চালাবো। কিন্তু সেই মুহূর্তে কেন কাজটা করলাম না, বলতে পারবো না। দয়া? হতে পারে। তাছাড়া এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে চিন্তা মাথায় ঘুরছে এখন।

কেটির দিকে তাকালাম। একদম নড়ছে না।

সাঁইত্রিশ

আরেকজন অফিসার এলেন আমার জবানবন্দি নিতে। এর আগে কম করে হলেও চারজনের কাছে একই ফিরিস্তি দিয়েছি ইতিমধ্যে।

"আমি আগে জানতে চাই যে কেটির কী অবস্থা এখন?" বললাম।

আমার দিক থেকে এখন নজর ফিরিয়ে নিয়েছেন কর্তব্যরত ডাক্তার। সিনেমাতে দেখা যায় যে ডাক্তাররা সাধারণত তাদের রোগীদের পুলিশী জেরা থেকে বাঁচায় বা অন্তত *ঠেকানোর* চেষ্টা করে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে সেরকমটা হয়নি। জরুরী বিভাগে এক তরুণ পাকিস্তানি ডাক্তার হাসিমুখে পুলিশ অফিসারকে বলেন যে সে তার কাজ চালিয়ে যেতে পারে। এর মাঝেই আমার কাঁধের ডানা আবার আগের অবস্থানে ফিরিয়ে আনলো সে। কব্জির ক্ষতের ওপর আয়োডিন ছিটিয়ে একটা বিশাল করাত বের করে হাতকড়া দুটো কেটে ফেললো (হাসপাতালে করাত কী করছিলো, সে ব্যাপারে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করে কোন লাভ নেই)। পুরোটা সময় কিন্তু পুলিশের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলাম আমি। এখনও ঘুমোনো পোশাক আমার পরনে। পায়ে হাসপাতালের পাতলা স্যান্ডেল।

"আমার প্রশ্নের উত্তর দিন," পুলিশ অফিসার বললো।

গত দুই ঘণ্টা ধরে এরকমটাই চলছে। অ্যাড্রেনালিনের প্রভাব কমে যাওয়ায় ব্যাথাগুলো আগের চেয়ে প্রবলভাবে অনুভব করছি। আর সহ্য হচ্ছে না।

"হ্যাঁ, সব স্বীকার করে নিচ্ছি," বললাম। "প্রথমে নিজেই নিজের হাতে হাতকড়া পরাই। এরপর ঘরে কিছু আসবাবপত্র ভাঙচুর করি আর গুলি ছুঁড়ি ইচ্ছেমতন। মেয়েটাকে গলা চেপে আধমরা করে নিজের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে আপনাদের ফোন দেই। স্বীকার করে নিলাম।"

"এটাও অসম্ভব না," আমাকে অবাক করে দিয়ে বললো অফিসার। তার মোম দেয়া গোঁফটা দেখে মনে হচ্ছে কোন থিয়েটার দলের সদস্য। নামটা বলেছিল, কিন্তু ভুলে গেছি।

"সরি?"

"সন্দেহ অন্য দিকে ঘোরানোর চেষ্টা।"

"আমি আমার শোল্ডার জয়েন্ট ডিসলোকেট করেছি, হাত কেটেছি, বিছানা ভেঙে ফেলেছি শুধুমাত্র সন্দেহ অন্য দিকে ঘোরানোর জন্যে?"

গতানুগতিক আর দশজন পুলিশ অফিসারদের মতোই পাত্তা না দেয়ার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাকালো সে। "এর আগে একজনকে দেখেছিলাম নিজের পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলতে। প্রথমে বলেছিল একদল কৃষ্ণাঙ্গ তাদের আক্রমণ করেছিল। আসলে তার ইচ্ছে ছিল একটুখানি কাটবে কিন্তু ভুলে পুরোটাই কেটে ফেলবে।"

"চমৎকার একটা গল্প।"

"এখানেও সেরকম কিছু ঘটতে পারে।"

"আমার পুরুষাঙ্গ ঠিকঠাকই আছে, ধন্যবাদ।"

"আপনি বলেছেন যে কেউ একজন আপনার অ্যাপার্টমেন্টে প্রবেশ করেছিল। প্রতিবেশীরা গুলির আওয়াজ পেয়েছে।"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে তাদের কেউ কেন কাউকে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরুতে দেখলো না?" সন্দিহান চোখে জিজ্ঞেস করলো অফিসার।

"কারণ, তখন রাত দুটো বাজছিল ঘড়িতে।"

এখনও জরুরী বিভাগের একটা টেবিলে বসে আছি পা ঝুলিয়ে। ঝিঁঝিঁ ধরে যাচ্ছে দেখে লাফিয়ে নামলাম।

"যাচ্ছেন কোথায়?"

"কেটিকে দেখতে।"

"সেটা সম্ভব হবে না," গোঁফ নাচিয়ে বললো অফিসার। "তার বাবা আছে এখন সেখানে।"

প্রতিক্রিয়ার আশায় আমার চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকলো কিছুক্ষণ, কিন্তু কিছু পেলো বলে মনে হয় না।

"আপনার ব্যাপারে কিন্তু অনেক কিছুই বলেছেন মিস মিলারের বাবা।"

"তা তো বলবেনই।"

"তার ধারণা আপনিই মূল কালপ্রিট।"

"উদ্দেশ্যটা কি আমার?"

"মানে আপনার মোটিভ কী?"

"না, উদ্দেশ্যে—মানে, এটা করে আমার কী লাভ? আপনার কি আসলেও মনে হয়ে যে ওকে খুন করার চেষ্টা করেছি আমি?"

নির্বিকার ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাকালো অফিসার। "না মনে করার তো কিছু নেই।"

"তাহলে ও বেঁচে থাকা অবস্থায় আপনাদের ফোন দিলাম কেন?" জিজ্ঞেস করলাম। "এত ঝামেলা যখন করলামই, ওকে একেবারে শেষ করে দিতে সমস্যা কী ছিল?"

"কাউকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলা খুব সহজ কিছু না," বললো সে। "হয়তো ভেবেছিলেন যে মারা গেছে।"

"আপনার নিজের কানেও বোকার মতো শোনাচ্ছে না কথাটা?"

তার পেছনের দরজাটা খুলে গেল এসময়। একটা পরিচিত মুখ দেখতে পেলাম। কিছুক্ষণ আগে আমাকে যে অফিসার এটাসেটা প্রশ্ন করছিল তার সাথে পিস্টিলো ঢুকেছে ভেতরে। চোখে রাজ্যের হতাশা। আমার সামনে দাঁড়ানো গোঁফঅলা অফিসারকে ইশারায় সরে যেতে বললো সে। জিজ্ঞাসাবাদের মাঝে এরকম সরে যেতে বলায় বিরক্ত হলেও মুখে কিছু বললো না অফিসার। পিস্টিলোর সাথে এখন একা আমি।

প্রথম কিছুক্ষণ কোন কথা হলো না। রুমের ভেতরে পায়চারি করলেন তিনি কিছুক্ষণ। এটা-সেটা নেড়ে দেখলেন। হাসপাতালের ঘরগুলোতে সাধারণত অ্যান্টিসেপ্টিকের গন্ধ থাকলেও এই ঘরটায় কড়া আফটার শেভের গন্ধ। নাক কুঁচকে আছেন পিস্টিলো, আমার অবশ্য সয়ে গেছে এতক্ষণে।

"কী হয়েছিলো খুলে বলুন," বললেন তিনি।

"কেন, আপনার পুলিশ বন্ধুটি কিছু বলেনি?"

"তাদের বলেছি যে আপনার মুখ থেকেই যা শোনার শুনবো," পিস্টিলো বললেন। "নতুবা এতক্ষণে আপনাকে জেলে ঢুকিয়ে দিত।"

"কেটি কেমন আছে সেটা জানতে চাই আমি।"

আমার অনুরোধটা নিয়ে দুই সেকেন্ড ভাবলেন। "ভোকাল কর্ডে সাময়িক অস্বস্তি আর গলার চারপাশে দাগ থাকবে কিছুদিন, এছাড়া বাকি সব ঠিকঠাক।"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম একটা।

"শুরু করুন," পিস্টিলো বললো।

কী ঘটেছে, সে ব্যাপারে সব খুলে বললাম। কেটির মুখে 'জন' নামটা শুনেছি, এটা বলার পর হাত উঁচু করে আমাকে থামালেন।

"এই 'জন'-টা কে হতে পারে, কোন ধারণা আছে আপনার?"

"হয়তো আছে।"

"বলুন।"

"ছোটবেলা থেকেই তাকে চিনি আমি। জন অ্যাসেল্টা।"

ফ্যাকাসে হয়ে গেল পিস্টিলোর চেহারা।

"আপনি চেনেন তাকে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"এত কিছু থাকতে আপনার এটা কেন মনে হলো যে সে জন অ্যাসেন্টার কথা বুঝিয়েছে?" আমার প্রশ্নটা পুরোপুরি উপেক্ষা করে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"আমার নাকের এই অবস্থার জন্যে সে-ই দায়ী।"

ঘোস্ট যে আমার অ্যাপার্টমেন্টে এসেছিল, সে ব্যাপারেও বিস্তারিত বললাম।

"অ্যাসেন্টা আপনার ভাইকে খুঁজছে?"

"সেটাই তো বলেছিল।"

লাল হয়ে উঠলো তার চেহারা। "এটা আমাকে আগে বলেননি কেন?"

"আসলেই," বললাম। "আপনি তো সবসময় আমাকে সহায়তা করে এসেছেন সব ব্যাপারে! বলা উচিত ছিল।"

আমার কণ্ঠের শ্লেষটা ধরতে পারলেও সে ব্যাপারে কিছু বললেন না তিনি। "জন অ্যাসেন্টার ব্যাপারে কিছু জানেন আপনি?"

"একই শহরে বড় হয়েছি। তাকে ঘোস্ট বলে ডাকতো সবাই।"

"অ্যাসেন্টা আমার চেনা সবচেয়ে পাগলাটে লোকদের একজন," বলে মাথা ঝাঁকালেন পিস্টিলো। "সে আসেনি আপনার অ্যাপার্টমেন্টে।"

"এতটা নিশ্চিত হয়ে কীভাবে বলছেন?"

"কারণ আপনারা দুজনই বেঁচে আছেন।"

আবারো নীরবতা নেমে এলো ঘরটায়।"

"তার মতো ঠান্ডা মাথার খুনি খুব কমই আছে।"

"তাহলে জেলে পচছে না কেন?" জিজ্ঞেস করলাম।

"বোকার মতো কথা বলবেন না! নিজের কাজে খুবই দক্ষ সে।"

"মানুষ মারায়?"

"হ্যাঁ। দেশের বাইরে থাকে। কোথায়, সেটা কেউ জানে না। সেন্ট্রাল অ্যামেরিকার গভ. ডেথ স্কোয়াডের হয়ে কাজ করেছে। আফ্রিকার স্বৈরশাসকদের সহায়তা করেছে অনেক কাজে," বলে আবারো মাথা ঝাঁকালেন পিস্টিলো। "নাহ, অ্যাসেন্টা যদি মারতেই চাইতো তাকে, তাহলে এতক্ষণে বডি ব্যাগে ভরে মর্গে নিয়ে যেতে হতো মিস মিলারকে।"

"হয়তো অন্য কোন জনের কথা বলতে চেয়েছে কেটি, কিংবা ভুল শুনেছি আমি।"

"হয়তো," কিছুক্ষণ ভাবলেন পিস্টিলো। "আরেকটা ব্যাপার। ঘোস্ট বা অন্য কেউ যদি কেটি মিলারকে মারতেই চাইবে, তাহলে আপনাকে বিছানার সাথে আটকে ফেলার কী দরকার ছিল?"

আমিও ভেবেছি প্রশ্নটা নিয়ে, কিন্তু কোন সন্তোষজনক জবাব খুঁজে পাইনি। "হয়তো পুরোটাই খুব ভেবে-চিন্তে করা হয়েছে।"

"মানে?" ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন পিস্টিলো।

"আমাকে বিছানার সাথে আটকে ফেলে লোকটা। এরপর সুযোগ পেলে হয়তো কেটিকে মেরেই ফেলতো। তখন–" পুরো শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠলো আমার, "–এমনভাবে সব সাজানো হতো যে সবাই ধরেই নিতো আমি খুনটা করেছি," বলে তার দিকে তাকালাম।

"এখন নিশ্চয়ই বলবেন না 'আমার ভাইয়ের মতো '?"

"হ্যাঁ," বললাম, "ঠিক এটাই মনে হচ্ছে আমার।"

"যত্তসব ফালতু কথা।"

"ভেবে দেখুন, মি. পিস্টিলো। ক্রাইম সিনে আমার ভাইয়ের রক্ত কেন পাওয়া গিয়েছিল সেটা কিন্তু আপনারা কখনো ব্যাখা করতে পারেননি।"

"জুলি মিলারের সাথে ধস্তাধস্তি হয়েছিল তার।"

"ধস্তাধস্তিতে এত বেশি রক্তপাত হবার কথা না," বলে তার দিকে এগিয়ে গেলাম। "এগারো বছর আগে কেইনকে ফাসানো হয়েছিল। আর আজকে সেই পুরনো নাটক আবারো মঞ্চস্থ করতে চেয়েছিল কেউ।"

"সস্তা নাটকের স্ক্রিপ্ট মনে হচ্ছে। আর আরেকটা ব্যাপার। পুলিশের লোকেরা কিন্তু আপনার এই জাদুকরদের মতো হ্যান্ডকাফ ছুটিয়ে ফেলার ঘটনাটা বিশ্বাস করছে না। তাদের ধারণা আপনিই কেটি মিলারকে হত্যার চেষ্টা করেছেন।"

"আপনার কী ধারণা?"

"কেটির বাবা এসেছেন এখানে। পুরো তোলপাড় অবস্থা।"

"শুনে অবাক হলাম না।"

"একদম ফেলনা নয় কিন্তু বিষয়টা।"

"আপনি ভালো করেই জানেন যে আমি কাজটা করিনি, পিস্টিলো। গতকাল আপনি যা-ই বলুন না কেন, এটাও খুব ভালো করেই জানেন যে জুলির হত্যাকাণ্ডের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

"আপনাকে সাবধান করেছিলাম এই কেস থেকে দূরে থাকতে।"

"সেটা মানা না মানা আমার ব্যাপার।"

"ঠিক বলেছেন, হিরো," লম্বা একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন পিস্টিলো। "এবার তাহলে কী হবে সেটাও ভালো করে শুনে নিন," সামনের দিকে এগিয়ে এসে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন। "আপনাকে জেলে ভরবো আমি।"

"একদিনের জন্যে যথেষ্ঠ পরিমাণ হুমকি শোনা হয়ে গেছে আমার," দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললাম।

"এবারেরটা হুমকি না, উইল। আজকে রাতেই হাজতে নিয়ে যাওয়া হবে আপনাকে।"

"বেশ। একজন আইনজীবী চাই আমার।"

ঘড়ির দিকে তাকালেন পিস্টিলো। "সেটার জন্যে ইতোমধ্যে দেরি হয়ে গেছে। কালকে সকালে কোর্টে চালান করা হবে আপনাকে। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিস থেকে বলবে যে জামিন পেলে পালিয়ে যেতে পারেন। সেজন্যে জামিন না দেয়ার সুপারিশ করবে। আমার ধারণা, তাদের আর্জি মেনে নেবে আদালত।"

আমি কিছু বলতে গেলে হাত উঁচিয়ে থামালেন পিস্টিলো। "আপনার হয়তো ভালো লাগবে না শুনতে, তাতে আমার কিছু যায়-আসে না। আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্যে প্রমাণ খুঁজে বের করবো আমি। আর খুঁজে না পেলে দরকার হলে পয়দা করবো। চাইলে আপনার আইনজীবিকে বলতে পারেন এই কথা। তখন আমি শুধু পুরো ব্যাপারটা অস্বীকার করবো, ব্যস। আপনি একজন সন্দেহভাজন খুনি, যে কিনা নিজের খুনি-ভাইকে এগারো বছর ধরে লুকিয়ে থাকতে সহায়তা করছেন। আর আমি দেশের সবচেয়ে বড় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। কার কথা বিশ্বাস করবে সবাই?"

"কেন এসব করছেন?" জিজ্ঞেস করলাম।

"আপনাকে আমি বলে দিয়েছিলাম দূরে থাকতে।"

"আমার জায়গায় আপনি হলে কী করতেন? কেইন যদি আপনার ভাই হতো?"

"সে বিষয় তো এখানে আসছেই না! আপনি আমার কথা শোনেননি। ফলে আপনার প্রেমিকা খুন হয়েছেন আর কেটি মিলার খুন হতে হতে বেঁচে গিয়েছেন।"

"ওদের কারো কোন ক্ষতি করিনি আমি।"

"আলবত করেছেন! আপনার কারণেই তাদের এই অবস্থা। যদি আমার কথা শুনতেন, তাহলে তাদের সাথে এরকম কিছু ঘটতো?"

কথাটা একদম জায়গামত গিয়ে আঘাত করলো, তবুও হাল ছাড়লাম না আমি। "নিজে সাধু সাজছেন কেন, মি. পিস্টিলো? লরা এমারসনের ব্যাপারটা যে চেপে গেলেন—"

"এখানে আমি আপনার সাথে এরকম চোর-পুলিশ খেলতে আসিনি। আজকে রাতটা হাজতেই কাটবে আপনার। যে করেই হোক, আপনার বিরুদ্ধে প্রমাণ যোগাড় করবো।"

কথাগুলো বলে হনহন করে দরজার দিকে হাঁটা দিলেন তিনি।

"পিস্টিলো?" পেছন থেকে আমার ডাক শুনে ঘুরে তাকালেন, "আসলে আপনি চাইছেনটা কি এখানে?"

"আপনার ভাইকে জিজ্ঞেস করুন," বলে বের হয়ে গেলেন।

আটত্রিশ

ফাঁকা হুমকি দেননি পিস্টিলো। থার্টি সিক্সথ স্ট্রিটের মিডটাউন সাউথ থানা হাজতে রাত কাটলো আমার। ভেতরে প্রস্রাব, বমি আর ঘামের গন্ধে টেকা দায়। হাসপাতালের সেই অ্যান্টিসেপ্টিক আর আফটার শেভের বিদঘুটের গন্ধটা এখন স্বর্গীয় মনে হচ্ছে। হাজতে দুইজন সঙ্গীও আছে আমার। একজন ক্রস ড্রেসার (একটু পরপরই কাঁদছে গলা ছেড়ে) আর এক গাট্টাগোট্টা কৃষ্ণাঙ্গ লোক (ঘুমোচ্ছে নাক ডেকে)। অনেকে হাজতে রাত কাটানো নিয়ে কতরকম গল্প বলে, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে বলার মতো কিছু ঘটবে বলে মনে হয় না।

ব্রুস স্প্রিংস্টিনের একটা রোমান্টিক গান চালিয়ে রেখেছে নাইট শিফটের কেউ। গানটা শুনে শিলার কথা মনে পড়ে গেল। আবারো মুষড়ে পড়লাম। বেয়াড়া আবেগগুলো বাঁধ মানতেই চায় না।

হাজতে ঢোকানোর পূর্বে আমাকে বলা হয়েছিল যে চাইলে একজনকে ফোন করতে পারবো। স্কয়ার্স বাদে আর কারো নাম মাথায় আসেনি। "ঝামেলা হয়ে গেল," পুরোটা শুনে বলে সে। এরপর কথা দেয় যে একজন ভালো আইনজীবির সাথে যোগাযোগ করবে আর কেটির ব্যাপারে খোঁজ নেবে।

"ওহ, কুইক-গো'র সিকিউরিটি টেপগুলোর ব্যাপারে তোমাকে কিছু জানানো হয়নি।"

"কী জানানো হয়নি?"

"তোমার পরিকল্পনায় কাজ হয়েছে। কালকে ফুটেজগুলো দেখতে পাবো আমরা।"

"যদি এখান থেকে বের হতে পারি।"

"হ্যাঁ," স্কয়ার্স বললো। "জামিন না পেলে আসলেও মুশকিল হয়ে যাবে।"

সকাল বেলা সেন্টার স্ট্রিটের জর্জ কোর্টে হাজির করা হলো আমাকে। সেখানকার হোল্ডিং পেনটা বেইজমেন্টে। লোকে যে বলে অ্যামেরিকায় হাজার দেশের মানুষ একসাথে বাস করে, তার প্রমাণ পেলাম আবারো। অন্তত দশটা ভাষা কানে এলো। গায়ের রঙের পার্থক্যও চোখে পড়ার মতো। পাগড়ি, টুপি, বেইজবল ক্যাপ–কোনকিছুর অভাব নেই। আর সবারই এক কথা–'আমি নির্দোষ'।

বিচারকের সামনে যখন দাঁড় করানো হলো আমাকে, স্কয়ার্সকে দেখলাম পেছন দিকে বসে আছে। আদালতে আমার প্রতিনিধিত্ব করছে হেস্টার ক্রিমস্টেইন নামের এক মহিলা আইনজীবী। চেহারাটা খুব পরিচিত ঠেকলো, নিশ্চয়ই বড়সড় কোন কেস লড়েছে আগে। একবার আমার সাথে হাত মিলিয়ে নিজের নির্ধারিত আসনে গিয়ে বসলো সে। তরুণ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি তার দিকে এমন ভঙ্গিতে তাকালো যেন কোন ফাঁদে আটকে পড়া শিকার তার শিকারিকে দেখছে।

"আমরা সুপারিশ করছি, মি. ক্রেইনের জামিন নামঞ্জুর করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে পুলিশি হেফাজতে পাঠানো হোক," তরুণ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি বললো কিছুক্ষণ পর। "জামিন পেলে তিনি গা-ঢাকা দিতে পারেন।"

"কেন?" জিজ্ঞেস করলেন বিচারক সাহেব, চোখে রাজ্যের বিরক্তি তার।

"তার ভাই খুনের সন্দেহভাজন আসামী। গত এগারো বছর ধরে পালিয়ে আছেন। শুধু তাই নয়, এবারকার ভিক্টিম আগের কেসটার ভিক্টিমের ছোট বোন।"

নড়েচড়ে বসলেন বিচারক। "কী?"

"পুলিশের সন্দেহ, আদালতে উপস্থিত মি. ক্রেইন, মিস ক্যাথেরিন মিলারকে হত্যার চেষ্টা করেছেন। মি. ক্রেইনের ভাই, কেইন ক্রেইন এগারো বছর আগের জুলি মিলার হত্যাকাণ্ডের সন্দেহভাজন আসামী।"

কপালে হাত বুলানো থামিয়ে দিলেন বিচারক। "হ্যাঁ, কেসটার কথা মনে আছে আমার।"

হাসি ফুটলো তরুণ ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির মুখে।

এবারে হেস্টার ক্রিমস্টেইনের দিকে তাকালেন বিচারক। "মিস ক্রিমস্টেইন?"

"ইয়োর অনার, মি. ক্রেইনের বিরুদ্ধে আনা যাবতীয় অভিযোগ নাকচ করে এই মুহূর্তে তাকে হয়রানি থেকে মুক্তি দেয়া হোক।"

"আপনার কথা শুনে অবাক না হয়ে পারছি না, মিস ক্রিমস্টেইন।"

"মি. ক্রেইন তার নিজের পরিচয়ের ভিত্তিতেই মুক্তি পেতে পারেন। কোন ক্রিমিনাল রেকর্ড নেই তার। কোভেন্যান্ট হাউজে চাকরি করেন, যাদের সমস্ত কাজ শহরের অসহায় নাগরিকদের নিয়ে। মি. কেইন ক্রেইনের সাথে তার কোন তুলনাই চলে না। একজন নিরপরাধ মানুষকে শুধুমাত্র তার ভাইয়ের পরিচয়ের ওপর ভিত্তি করে দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করছেন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি।"

"তাদের সন্দেহ কি যুক্তিযুক্ত নয়?"

"না, ইয়োর অনার। সে হিসেবে বললে, মি. ক্রেইনের বোন কিছুদিন আগে চুল কোঁকড়া করিয়েছেন। এখন কি তিনিও সেটা করবেন?"

ঘরে উপস্থিত অনেকেই হেসে উঠলো কথাটা শুনে।

তরুণ অ্যাটর্নির চেহারা লাল হয়ে উঠেছে। "ইয়োর অনার, আমার সহকর্মীর এরকম বোকার মতো উপমার ব্যবহার–"

"বোকার মতো কী পেলেন এতে?" ধমকে উঠলো ক্রিমস্টেইন।

"আমাদের কথা হচ্ছে মি. ক্রেইন সুযোগ পেলেই গা ঢাকা দিতে পারেন।"

"ফালতু কথা। তিনি পালাতে যাবেন কেন? আপনাদের এই দাবির পেছনে কারণটা হচ্ছে, তার ভাই আজ থেকে এগারো বছর আগে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সে-ই যে আসল খুনি, এটা আজ অবধি প্রমাণিত নয়। এমনটাও হতেও পারে যে সে মৃত। তবে সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা হচ্ছে, আমাদের প্রিয় অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি আসল তথ্যটাই চেপে গেছেন।"

তরুণ অ্যাটর্নির দিকে তাকিয়ে হাসলো হেস্টার ক্রিমস্টেইন।

"মি. থমসন?" বিচারক জিজ্ঞেস করলেন।

মাথা নিচু করে রেখেছে তরুণ অ্যাটর্নি।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিজেই বলে উঠলো হেস্টার ক্রিমস্টেইন। "এই ঘটনার ভিক্টিম, মিস ক্যাথেরিন মিলার, আজকে সকালে দাবি করেছেন যে মি. ক্রেইন নির্দোষ।"

কথাটা শুনে ভ্রু কুঁচকে গেল বিচারক সাহেবের। "মি. থমসন?" আবারো বললেন তিনি।

"কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়, ইয়োর অনার।"

"*পুরোপুরি* সত্য নয় মানে?"

"মিসেস ক্রেইন বলেছেন যে অন্ধকারে আততায়ীর চেহারা দেখতে পারেননি তিনি। একটা মুখোশ পরে ছিল সে।"

"এবং এটাও বলেছেন যে আমার মক্কেল সেই ব্যক্তি নন," তার হয়ে বাক্যটা শেষ করে দিল হেস্টার ক্রিমস্টেইন।

"মিস মিলার বলেছেন *তার বিশ্বাস* মি. ক্রেইন সেই ব্যক্তি নন," পাল্টা তর্ক করলো থমসন। "ইয়োর অনার, তিনি আহত এবং বিভ্রান্ত। আক্রমণকারীকে দেখেনওনি, তাই আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি না যে–"

"আমরা আজকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে পারবো না, মি. থমসন," তার কথা শেষ হবার আগেই বললেন বিচারক। "তবে আপনার জামিন নামঞ্জুরের আবেদন নাকচ করা হলো।"

ত্রিশ হাজার ডলারের বিনিময়ে আমাকে জামিন দিয়ে দিলেন তিনি।

ঊনচল্লিশ

ভেবেছিলাম ওখান থেকে বের হয়ে সরাসরি হাসপাতালে কেটিকে দেখতে যাবো, কিন্তু স্কয়ার্স মাথা ঝাঁকিয়ে বললো যে কাজটা আপাতত ঠিক হবে না। কেটির বাবা আছেন সেখানে। এক মুহূর্তের জন্যে মেয়ের পাশ ছেড়ে নড়ছেন না। একজন অস্ত্রধারী গার্ডের ব্যবস্থাও করেছেন। তার কথা চিন্তা করে একটু খারাপই লাগলো আমার। এর আগেও এক মেয়েকে হারিয়েছেন। এবারে কিছুতেই সেরকমটা হতে দেবেন না।

স্কয়ার্সের মোবাইল ফোন থেকে হাসপাতালের নম্বরে ফোন দিলাম, কিন্তু সেখান থেকে জানানো হলো যে এ মুহূর্তে কেটি মিলারের সাথে কথা বলার অনুমতি পাওয়া সম্ভব হবে না। অগত্যা স্থানীয় ফুলের দোকানে যোগাযোগ করে এক তোড়া ফুল পাঠানোর ব্যবস্থা করলাম। কেউ একজন তাকে খুন করার চেষ্টা করেছে আগের রাতে, আর আমি কিনা ফুল, টেডি বিয়ার আর মিনি মাইলার বেলুন পাঠাচ্ছি! কিন্তু এটা ছাড়া আপাতত আর কোন উপায়ও নেই।

আজকে নিজের গাড়িতে করে এসেছে স্কয়ার্স। ১৯৬৮ মডেলের একটা নীল রঙের ক্যাডিলাক। লিংকন টানেলের কাছে পৌঁছে সবসময়ের মতোই গতির কাটা প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এলো। ছোটবেলা থেকেই এমনটা দেখে আসছি। ইদানীং জ্যাম আরো বেড়েছে।

"ভালো বুদ্ধি দিয়েছিলে," স্কয়ার্স বললো আচমকা।

"কী?"

"জেরেমি যে আমার ইয়োগা স্টুডিওতে আসতো, এটা মনে রেখেছো দেখেই কাজটা এত সহজ হয়ে গেল।"

"খুলে বলো পুরোটা।"

"আমি জেরেমিকে ফোন দিয়ে সমস্যাটা বললাম। তখন সে জানালো কুইক-গোয়ের মালিক ইয়ান আর নোয়াহ মুলার নামের দুই ভাই। এরপর আর খুব বেশি সময় লাগেনি। তাদের ফোন দিয়ে বলে দেয় যে আমরা কী চাইছি..." বলে কাঁধ ঝাঁকালো স্কয়ার্স।

"তোমার কোন তুলনা হয় না," সমীহের সাথে মাথা নেড়ে বললাম।

"আসলেই।"

কুইক-গোয়ের অফিস উত্তর নিউ জার্সি'র একদম প্রাণকেন্দ্রে। নিউ জার্সির রাস্তা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তোলে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমার যুক্তি হচ্ছে, প্রতি ঘন্টায় এত এত ভারি যানবাহন যদি একটা রাস্তার ওপর দিয়ে যায়, তাহলে এর চেয়ে ভাল আর কী-ই বা আশা করা যেতে পারে? বাইরের দিকের এই বাইপাস রাস্তাগুলো বাদে গোটা নিউ জার্সি কিন্তু ভীষণ সুন্দর।

উত্তর নিউ জার্সির বিখ্যাত (কিংবা কুখ্যাত) জলাভূমির মাঝ দিয়ে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছি আমরা।

"কীসের গন্ধ, গত রাতে মূলা খেয়েছিলে নাকি?"

ভ্রু উঁচু করে ওর দিকে তাকালাম।

"আরে, পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছি।"

ওয়্যারহাউজ-কাম-অফিসটায় পৌঁছে গেলাম কিছুক্ষণ পর। দুই মুলার ভাইয়ের সম্পত্তির বাজারমূল্য কয়েকশো মিলিয়ন ডলার হলেও ছোট একটা অফিসে বসে তারা। সাধারণ দর্শন ডেস্ক আর কাঠের চেয়ার সরকারি অফিসের কথা মনে করিয়ে দেয়। কোন কম্পিউটার, ফ্যাক্স কিংবা ফটোকপি মেশিন চোখে পড়লো না। শুধু ডেস্ক আর কয়েকটা লম্বা ফাইলিং ক্যাবিনেট। দুটো ফোন আছে অবশ্য। চারপাশে কাঁচ দিয়ে ঘেরা। আশপাশের কর্মব্যস্ততার দিকে নজর রাখতে পছন্দ করে দুই ভাই। কেউ ভেতরে উঁকি দিল কিনা সে বিষয়ে মাথা ঘামায় না।

দুজনের চেহারা একইরকম, পোশাকেও মিল আছে। সাদা শার্ট আর কালো গ্যাবার্ডিনের প্যান্ট পরনে। শার্টের ওপরের দিকের বোতাম খোলা থাকায় বুকের ধূসর লোম দেখা যাচ্ছে। স্কয়ার্সকে দেখে দরাজ হাসি ফুটলো দুজনের চেহারায়।

"আপনি নিশ্চয়ই যোগী স্কয়ার্স।"

জবাবে শান্তভঙ্গিতে একবার মাথা নাড়লো আমার বন্ধু।

দুজনেই ছুটে এসে হাত মেলালো তার সাথে। আমার মনে হচ্ছিল ওর ডান হাতটা বুঝি খুলেই যাবে।

"একরাতের মধ্যে টেপগুলো এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছি," তুলনামূলক লম্বা ভাইটা বললো। ছোট বাচ্চারা যেরকম ভালো কিছু করার পরে প্রশংসার আশায় বড়দের দিকে তাকায়, তার চোখে সেরকম দৃষ্টি। আবারো আগের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো স্কয়ার্স। চোখে পড়ার মতো আরেকটা

বিষয় আছে এখানে, ওয়্যারহাউজে যে কর্মীই আসছে, সবাইকে হেসে স্বাগত জানাচ্ছে দুই মুলার ভাই। একই ভঙ্গিতে জবাব দিচ্ছে তারা। সচরাচর এরকমটা দেখা যায় না।

কিছুক্ষণ পর জানালাবিহীন একটা ঘরে পা রাখলাম আমরা। কাউন্টারের ওপর মাঝারি সাইজের কফি মেশিন। পাশেই পুরনো আমলের একটা অ্যান্টেনা টিভি আর ভিসিআর প্লেয়ার। এরকম পুরনো জিনিস এলিমেন্টারি স্কুলের পর আর দেখিনি।

লম্বা ভাইটা টিভি চালু করে ভিসিআরে একটা টেপ ঢোকালো। "একটা টেপে বারো ঘন্টার ফুটেজ থাকে," বললো সে। "আপনারা বলছেন যে লোকটা তিনটার দিকে দোকানে ঢুকেছিল, তাই না?"

"সেরকমটাই শুনেছি," স্কয়ার্স বললো।

"এই ফুটেজটা শুরু হয়েছে দুটো পঁয়তাল্লিশ থেকে। যেহেতু প্রতি তিন সেকেন্ডে একটা ছবি-এই হিসেবে ভিডিও হয়, খুব বেশিক্ষণ লাগবে না তিনটায় পৌঁছুতে। ফাস্ট ফরোয়ার্ড বাটনটা কাজ করে না, দুঃখিত। ওহ, রিমোট কন্ট্রোলও নেই আমাদের। তাই আপনাদের সুবিধামত সময়ে প্লে বাটনটা চেপে দিলেই হবে। আমরা বিরক্ত করবো না, যতক্ষণ ইচ্ছে থাকুন।"

"টেপটা রেখেও দিতে হতে পারে আমাদের," স্কয়ার্স বললো।

"সমস্যা নেই, আমরা কপি করে নেবো দরকার হলে।"

"ধন্যবাদ।"

এক ভাই স্কয়ার্সের সাথে আবারো হাত মেলালো। আরেকজন জাপানি কায়দায় বাউ করার ভঙ্গিতে মাথা নিচু করলো একবার (বানিয়ে বলছি না)। তারা চলে গেলে রুমে একা হয়ে গেলাম আমরা। দেরি করার কোন মানে হয় না। সামনে এগিয়ে প্লে বাটনে চাপ দিলাম। ঝিরঝির দূর হয়ে গেল, সেই সাথে শব্দও। ভলিউম বাটনে চাপাচাপি করেও কোন লাভ হলো না।

সাদা-কালো ভিডিও। স্ক্রিনের নিচের দিকে সময় দেখাচ্ছে। ক্যামেরার অবস্থান ক্যাশ কাউন্টারের ঠিক ওপরে। সোনালি চুলের এক তরুণী বসে আছে কাউন্টারের পেছনে। যারা দেখেননি, তারা হয়তো বুঝবেন না, কিন্তু প্রতি তিন সেকেন্ডে একটা ছবি-এভাবে যে ভিডিও রেকর্ড করা হয়, তা অত্যন্ত বিরক্তিকর।

"আমরা বুঝবো কি করে কোনটা ওয়েন এনফিল্ড?" জিজ্ঞেস করলো স্কয়ার্স।

"চল্লিশ বছর বয়সী একজন লোক, চুলে ক্রু কাট।"

কিছুক্ষণ দেখার পর মনে হলো আমি যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়ে সহজই কাজটা। কাস্টোমারদের অধিকাংশই বয়স্ক। স্টোনপয়েন্টের বেশিরভাগ অধিবাসী বোধহয় অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী। ভন স্টার্নোকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

তিনটা আট মিনিটে তাকে দেখলাম আমরা। প্রথমে অবশ্য শুধু পিঠটাই দেখা গেলো। পরনে শর্টস আর হাফহাতা শার্ট। কাউন্টার পার হয়ে জিনিসপত্রের একদম শেষ তাকটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছি আমরা। তিনটা নয় মিনিট চব্বিশ সেকেন্ডে সম্ভাব্য ওয়েন এনফিল্ড ক্যাশ রেজিস্টারের দিকে ফিরলো। হাতে দুধের গ্যালন আর রুটি। পজ বাটনের কাছে হাত নিয়ে রেখেছিলাম চেহারাটা ঠিকমতো দেখার জন্যে।

সেটার কোন দরকার হলো না।

দাড়িটা দেখে হয়তো অনেকে বিভ্রান্ত হতে পারে। খাটো করে ছাঁটা চুলটাও দোটানায় ফেলে দেবে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ব্যস্ত রাস্তায় তার পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে আমিও হয়তো চিনতাম না। কিন্তু এখন আর যা-ই হোক, স্বাভাবিক পরিস্থিতি নয়। যতটা সম্ভব মনোযোগ দিয়ে দেখছি। তাই ঠিকই চিনতে পারলাম। পজ বাটনটা চেপে দিলাম সাথেসাথে। স্ক্রিনের নিচে সময় দেখাচ্ছে ৩:০৯:৫১।

সন্দেহের কোন সুযোগই নেই। ওভাবেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলাম কিছুক্ষণ। হাসবো না কাঁদবো কিছুই বুঝতে পারছি না। স্কয়ার্সের দিকে তাকালাম। সে-ও আমাকেই দেখছে। মাথা নাড়লাম একবার। ঠিক ধরেছে।

ওয়েন এনফিল্ড হচ্ছে আমার ভাই, কেইন।

চল্লিশ

ইন্টারকম বেজে উঠলো।

"মি. ম্যাকগুয়ান?" রিসিপশনিস্টের কণ্ঠস্বর। নিরাপত্তা দলেরই একজন সদস্য সে।

"বলো।"

"জশুয়া ফোর্ড এবং রেমন্ড ক্রমওয়েল এসেছেন।"

জশুয়া ফোর্ড হচ্ছে স্ট্যানফোর্ড-কামিংস-ফোর্ড ল'ফার্মের সিনিয়র পার্টনার। এই ল'ফার্মের অধীনে প্রায় তিন শত আইনজীবী কাজ করেন। রেমন্ড ক্রমওয়েল তার সহকারী। সিকিউরিটি মনিটরে তাদের দুজনকেই দেখতে পাচ্ছে ফিলিপ। ফোর্ড গায়ে গতরে বেশ লম্বা, ছয় ফুট চার। ওজন একশো কেজির আশপাশে। আগ্রাসী ব্যবহার এবং রগচটা স্বভাবের জন্যে বেশ দুর্নাম আছে তার। ক্রমওয়েল সে তুলনায় বেশ ছিমছাম, আচার ব্যবহারও ভালো।

ঘোস্টের দিকে তাকালো ম্যাকগুয়ান। শীতল হাসিটা আবারো একমুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ করে দিল তাকে। অ্যাসেল্টাকে এসবে জড়ানো ঠিক হয়েছে কিনা, তা নিয়ে আবারো ভাবলো কিছুক্ষণ। অবশ্য ঘোস্টের নিজের স্বার্থও আছে এক্ষেত্রে, সেই ভেবেই তাকে দলে নেয়া।

তাছাড়া এসব কাজে ঘোস্টের সমকক্ষ কেউ নেই।

"মি. ফোর্ডকে পাঠাও আপাতত," মনে অস্বস্তি নিয়েই বললো সে। "ওয়েটিং রুমে মি. ক্রমওয়েলের যেন কোন অসুবিধে না হয়।"

"জি, মি. ম্যাকগুয়ান।"

গত কয়েকদিন গোটা ব্যাপারটা নিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে ছিল ম্যাকগুয়ান। কারণ ছাড়া সহিংসতা বা রক্তারক্তি কখনোই আকৃষ্ট করেনি তাকে, তবে কোন আপত্তিও করেনি। এক দিক দিয়ে ঘোস্ট ঠিকই বলে,

বাঁচার জন্যে যে কোন কিছু করতে পারে মানুষ। কারণ মৃত্যু মানেই তার পরিচিত সব কিছু থেকে বিদায় নেয়া। আর অজানার প্রতি ভয়টা মজ্জাগত। কেউ যদি ভাবে, সে মৃত্যুর উর্ধ্বে, তাহলে তার চেয়ে বড় আহাম্মক গোটা দুনিয়ায় আর কেউ নেই। আশপাশের সব জন্তু-জানোয়ারের মতোই মানুষেরও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

হ্যাঁ, এটা ঠিক যে অন্যান্য সব দিক দিয়ে মানুষ পশুকূলের রাজা। সবার ওপর ছড়ি ঘোরায়, কিন্তু মৃত্যু ব্যাপারটা আর সবার সাথে তাকেও একই কাতারে নিয়ে আসে।

দরজার দিকে এগিয়ে গেলো ঘোস্ট।

প্রতিপক্ষকে কখনোই সুবিধাজনক অবস্থানে থাকতে দেয়া যাবে না, এটা একদম প্রাথমিক নিয়ম। সেজন্যে যেকোন পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। অন্যান্যরা যা করতে ভয় পায়, নিষিদ্ধ কাজ ভাবে, সেসবেও ম্যাকগুয়ানের কোন আপত্তি নেই। যেমন আইনজীবী, পুলিশ বা এফবিআই এজেন্টকে হত্যা করা। তার লাইনের সবাই এটা মেনে চলে যে আর যা-ই হোক, এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তির গায়ে আঁচড় দেয়া যাবে না। কিন্তু ম্যাকগুয়ান শুধু আঁচড় কেটেই থেমে থাকেনি, মাটির ছয় ফিট গভীরে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। আবার অনেকে ভাবে যারা বেশ শক্তিশালী অবস্থানে আছে তাদেরও কিছু করা যাবে না। ম্যাকগুয়ানের কাছে এটাও হাস্যকর মনে হয়।

জশুয়া ফোর্ড ভেতরে প্রবেশের আগে থেকেই লোহার ব্যাটন হাতে তৈরি ছিল ঘোস্ট। জিনিসটা কারো বেজবল ব্যাটের সমান লম্বা, পুরু। জুতসই একটা আঘাতই ভবলীলা সাঙ্গ করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ঠ। খুলিতে লাগলে ডিমের খোসার মতো দুমড়ে যাবে।

মাথা উঁচু করে স্বভাবসুলভ বড়লোকি চালে ভেতরে পা রাখলো জশুয়া ফোর্ড। "মি. ম্যাকগুয়ান," ফিলিপের দিকে তাকিয়ে হেসে বললো।

হাসিটা ফিরিয়ে দিল ম্যাকগুয়ান। "মি. ফোর্ড।"

ডানদিকে কেউ একজন আছে বুঝতে পেরে ঘোস্টের দিকে ঘুরলো ফোর্ড। করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে ঘোস্টের নজর অন্যদিকে। চোখের পলকে ফোর্ডের হাঁটুর নিচ বরাবর সর্বশক্তিতে ব্যাটন দিয়ে আঘাত হানলো। গুঙিয়ে উঠে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়লো ফোর্ড। আবারো আঘাত হানলো ঘোস্ট, এবারে ডান কাঁধ বরাবর। ফোর্ডের মনে হলো তার ডান হাতটা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। পরবর্তীতে আঘাতটা পাঁজর বরাবর পড়তেই, হাড় ফাটার বিশ্রী একটা শব্দ কানে গেল ঘরে উপস্থিত সবার। এখন মেঝেতে কুন্ডুলী পাকিয়ে শুয়ে আছে ফোর্ড।

"কোথায় ও?" রুমের অন্য পাশ থেকে জিজ্ঞেস করলো ম্যাকগুয়ান।

"কে?" ঢোক গিলে কোন মতো জিজ্ঞেস করলো জশুয়া ফোর্ড।

প্রশ্ন করেই বুঝলো যে ভুল হয়ে গেছে। এবারে গোড়ালি লক্ষ্য করে ব্যাটন চালিয়ে দিল ঘোস্ট। সিকিউরিটি মনিটরের দিকে এক ঝলক তাকালো ম্যাকগুয়ান। ক্রমওয়েল চুপচাপ বসে আছে ওয়েটিং রুমে। ভেতরে কি হচ্ছে এ সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই।

গোড়ালির একই জায়গায় আবারো আইনজীবিকে আঘাত করলো ঘোস্ট। বিয়ারের বোতলের ওপর দিয়ে একটা মালবাহী ট্রাক চলে গেলে যেরকম আওয়াজ হয়, ঠিক সেরকম একটা শব্দ শুনতে পেলো ম্যাকগুয়ান। এক হাত তুলে এরকম পাশবিক নির্যাতন থেকে রেহাই চাচ্ছে ফোর্ড।

গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতায় ম্যাকগুয়ান এটা জেনেছে যে কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করার আগেই আঘাত হানা ভালো। বেশিরভাগ লোককেই হুমকি দেয়া হলে, তারা চেষ্টা করে কথার মারপ্যাঁচে সেই অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে। ফোর্ডের মতো আইনজীবিদের ক্ষেত্রে এই কথাটা আরো বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মিথ্যে, আধ-সত্য কথা বলে ছক উল্টে দেয়ার চেষ্টা করবে। তাদের ধারণা প্রতিপক্ষকে কথার ছলে সর্বদা পরাজিত করা সম্ভব।

এই ভুল ধারণাটা প্রথমেই দূর করা প্রয়োজন।

আর সেজন্যে এরকম আচমকা আঘাতের বিকল্প নেই। শারীরিক কষ্টের তোড়ে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি-যৌক্তিকতা সব লোপ পায়। তখন কেবল একটিমাত্র আদিম চিন্তাই ঘুরপাক খায় মগজে। কীভাবে জান বাঁচাবো?

ম্যাকগুয়ানের দিকে তাকালো ঘোস্ট। মাথা নেড়ে তাকে সরে দাঁড়াবার ইঙ্গিত করে সামনে এগিয়ে গেল সে।

"ভেগাসে গিয়েছিল ও," ম্যাকগুয়ান বললো। "বড় একটা ভুল ছিল সেটা। এক হাতুড়ে ডাক্তারের সাথে দেখাও করেছে। আশপাশের ফোন বুথগুলোর এর এক ঘণ্টা আগে পরের কল-লিস্ট খতিয়ে দেখেছি। ওগুলো থেকে কেবলমাত্র একটি আন্তঃরাজ্য ফোনকলের সন্ধান পায় আমার লোক। বলুন তো কাকে ফোন করা হয়েছিল, মি. ফোর্ড? আপনাকে। তবুও নিশ্চিত হবার জন্যে আপনার অফিসের ওপর নজর রাখতে বলেছিলাম একজনকে। এফবিআইয়ের লোকেরা গতকাল দেখা করেছে আপনার সাথে। সব মিলে যাচ্ছে। কেইনের নিশ্চয়ই একজন আইনজীবী দরকার। আর সেই আইনজীবী হতে হবে এমন একজন যার সাথে আমার কোন প্রকার সম্পর্ক নেই। যেমন, আপনি।"

"কিন্তু–" বলতে গেলো জশুয়া ফোর্ড।

হাত উঁচিয়ে তাকে মাঝপথেই থামিয়ে দিল সে। ফোর্ডও কথা বাড়ালো না। পেছনে সরে এসে ঘোস্টের দিকে তাকালো ম্যাকগুয়ান। "জন," মুখ দিয়ে এটুকুই একবার উচ্চারণ করলো শুধু।

সামনে এগিয়ে কোনপ্রকার দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছাড়াই ফোর্ডের কনুই বরাবর ব্যাটন নামিয়ে আনলো ঘোস্ট। আবারো বিশ্রী সেই শব্দটা শুনতে পেল ম্যাকগুয়ান। ফোর্ডের মুখের শেষ রক্তটুকুও উধাও হয়ে গেল।

"এখন আপনি যদি ভাব দেখান যে আমি কী বলছি সেটা বুঝতে পারছেন না," ম্যাকগুয়ান বললো। "তাহলে এবারে আমার বন্ধু একদম জায়গামত আঘাত করবে।"

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ আগের মতোই পড়ে রইলো ফোর্ড। কিন্তু এরপর যখন মাথা উঁচু করে তাকালো, তার চোখের দৃষ্টি দেখে অবাক না হয়ে পারলো না ম্যাকগুয়ান। একবার ঘোস্টের দিকে, আরেকবার তার দিকে তাকিয়ে বললো, "গোল্লায় যান।"

ম্যাকগুয়ানের দিকে তাকালো ঘোস্ট। ডান ভ্রু উঁচু করে হাসিমুখে বললো, "বেশ সাহসী দেখা যাচ্ছে।"

"জন..."

কিন্তু তার কথা কানেই তুললো না ঘোস্ট। ফোর্ডের মুখ বরাবর চালিয়ে দিল ব্যাটনটা। ভেজা জিনিসে শক্ত কিছুর বাড়ি পড়লে যেরকম শব্দ হয়, ঠিক সেরকম শোনালো আওয়াজটা। রক্তের ছোটখাটো পুকুর এখন জায়গাটায়। একদম নিথর হয়ে গেছে ফোর্ড। হাঁটু বরাবর আঘাত করার জন্যে ব্যাটনটা তুললো ঘোস্ট।

"এখনও জ্ঞান আছে?" ম্যাকগুয়ান জিজ্ঞেস করলো।

কথাটা শুনে থেমে গেলো ঘোস্ট। নিচু হয়ে এক ঝলক দেখে বললো, "জ্ঞান আছে, তবে শ্বাস-প্রশ্বাস অনিয়মিত। আরেকটা বাড়ি পড়লে হয়তো ধরাধাম থেকে বিদায় নিতে হতে পারে।"

কিছুক্ষণ ভাবলো ম্যাকগুয়ান। "মি. ফোর্ড?"

খুব কষ্টে তার দিকে তাকালো আইনজীবি।

"কোথায় আছে ও?" জিজ্ঞেস করলো ম্যাকগুয়ান।

এবারে মাথা ঝাঁকালো ফোর্ড।

মনিটরের কাছে হেঁটে গিয়ে সেটা জখুয়া ফোর্ডের দিকে ঘুরিয়ে দিল ম্যাকগুয়ান। ক্রমওয়েলকে দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনে, নিশ্চিন্তে কফির কাঁপে চুমুক দিচ্ছে।

"সুন্দর একটা জুতা পরেছে ছেলেটা," বললো ঘোস্ট। "অ্যালেন-এডমন্ডস কালেকশনের নাকি?"

উঠে বসার চেষ্টা করলো ফোর্ড, কিন্তু লাভ হলো না। হাত দুটো নড়ছে না তার মর্জি অনুযায়ী।

"ওর বয়স কত?" জিজ্ঞেস করলো ম্যাকগুয়ান।

জবাব দিল না ফোর্ড।

ব্যাটনটা ওঠালো ঘোস্ট। "আপনাকে জিজ্ঞেস করেছে–"

"উনত্রিশ।"

"বিবাহিত?"

"হ্যাঁ।"

"ছেলেমেয়ে আছে?"

"দুই ছেলে।"

মনিটরের দিকে আরো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো ম্যাকগুয়ান। "ঠিক বলেছো, জন। জুতো দুটো আসলেও সুন্দর," বলে ফোর্ডের দিকে তাকালো সে। "কেইন কোথায়? বলুন আমাদের। নতুবা ও এখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারবে না।"

আস্তে করে ব্যাটনটা মাটিতে নামিয়ে রাখলো ঘোস্ট। এরপর পকেট থেকে যে জিনিসটা বের করলো, সেটা ভারতীয় উপমহাদেশের ঠগীরা ব্যবহার করতো নিঃশব্দে মানুষ মারার কাজে। হাতলটা মেহগনি কাঠের, প্রায় আট ইঞ্চির মতো লম্বা। সামনে একটা চিকন দড়ির ফাঁস। দেখতে নিরীহ দর্শন মনে হলেও শত শত লোকের জীবননাশের কারণ এটা।

"ওর সাথে এসবের কোন সম্পর্ক নেই," ফোর্ড বললো।

"মনোযোগ দিয়ে শুনুন," ম্যাকগুয়ান বললো। "কথাটা একবারই বলবো আপনাকে।"

ফোর্ড অপেক্ষা করছে শোনার জন্যে।

"কখনো মিথ্যে হুমকি দেই না আমরা।"

হেসে উঠলো ঘোস্ট। ফোর্ডের দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো ম্যাকগুয়ান। এরপর ইন্টারকমের বাটনে চাপ দিল। সিকিউরিটি রিসিপশনিস্টের কণ্ঠ ভেসে এলো রিসিভারে।

"জি, মিস ম্যাকগুয়ান?"

"মি. ক্রমওয়েলকে ভেতরে পাঠাও।"

"জি, স্যার।"

মনিটরে দেখা গেল যে বিশালদেহী রিসিপশনিস্ট ক্রমওয়েলকে অনুরোধ করছে ভেতরে আসার জন্যে। কফির কাপটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালো তরুণ আইনজীবী। এগিয়ে আসতে লাগলো ম্যাকগুয়ানের অফিসের দরজার দিকে। ফোর্ডের সাথে একবার চোখাচোখি হলো ম্যাকগুয়ানের।

"আপনি আসলেও একটা গর্দভ," ম্যাকগুয়ান বললো।

কাঠের হাতলটা শক্ত করে ধরে অপেক্ষা করছে ঘোস্ট।

সিকিউরিটি গার্ড দরজা খুলে ধরলে হাসিমুখে ভেতরে প্রবেশ করলো রেমন্ড ক্রমওয়েল। বসকে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে মুহূর্তে মুখ থেকে মুছে গেল হাসিটা। "এ কী–"

ততক্ষণে নিঃশব্দে ক্রমওয়েলের পেছনে চলে গেছে ঘোস্ট। দুপায়ের পেছনে লাথি চালানোর সাথে সাথে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো সে। এই একই কাজটা আগেও অনেকবার করেছে ঘোস্ট।

দক্ষ হাতে ফাঁসটা ঢুকিয়ে দিল তরুণ আইনজীবির মাথা গলে। গলার কাছটায় পৌছুতেই হ্যাঁচকা টান দিল পেছন দিকে। একই সাথে ডান হাঁটু দিয়ে চাপ প্রয়োগ করছে ক্রমওয়েলের পিঠের মাঝ বরাবর। চামড়ায় কেটে বসেছে ফাঁস। মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন থেমে গেছে আরো আগেই। চোখ কোটর ছেড়ে প্রায় বেরিয়ে এসে ক্রমওয়েলের। দড়িটা সরানোর চেষ্টা করছে প্রাণপনে। কিন্তু ঘোস্ট ঢিল করলো না বন্ধন।

"বলছি!" চেঁচিয়ে উঠলো ফোর্ড। "থামুন।"

কিন্তু তার কথার কোন জবাব দিল না কেউ।

একদৃষ্টিতে শিকারের দিকে তাকিয়ে আছে ঘোস্ট। ক্রমওয়েলের চেহারা এখন টকটকে লাল।

"বলবো, সব বলবো-" ম্যাকগুয়ানের দিকে ফিরলো ফোর্ড। নির্বিকার ভঙ্গিতে ভাঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে সে, চোখে প্রচ্ছন্ন উপহাস। ক্রমওয়েলের অস্ফুট, প্রায়-জান্তব শব্দ ছাড়া গোটা ঘরে আর কোন শব্দ নেই এই মুহূর্তে।

"প্লিজ," বিড়বিড় করে বললো ফোর্ড।

মাথা ঝাঁকিয়ে আবারো আগের কথাটারই পুনরাবৃত্তি করলো ম্যাকগুয়ান। "কখনো মিথ্যে হুমকি দেই না আমরা।"

আরো শক্ত হয়ে চেপে বসলো ঘোস্টের ফাঁস।

একচল্লিশ

বাবাকে সিকিউরিটি টেপের ফুটেজটার ব্যাপারে বলতেই হবে।

মিডোল্যান্ডের কাছে বাস স্টপে আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল স্কয়ার্স। এরকম একটা তথ্য জানার পর এখন বুঝতে পারছি না যে কী করবো। আশপাশে কী হচ্ছে সে বিষয়েও কোন হুঁশ নেই। চিন্তা-ভাবনা ভোঁতা হয়ে আসছে।

কেইন আসলেই বেঁচে আছে!

এখন চাক্ষুষ প্রমাণ আছে আমার কাছে। ওয়েন এনফিল্ড ছদ্মনামে এতদিন ধরে নিউ মেক্সিকোতে থাকছে সে। আমার মনের একটা অংশ এই তথ্য পেয়ে যার-পর-নাই খুশী, অস্বীকার করবো না। *কেইনের সাথে কি তাহলে আবারো দেখা হবে আমাদের?*

কিন্তু তখনই শিলার কথা মনে হলো।

আমার ভাই যে বাড়িটায় থাকতো সেখানে দুটো মৃতদেহের সাথে ওর আঙুলের ছাপও পাওয়া গেছে। এসবের সাথে শিলার সম্পর্ক কী? আমি ভাবতেই পারিনি—নাহ ভুল বলছি, আমি আসলে সত্যের মুখোমুখি হতে চাইনি এতদিন। যদি স্বাভাবিক ভাবে চিন্তা করি, তাহলে কেবল বিশ্বাসঘাতকতা কথাটা অনবরত ঘুরপাক খায় মাথার ভেতরে। তখন মনে হয় শিলার একদম নিরীহ ভঙ্গিতে কাউচে বসে বই পড়া, মুখের ওপর এসে পড়া অবাধ্য চুলগুলো নিয়ে খেলা, শাওয়ার থেকে বেরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধ হাসি দেয়া, আমার পুরনো কয়েক সাইজ বড় সোয়েটারটা পরে রাতে ঘুমোতে যাওয়া—সবই গভীর কোন চক্রান্তের অংশ...

এর চেয়ে কিছু না ভাবাই ভালো।

অন্য দিকে চিন্তা ঘোরানোর চেষ্টা করলাম। আমার ভাই আর প্রাক্তন প্রেমিকা দুজনই চিরতরে চলে যায়, কোন প্রকার বিদায় না জানিয়েই। সত্যটা

জানার আগ পর্যন্ত একবারের জন্যেও মনে হয়নি যে এসব ভুলে থাকতে পারব কখনো। স্কয়ার্স অবশ্য শুরুতেই সাবধান করে দিয়েছিল–যা জানবো, তা আমার ভালো না-ও লাগতে পারে। কিন্তু এসবের আসলেও দরকার ছিল। হয়তো আমি এখন কেইনকে সাহায্য করতে পারবো।

তাই একটা তথ্যই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে বারেবারে–কেইন বেঁচে আছে। আর সে পুরোপুরি নির্দোষ। এ সম্পর্কে যে সন্দেহটুকু ছিল, তা পুরোপুরি দূর করে দিয়েছে পিস্টিলো। হয়তো ওর সব সমস্যার সমাধান করলে মায়ের আত্মাও শান্তি পাবে।

আজকে আমাদের পরিবারের আনুষ্ঠানিক শোক প্রকাশের শেষ দিন। বাসায় ফিরে দেখলাম বাবা নেই। রান্নাঘর থেকে সেলমা খালা বললো বাইরে হাঁটতে বেরিয়েছে সে। একটা অ্যাপ্রন পরে আছে খালা, এটা কোত্থেকে যোগাড় করলো কে জানে। আমাদের তো কোন অ্যাপ্রন ছিল না কখনো, এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। খালা কি সাথে করে নিয়ে এসেছে এটা? সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসে সে। ঘরের কোথাও একটু ধুলো জমতে দেয় না। রান্নাঘরের সিঙ্কে এঁটো বাসন পড়ে থাকতে দেয় না। বোনের তুলনায় একদম চুপচাপ সেলমা খালা। কিছু মানুষ আছে না? সবসময় পর্দার আড়ালে থাকতে পছন্দ করে, কিন্তু কাজের সময় ঠিকই নির্ভর করতে পারবেন তাদের ওপর–সেলমা খালা সেরকমই। মারে খালু আর তার কোন সন্তান নেই। যদিও বাবা-মায়ের কথায় আড়ি পেতে শুনেছিলাম একটা মৃত শিশু প্রসবের কথা। জীবনে হয়তো প্রথমবারের মতো তার দিকে ভালোভাবে তাকাচ্ছি আমি। একটা মানুষ, যার জন্যে প্রতিটা দিন নতুন একটা লড়াই।

"ধন্যবাদ, খালা," বললাম।

জবাবে কেবল মাথা নাড়লো সে।

খুব বলতে ইচ্ছে করছে যে তাকে কতটা ভালোবাসি, আমাদের পুরো পরিবার তার প্রতি কতটা কৃতজ্ঞ। মায়ের অবর্তমানে তার সান্নিধ্য খুব করে দরকার আমাদের সকলের। কিন্তু পারলাম না। এর বদলে জড়িয়ে ধরলাম দুহাত বাড়িয়ে। প্রথমে আমার এরকম অকস্মাৎ আবেগের প্রদর্শনীতে শক্ত হয়ে গেল সে, এরপর স্নেহের সাথে হাত বুলিয়ে দিল মাথায়।

"সব ঠিক হয়ে যাবে।"

বাবা হাঁটতে বের হলে কোন দিকটায় যায়, সেটা জানা আছে আমার। কভিংটন টেরেস পার হয়ে সামনে এগিয়ে গেলাম, ইচ্ছেকৃতভাবে কিছুটা ঘুরপথে এসেছি যাতে মিলারদের বাসার সামনে দিয়ে না যেতে হয়। জর্জ আর ডেইজিদের উঠোনের মধ্যে দিয়ে হেঁটে কিছুটা সামনে এগোলেই মাঠ। এখানে লিটল লিগের খেলা হয় সাধারণত। কিন্তু খেলার মৌসুম শেষ হয়ে যাওয়াতে পুরো মাঠই খালি। পাশের খালি বেঞ্চগুলোর একটাতে বসে আছে বাবা। বাচ্চাদের দলগুলোর বেইজবল কোচ হিসেবে অনেক মৌসুম এখানে

কাটাতে হয়েছে তাকে। ভীষণ ভালোবাসতেন কাজটা। বিশেষ করে কেইনের দলটার খেলা থাকলে তার খুশির সীমা থাকতো না। দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু–মি. বার্টিলো এবং মি. হরোউইটজকে নিয়ে পারলে মাঠেই থেকে যেতেন। তার দুই বন্ধুই বয়স ষাট হবার আগেই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছেন, কিন্তু স্মৃতিগুলো নিশ্চয়ই এখনও স্পষ্ট।

"তোমার মা একবার আম্পায়ারিং করেছিল, মনে আছে?" আমার দিকে তাকিয়ে হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

"খুব বেশি কিছু মনে নেই, আমার বয়স তখন কত ছিল? চার?"

"হ্যাঁ, ওরকমই," স্মৃতিকাতর ভঙ্গিতে মাথা ঝাকালো সে। "তখনও সমাজ বদল নিয়ে বেশ তৎপর ছিল সানি। '*মেয়েদের স্থান ঘরে এবং অফিসে*'–এরকম স্লোগান লেখা টিশার্ট পরতো। তখনও কিন্তু মেয়েদের লিটল লিগ শুরু হয়নি, এটা মনে রেখো। কোন একভাবে তোমার মায়ের কানে আসে যে লিগে কোন নারী আম্পায়ার নেই। এরপর খেলার নিয়মনীতি লেখা বইটা পড়ে দেখে সেখানে কোথাও এ বিষয়ে কোন বিধিনিষেধ নেই।"

"তাই আম্পায়ারিংয়ের জন্যে নাম লেখায়?"

"হ্যাঁ।"

"এরপর?"

"অনেকেই উল্টোপাল্টা মন্তব্য করে, কিন্তু নিয়ম তো নিয়মই। তাই তাকে আম্পায়ারিং করতে দেয়া হয়। কিন্তু কিছু সমস্যাও ছিল।"

"যেমন?"

"যেমন ও পৃথিবীর সবচেয়ে জঘন্য আম্পায়ার," হাসিমুখে বললো বাবা। অতীতের কোন ঘটনার কথা বলতে গিয়ে এর আগে কখনো কারো চেহারায় এতটা নির্মল হাসি ফুটতে দেখিনি। বুকের বামপাশে চিনচিনে ব্যাথা অনুভব করলাম। "খেলার মূল নিয়ম-কানুন সম্পর্কে খুব ভালো জানা ছিল না ওর। তাছাড়া চশমা ছাড়া চোখেও খুব একটা ভালো দেখতো না, এটা তো জানো তুমি।"

দুজনেই হেসে উঠলাম এবারে। দৃশ্যটা যেন দেখতে পাচ্ছি মনের চোখে। কপালে হাত দিয়ে বলটা উড়ে যেতে দেখছে মা। এরকম একটা মানুষ কীভাবে এত তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে চলে গেল? অবশেষে আমার দিকে মুখ ফেরালো বাবা। কাটা-ছেঁড়ার দাগগুলো দেখে চোখ বড় হয়ে গেল তার।

"তোমার এ কি হাল?"

"ঠিক আছি আমি, চিন্তা করো না।"

"মারামারি করেছো কারো সাথে?"

"ওরকম কিছু না। তোমার সাথে একটা ব্যাপারে কথা আছে আমার।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলো বাবা। ভাবছি কথাটা কীভাবে তুলবো, কিন্তু বাবা সহজ করে দিল কাজটা।

"দেখাও আমাকে," বললো সে।

তাকালাম তার দিকে।

"তোমার বোন ফোন দিয়েছিল আজকে সকালে। ছবিটার ব্যাপারে জানিয়েছে।"

ওটা এখনও সাথেই আছে আমার। বের করে তার হাতে দিলাম। এমন ভঙ্গিতে ছবিটা নিল, যেন একটু ছোঁয়া লাগলেই নষ্ট হয়ে যাবে। "ঈশ্বর!" চোখ কোণে জল জমতে শুরু করেছে তার।

"তুমি জানতে না?" জিজ্ঞেস করলাম।

"না," বলে আবারো ছবির দিকে তাকালো বাবা। "তোমার মা তো কিছুই বলেনি আমাদের।" বাবার চেহারায় পরিচিত একটা অনুভূতি খেলা করতে দেখলাম। তার ভালোবাসার মানুষটা, সন্তানদের মা, এতদিনের জীবনসঙ্গী-এরকম একটা ব্যাপার লুকিয়ে রেখেছিল তার কাছ থেকে। কষ্ট পাওয়াটা স্বাভাবিক।

"আরেকটা ব্যাপার," বললাম।

"কেইন নিউ মেক্সিকোতে ছিল এতদিন," পুরো ঘটনা যতটা সংক্ষেপে সম্ভব, খুলে বললাম তাকে। চুপচাপ সব শুনলো বাবা।

আমার কথা শেষ হলে বললো, "ওখানে কতদিন ছিল?"

"কয়েক মাস। কেন?"

"তোমার মা বলেছিল যে ও নাকি ফিরে আসবে, নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করার পর।"

নীরবে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম আমরা। ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে মন। হয়তো এগারো বছর আগে এরকমটা হয়েছিল-কেউ খুন করে ফাঁসিয়ে দেয় কেইনকে, বাধ্য হয়ে দেশের বাইরে গা ঢাকা দেয় সে। সময় চলতে থাকে সময়ের মতো। কিছুদিন আগে দেশে ফেরে।

কেন?

যেমনটা আমার মা বলেছে বাবাকে, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্যে। সেটা হতেও পারে। কিন্তু তাই বলে এতদিন পরে? কারণটা যা-ই হোক না কেন, কেইন ফিরে এসেছে। আর ফিরেই ঝামেলায় ফেঁসে গেছে।

কেউ একজন জানে সবকিছু।

কে?

উত্তরটা সহজ-যে জুলিকে হত্যা করেছে। সেই লোকটা এখন নিশ্চয়ই কেইনের মুখও বন্ধ করতে চাইবে। এরপর? জানি না আমি। এখনও ধাঁধার সবগুলোর টুকরো হাতে আসেনি।

"বাবা?"

"হ্যাঁ?"

"তুমি কি কখনো ভেবেছিলে যে কেইন বেঁচে আছে?"

এবারে উত্তর দেয়ার আগে কিছুক্ষণ সময় নিল সে। "ওকে মৃত ধরে নেয়াটাই সহজ ছিল।"

"আমার প্রশ্নের উত্তর কিন্তু দিলে না।"

আবারো মাঠের দিকে দৃষ্টি ফেরালো বাবা। "কেইন তোমাকে অনেক পছন্দ করতো, উইল।"

কিছু বললাম না এর প্রেক্ষিতে।

"কিন্তু ওকে সে অর্থে ভালো ছেলে বলা যাবে না কখনোই।"

"সেটা জানি আমি।"

"জুলি যখন খুন হয়," বাবা বললো। "কেইন ততদিনে বেশ বড় রকমের ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে গেছে। এখানে লুকিয়ে থাকতে এসেছিল সে।"

"লুকোতে কেন?'

"জানি না।"

ভাবলাম কিছুক্ষণ। মনে আছে আমার, এর আগের দুই বছরে একবারের জন্যেও ঘরমুখো হয়নি সে, জুলির ব্যাপারেও কিছু জিজ্ঞেস করেনি। এগুলো কীসের ইঙ্গিত? জানি না।

"ফিলিপ ম্যাকগুয়ানের কথা মনে আছে তোমার?"

মাথা নাড়লাম। কেইনের হাইস্কুলের বন্ধু। 'ক্লাস লিডার'। ওপরমহলে নাকি বেশ জানাশোনা ছিল তার। "শুনেছি এখন বোনান্নোদের ওখানে থাকে?"

"হ্যাঁ।"

বোনান্নোরা ছিল লিভিংস্টোনের বনেদি মাফিয়া পরিবার। এখানকার সবচেয়ে বড় বাড়িটার মালিক। নানারকম গুজব রটেছিল তাদের ব্যাপারে। বিশাল বাড়িটার উঠোনের মাটি খুড়লে নাকি শ'খানেক লাশ পাওয়া যাবে। বেড়ার সাথে বিদ্যুতের সংযোগ দেয়া–এরকম। ওগুলোর কোনটা সত্য কিনা এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে আমার, কিন্তু বুড়ো বোনান্নোকে একানব্বই বছর বয়সে গ্রেফতার করে পুলিশ।

"ওর কথা বললে কেন?"

"কেইন ওর সাথেই কাজ করতো।"

"কাজ? কীরকম কাজ?"

"শুধু এটুকুই জানি আমি।"

ঘোস্টের কথা মনে পড়লো এসময়। "জন অ্যাসেন্টাও কি ওদের সাথে ছিল?"

শক্ত হয়ে গেল বাবা। চোখে ভয় খেলা করছে এখন। "একথা জিজ্ঞেস করলে কেন?"

"ওরা তিনজন তো হাইস্কুলে অনেক বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল," বললাম। পরমুহূর্তেই মনে হলো যে সত্যটা বাবার কাছ থেকে লুকিয়ে লাভ নেই। "তার সাথে কিছুদিন আগে দেখা হয়েছে আমার।"

"অ্যাসেল্টার সাথে?"

"হ্যাঁ।"

"সে-ও ফিরে এসেছে?"

"হ্যাঁ।"

চোখ বন্ধ করে ফেললো বাবা।

"কী হয়েছে?"

"খুবই বিপজ্জনক সে," বাবা বললো।

"জানি আমি।"

"তোমার মুখের এই অবস্থার কি অ্যাসেল্টা করেছে?"

ভালো প্রশ্ন, ভাবলাম। "আংশিক।"

"আংশিক?"

"অনেক লম্বা কাহিনি, বাবা।"

আবারো চোখ বন্ধ করে ফেললো বাবা। কিছুক্ষণ পর আমার উরুতে চাপড় মেরে উঠে দাঁড়ালো। "চলো, বাসায় ফেরা যাক।"

তাকে আরো কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম, কিন্তু এখন সেসবের সময় নয়। উঁচু বেঞ্চ থেকে নামতে কিছুটা অসুবিধা হচ্ছিল বাবার। আমি হাত বাড়িয়ে দিলেও ধরলো না সে। একাই নামলো।

পাথুরে রাস্তাটায় উঠেছি কেবলম, এসময় দুজনেই থমকে গেলাম।

আমাদের সামনে পকেটে হাত দিয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে পরিচিত একটা লোক। তাকে নিয়ে কেবলই কথা হচ্ছিল আমাদের। ঘোস্ট।

প্রথমে মনে হলো যে ভ্রম। কিন্তু আমার পাশে বাবাও শক্ত হয়ে গেছে। এসময় কণ্ঠটা কানে এলো।

"বাপ-ছেলের এরকম মিল, আজকাল দেখাই যায় না।"

আমার সামনে এসে দাঁড়ালো বাবা, যেন দরকার হলে ঘোস্টের হাত থেকে রক্ষা করবে। "কী চাও তুমি?" চেঁচিয়ে জানতে চাইলো।

আবারো হাসলো ঘোস্ট। "মি. ক্লেইন, আপনার মনে আছে যে আমার বাবা একবার এসেছিল খেলা দেখতে?"

দাঁতে দাঁত চেপে তাকিয়ে আছে বাবা।

"চমৎকার একটা দিন ছিল, উইল। মাতাল অবস্থায় স্ন্যাক বারটা প্রস্রাব করে ভাসিয়ে দেয় বাবা। দেখার মতো দৃশ্য। মিসেস ট্যাঙ্গমোর তো আরেকটু হলেই স্ট্রোক করতো!"

"কী চাও তুমি?" আবারো জিজ্ঞেস করলো বাবা।

কিন্তু ঘোস্টের জবাব দেয়ার কোন ইচ্ছেই নেই যেন। "মি. ক্রেইন, আপনার কি আমাদের অল-স্টার দলের স্টেট ফাইনাল ম্যাচটার কথা মনে আছে?"

"হ্যাঁ," বাবা বললো।

"কেইন আর আমি তখন কোন গ্রেডে পড়তাম?"

এবারে বাবা কিছু বললো না।

"ওহ না! আমি তো ভুলেই গেছিলাম। সে বছর খেলতে পারিনি। এর পরের বছরেও না। জেলে ছিলাম বোধহয়।"

"তুমি কখনো জেলে যাওনি," বাবা বললো।

চোখ সরু করে বাবার দিকে তাকালো ঘোস্ট, যেন তার কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করছে। খানিক বাদে মাথা নেড়ে বললো, "ওহ হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। আমি তখন ছিলাম *সংশোধন কেন্দ্রে*। বুঝলে উইল, তখন দশ-এগারো বছরের ছেলেদের পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষগুলোর সাথে একই প্রতিষ্ঠানে বন্দি করে রাখা হতো। *'চারিত্রিক সংশোধনে জন্যে'*। আমার প্রথম রুমমেট ছিল টিমি নামের একটা ছেলে। পাইরোম্যানিয়াক। নিজের বাবা-মাকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছিল। একরাতে কোত্থেকে যেন একটা ম্যাচ চুরি করে এনে আমার বিছানায় আগুন ধরিয়ে দেয় সে। তিন সপ্তাহ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে থাকতে হয় আমাকে। সময় শেষ হয়ে এলে আমি আবারো নিজের শরীরে আগুন ধরিয়ে দিতে রাজি ছিলাম, যাতে ফিরতে না হয় ঐ কেন্দ্রে।"

একটা গাড়ি ধুলো উড়িয়ে চলে গেল মিডোব্রুক রোড দিয়ে। পেছনের সিটে ছোট্ট একটা ছেলে বসে আছে উঁচু সেফটি সিটে। চারদিক একদম স্তব্ধ, একটুও বাতাস নেই। গাছের পাতা নড়ছে না।

"সেটা অনেক বছর আগের কথা," কোমল সুরে বললো বাবা।

ঘোস্ট চোখ সরু করে তাকালো বাবার দিকে, যেন বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শুনছে তার কথা। অবশেষে মাথা নেড়ে বললো, "হ্যাঁ, এবারো ঠিক বলেছেন মি. ক্রেইন। তাছাড়া আমার বাসার জীবন যে খুব একটা ভালো ছিল, এমনও নয়। বাসায় থেকে বাবার হাতে মার খাওয়ার চাইতে এরকম 'সংশোধন কেন্দ্রে' সময় কাটানো ভাল।"

এবারে বুঝলাম যে ড্যানিয়েল স্কিনার নামের সেই ছেলেটাকে ছুরিকাঘাতে মেরে ফেলার ঘটনার ব্যাপারে কথা বলছে সে। তবে আরেকটা বিষয় বেশ অদ্ভুত লাগলো, আগে কখনো ভাবিনি এ নিয়ে। ঘোস্টের কাহিনি অনেকটাই আমাদের শেল্টারে আসা ছেলেমেয়েদের কাহিনির মতো শোনাচ্ছে। কিন্তু সে এখন আর বাচ্চা নয়। যদি ঠিক বয়সে সাহায্য পেত, তাহলে আজকে কি ঘোস্ট এই অবস্থায় থাকতো?

"উইলি?"

আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার ইচ্ছে ছিল বোধহয়, কিন্তু বাবা এমনভাবে আমাকে আগলে দাঁড়িয়ে আছে যে সেটাও প্রায় অসম্ভব। নির্ভয় দেয়ার ভঙ্গিতে তার কাঁধে হাত রাখলাম আমি।

"কী?" জিজ্ঞেস করলাম।

"তুমি তো জানো, আমাকে আবারো সেই '*সংশোধন কেন্দ্রে*' পাঠানো হয়।"

"হ্যাঁ।"

"তখন আমি হাইস্কুলের শেষ বর্ষে ছিলাম, আর তুমি দ্বিতীয় বর্ষে।"

"মনে আছে আমার।"

"যতদিন ঐ জায়গাটায় ছিলাম, একজন মাত্র ব্যক্তি আমার সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। কে জানো?"

মাথা নাড়লাম। জুলি।

"তুমি খুন করেছো ওকে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"আমাদের মধ্যেই একজন দোষী ওর মৃত্যুর জন্যে।"

"যথেষ্ঠ হয়েছে," বাবা বললো এসময়।

তার পাশে এসে দাঁড়ালাম আমি। "মানে?"

"তুমি, উইলি। তুমি।"

"কী?" এই বিভ্রান্তির কি কোন শেষ নেই?

"ওর হয়ে লড়াই করার কথা ছিল তোমার," ঘোস্ট বললো। "ওকে রক্ষা করার কথা ছিল।"

মনে হচ্ছে যেন কেউ শিক গরম করে ঢুকিয়ে দিয়েছে আমার বুকের ভেতরে।

"এখানে কেন এসেছো তুমি?" জিজ্ঞেস করলো বাবা।

"আসলে আমি নিজেও জানি না, মি. ক্রেইন।"

"আমার পরিবারের কারো কাছে ঘেঁষবে না আর কখনো। যদি কাউকে মারতেই চাও, তাহলে আমাকে মারো।"

"না, স্যার, আপনাকে কিছু করতে চাই না আমি," বলে বাবার দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো সে। "আপনি যেরকম আছেন, সেরকমই ভালো।"

হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে পাশের ঝোপঝাড়ে ঘেরা এলাকায় ঢুকে পড়লো ঘোস্ট। দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। আরো দুই-তিন মিনিট সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকলাম আমরা। সময়ে সাথে সাথে ভারী হয়ে উঠছে বাবার নিঃশ্বাস।

"বাবা?"

ইতোমধ্যে হাঁটতে শুরু করে দিয়েছে সে। "বাসায় চলো, উইল।"

বিয়াল্লিশ

বাবা মুখ খুলবেই না।

বাসার ফেরার সাথে সাথে নিজের রুমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। গত চল্লিশটা বছর এই ঘরে তার সবসময়ের সঙ্গী ছিল মা। জীবন একসাথে এতকিছু ছুঁড়ে দিচ্ছে আমার দিকে যে তাল সামলানো দায়। যে কোন মুহূর্তে কাজ করা বন্ধ করে দিতে পারে মগজটা। সবচেয়ে হতাশাজনক ব্যাপার হচ্ছে, এখনও বেশিরভাগ তথ্য অজানা। গল্পের শেষটায় পৌঁছুতে চাইলে জানতে হবে আরো অনেক কিছু।

শিলা।

একজন ব্যক্তি আছে যে কিনা এই রহস্যের ধুম্রজাল কাটিয়ে উঠতে আমাকে তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে পারে। তাই খালা-খালুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা শহরে এসে পড়লাম। কয়েকবার সাবওয়ে বদলে পা রাখলাম ব্রনক্সে। সূর্য তার দায়িত্ব সেরে বাড়ির পথ ধরেছে। আঁধার ঘনাচ্ছে আকাশে। এলাকাটা ভালো নয়, তবুও ভয়ডরের কোন বালাই নেই আজ আমার মনে।

কড়া নাড়ার আগেই খুলে গেল দরজাটা। চেইনটা অবশ্য সরায়নি তানিয়া। ফাঁক দিয়ে মাথা বের করে বললো, "ঘুমোচ্ছে ও।"

"আমি আপনার সাথে কথা বলতে এসেছি," বললাম।

"কিছু বলার নেই আমার।"

"আপনাকে মেমোরিয়াল সার্ভিসের দিন দেখেছি আমি।"

"চলে যান।"

"প্লিজ, শুনুন আমার কথা," বললাম। "ব্যাপারটা জরুরী।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চেইনটা পুরোপুরি খুলে দিল তানিয়া। একপাশে সেই নিভু নিভু আলোর ল্যাম্পটা এখনও জ্বলছে। জীর্ণ ঘরটায় চোখ বুলিয়ে একটা কথাই মনে হলো, তানিয়াও তো এখানে লুইস কাস্টম্যানের মতোই

বন্দী। তার দিকে ঘুরে তাকালাম। এমনভাবে পেছনে সরে গেলেন যেন আমার দৃষ্টিতে বিষাক্ত কিছু আছে।

"তাকে এভাবে কতদিন রাখার পরিকল্পনা আপনার?" জিজ্ঞেস করলাম।

"আমার কোন পরিকল্পনাই নেই," জবাবে বললো সে।

আমাকে একবারও বসতে বলেনি তানিয়া। দুজনেই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি শুরু থেকে।

"সেদিন মেমোরিয়াল সার্ভিসে এসেছিলেন কেন?" জিজ্ঞেস করলাম।

"ওরকম অনুষ্ঠানে কেন যায় মানুষ?" পাল্টা প্রশ্ন হানলো সে।

"শিলাকে চিনতেন আপনি?"

"হ্যাঁ।"

"বন্ধু ছিলেন?"

তানিয়ার মুখে হয়তো হাসি ফুটলো, কিন্তু ঠোঁটের দুপাশের কাটা অংশের জন্যে বোঝা গেল না পরিষ্কারভাবে। "মোটেও না।"

"তাহলে এসেছিলেন কেন?"

"অদ্ভুত একটা কথা শুনতে চান?" ঘাড় একদিকে কাত করে বললো সে।

এরকম প্রশ্নের উত্তর কীভাবে দেয় মানুষ? অগত্যা মাথা নাড়লাম।

"ষোলো মাসের মধ্যে সেদিনই প্রথমবারের মতো অ্যাপার্টমেন্ট ছেড়ে বের হয়েছিলাম আমি।"

এর জবাবে বলার মতো কিছু খুঁজে পেলাম না। "আপনাকে ওখানে দেখে ভালো লেগেছিল," বললাম অবশেষে।

বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকালো তানিয়া। রুমে একমাত্র তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই এই মুহূর্তে। জানি না যে তার সমস্যাটা আসলে কী, কিন্তু মনে হচ্ছে প্রতিবার শ্বাস নেয়ার জন্যে কষ্ট করতে হচ্ছে তাকে।

"দয়া করে বলুন কেন এসেছিলেন।"

"মৃতের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্যে," বলে কিছুক্ষণের জন্যে থামলো সে। "আর ভেবেছিলাম আপনাদের সাহায্য করতে পারবো।"

"সাহায্য?"

লুইস কাস্টম্যানের বেডরুমের দরজার দিকে তাকালো তানিয়া। "ও বলেছে আমাকে কেন এখানে এসেছিলেন আপনারা। তাই ভেবেছিলাম হয়তো শিলার ব্যাপারে আরো কিছু জানাতে পারবো।"

"কী বলেছে কাস্টম্যান?"

"এটাই যে শিলা আপনার গার্লফ্রেন্ড," ল্যাম্পের দিকে এগিয়ে গেল তানিয়া। মুখ ঘুরিয়ে ফেলার ইচ্ছেটা জোর করে দমালাম। অবশেষে একটা চেয়ারে বসে আমাকেও বসার ইঙ্গিত দিল সে। "সত্যি কথা বলেছে ও?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি ওকে খুন করেছেন?"

"মানে? নাহ," বিস্মিত স্বরে জবাব দিলাম।

আমার কথা তার বিশ্বাস হয়েছে বলে মনে হলো না।

"আপনার কথা ঠিক বুঝছি না," বললাম। "বলছিলেন যে সাহায্য করতে গিয়েছিলেন।"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে পালিয়ে গেলেন কেন?"

"সেটা আমিও জানি না।"

মাথা ঝাঁকালাম আমি।

চেয়ারে সামনে পেছনে দুলতে শুরু করেছে সে এখন।

"তানিয়া?"

"আপনার নাম শুনেছি আমি," বললো সে।

"কী?"

"আপনি জিজ্ঞেস করছিলে না যে কেন সেদিন পালিয়ে এসেছিলাম," দোলা থামিয়ে বললো সে। "কারণ আপনার নাম শুনেছিলাম।"

"বুঝছি না কিছু।"

আবারো দরজার দিকে তাকালো সে। "লুইস আপনার পরিচয় জানতো না। এমনকি ওখানে আপনার নাম শোনার আগ পর্যন্ত আমিও জানতাম না। স্কয়ার্সের বক্তব্য থেকে জেনেছি। আপনি উইল ক্লেইন।"

"হ্যাঁ।"

"আর-" নরম হয়ে এলো তার কণ্ঠস্বর। "তুমি হচ্ছো কেইনের ভাই।"

নীরবতা নেমে আসলো ঘরটায়।

"আমার ভাইকে চেনেন আপনি?"

"অনেক আগে দেখা হয়েছিল আমাদের।"

"কীভাবে?"

"শিলার মাধ্যমে," সোজা হয়ে আমার চোখে চোখ রাখলো সে। অদ্ভুত। সবাই বলে যে চোখের দিকে তাকালে আত্মাসুদ্ধ দেখে নেয়া যায়। ভুয়া কথা। তানিয়ার চোখটা একদম সাধারণ। কোন ক্ষত নেই সেখানে, তার পূর্ব ইতিহাসের কোন ছাপও নেই। "লুইস আপনাকে নিশ্চয়ই বলেছে যে এক গ্যাংস্টারের সাথে চলাফেরা ছিল শিলার।"

"হ্যাঁ।"

"আপনার ভাইয়ের কথাই বলেছে।"

মাথা ঝাঁকালাম। প্রতিবাদে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু যখন খেয়াল করলাম যে কথা শেষ হয়নি তার, চুপ করে গেলাম।

"শিলা কখনো আমাদের এখানকার জীবনের সাথে মানিয়ে নিতে পারেনি। বড্ড বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল ওর। তখন কেইনের সাথে পরিচয় হয়

তার। সে-ই ওকে সাহায্য করে কানেক্টিকাটের একটা বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার ব্যাপারে। তবে সেটার পেছনে মাদক বিক্রিও ছিল অন্যতম কারণ। এখানে রাস্তায় সবার নির্দিষ্ট অবস্থান আছে, নতুন কারো পক্ষে তাই মাদক বিক্রি করা সহজ নয়। কিন্তু ওরকম বড়লোকি বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি একবার লাইনঘাট ঠিক করা যায়, একদম কাঁচা পয়সা।"

"আপনার মতে আমার ভাই সেজন্যেই শিলাকে ওখানে ভর্তি করিয়ে দেয়?"

"আপনি আসলেও জানতেন না কিছু?" আবারো চেয়ারে দুলতে শুরু করলো সে।

"না।"

"আমি ভেবেছিলাম–" কথাটা শেষ করলো না সে।

"কী?"

"জানি না কী ভেবেছিলাম," মাথা ঝাঁকিয়ে বললো তানিয়া।

"প্লিজ, বলুন," অনুরোধ করলাম।

"খুবই অদ্ভুত না ব্যাপারটা? প্রথমে আপনার ভাইয়ের সাথে সম্পর্কে জড়ালো শিলা। এখন শুনছি আপনার সাথেও সম্পর্ক ছিল। আর আপনি বলছেন কিছুই জানেন না।

আবারো, কীভাবে জবাব দেব বুঝে উঠতে পারলাম না। "শিলার কী হলো এরপর?"

"আমার চেয়ে আপনিই ভালো জানেন।"

"না, আমি তখনকার কথা জানতে চাইছি।"

"এখান থেকে চলে যাবার পর ওর সাথে আর কখনো দেখা হয়নি আমার। দুয়েকবার ফোন দিয়েছিল, ব্যস। কেইন ছেলেটা সুবিধের ছিল না। আপনি আর স্কয়ার্স ভালো মানুষ। আপনাদের সাথে পরিচয় হয়ে শিলার ভালোই হয়েছিল হয়তো। কিন্তু সেদিন ওখানে আপনার নামটা শুনে ভয় পেয়ে যাই..." বলে কাঁধ ঝাঁকালো তানিয়া।

"কার্লি নামটা শুনেছেন কখনো?"

"না। শোনা উচিত ছিল?"

"আপনি কি জানতেন যে শিলার একটা মেয়ে ছিল?"

কথাটা শুনে আবারো চেয়ারে দুলতে শুরু করলো সে। "খোদা!" তার কণ্ঠে স্পষ্ট বেদনা।

"আপনি জানতেন?"

"না," মাথা ঝাঁকিয়ে বললো।

"ফিলিপ ম্যাকগুয়ান নামের কাউকে চেনেন?"

"না," আবারো মাথা ঝাঁকালো সে।

"জন অ্যাসেন্টা? জুলি মিলার?"

"না," এবারে আগের তুলনায় দ্রুত জবাব দিল সে। "এদের কাউকেই চিনি না," বলে উঠে দাঁড়ালো। "আমি ভেবেছিলাম এগুলো থেকে মুক্তি পেয়েছে ও।"

"পেয়েছিল," বললাম। "কিছু সময়ের জন্যে।"

কাঁধ ঝুলে পড়লো তার। এখন দেখে মনে হচ্ছে শ্বাস নিতে আগের চাইতেও বেশি কষ্ট হচ্ছে। "শেষ পরিণতিটা আরো ভালো হওয়া উচিত ছিল ওর জন্যে।"

দরজার দিকে এগিয়ে গেলো তানিয়া। বেরিয়ে যাবার স্পষ্ট ইঙ্গিত। কিন্তু উঠলাম না আমি। লুইস কাস্টম্যানের দরজার দিকে আবারো তাকালাম। আবারো মনে হলো যে এই বাসায় বন্দীর সংখ্যা দুইজন। বুঝতে পারছি যে আমার দিকে তাকিয়ে আছে তানিয়া।

"এখন অনেক রকম চিকিৎসা আছে," তার উদ্দেশ্যে বললাম। "স্কয়ার্স অনেক গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের চেনে। আমরা সাহায্য করতে পারবো আপনাকে।"

"ধন্যবাদ, কিন্তু আমার কিছু চাই না।"

"এভাবে প্রতিশোধস্পৃহা বুকে নিয়ে তো সারাজীবন বাঁচতে পারবেন না।"

একটা ক্লান্ত হাসি ফুটলো তার চেহারায়। "আপনার ধারণা প্রতিশোধ নেয়ার তাড়নায় এখানে এভাবে থাকছি আমি?" নিজের মুখের দিকে ইঙ্গিত করে বললো সে।

আবারো বিভ্রান্তি ভর করলো আমার চিত্তে।

মাথা ঝাঁকালো তানিয়া। "ও আপনাকে বলেছে না যে কীভাবে মেয়েদের পটিয়ে এখানে নিয়ে আসতো?"

"হ্যাঁ," মাথা নেড়ে বললাম।

"সব কৃতিত্ব নিজেই নিতে চায়। নিজের দামী জামা-কাপড় আর মধু মাখানো বুলির কথা বলে। কিন্তু চিন্তা করে দেখুন, বাস থেকে নতুন একটা শহরে নামার পর সব মেয়েরই কিন্তু অচেনা একটা পুরুষ মানুষের সাথে কোথাও যেতে ভয় করবে। লুইস কাজটা খুব সহজেই করতে পারতো, কারণ একজন সঙ্গী ছিল তার। এক নারী সঙ্গী। তার কারণেই ভরসা পেতো মেয়েরা। নিজেদের নিরাপদ ভাবতো।"

অপেক্ষা করছে তানিয়া। চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বুকের বামপাশ থেকে একটা কম্পন শুরু হয়ে পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়লো আমার। দরজা খুলে দিল সে। নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম, আর কখনো ফিরিনি।

তেতাল্লিশ

ভয়েস মেইলে দুটো মেসেজ এসে জমা হয়েছে। প্রথমটা পাঠিয়েছেন শিলার মা, এডনা রজার্স। শুকনো কণ্ঠে জানালেন যে দুদিন বাদে আইডাহোর ম্যাসনে একটা চ্যাপেলে শিলার শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবে। সেখানকার ঠিকানাটাও বিস্তারিত জানিয়েছেন। মেসেজটা সেভ করে রাখলাম।

দ্বিতীয় মেসেজটা এসেছে ভন স্টার্নোর পক্ষ থেকে। জরুরী ব্যাপারে কথা বলার জন্যে যত দ্রুত সম্ভব তাকে ফোন দিতে বলেছে। তার কণ্ঠের উত্তেজনাটুকু ঠিকই ধরতে পারলাম। ওয়েন এনফিল্ডের প্রকৃত পরিচয় সে-ও জানতে পেরেছে কিনা ভাবলাম। এ মুহূর্তে তার সেটা জানা কি আসলেও ঠিক হবে?

একবার রিং হতেই ফোন ধরলো ভন।

"কী খবর?" জিজ্ঞেস করলাম।

"বেশ গুরুত্বপূর্ণ কিছু জিনিস জানতে পেরেছি।"

"বলুন দেখি।"

"আমাদের আরো আগেই বোঝা উচিত ছিল।"

"কী?"

"ধাঁধাঁর সবগুলো টুকরো একসাথে জোড়া দেয়ার চেষ্টা করুন। ছদ্মনামের একটা লোক। এফবিআইয়ের অতি আগ্রহ। এত গোপনীয়তা। আবার এরকম অচেনা, চুপচাপ একটা মফস্বল। বুঝতে পারছেন?"

"না।"

"ক্রিপকো কর্পোরেশনের ব্যাপারে খোঁজখবর করতে গিয়েই থলের বেড়াল বেরিয়ে এসেছে। কয়েকজন সোর্সের সাথে আলাপও করেছি এ নিয়ে। আসলে ব্যাপারটা কী, ওরা এসব খুব ভালো করে লুকোনোর চেষ্টাও করে না। তাদের কাছে কেবলমাত্র ঐ ব্যক্তিকে লুকিয়ে রাখাটাই মুখ্য।"

"ডন?"

"কী?"

"আমি এখনও কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"ক্রিপকো কোম্পানিটার ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে গিয়ে *ইউনাইটেড স্টেটস মার্শাল অফিসের* নাম জানতে পেরেছি আমি।"

আবারো মনে হতে লাগলো যে পুরো পৃথিবীটা দুলে উঠেছে। একটা আশার বিন্দু উঁকি দিচ্ছে অন্ধকার থেকে। "মানে, ওয়েন এনফিল্ড একজন আন্ডারকভার এজেন্ট?"

"না, আমার সেটা মনে হয় না। স্টোনপয়েন্টে তদন্ত করার মতো কিছু নেই তো!"

"তাহলে?"

"রাষ্ট্রীয় কোন মামলার সাক্ষীদের নিরাপদে রাখার দায়িত্ব পালন করে কারা, বলুন তো?"

"এফবিআই?"

"না, ইউ এস মার্শাল।"

আরো বিভ্রান্তি। "তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন ওয়েন এনফিল্ডকে...?"

"সরকার তাকে লুকিয়ে রেখেছিল এখানে। নতুন একটা পরিচয়ও তৈরি করে দিয়েছিল। এসব ব্যাপারে তারা সাধারণত সাক্ষীর পরিচয় লুকানো বাদে অন্যান্য বিষয়ে অতটা গুরুত্ব দেয় না। আর এখানেই ভুলটা করে। খুব বেশি লোক অবশ্য এই তথ্যটা জানে না। এবারে বুঝতে পারছেন?"

"মনে হয়।"

"আমার যতদূর ধারণা, এই ওয়েন এনফিল্ড লোকটা বেশ খারাপ কিছুর সাথে জড়িত। অবশ্য রাজসাক্ষীদের বেশিরভাগই এমন হয়। তাকে এখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, কিন্তু কোন কারণে দুজন লোককে খুন করে পালিয়ে যায়। এফবিআই চায় না এ ব্যাপারে জানাজানি হোক। ব্যাপারটা কতটা লজ্জার হবে তাদের জন্যে, বুঝতে পারছেন? সরকারের সাথে চুক্তি করার পর একটা লোক এভাবে খুন করে পালিয়ে গেল। বুঝতে পারছেন?" আবার বললো স্টার্নো।

এবারে চুপ থাকলাম আমি।

"উইল?"

"হ্যাঁ।"

"আপনি কিছু লুকোচ্ছেন, তাই না?"

কী করা উচিত এখন আমার?

"ঝেরে কাশুন তো," বললো স্টার্নো। "কী চুক্তি হয়েছিল আমাদের, ভুলে গেছেন?"

তাকে কী বলতাম আমি জানি না। ওয়েন এনফিল্ড আর আমার ভাই একই মানুষ, এটা কি জানাতাম? নাকি সবকিছু জানিয়ে বলতাম, আপাতত অন্য কাউকে না জানাতে? তবে সেই প্রশ্নের উত্তর আর পাওয়া হলো না। ক্লিক শব্দ হতেই লাইন কেটে গেল।

ঠিক সেই সময় দরজায় জোরে নক করলো কেউ।

"এফবিআই। দরজা খুলুন।"

গলাটা আমার পরিচিত। ক্লডিয়া ফিশার। নব ঘোরাতেই প্রবল ধাক্কার কারণে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলাম। উদ্যোত বন্দুক হাতে ভেতরে প্রবেশ করলো ফিশার। দুহাত মাথার ওপরে তোলার নির্দেশ দিলো। তার সঙ্গী ড্যারেল উইলকক্সকেও দেখতে পাচ্ছি। দুজনকেই কেমন যেন ফ্যাকাসে লাগছে। একটু ভীতও বটে।

"হচ্ছেটা কী?" জিজ্ঞেস করলাম।

"হাত ওপরে তুলুন!"

তার নির্দেশ মানলাম। হাতকড়া বের করে আমার দিকে এগোতে গিয়েও থেমে গেল ফিশার। হঠাৎই নরম হয়ে এলো তার কণ্ঠস্বর। "কোনরকম ঝামেলা ছাড়া আসবেন আমাদের সাথে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

"তাহলে আসুন চুপচাপ।"

চুয়াল্লিশ

কোনপ্রকার তর্কে জড়ালাম না তাদের সাথে। কোন হুমকি-ধামকিও দিলাম না। এমনকি এটাও জিজ্ঞেস করিনি যে কোথায় যাচ্ছি। এরকম পরিস্থিতিতে এসব প্রশ্ন আমার অবস্থা আরো খারাপের দিকেই ঠেলে দিবে।

পিস্টিলো আমাকে বারবার সাবধান করে দিয়েছিল এসব নিয়ে না ঘাঁটাঘাঁটি করতে। এমনকি আমি নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও জেলে ঢোকাতে চেয়েছিলো। তবুও হাল ছাড়িনি। এই নব উদ্যোম বা সাহস কোথেকে এলো, তা বলতে পারবো না। হয়তো অতীতই একজন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে সাহসী হতে। শিলা আর আমার মা–দুজনই মৃত। কেইনকে হারিয়েছি আর অনেক আগে। একজন মানুষকে এভাবে কোণঠাসা করলে একটা পর্যায়ে গিয়ে সে এরকম কিছু করবেই।

নিউ জার্সির একটা লোকালয়ে এসে থামলো গাড়ি। আশপাশের সবগুলো বাড়ি দেখতে হুবহু একই রকম। দোতলা, সামনে বড় উঠোন আর একপাশে ফুলের বাগান। সেরকমই বিশেষত্বহীন একটা বাড়ির দিকে এগোলাম আমরা। ফিশার নব ঘোরাতেই খুলে গেল দরজা। গোলাপি সোফা আর কনসোল টিভি সমেত একটা ঘরের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়ে রান্নাঘরের সামনে থামলাম। কনসোলের ওপরে দুটা ছেলের বেশ কয়েকটা ছবি। প্রতিটা ছবিতে তাদের বয়স ভিন্ন ভিন্ন। ছোট থেকে বড় এই ক্রমে সাজানো হয়েছে ছবিগুলো। কতগুলো ছবিতে তাদের মাকেও দেখা যাচ্ছে।

রান্নাঘরের একপাশে সুইং ডোর লাগানো। সেটার সামনেই থেমেছি আমরা। ভেতরে আইস টি হাতে একটা ফরমিকা টেবিলের পাশে বসে আছেন পিস্টিলো। ছবিতে যে মহিলাকে দেখেছি সে দাঁড়িয়ে আছে সিঙ্কের পাশে। নীরবে দৃশ্যপট থেকে বিদায় নিল ফিশার আর উইলকক্স।

"আমার ফোন ট্যাপ করেছিলেন আপনারা।"

মাথা ঝাঁকালেন পিস্টিলো। "নাহ, ট্যাপ করলে শুধু এটা জানা যায় যে কলটা কোত্থেকে আসছে। আপনার ক্ষেত্রে একটা লিসেনিং ডিভাইস ব্যবহার করেছি আমরা। আগেই বলে নিচ্ছি, আদালত থেকে অনুমতিও নিয়েছিলাম।"

"এবারে কী চান আপনি?"

"গত এগারো বছর ধরে যেটা চেয়ে আসছি," বললেন তিনি। "আপনার ভাইকে।"

সিঙ্কের কল চালু করে দিল মহিলা। একটা গ্লাস ধুচ্ছে এখন। ফ্রিজের পাল্লার সাথে আরো ছবি ঝোলানো। কোন কোনটাতে ছেলে দুটোর সাথে পিস্টিলোকেও দেখা যাচ্ছে। তবে এই ছবিগুলো তুলনামূলক নতুন।

"মারিয়া?" পিস্টিলো বললেন এই সময়।

কল বন্ধ করে তার দিকে তাকালো মহিলা।

"মারিয়া, ইনি হচ্ছেন উইল ক্লেইন। উইল, ও মারিয়া।"

একটা তোয়ালেতে হাত মুছলো সে। খুব সম্ভবত পিস্টিলোর স্ত্রী।

"আপনার সাথে পরিচিত হয়ে ভালো লাগলো," একটু বেশিই কাঠখোট্টা শোনালো কথাটা।

প্রতিউত্তরে আমিও বিড়বিড় করে কিছু একটা বললাম। পিস্টিলোর ইশারায় একটা চেয়ার টেনে বসে পড়লাম বিপরীত দিকে।

"কিছু খাবেন, মি. ক্লেইন?" মারিয়া জিজ্ঞেস করলো।

"না, ধন্যবাদ।"

আইস-টির গ্লাসটা উঁচু করলেন পিস্টিলো। "খেয়েই দেখুন। চমৎকার।"

মারিয়াও জোরাজুরি করতে লাগলো বিধায় মাথা নাড়লাম অগত্যা। ধীরে-সুস্থে একটা গ্লাসে আইস টি ঢেলে আমার সামনে রাখলো সে। ধন্যবাদ জানিয়ে হাসার চেষ্টা করলাম। জবাবে তার মুখেও দুর্বল একটা হাসি ফুটলো।

"আমি অন্য ঘরে আছি, জোয়ি," বললো সে।

"ধন্যবাদ, মারিয়া।"

দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে গেল মহিলা।

"ও আমার বোন," দরজার দিকে তাকিয়েই বললেন পিস্টিলো। এরপর ফ্রিজের সাথে টাঙানো ছবিগুলো দেখালেন আমাকে। "এই দুজন আমার ভাগ্নে। একজনের বয়স ষোল, আরেকজনের আঠারো।"

"আচ্ছা," বলে টেবিলের ওপর হাত রাখলাম। "আমি ফোনে কার সাথে কী কথা বলি সব শুনছিলেন আপনারা।"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে তো এটাও নিশ্চয়ই জানেন যে কেইন কোথায় সেসম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আমার।"

"সেটাও জানি," আইস-টি'র গ্লাসে একবার চুমুক দিয়ে বললেন পিস্টিলো। "ছবিতে কি কিছু একটা নেই বলে মনে হচ্ছে আপনার কাছে?"

"এসব কথার খেলা কখনোই ভালো লাগে না আমার, পিস্টিলো।"

"আমারো না। কিন্তু ভালো করে দেখুন তো একবার। কী নেই?"

তাকানোর প্রয়োজনবোধ করলাম না। কারণ উত্তরটা আমি জানি। "ওদের বাবা।"

জবাবে এমন ভঙ্গিতে তুড়ি বাজালেন পিস্টিলো, যেন কোন লেট নাইট শো'র উপস্থাপক তিনি। "একবারেই বুঝে গেছেন দেখছি।"

"এসবের মানে কী?"

"বারো বছর আগে আমার বোন তার স্বামীকে হারায়। তখন ওর ছেলেদের একজনের বয়স ছিল ছয় আরেকজনের চার। মারিয়া একা বড় করেছে তাদের। মাঝেসাঝে আমিও সাহায্য করেছি, কিন্তু একজন মামা কি আর বাবার অভাব পূরণ করতে পারে?"

কিছু বললাম না।

"ওর নাম ছিল ভিক্টর ডোবার। পরিচিত লাগছে?"

"না।"

"খুন হয়েছিল ভিক। কপালে দুটো বুলেট কেড়ে নিয়েছিল ওর প্রাণভোমরা," বলে আবারো গ্লাসে চুমুক দিলেন পিস্টিলো। "আপনার ভাই, কেইন ছিল সেখানে।"

বুকের ভেতরে আমার হৃদযন্ত্রটা একবার লাফিয়ে উঠলো। আমার জবাবের অপেক্ষা না করেই উঠে দাঁড়ালেন পিস্টিলো। "পরে আবার বাথরুমে দৌড়াতে হবে, কিন্তু আরেক গ্লাস আইস টি না হলে চলবে না আমার। আপনার কিছু লাগবে, উইল?"

"আমার ভাই ওখানে ছিল মানে?" চেহারার হতভম্ব ভাব যতটা সম্ভব কাটিয়ে উঠে বললাম।

পিস্টিলোর যেন কোন তাড়া নেই আজকে। ফ্রিজার খুলে একটা আইস-ট্রে বের করলেন তিনি। বেশ সময় নিয়ে বরফ ভাঙলেন। এরপর সেখান থেকে কিছুটা তুলে নিয়ে নিজের গ্লাসে ঢাললেন। "আমাদের আলোচনা শুরু করার আগে আপনাকে একটা প্রমিস করতে হবে।"

"কী?"

"কেটি মিলারের ব্যাপারে।"

"ওর ব্যাপারে কী?"

"মেয়েটা একদমই বাচ্চা।"

"সেটা জানি আমি।"

"আর এটা বেশ বিপজ্জনক একটা কেস। আপনি নিশ্চয়ই তা বুঝে গেছেন এতদিনে। আমি চাই না কেটির কিছু হোক আবারো।"

"আমিও চাই না।"

"তাহলে আপনি আমাকে কথা দিন উইল। কথা দিন যে কেটিকে আর জড়াবেন না এসবে।"

তার চেহারাতেই স্পষ্ট যে এ বিষয়ে আমার কোন আপত্তিই গ্রাহ্য করা হবে না। "ঠিক আছে, কথা দিচ্ছি," বললাম কিছুক্ষণ পর।

আমার চেহারার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন তিনি। মিথ্যে বলছি কিনা বোঝার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এ বিষয়ে তার সাথে আমিও একমত। কেটিকে ইতোমধ্যে বেশ কড়া মূল্য চুকাতে হয়েছে। আমি আসলেও চাই না যে ওর আর কোন ক্ষতি হোক।

"আমার ভাইয়ের ব্যাপারে বলুন।"

গ্লাসে আইস টি ঢেলে আবারো চেয়ারে গিয়ে বসলেন তিনি। বেশ লম্বা একটা সময় টেবিলের দিকে তাকিয়ে থেকে মুখ তুললেন অবশেষে। "টিভিতে আপনি নিশ্চয়ই অনেকবার দেখেছেন যে ফুলটন ফিশ মার্কেট গ্যাংয়ের সবাইকে জেলের ভাত খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে বা ওল্ড ইয়র্ক সিন্ডিকেটের সবাইকে গ্রেফতার করে আদালতে হাজির করা হয়েছে। গ্যাংস্টার, মাফিয়াদের দিন শেষ। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর জিত হয়েছে শেষ পর্যন্ত।"

হঠাৎ গলা শুকিয়ে গেল আমার, মনে হচ্ছে কেউ যেন মরুভূমির বালির মতো আর্দ্রতা শুষে নিয়েছে। সামনে রাখা গ্লাসটা তুলে লম্বা চুমুক দিলাম। একটু বেশিই মিষ্টি।

"ডারউইনের ব্যাপারে কিছু জানেন?" জিজ্ঞেস করলেন পিস্টিলো।

বুঝতে পারলাম যে প্রশ্নটা বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে করেছেন অ্যাসিট্যান্ট ডিরেক্টর। "সবচেয়ে শক্তিশালী যে, সে-ই টিকে থাকবে।"

"না, সবচেয়ে শক্তিশালীর ব্যাপারে কিছু বলেননি। এই ব্যাখাটা ভুল। তিনি বলেছেন যারা পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে অভিযোজিত হতে পারবে, তারাই টিকবে। পার্থক্যটা ধরতে পারছেন?"

মাথা নাড়লাম।

"বলা যায় যে অপরাধীদেরও অভিযোজন ঘটেছে। ম্যানহাটান থেকে তল্পিতল্পা গুটিয়ে মফস্বলের দিকে চলে যায় তারা, যেখানে মাদক বিক্রি করা এখানকার চাইতে নিরাপদ। ওসব অঞ্চলে দুর্নীতিও তুলনামূলক সহজ। যেমন ক্যামডেনের গত পাঁচজন মেয়রের মধ্যে তিনজনের বিরুদ্ধেই মামলা করেছে দুর্নীতি দমন ব্যুরো। আটলান্টিক সিটির অবস্থা তো আরো খারাপ।"

চেয়ারে নড়েচড়ে বসলাম আমি। "এত বড় ভূমিকার আসলেও কি কোন দরকার আছে পিস্টিলো?"

"হ্যাঁ, অবশ্যই আছে!" চেহারা লাল হয়ে উঠেছে তার। যদিও বুঝতে পারছি যে নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করছেন। "আমার ভগ্নিপতি—এই ছেলে দুটোর বাবা—চেয়েছিল রাস্তা থেকে এসব উৎপাত দূর করতে। তাই

আন্ডারকভার কাজ করছিল সে। কিন্তু কেউ একজন জেনে যায়। মরতে হয় তাকে আর তার সঙ্গীকে।"

"আর আপনার ধারণা আমার ভাই এই ঘটনার সাথে জড়িত?"

"হ্যাঁ। ধারণা না, জানি আমি।"

"প্রমাণ আছে কোন?"

"প্রমাণের চেয়েও বেশি কিছু আছে," হাসি ফুটলো পিস্টিলো মুখে। "আপনার ভাই সব নিজে স্বীকার করেছে।"

এমনভাবে পিছিয়ে গেলাম যেন কেউ আমাকে উদ্দেশ্য করে বেইজবল ব্যাট চালিয়ে দিয়েছে। মাথা ঝাকাচ্ছি অনবরত। শান্ত হও–নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। উল্টোপাল্টা কিছু নিশ্চয়ই করবেন না পিস্টিলো। কিন্তু কাল রাতেই তো আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করেছিলেন, তাই না?

"আমাদের বোধহয় হাতের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা উচিত, উইল। আর দয়া করে ভুল বুঝবেন না। আমার মনে হয় না আপনার ভাই কাউকে হত্যা করেছে।"

"কিন্তু আপনি তো কেবলই বললেন–"

হাত উঁচু করে আমাকে থামালেন তিনি। "আগে পুরোটা শুনুন।"

আবারো উঠে দাঁড়ালেন পিস্টিলো। আমার সাথে আজকের এই আলাপচারিতা তার নিজের জন্যেও এক মহা ধৈর্য্য পরীক্ষা। খুব কষ্টে রাগ চেপে রেখেছেন। তবে কতক্ষণ চেপে রাখতে পারবেন, সন্দেহ। বোনের এই দুর্ভাগ্যের কারণে ভেতরে ভেতরে নিশ্চয়ই অনেক রাগ জমা হয়েছে এই কয় বছরে।

"ফিলিপ ম্যাকগুয়ানের হয়ে কাজ করতো আপনার ভাই। তার পরিচয় নিশ্চয়ই জানেন আপনি।"

জানলেও কিছু বললাম না।

"ম্যাকগুয়ান জন অ্যাসেন্টার চাইতেও বিপজ্জনক। কারণ তার মাথায় চিকন বুদ্ধির পরিমাণ অন্যান্যদের তুলনায় ঢের বেশি। OCID-এর মতে ইস্ট কোস্টের সবচেয়ে বড় গ্যাংস্টারদের একজন সে।"

"OCID?"

"অর্গানাইজড ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন," বললেন পিস্টিলো। "তরুণ বয়সেই ম্যাকগুয়ান বুঝতে পেরেছিল যে ভবিষ্যতে কঠিন সময় অপেক্ষা করছে তাদের জন্যে। যা বলছিলাম একটু আগে, অভিযোজন। অর্গানাইজড ক্রাইমের বর্তমান অবস্থা নিয়ে খুব বেশি কিছু বলবো না। বর্তমানে নতুন কিছু রাশিয়ান, চাইনিজ আর পুরনো ইটালিয়ানদের আধিপত্য চলছে। কিন্তু সবাই পাতায় পাতায় চললে ম্যাকগুয়ান চলে শিরায় শিরায়। বয়স তেইশ হবার আগেই দলের একদম মাথায় পৌঁছে যায় সে। এই লাইনের পুরনো সব ব্যবসায় অভিজ্ঞতা আছে তার–পতিতাবৃত্তি, চড়া সুদে

ধার দেয়া, মাদক। কোনটাই বাদ নেই। তার সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা হচ্ছে শহর থেকে দূরে তুলনামূলক চুপচাপ এলাকায় মাদক ব্যবসা, যেখানে প্রতিযোগীতা কম।"

তানিয়ার কথা মনে পড়লো এ সময়। শিলার ব্যাপারেও এরকম মন্তব্যই করেছিল সে।

"ম্যাকগুয়ান হত্যা করে আমার ভগ্নিপতি আর তার পার্টনার কার্টিস অ্যাঙ্গলারকে। আপনার ভাই জড়িত ছিল এসবে। তাকে অবশ্য অন্য অভিযোগের প্রেক্ষিতে গ্রেফতার করা হয়।"

"কবে?"

"জুলি মিলার খুন হবার ছয় মাস আগে।"

"তাহলে সে বিষয়ে আমি কোন কিছু আগে শুনিনি কেন?"

"কারণ কেইন আপনাকে বলেনি। আমরাও চাচ্ছিলাম না যে এ বিষয়ে মুখ খুলুক সে। আমাদের মূল উদ্দেশ্যে ছিল ম্যাকগুয়ানকে ধরা। তাই তাকে টোপ দেয়া হয়।"

"টোপ দেয়া হয়?"

"হ্যাঁ। কেইনকে প্রস্তাব দেয়া হয় যে সে যদি আমাদের সহায়তা করে তাহলে আদালতে বেকসুর খালাস পাবে।"

"মানে আপনারা চাচ্ছিলেন সে যাতে ম্যাকগুয়ানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়?"

"এর চেয়েও বেশি কিছু। ম্যাকগুয়ান ভীষণ সাবধানী। তার বিরুদ্ধে তথ্য প্রমাণাদি খুব কম ছিল আমাদের হাতে। তাই এমন একজনের দরকার পড়ে যে কিনা ভেতর থেকে তথ্য যোগাড় করে দিতে পারবে আমাদের। সেই দায়িত্ব বর্তায় কেইনের ওপর।"

"আপনি তাহলে বলতে চাইছেন কেইন আপনাদের হয়ে কাজ করতো?"

ক্রোধের ঝিলিক দেখতে পেলাম পিস্টিলোর চোখজোড়ায়। "এভাবেও বলার কিছু নেই। আপনার মতলবী ভাই নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিলো শুধু, আর কিছু না।"

মাথা নাড়লাম আবারো। পিস্টিলো যা বলছে, তার পুরোটাই মিথ্যেও হতে পারে।

কাউন্টারের ওপর থেকে একটা কুকি তুলে নিলেন পিস্টিলো। আবারো চুমুক দিলে আইস টির গ্লাসে। "এরপর ঠিক কি হয়েছিলো, সে ব্যাপারে আমরাও পরিষ্কার জানি না, তবে আন্দাজ করে বলতে পারি।"

"ঠিক আছে।"

"ম্যাকগুয়ান বুঝে যায়। আবারো বলছি, অন্য সবার চাইতে বিপজ্জনক সে। আপনি-আমি যেরকম বাথরুমে যাবার সিদ্ধান্ত নেই, কাউকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়াটাও তার কাছে ওরকমই একটা ব্যাপার। এসব ক্ষেত্রে কোন অনুভূতিই কাজ করে না তার।"

এবারে খানিকটা আঁচ করতে পারছি পিস্টিলোর উদ্দেশ্যে সম্পর্কে। "ম্যাকগুয়ান যদি জেনেই যায় যে কেইন আপনাদের হয়ে কাজ করছে–"

"এর পরিণতি নিশ্চিত মৃত্যু," বাক্যটা আমার হয়ে শেষ করে দিলেন তিনি। "আমরা তার সাথে যোগাযোগ রাখছিলাম। কিন্তু এক রাতে কিছু না জানিয়েই পালিয়ে যায় সে।"

"ম্যাকগুয়ান জেনে গিয়েছিলো, এই কারণে?"

"আমাদের সেটাই ধারণা। তখনই আপনাদের বাসায় যায় সে। কেন, সেটা জানি না। হয়তো ভেবেছিল ম্যাকগুয়ান সন্দেহ করবে না যে বাসার লোককে বিপদে ফেলে লিভিংস্টোনে গা ঢাকা দেবে সে।"

"এরপর?"

"এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছেন যে অ্যাসেল্টাও ম্যাকগুয়ানের হয়ে কাজ করতো।"

"আপনার ভাষ্যমতে," বললাম।

কথাটা আমলে নিলেন না তিনি। "এখানে অ্যাসেল্টারও স্বার্থ আছে। লরা এমারসনের কথা বলছিলেন না? আপনার ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা জানতে পারি যে অ্যাসেল্টা খুন করে তাকে। শ্বাসরোধে হত্যা করা হয় মিস এমারসনকে, অ্যাসেল্টার প্রিয় খুন করার পদ্ধতি। কেইনের মতে, লরা এমারসন হেভারটন বিশ্ববিদ্যালয়ে অভ্যন্তরে মাদক ব্যবসা সম্পর্কে সবকিছু জেনে গিয়েছিল। কর্তৃপক্ষকে সবকিছু জানানোর ইচ্ছে ছিল তার।"

"এজন্যে তাকে মেরে ফেলে ওরা?"

"হ্যাঁ, এজন্যেই তাকে মেরে ফেলে ওরা। নতুবা কী করতো? ডেকে এনে আইসক্রিম খাওয়াতো? আমরা এখানে যাদের নিয়ে কথা বলছি, তারা মানুষরূপী শয়তান, উইল। এটা খুব ভালো করে মগজে ঢুকিয়ে নিন।"

হাইস্কুলে থাকতে বেশ কয়েকবার বিভিন্ন বোর্ড গেইম খেলার জন্যে আমাদের বাসায় এসেছে ফিলিপ ম্যাকগুয়ান। এসব খেলায় সবসময় সে-ই জিততো। ক্লাস প্রেসিডেন্ট ছিল, সবার পছন্দের। কে জানতো পুরোটাই মুখোশ?

"কোন একভাবে ম্যাকগুয়ানরা জেনে যায় আপনার ভাই কোথায় আছে। হয়তো ভার্সিটি থেকে জুলির পিছু নেয় ঘোস্ট। যাইহোক, মিলারদের বাসায় আপনার ভাইয়ের মুখোমুখি হয় সে। আমাদের থিওরি হচ্ছে জুলি আর কেইন, দুজনকেই খুন করার উদ্দেশ্যে সেখানে যায় অ্যাসেল্টা। ক্রাইম সিনে কিন্তু তার হাতের ছাপও পাওয়া গিয়েছিল। আমাদের ধারণা আপনি সে রাতে বাইরে তাকেই দেখেছিলেন। আপনার ভাইয়ের রক্তের ব্যাপারেও তো ব্যাখা পাচ্ছেন এখন, নাকি? শুধু জুলি মারা যাওয়ায় বিপদে পড়ে যায় অ্যাসেল্টা। তখন করার মতো একটা কাজই ছিল তার। এমনভাবে ঘটনা সাজানো, যেন সবার সন্দেহ গিয়ে পড়ে কেইনের ওপরে।"

কথা থামিয়ে আরেকটা কুকি খোঁটাতে শুরু করলেন তিনি। আমার দিকে তাকাচ্ছেন না ইচ্ছে করেই। আমি জানি যে পুরো গল্পটাই মিথ্যে হতে পারে, কিন্তু কেন যেন বিশ্বাস হচ্ছে না সেটা। বরং সত্য হবার সম্ভাবনাই বেশি বলে মনে হচ্ছে এখন। এবারে আমার পালা রাগ সামাল দেয়ার।

"তাহলে, এতগুলো বছর–" বলে একবার ঢোক গিললাম, এরপর আবার শুরু করলাম, "এতগুলো বছর ধরে আপনারা জানতেন যে কেইন জুলিকে হত্যা করেনি।"

"না, মোটেও ওরকম কিছু ভাবতাম না।"

"কিন্তু আপনি এইমাত্র বললেন–"

"সেটা একটা সম্ভাবনা মাত্র, উইল। থিওরি। এমনটাও খুবই সম্ভব যে হয়তো কেইনই খুন করেছে মিস মিলারকে।"

"আপনি সেটা বিশ্বাস করেন না।"

"আমি কি বিশ্বাস করি, না করি–তা আমাকেই বলতে দিন নাহয়।"

"কেইন কেন খুন করবে জুলিকে?"

"আপনার ভাই খুবই খারাপ একজন মানুষ। এটা ভুলবেন না।"

"কিন্তু এটা তো কোন মোটিভ হতে পারে না," মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম। "কেন? আপনি যখন জানতেনই যে কেইন জুলিকে খুন করেনি, কেন তার ওপর দোষ চাপালেন?"

এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না তিনি। দেয়ার দরকারও ছিল না আসলে। ফ্রিজের ছবিগুলোই সব ব্যাখা করছে।

"কারণ, যে কোন মূল্যে কেইনকে চাই আপনার," নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিলাম। "কেইনই একমাত্র ব্যক্তি, যে আপনাকে ম্যাকগুয়ান অবধি পৌছে দিতে পারবে। সে যদি সাধারণ কোন ঘটনার সাক্ষী হতো, তাহলে কেউ তাকে খোঁজার জন্যে এত উদগ্রীব হতো না। কিন্তু সে যেহেতু জুলি মিলারকে হত্যার সন্দেহভাজন আসামী, গণমাধ্যম থেকে শুরু করে সবাই তার পেছনে উঠে পড়ে লেগেছিল। এসব রিপোর্টের কারণেই লুকিয়ে থাকাটা কঠিন হবে তার জন্যে।"

এখনও হাতের দিকেই তাকিয়ে আছেন পিস্টিলো।

"আমার ধারণা ঠিক, তাই না?"

ধীরে ধীর মাথা ওঠালেন পিস্টিলো। "আপনার ভাই একটা চুক্তি করেছিলো আমাদের সাথে," ঠান্ডা সুরে বললেন। "পালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে সেই চুক্তিটা ভঙ্গ করেছে সে।"

"তাই মিথ্যে বলতেও আপনার একটুও গলা কাঁপেনি।"

"যে কোন মূল্যে তাকে খুঁজে বের করাটা ভীষণ জরুরী ছিল।"

রাগে রীতিমতো কাঁপছি এখন আমি। "তার পরিবার গোল্লায় যাক, নাকি?"

"সেটা তো আমার দোষ না।"

"আমাদের পরিস্থিতি কী হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন ধারণা আছে আপনার?"

"একটা ব্যাপার ভালো করে শুনে রাখুন, উইল। এসবে আমার কিচ্ছু যায়-আসে না। আপনার ধারণা সব কষ্ট শুধু আপনাদের পরিবারের লোকেরাই করেছে? আমার বোনের চোখের দিকে তাকিয়ে বলতে পারবেন সে কথা? তার ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বলতে পারবেন?"

"কিন্তু তাই বলে এটা ঠিক নয় যে–"

"কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক, সে ব্যাপারে আমাকে জ্ঞান দিতে আসবেন না," টেবিলে আচমকা কিল বসালেন পিস্টিলো। "আমার বোনের তো কোন দোষ ছিল না।"

"আমার মায়েরও কোন দোষ ছিল না।"

"না!" আবারো টেবিলে কিল বসালেন তিনি। "তাদের অবস্থার মধ্যে তফাতটা আকাশ-পাতাল। ভিক কর্তব্যরত অবস্থায় মারা যায়। পরিবারের কথা ভাবার কোন সুযোগ ছিল না তার। কিন্তু আপনার ভাই ইচ্ছে করে পালিয়ে যায়, আপনাদের এরকম অবস্থায় ফেলে।"

"পালাতে বাধ্য হয়," বললাম আমি। "কেউ একজন খুন করার চেষ্টা করছিল তাকে। সেই সাথে আপনারা তাকে খুনের আসামী সাজিয়ে উপস্থাপন করেন গণমাধ্যমের সামনে। তার আর কোন উপায় ছিল না।"

"পুরো সিদ্ধান্তটাই ছিল তার একান্ত, এটা ভুলবেন না উইল।"

"আপনি আপনার পরিবারের লোকদের সাহায্য করতে গিয়ে আমার পরিবারের কথা চিন্তাই করেননি।"

আর সহ্য হলো না পিস্টিলোর। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। গ্লাসটা মেঝেতে পড়ে ভেঙে গেল। "আপনার পরিবারের দুর্দশার সাথে আমার বোনের দুর্দশার কোন তুলনাই হয় না!"

তার সাথে তর্ক করাটা যে বৃথা এটা চোখের দিকে তাকাতেই বুঝে গেলাম। তাছাড়া এখনও আমি নিশ্চিতভাবে জানি না যে সত্য কথাই বলছে কিনা সে। কিন্তু আমার আরো তথ্য দরকার। তাকে রাগালে সেটা সম্ভব হবে না। পুরো গল্পটা বলা এখনও শেষ হয়নি তার। আরো অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া বাকি।

ক্লডিয়া ফিশার বাইরে থেকে একবার উঁকি দিল এসময়। ডান হাতের বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে পিস্টিলো তাকে আশ্বস্ত করলেন যে সব ঠিকই আছে। আবারো চেয়ারে বসে পড়লেন তিনি। ফিশারও চলে গেল।

এখনও রাগে ফুঁসছেন এফবিআইয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর।

"এরপরে কী হলো?" জিজ্ঞেস করলাম শান্তস্বরে।

"এখনও বোঝেননি?"

"না।"

"আসলে আমাদের ভাগ্য ভালো ছিল এই ক্ষেত্রে। স্টকহোমে ছুটি কাটাতে গিয়েছিল আমাদের একজন এজেন্ট।"

"মানে?"

"আমাদের এই এজেন্টই স্টকহোমের রাস্তায় দেখতে পায় আপনার ভাইকে।"

বিস্ময় গোপন করতে পারলাম না। "দাঁড়ান! কবেকার ঘটনা এটা?"

"চার মাস আগের," মনে মনে হিসেব করে বললেন পিস্টিলো।

এখনও বিভ্রান্ত আমি। "কেইন পালিয়ে যায়?"

"নাহ্। এবারে সেই সুযোগটা পায়নি। আমাদের এজেন্ট সেখানেই পাকড়াও করে তাকে।"

আমার দিকে কিছুটা ঝুঁকে আসেন পিস্টিলো। "তাকে ধরে ফেলি আমরা," প্রায় ফিসফিসিয়ে কথা বলছেন এখন। "ধরে এখানে নিয়ে আসি।"

পঁয়তাল্লিশ

গ্লাসে ব্র্যান্ডি ঢালার কাজটা ফিলিপ ম্যাকগুয়ান নিজেই করলো।

তরুণ আইনজীবির দেহ সরিয়ে নেয়া হয়েছে ইতিমধ্যে। স্থানুর মতো মেঝেতে শুয়ে আছে জগুয়া ফোর্ড। দেহে প্রাণ আছে, কিন্তু অনেকক্ষণ ধরেই নড়াচড়া করছে না।

ঘোস্টের দিকে ব্র্যান্ডির গ্লাস বাড়িয়ে ধরলো ম্যাকগুয়ান। দুজন পাশপাশি বসে আছে এখন। নিজের গ্লাসে লম্বা একটা চুমুক দিল সে। ঘোস্টের মুখে সেই শীতল হাসিটা ফিরে এসেছে।

"কী?"

"ব্র্যান্ডিটা ভালো।"

"হ্যাঁ।"

বাদামি পানীয়টা দিকে তাকালো ঘোস্ট। "মনে আছে একসময় রাইকার হিলে বসে আমরা দোকানের সবচেয়ে স্বস্তা বিয়ারটা খেতাম, ফিলিপ?"

"শ্লিটয আর ওল্ড মিলওয়াকি," ম্যাকগুয়ান বললো।

"হ্যাঁ।"

"ইকোনমি ওয়াইন অ্যান্ড লিকার স্টোরে কেইনের এক বন্ধু কাজ করতো। আমাদের তো কখনো পরিচয়পত্রও দেখাতে হতো না।"

"দারুণ সময় ছিল তখন," বললো ঘোস্ট।

"কিন্তু এটা-" গ্লাস উঠিয়ে দেখালো ম্যাকগুয়ান, "আরো ভালো।"

"তাই?" বলে আবারো গ্লাসে চুমুক দিল ঘোস্ট। আয়েশী ভঙ্গিতে চোখ বন্ধ করে বললো, "আমাদের প্রতিটা সিদ্ধান্ত পুরো পৃথিবীতে নাকি নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করে-এই থিওরিটা শুনেছো?"

"হ্যাঁ।"

"মাঝে মাঝে ভাবি, তরুণ বয়সে নেয়া কিছু সিদ্ধান্ত যদি বদলাতে পারতাম, তাহলে হয়তো একদম ভিন্ন একটা বাস্তবতায় বাস করতাম এখন।"

"বয়সের সাথে সাথে তোমার হৃদয়টাও কোমল হয়ে উঠছে নাকি?" মুখে হাসি ফুটলো ম্যাকগুয়ানের।

"ওরকম কিছু না," ঘোস্ট মাথা ঝাঁকিয়ে বললো। "তবুও মাঝে মাঝে মাথায় এসব চিন্তা এসে পড়ে।"

"মানুষকে কষ্ট দিতে ভালো লাগে তোমার, জন।"

"তা লাগে।"

"সবসময়ই লাগতো।"

কিছুক্ষণ ভাবলো ঘোস্ট। "না, সবসময় না। কিন্তু এখানে প্রশ্নটা হচ্ছে, কেন?"

"কেন মানুষকে কষ্ট দিতে ভালো লাগে তোমার?"

"শুধু কষ্ট দেয়া না। তাদের কষ্ট দিয়ে হত্যা করতে ভালো লাগে আমার। ভিক্টিমদের শ্বাসরোধ করে হত্যা করি, কারণ পদ্ধতিটা ভীষণ কষ্টদায়ক। বুলেটে বড্ড দ্রুত হয়ে যায় কাজ, ছুরির পোঁচের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু শ্বাসরোধ করে হত্যার ক্ষেত্রে মানুষ একদম শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যায়। কিন্তু তাদের শ্বাসনালীতে এক বিন্দু অক্সিজেন ঢোকার অনুমতি দেই না। শেষ অবধি শ্বাসটা আর নেয়া হয় না তাদের।"

"এজন্যেই কোন পার্টিতে তুমি গেলে সেটা জমে ওঠে," ব্যঙ্গাত্মক স্বরে বললো ম্যাকগুয়ান। "এত চমৎকার সব গল্প তোমার।"

"তা ঠিক," ঘোস্ট আমলে নিল না খোঁচাটা। পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে বললো, "কিন্তু কেন? কেন এরকম একটা কাজ উপভোগ করি আমি? আমার মধ্যে কি বিবেকবোধ বলতে কিছু নেই? যখন কেউ আমার হাতে শ্বাস নেয়ার জন্যে তড়পাতে থাকে, তখনই কেন জীবনটা সবচেয়ে বেশি রঙিন মনে হয়?"

"সেজন্যে নিশ্চয়ই তোমার বাবাকে দোষ দেবে না এখন?"

"নাহ্, সেটা উচিত হবে না," গ্লাসটা নামিয়ে রেখে ম্যাকগুয়ানের দিকে তাকালো ঘোস্ট। "সেদিন যদি আমি কবরস্থানে তোমার ঐ দুজন লোককে না মারতাম, তাহলে তুমি কি আমাকে হত্যা করতে?"

সঠিক উত্তরটা খোঁজার চেষ্টা করলো ম্যাকগুয়ান। "আসলে আমি জানি না," সত্যিটাই বললো একটু পর। "হয়তো।"

"আর তুমি আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু," ঘোস্ট বললো।

"তুমিও আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধু।"

হাসলো ঘোস্ট। "আমাদের ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা, তা না ফিলিপ?"

এবারে কোন জবাব দিল না ম্যাকগুয়ান।

"কেইনের সাথে আমার প্রথম দেখা হয় চার বছর বয়সে," আজকে স্মৃতিচারণের মেজাজে আছে ঘোস্ট। "এলাকার সব বাচ্চাদের সাবধান করে

দেয়া হয়েছিল যেন আমাদের বাসার আশেপাশেও কেউ না আসে। অ্যাসেন্টাদের সংস্পর্শে বখে যাবে...তুমি তো জানোই নিশ্চয়ই।"

"জানি," ম্যাকগুয়ান বললো।

"কিন্তু কেইনের আগ্রহ বরং বেড়ে গিয়েছিল এই নিষেধের পর। আমাদের বাসায় সময় কাটাতে ভাল লাগতো তার। মনে আছে, ছয় বছর বয়সে বাবার বন্দুকটা খুঁজে পাই আমরা। সেদিনই ওটা হাতে নেয়ার পর ক্ষমতা কী জিনিস, তা অনুভব করি মনেপ্রাণে। বন্দুকটা দিয়ে রিচার্ড ওয়ার্নারকে ভয় দেখাতাম। একবার ধরে এনে হাত পা বেঁধে রেখেছিলাম। বেচারা প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলেছিলো।"

"আর তোমরা সেটা উপভোগ করেছিলে।"

"হয়তো," ঘোস্ট মাথা নেড়ে বললো।

"আমার একটা প্রশ্ন আছে," ম্যাকগুয়ান বললো।

"কী প্রশ্ন?"

"তোমার বাবার তো একটা বন্দুক ছিলই, তাহলে ড্যানিয়েল স্কিনারকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে ছুরি কেন ব্যবহার করেছিলে?

মাথা ঝাঁকালো ঘোস্ট। "এ বিষয়ে কথা বলতে চাই না আমি।"

"কখনোই কিছু বলোনি।"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

সরাসরি প্রশ্নটার উত্তর দিল না ঘোস্ট। "বাবা আমাকে বন্দুক হাতে দেখে ফেলেছিল একবার। খুব মার খেয়েছিলাম।"

"এটা তো তোমার জন্যে নিয়মিত একটা ঘটনা ছিল।"

"হ্যাঁ।"

"তার ওপর পাল্টা রাগ ঝারতে কখনো ইচ্ছে হয়নি তোমার?" ম্যাকগুয়ান জিজ্ঞেস করলো।

"বাবার ওপর? নাহ। তার অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে ঘেন্নাও কাজ করতো না। মা আমাদের ছেড়ে চলে গেছে, এই শোকটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি কখনো। সবসময়ই ভাবতো যে মা হয়তো ফিরে আসবে। মাতাল হয়ে কাউচে বসে একা একাই কথা বলতো তার সাথে। চিৎকার করে কাঁদতো মাঝে মাঝে। বাবার হৃদয় চিরতরে ভেঙে দিয়েছিল মা। অনেক মানুষ মেরেছি আমি, ফিলিপ। অনেককে চোখের সামনে মরতে দেখেছি। কিন্তু তাদের কারো চোখে আমি সেই দুঃখ দেখেনি, যা বাবার চোখে মায়ের জন্যে দেখেছিলাম।"

মেঝেতে জশুয়া ফোর্ড গুঙিয়ে উঠলো এসময়, কিন্তু ওরা পাত্তাই দিল না।

"তোমার বাবা এখন কোথায়?" ম্যাকগুয়ান জিজ্ঞেস করলো।

"মিশিগান। মদ ছুঁয়েও দেখে না। একটা সঙ্গী জুটিয়ে নিয়েছে, দুজনে মিলে ধর্ম-কর্ম নিয়ে পড়ে থাকে।"

"তার সাথে কখনো কথা হয় না তোমার?"

"না," নরম স্বরে বললো ঘোস্ট।

এরপর চুপচাপ কিছুক্ষণ হাতের গ্লাসে চুমুক দিল দুজন।

"তোমার কী অবস্থা, ফিলিপ? তুমি তো কখনোই গরীব ছিলে না। বাসার পরিবেশও ভালো ছিল।"

"বলতে পারো শুধুমাত্র বাবা-মা ভালো ছিল।"

"এটা জানি যে তোমার চাচার গ্যাংস্টারদের সাথে ওঠাবসা ছিল তখন থেকেই। সেই পথেই হেঁটেছো তুমি। কিন্তু চাইলেই তো অন্য পথ বেছে নিতে পারতে। নেওনি কেন?"

হাসলো ম্যাকগুয়ান।

"কী?"

"আমাদের মধ্যে যে এত পার্থক্য, তা আসলে আগে বুঝিনি।"

"কীরকম পার্থক্য।"

"দিন শেষে তুমি পস্তাও," ম্যাকগুয়ান বললো। "মানে, কাজটা করার সময় উপভোগ করো ঠিকই, কিন্তু শুভ-অশুভের দাঁড়িপাল্লায় নিজেকে অশুভই মনে করে আসছো এতদিন," বলেই হঠাৎ সোজা হয়ে বসলো সে। "ঈশ্বর!"

"কী?"

"আমি যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়েও বিপজ্জনক তুমি, জানো?"

"কীভাবে?"

"তুমি কেইনের ওপর প্রতিশোধ নিতে ফিরে আসোনি," ম্যাকগুয়ান বললো। "ফিরেছো ছোট মেয়েটার জন্য, তাই না?"

এবারে গ্লাসে লম্বা একটা চুমুক দিল ঘোস্ট। কিন্তু মুখে কিছু বললো না।

"অল্প বয়সে নেয়া সিদ্ধান্ত আর বদলে যাওয়া বাস্তবতার ব্যাপারে কথা বলছিলে একটু আগে," বলেই চলেছে ম্যাকগুয়ান। "তোমার ধারণা সেদিন রাতে কেইন যদি মারা যেতো, তাহলে এখন হয়তো পরিস্থিতি অন্যরকম হতে পারতো তোমার জন্যে।"

"আসলেও," বললো ঘোস্ট।

"কিন্তু অন্যরকম মানেই যে ভালো কিছু, তা ভাবা ভুল," পাল্টা যুক্তি দিল ম্যাকগুয়ান। "এখন কী করবে?"

"উইলের সহযোগিতা চাই আমাদের। একমাত্র সে-ই পারবে কেইনকে বের করে আনতে।"

"আমার মনে হয় না ও সাহায্য করতে রাজি হবে।"

"তুমি তো ওকে চেনো ভালো করে, বলো দেখি কী করা যায়?" ভ্রু কুঁচকে বললো ঘোস্ট।

"ওর বাবা?"

"না।"

"বোন?"

"অনেক বেশি দূরে থাকে সে," ঘোস্ট বললো।

"কিন্তু একটা পরিকল্পনা আছে তোমার মাথায়, তাই না?"

"ভাবো," ঘোস্ট বললো।

আসলেও ভাবলো ম্যাকগুয়ান। ঘোস্টের ইঙ্গিতটা বোঝার সাথে সাথে মুখে হাসি ফুটলো তার। "কেটি মিলার।"

ছেচল্লিশ

আমার দিকে তাকিয়ে আছেন পিস্টিলো। তার দেয়া বিস্ফোরক তথ্যটা শোনার পর আমার প্রতিক্রিয়া কী হয়, তা দেখার জন্যে অপেক্ষা করছেন। এতদিনে ঘটনার জট খুলতে শুরু করেছে।

"আমার ভাইকে ধরে ফেলেছিলেন আপনারা?"

"হ্যাঁ।"

"অ্যামেরিকায় ফিরিয়ে এনেছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে পেপারে এ ব্যাপারে কোন প্রতিবেদন দেখলাম না কেন?"

"ইচ্ছে করেই চেপে যাওয়া হয়েছে," পিস্টিলো বললেন।

"ম্যাকগুয়ান জেনে যাবে, এই ভয়ে?"

"এটা আংশিক কারণ।"

"মানে?"

কিছু না বলে মাথা ঝাঁকালেন পিস্টিলো।

"এখনও ম্যাকগুয়ানকে ধরতে চান আপনি," বললাম।

"হ্যাঁ।"

"আর আমার ভাইকে সেজন্যেই দরকার, এতদিন পরেও।"

"তার সাহায্য কাজে লাগতো আমাদের।"

"সেজন্যেই আবারো চুক্তি করেন?"

"বলতে পারেন যে পুরনো চুক্তিটাই নবায়ন করা হয়।"

"উইটনেস প্রোটেকশন প্রোগ্রামের সহায়তা নেন সেই কাজে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন পিস্টিলো। "প্রথমে কড়া নজরদারির মধ্যে একটা হোটেলে রাখা হয়েছিল তাকে। কিন্তু কেইনের কাছে যে তথ্যগুলো ছিল, তার বেশিরভাগই পুরনো। যদিও সাক্ষী হিসেবে তার কদর একটুও

কমেনি। তবুও, আরো সময় দরকার আমাদের। হোটেলে তো চিরদিন রাখা সম্ভব নয় তাকে, কেইনও রাজি ছিল না থাকতে। তাই নামকরা একজন আইনজীবির সাথে যোগাযোগ করে সে, তার সাহায্য নিয়ে কিছু পরিবর্তন আনে চুক্তিতে। নিউ মেক্সিকোতে তার থাকার ব্যবস্থা করে দেই আমরা। কথা হয়েছিল যে প্রতিদিন একবার আমাদের এজেন্টকে ফোন দিবে। আদালতে যখন তার সাক্ষ্যের দরকার হবে, আমরা যোগাযোগ করবো তার সাথে। যদি এই চুক্তির কোন বরখেলাপ হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে পুরনো অভিযোগগুলো আবারো ফিরিয়ে আনা হবে।"

"কিন্তু?"

"ম্যাকগুয়ান জেনে যায়।"

"কীভাবে?"

"সেটা আমরা জানি না। হয়তো কেউ লাগিয়ে রেখেছিল। যাইহোক, আপনার ভাইকে হত্যার জন্যে দুই গুন্ডা পাঠায় সে।"

"উল্টো তারাই মারা যায় নিউ মেক্সিকোতে।"

"হ্যাঁ।"

"কে মেরেছে তাদের?"

"খুব সম্ভবত আপনার ভাই। সে যে কতটা বিপজ্জনক হতে পারে, এ সম্পর্কে বোধহয় ধারণা ছিল না তাদের। তাদের মেরে আবার পালিয়ে যায়।"

"তাই আপনারাও আবার তার পেছনে লেগেছেন।"

"হ্যাঁ," ফ্রিজের ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন পিস্টিলো।

"কিন্তু আমি তো জানি না যে কেইন কোথায়।"

"সেটা এতদিনে বুঝেছি। হয়তো আমরাই কোথাও গোলমাল করেছিলাম। কেইনেরও উচিত আমাদের সাথে যোগাযোগ করা। তাকে নিরাপত্তা দেবো আমরা। সেফ হাউজে থাকতে পারবে চাইলে। তাছাড়া আদালতে শাস্তির মেয়াদ কীরকম হবে, সেটা নির্ভর করছে তার সহযোগিতার ওপর।"

"আমার কাছে কী চাইছেন?"

"আপনার সাথে কখনো না কখনো যোগাযোগ করবে সে।"

"এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কী করে?"

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে গ্লাসের দিকে তাকালেন পিস্টিলো।

"এতটা নিশ্চিত হচ্ছেন কী করে?" আবারো জানতে চাইলাম।

"কারণ," ইচ্ছে করে মুখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে রেখেছেন পিস্টিলো, "আপনাকে ইতোমধ্যে ফোন দিয়েছিল কেইন।"

বুকের ওপর একটা দশমণি পাথর চেপে বসলো যেন।

"অ্যালবাকার্কিতে যে বাড়িটায় আপনার ভাই থাকতো, তার কাছেই একটা পে-ফোন বুথ আছে। সেখান থেকেই ফোন করা হয় আপনার

অ্যাপার্টমেন্টের ফোন নম্বরে। প্রথম ফোনটা করা হয় জোড়াখুনের ঘটনার এক সপ্তাহ আগে। আর দ্বিতীয়টা খুনের ঠিক পরপর।"

কথাটা শুনে চমকে ওঠা উচিত ছিল আমার। কিন্তু একটুও চমকালাম না। বরং মনে হচ্ছে সবকিছু একদম খাপে খাপে বসে যাচ্ছে এখন। কীভাবে, জানি না।

"আপনি ফোনকলগুলোর ব্যাপারে কিছু জানতেন না বোধহয়?"

আমি অ্যাপার্টমেন্টে না থাকলে কেইনের সাথে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির পক্ষেই কথা বলা সম্ভব।

শিলা।

"না, জানতাম না।"

"আপনার সাথে প্রথম যেদিন কথা বলি আমরা, তখন আমরাও বুঝতে পারিনি যে আপনি কিছু জানেন না। ধরেই নিয়েছিলাম আপনার সাথে যোগাযোগ করেছে কেইন।"

"শিলা রজার্স এসবের সাথে জড়ালো কীভাবে?" জিজ্ঞেস করলাম তার দিকে তাকিয়ে।

"মার্ডার সিনে তার আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়।"

"সেটা জানি আমি।"

"তাহলে আপনাকেই এখন প্রশ্নটা করি, উইল। আমরা ভেবেছি আপনার ভাই আপনার সাথে যোগাযোগ করেছে। আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে আপনার গার্লফ্রেন্ড নিউ মেক্সিকোতে কেইনের বাসায় গিয়েছে। আমাদের জায়গায় যদি আপনি থাকতেন, তাহলে কী ভাবতেন?"

"এসবের সাথে আমিও কোন না কোনভাবে জড়িত।"

"ঠিক বলেছেন। আমরা ভেবেছিলাম শিলা রজার্স আপনাদের দুই ভাইয়ের হয়ে বার্তা আদান-প্রদান করছে। গোপনে কেইনকে সাহায্য করছেন আপনি। তাই সে যখন পালিয়ে গেল, প্রথমেই আমাদের মাথায় আসে যে আপনারা দুইজন নিশ্চয়ই কিছু একটা জানেন।"

"কিন্তু এখন ভুলটা বুঝতে পেরেছেন।"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে এখন আপনারা কী সন্দেহ করছেন?"

"যেটা আপনি সন্দেহ করছেন, উইল," মি. পিস্টিলোর কণ্ঠে করুণার আভাস। "শিলা রজার্স আপনাকে ব্যবহার করেছে। ম্যাকগুয়ানের হয়ে কাজ করতো সে। তার কাছ থেকেই হারামিটা খবর পায় যে কেইন দেশে ফিরেছে। কিন্তু কেইনকে হত্যা করতে ব্যর্থ হওয়ায় ম্যাকগুয়ান রাগের চোটে মিস রজার্সকেই খুন করে।"

তাই বলে শিলা? শরীরের প্রতিটা রক্তবিন্দুতে অনুভব করতে পারছি ওর বিশ্বাসঘাতকতা। এতদিন এসব সংলাপ শুধুমাত্র সিনেমা নাটকেই শুনে এসেছি।

এরকম একটা মানুষকে কিনা এতটা ভালোবাসি আমি? এতটাই বোকা যে ঘুণাক্ষরেও কিছু সন্দেহ করিনি?

"আপনাকে এতদিন পর এসব বলছি, কারণ, আমার ধারণা বোকার মতো কিছু একটা করতে চলেছিলেন আপনি।"

"যেমন, গণমাধ্যমের কারো সাথে কথা বলা।"

"হ্যাঁ। আরেকটা ব্যাপার আপনাকে বুঝতে হবে। আপনার ভাইয়ের কাছে এখন দুটো পথ খোলা আছে। ম্যাকগুয়ান কিংবা ঘোস্টের হাতে খুন হওয়া অথবা আমাদের সাথে যোগাযোগ করে নিজেকে নিরাপদ রাখা।"

"হ্যাঁ," বললাম। "কতটা নিরাপদ থাকবে সেটা তো দেখতেই পাচ্ছি।"

"যা-ই বলুন না কেন, আমরা ছাড়া আর কারো কাছে সাহায্য পাবে না সে। এটাও ভাববেন না যে ম্যাকগুয়ান ছেড়ে দেবে তাকে। আপনার কি আসলেও মনে হয় যে কেটি মিলারের ওপর আক্রমনের ব্যাপারটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা? আপনার সাহায্য দরকার আমাদের, উইল। আর সেটা আপনার ভালোর জন্যেই।"

কিছু বললাম না। তাকে ভরসা করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে, এটা ভালো করেই জানি। আসলে কাউকেই আর ভরসা করতে পারবো বলে মনে হয় না। কিন্তু মি. পিস্টিলোর সাথে অন্যদের কোন তুলনা চলবে না। এগারো বছর ধরে নিজের বোনের কষ্ট চোখের সামনে দেখে আসছেন। আর এরকম একটা বিষয় যে কাউকে বদলে দিতে বাধ্য। যে কোন মূল্যে ম্যাকগুয়ানকে চাই তার। সে জন্যে দরকার হলে আমার ভাইকে বলি দিতেও পিছপা হবে না।

আমার পুরো পরিবারের আজকের এই অবস্থার জন্যে সে-ই দায়ী। আমার বোন এখান থেকে সিয়াটল চলে গেছে, মা জীবনের শেষ দিনটা পর্যন্ত কষ্ট পেয়েছে। তার মুখের হাসিটা কেড়ে নিয়েছে আমার সামনে বসে থাকা এফবিআইয়ের এই এজেন্ট। আমার মাকে হত্যা করেছে সে। কেউ যতই ক্যান্সারের কথা বলুক না কেন, আমাকে টলাতে পারবে না। ডাক্তাররা বলবে, তার রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়েছিলো, কিন্তু সেটার পেছনে কি সেই রাতের কোন ভূমিকা নেই? আর এখন সে আমার কাছে সাহায্য চাইছে!

তার বলা কথাগুলোর কতটুকু মিথ্যে তা জানি না, কিন্তু পাল্টা মিথ্যে বলতে কোন সমস্যা হলো না আমার। "সাহায্য করবো আমি," বললাম।

"বেশ," বললেন পিস্টিলো। "আপনার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো নিয়ে যাতে আর টানাহেঁচড়া না করা হয়, সে বিষয়টা দেখছি।"

ধন্যবাদ দিলাম না।

"আপনি চাইলে আমাদের কেউ আপনাকে বাসায় নামিয়ে দিয়ে আসতে পারে।"

ভাবলাম মানা করে দেই, কিন্তু এ মুহূর্তে এমন কিছু করা যাবে না, যাতে সন্দেহের উদ্রেক ঘটে তার মনে। আমাকে হয়তো ঘোল খাওয়াতে চাচ্ছেন, আমারও পাল্টা ঘোল খাওয়াতে সমস্যা কোথায়? রাজি হয়ে গেলাম।

"মিস রজার্সের শেষকৃত্যের অনুষ্ঠান বোধহয় সামনে?"

"আপনার বিরুদ্ধে যেহেতু আর কোন অভিযোগ নেই, যেখানে ইচ্ছে যেতে পারেন।"

কিছু বললাম না।

"যাবেন ওখানে?" জিজ্ঞেস করলেন পিস্টিলো।

"জানি না," এবারে সত্যিটাই বললাম তাকে।

সাতচল্লিশ

কিছু না করে বাসায় বসে থাকা সম্ভব না আমার পক্ষে, তাই সকাল হতেই অফিসের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। ভেবেছিলাম ওখানে গিয়েও হয়তো লাভ হবে না, মুখ গোমড়া করে থাকবো। কিন্তু হলো এর উল্টো। খেলোয়াড়রা যেরকম তাদের যাবতীয় দুশ্চিন্তা ছেড়ে মাঠে পা রাখে, কোভেন্যান্ট হাউজের অফিসের ব্যাপারটাও সেরকমই। এখানে যে ছেলেমেয়েরা আছে, তাদের চোখে যেন কখনো ভালোবাসার ঘাটতি ধরা না পড়ে—এই মূলমন্ত্রটাই বারবার আউড়ে চললাম মনে মনে।

হ্যাঁ, অনেকেই এসে সমবেদনা জানালো। শিলার স্মৃতিগুলোও সুযোগ বুঝে তাদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে শেল্টারের আনাচে-কানাচে, কিন্তু আমাকে দমাতে পারলো না কোনটাই। এমন না যে আমি বর্তমান পরিস্থিতির কথা পুরোপুরি ভুলে গেছি। কেইন কোথায় আছে, শিলাকে কে খুন করলো বা কার্লির ভাগ্যে কী ঘটেছে—এই প্রশ্নগুলোর জবাব এখনও জানতে চাই আমি। কিন্তু আজকে হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু জানা সম্ভব না। কেটির হাসপাতালে ফোন দিয়েছিলাম, কিন্তু এখনও তার সাথে কথা বলার অনুমতি নেই কারো। স্কয়ার্স একটা গোয়েন্দা সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে ডোনা হোয়াইট ছদ্মনামটার ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছে। এখন পর্যন্ত কিছু জানা যায়নি। তাই অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

রাতের বেলা অনেকদিন পর ভ্যান নিয়ে বেরুলাম। স্কয়ার্সও যোগ দিল আমার সাথে। সবকিছু খুলে বলেছি ওকে। কিছুক্ষণের মধ্যে শহরের আঁধারে মিশে যাবে আমাদের ভ্যানটা।

ঘর থেকে পালিয়ে রাস্তায় আশ্রয় নেয়া ছেলেমেয়েরা খুব সহজেই অন্যদের মাঝে মিশে যেতে পারে। বয়স্ক কাউকে দেখলে নিশ্চিত হয়ে বলা

সম্ভব যে সে গৃহহীন কিনা। চেহারাই অনেক কিছু বলে দেয়। কিন্তু কিশোর-কিশোরীদের দেখলে নিশ্চিত হয়ে বলা যায় না যে তারা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরতে বেড়িয়েছে নাকি নীড় ছেড়ে পালিয়ে এসেছে।

সবাই যা-ই বলুক না কেন, একজন প্রাপ্তবয়স্ক গৃহহীন ব্যক্তির সাহায্যের আকুতি পুরোপুরি উপেক্ষা করা মোটেও সহজ কোন কাজ নয়। চোখ নামিয়ে অন্য দিকে হাঁটতে শুরু করলেও মনের ভেতরে খচখচ করতে থাকবে। হয়তো এই বলে নিজেকে স্বান্তনা দেবেন যে এক-দুই ডলার হাতে এলেই তারা মদ বা নেশাদ্রব্য কিনতে ছুটে যাবে। কিন্তু আপনি যে অসহায় একটা মানুষের সাহায্যের অনুরোধে কোন প্রকার সাড়া দিলেন না, ব্যাপারটা পোড়াবে। অবশ্য আমরা যাদের খুঁজছি, তারা পুরোপুরি মিশে গেছে রাস্তার পরিবেশের সাথে। তাদের ব্যাপারে পরোয়া না করলেও খারাপ লাগবে না, কারণ তাদের দেখে সাহায্যপ্রার্থী মনে হয় না।

আমার হাতে বেশ কয়েকটা ফোন কার্ড গুঁজে দিল স্কয়ার্স। সেইন্ট জোনস এভিনিউতে গাড়ি থামিয়ে কাজে নেমে পড়লাম দুজনে। এই এলাকাটা হিরোইনখোরদের আখড়া হিসেবে বেশ পরিচিত। বেশ কয়েকজনের সাথে কথা বললাম, তাদের গল্প শুনলাম। নেশার ঘোরে হাত-পায়ের অদৃশ্য পোকা মাকড়গুলোকে তাড়াতে দেখলাম।

ভোর চারটার দিকে ভ্যানে ফিরলাম আমি আর স্কয়ার্স। গত কয়েক ঘন্টায় খুব একটা কথা হয়নি আমাদের মধ্যে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো ও। এখনও রাস্তায় অনেক ছেলেমেয়েদের দেখা যাচ্ছে।

"শিলার শেষকৃত্যে যাওয়া উচিত আমাদের," স্কয়ার্স বললো।

কিছু বলার সাহস হলো না।

"ওদের সাথে কখনো কাজ করতে দেখেছো শিলাকে?" জিজ্ঞেস করলো আমার বন্ধু। "তখন ওর চেহারাটা লক্ষ্য করেছিলে?"

দেখেছি আমি। স্কয়ার্স কী বলতে চাচ্ছে সেটাও বুঝছি।

"তাড়নাটা ভেতর থেকে না আসলে ওভাবে কাজ করা সম্ভব নয়।"

"তোমার কথা বিশ্বাস করতে খুব ইচ্ছে করছে।"

"শিলাকে দেখলে তোমার কেমন লাগতো প্রতিবার?"

"মনে হতো যে আমি এই পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবান মানুষ," বললাম।

"এরকম ভালোবাসা কখনো মেকি হয় না, উইল।"

"তাহলে সবকিছু তুমি কীভাবে ব্যাখা করবে?"

"ব্যাখা করার চেষ্টা করছি না তো আমি," ভ্যান চালু করে বললো স্কয়ার্স। "মগজের পাশাপাশি মাঝে মাঝে হৃদয়ের ওপরেও ভরসা করতে হয়।"

"কথাগুলো শুনতে ভালো লাগছে, স্কয়ার্স। কিন্তু আমার সাথে যা হয়েছে..."

"তাহলে এক কাজ করি চলো। যে শিলাকে আমরা চিনতাম, অন্তত তার খাতিরে শেষকৃত্যে যাই।"

"পুরোটাই ওর অভিনয় জানার পরেও?"

"হ্যাঁ। এমনও হতে পারে যে ওখানে গিয়ে নতুন কিছু জানতে পারলাম।"

"তুমিই না বলেছিলে, এমন কিছু হয়তো জানতে হতে পারে, যেটা আমাদের ভালো লাগবে না।"

"হ্যাঁ, তা ঠিক," বলে ভ্রু নাচালো স্কয়ার্স। "আমার বাণী অমৃতের কোন তুলনাই হয় না।"

হাসলাম।

"এটা ওর প্রাপ্য, উইল।"

ভুল বলেনি স্কয়ার্স। এখনও অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া বাকি। অনুষ্ঠানে হয়তো এমন কারো সাথে পরিচয় হবে, যে নতুন তথ্য দিতে পারবে। কিংবা আমার 'প্রিয়তমা'-কে একটা কফিনে দেখার পর হয়তো সবকিছু ভোলাটা সহজ হবে। সেই সম্ভাবনা কম, তবে সুযোগ নিয়ে দেখতে তো কোন অসুবিধে নেই।

"তাছাড়া কার্লির ব্যাপারেও ভাবতে হবে আমাদের," বলে জানালা দিয়ে বাইরে দেখালো স্কয়ার্স। "বাচ্চাদের নিয়েই তো আমাদের কাজ, নাকি?"

"হ্যাঁ," বলে ওর দিকে ফিরলাম। "বাচ্চাদের নিয়ে যখন কথা বলছিই আমরা–"

সানগ্লাসের কারণে ওর চোখজোড়া দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু স্টিয়ারিং হুইলের ওপর ওর হাতদুটো যে শক্ত হয়ে চেপে বসেছে, সেটা টের পেলাম।

"শিলা আর তোমাকে নিয়ে কথা বলছি আমরা," তীক্ষ্ণস্বরে বললো স্কয়ার্স।

"ওসব তো অতীত। হাজার কথা বললেও বদলাবে না।"

"আপাতত একটা বিষয়েই মনোযোগ দেই আমরা, ঠিক আছে?"

"না, ঠিক নেই," বললাম। "বন্ধুত্বে দুই পক্ষকেই সমানভাবে অংশগ্রহণ করতে হয়। শুধুমাত্র একজনের সমস্যা নিয়ে পড়ে থাকলে চলবে না।"

জবাবে কেবল মাথা ঝাঁকালো ও। ভ্যান চালাচ্ছে একমনে। ওর দাড়ি না কামানো মুখের দিক থেকে দৃষ্টি সরালাম না। ট্যাটুটা বেশ অদ্ভুত দেখাচ্ছে এখন। নিচের ঠোঁট কামড়ে চলেছে একটানা।

"কখনো ওয়ান্ডাকে বলিনি আমি," কিছুক্ষণ পর বললো সে।

"তোমার যে একটা বাচ্চা আছে, সে ব্যাপারে?"

"একটা ছেলে," আগের তুলনায় কোমল হয়ে এসেছে ওর কণ্ঠস্বর।

"কোথায় সে এখন?"

স্টিয়ারিং থেকে এক হাত উঠিয়ে গাল চুলকালো স্কয়ার্স। খেয়াল করলাম যে আঙুলগুলো কাঁপছে। "বয়স চার বছর হবার আগেই মাটির ছয় ফিট গভীরে ঠিকানা হয় ওর।"

চোখ বন্ধ করে ফেললাম।

"ওর নাম ছিল মাইকেল। কখনো ছেলেটার প্রতি কোন টান অনুভব করিনি। দেখেইছিলাম মোট দুবার। ওর সতেরো বছর বয়সী নেশাখোর মায়ের জিম্মায় রেখে নিজে ঘুরে বেড়াতাম। মাইকেলের যখন তিন বছর বয়স, একরাতে নেশার ঘোরে রাস্তার পার হতে গিয়ে তার মা ট্রাকের সামনে পড়ে যায়। দুজনকেই পিষে ফেলে ট্রাকটা। ব্যাপারটা আত্মহত্যা ছিল কিনা, এ নিয়ে এখনও সন্দেহ হয় আমার।"

"সরি, স্কয়ার্স," দুর্বল কণ্ঠে বললাম।

"বেঁচে থাকলে ওর বয়স হতো এখন একুশ।"

বলার মতো কিছু খুঁজে পাচ্ছি না, তবুও হাল ছাড়লাম না। "অনেক বছর আগের কথা। তখন একদমই কম বয়স ছিল তোমার।"

"এটা কোন যুক্তি হতে পারে না, উইল।"

"যুক্তি দিচ্ছি না। মানে–" কথাটা গুছিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছি মনে মনে। "আমার যদি একটা বাচ্চা থাকতো, তাহলে তুমি হতে তার গডফাদার। আমার অনুপস্থিতিতে তুমি ওর অভিভাবকত্বের দায়িত্ব পালন করতে। শুধুমাত্র আমাদের বন্ধুত্বের খাতিরে যে কাজটা করতাম, তা নয়। বরং বলতে পারো স্বার্থপরের মতো হতো কাজটা, আমার বাচ্চার নিরাপত্তার খাতিরে।"

"কিছু বিষয়ে নিজেকে কখনো ক্ষমা করা যায় না, উইল।"

"তার মৃত্যুর পেছনে তোমার তো কোন হাত নেই।"

"ঠিক বলেছো। আমার কোন দোষই নেই।"

সিগন্যালে আটকালাম আমরা। রেডিও চালু করে দিলাম। কোন বিশেষ খাবারটা দিনে দুবার খেলে শরীরের সমস্ত চর্বি ঝরে যাবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ চলছে। বিরক্ত হয়ে বন্ধ করে দিল স্কয়ার্স। স্টিয়ারিংয়ের ওপর হেলান দিয়ে আছে এখন।

"রাস্তায় কোন অসহায় ছেলেমেয়েকে দেখলেই সাহায্য করতে ইচ্ছে করে আমার। মনে হয় যদি তাদের সাহায্য করি, তাহলে হয়তো মাইকেলের আত্মা শান্তি পাবে। এভাবেই হয়তো তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবো," সানগ্লাসটা খুলে পড়লো এসময়। "কিন্তু এটাও খুব ভালো করেই জানি, আমি যা-ই করি না কেন, কিছু বদলাবে না।"

মাথা ঝাঁকালাম। এরকম কথার প্রেক্ষিতে কী বলা যায়, সেটা নিয়ে ভাবলাম অনেকক্ষণ। কিন্তু কিছুই মাথায় এলো না। "ভুল বললে," শেষমেষ এটুকু বললাম কোনমতে।

আবারো সানগ্লাস চোখে দিয়ে রাস্তার দিকে তাকালো স্কয়ার্স।

"তুমি শেষকৃত্য অনুষ্ঠানটায় যাওয়ার কথা বললে, কারণ সেটা শিলার প্রাপ্য। কিন্তু ওয়ান্ডার ব্যাপারে তো ভুলে গেলে চলবে না!" হাল না ছেড়ে বললাম।

"উইল?"

"কী?"

"এ বিষয়ে আর কথা বাড়াতে চাচ্ছি না।"

আটচল্লিশ

কোন রকম ঝামেলা ছাড়াই ভোরের ফ্লাইটে পৌছে গেলাম বোইজিতে। লাগার্ডিয়া থেকে প্লেনে চড়ি আমরা। ইকোনমি ক্লাসের আমার সিটটার ঠিক সামনেই সিট পড়েছিল এক বয়স্ক ভদ্রমহিলার। গোটা ফ্লাইট নিজের আসনটা পেছনের দিকে হেলিয়ে রেখেছিলেন। বলতে গেলে একদম আমার কোলের ওপরেই এসে পড়েছিল তার মাথাটা। কতগুলো চুল আছে তা গুণতে গুণতেই সময় কেটে যায়।

স্কয়ার্স বসেছিল আমার ডানদিকে। পুরোটা পথ মুখ ডুবিয়ে রেখেছে 'ইয়োগা জার্নালে'। সেখানে একটা প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে তার সম্পর্কে। কিছুক্ষণ পরপরই মাথা নেড়ে বলছিল, "ঠিক বলেছে, আসলেও আমি ওরকম।" গোটাটাই যে আমাকে বিরক্ত করার জন্যে, তা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না।

'*ওয়েলকাম টু ম্যাসন, আইডাহো*'–সাইনটা দেখা অবধি সবকিছু মোটামুটি ভুলে থাকতে পারলাম। একটা বুইক স্কাইলার্ক ভাড়া করেছে স্কয়ার্স। দুবার পথ ভুল করলাম আমরা। এরকম একটা শহরেও চারদিকে স্ট্রিপ মলের আধিপত্য। নামকরা সব মেগাস্টোরই চোখে পড়লো–শেফ সেন্ট্রাল, হোম ডিপো, ওল্ড নেভি।

সাদা রঙের চ্যাপেলটা বেশ ছোট, বলার মতো সেরকম কোন বিশেষত্ব নেই। এডনা রজার্সকে দেখতে পেলাম। একা একা দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছেন। গাড়ি থামালো স্কয়ার্স। ঘাড়ের পেশি শক্ত হয়ে গেছে আমার। দরজা খুলে বাইরে পা রাখলাম। ঘাসের বাদামি রঙ দেখে সূর্যের তেজ আন্দাজ করা যাচ্ছে। আমাদের দিকে তাকালেন এডনা রজার্স। লম্বা একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন নির্বিকার ভঙ্গিতে।

তার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। স্কয়ার্স পাশেই আছে। বড্ড খালি খালি লাগছে।

শিলার শেষকৃত্যে এসেছি আমি! আজ তাকে কবর দেয়া হবে!

এখনও সিগারেটটা টেনেই চলেছেন এডনা রজার্স। "তুমি শেষ পর্যন্ত আসবে কিনা ভাবছিলাম।"

"এসেই পড়লাম।"

"কার্লির কথা কিছু শুনেছো?"

"না," কথাটা সত্যও নয়, আবার মিথ্যেও নয়। "আপনি?"

মাথা ঝাঁকালেন তিনি। "পুলিশ অতটা গুরুত্ব দিয়ে খুঁজছে না। বারবার বলছে যে শিলার কোন বাচ্চা থাকার সম্ভাবনা কম। আমার ধারণা ওরা বিশ্বাসই করছে না ব্যাপারটা।"

এর পরের ঘটনাগুলো ঘটে গেলো চোখের নিমেষে। স্কয়ার্স সমবেদনা জানালো। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবে ভরে উঠলো চ্যাপেল। তাদের বেশিরভাগই স্যুট পরিহিত পুরুষ। শিলার বাবার সাথে একই প্ল্যান্টে কাজ করে। কেন জানি না, কিন্তু ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত ঠেকলো আমার কাছে। কয়েকজনের সাথে হাত মেলালাম, তাদের নাম ভুলেও গেলাম। শিলার বাবা বেশ লম্বা, সুদর্শন একজন মানুষ। আমাকে দেখে একবার শক্ত আলিঙ্গনে বেঁধে তার সহকর্মীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। শিলার এক ভাই আর এক বোন আছে। দুজনেই অন্যমনস্ক এ মুহূর্তে।

অনেকটা সময় বাইরেই কাটালাম আমরা। যেন ভেতরে গিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করতে ভয় পাচ্ছি। বেশ কয়েকটা দলে ভাগ হয়ে গল্প করছে সবাই। কমবয়সি ছেলেমেয়েরা শিলার ভাইবোনের সাথে আছে। শিলার বাবা দাঁড়িয়ে আছেন তার স্যুট পরিহিত সহকর্মীদের সাথে। মহিলারা দাঁড়িয়ে আছেন দরজার কাছে।

স্কয়ার্সের দিকে অনেকেই তাকাচ্ছে, তবে এতে অভ্যস্ত সে। আজকেও সেই জিন্স পরনে তার, তবে এর সাথে মানানসই নীল রঙের ব্লেজারও গায়ে চাপিয়েছে। আসার পথে বলছিল যে অন্য সময় হলে স্যুট পরতো, কিন্তু শিলা নাকি তখন চিনতে পারতো না তাকে।

ধীরে ধীরে ছোট চ্যাপেলটার দিকে এগোতে শুরু করলো সবাই। এত লোক দেখে একটু অবাকই হয়েছি। তবে এখানে উপস্থিত সবাই মূলত শিলার পরিবারের অন্য সদস্যদের খাতিরে এসেছে, তার জন্যে না। শিলার সাথে অনেক বছর আগেই সম্পর্ক চুকেবুকে গেছে তাদের। আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন এডনা রজার্স। মুখে শুকনো হাসি। তাকে এখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি আমি।

সবার শেষে চ্যাপেলে প্রবেশ করলাম আমরা। শিলাকে কতটা 'সুন্দর', 'জীবন্ত' দেখাচ্ছে এই নিয়ে ফিসফিসিয়ে কথা বলছে সকলে। সবসময়ের

মতোই মন্তব্যগুলো বিরক্তিকর ঠেকলো আমার কাছে। খুব একটা ধার্মিক নই আমি, কিন্তু মৃতদেহ সৎকারের ব্যাপারে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতিই সমর্থন করি। যত দ্রুত সম্ভব মাটি দিয়ে দিতে হবে মৃতকে। তাছাড়া আমাদের ওপেন কাসকেট ফিউনারেলও হয় না।

ওপেন কাসকেট ফিউনারেল ভালো লাগে না আমার।

মৃত একজন মানুষকে এভাবে পরিপাটি করে সাজানো অবস্থায় দেখাটা একটু কেমন যেন। মনে হয় 'মাদাম তুসো' জাদুঘরে চলে এসেছি; যেকোন সময় প্রাণ ফিরে পাবে শবদেহ। লাইনের একদম শেষে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা। শিলাকে শেষবারের মতো দেখার লাইন।

কিন্তু একবার এসেই যখন পড়েছি, নিয়ম তো পালন করতেই হবে। শক্ত করে আমার হাত ধরে আছেন এডনা রজার্স। যতই সামনে এগোচ্ছি, তার হাঁটুর কাঁপুনি বাড়ছে। যাতে পড়ে না যান, সেজন্যে আমিও শক্ত করে ধরলাম তাকে। আবারো হাসলেন তিনি, তবে এবারের হাসিটা বেশ আন্তরিক।

"ওর জন্যে আমার ভালবাসা কখনোই কমেনি," ফিসফিসিয়ে বললেন। "সন্তানদের জন্যে মার ভালোবাসা নিঃশর্ত।"

স্কয়ার্স ঠিক আমাদের পেছনেই। ধীরে ধীরে এগোচ্ছি আমরা। আবারো সেই আশাটা নীড় বাঁধছে বুকের ভেতরে, সম্পূর্ণ অযৌক্তিক একটা আশা। তবে আমার মনে হয় না এটা খারাপ কিছু। মায়ের শেষকৃত্যের দিনেও এমনটা অনুভূতি হয়েছিল আমার। মনে হচ্ছিল কফিনটার দিকে তাকালে হয়তো দেখবো সেটা খালি, গোটা ব্যাপারটাই একটা ভ্রম বৈ কিছু নয়। বোধহয় সেজন্যেই অনেকে ওপেন কাসকেট ফিউনারেল পছন্দ করে। মায়ের শেষ নিঃশ্বাস অবধি পাশে ছিলাম আমি। তবুও সেদিন আশায় বুক বেঁধেছিলাম এই ভেবে যে ঈশ্বর হয়তো শেষ মুহূর্তে মতো পাল্টেছেন।

মৃতের আত্মীয়-স্বজনদের অনেকেই এরকমটা ভাবে নিশ্চয়ই। সত্যকে অস্বীকার শোক প্রকাশেরই একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমিও তাই এখন মনে মনে আশা করছি যে এফবিআই যে ডাটাবেজের সাথে শিলার আঙুলের ছাপ মিলিয়ে দেখেছিল, সেখানে হয়তো কোন গোলমাল হয়েছে, কিংবা মি. এবং মিসেস রজার্স ভুল কাউকে শিলা বলে সনাক্ত করেছেন। এমনকি এই চ্যাপেলে উপস্থিত সবারই হয়তো ভুল হচ্ছে। শিলা আসলে বেঁচে আছে। খুন করে রাস্তার পাশে যাকে ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছিল, সে অন্য কেউ।

আমার আশাটা সত্য প্রমাণিত হলো না।

মানে পুরোপুরি সত্য প্রমাণিত হলো না আর কি।

এডনা রজার্সের সাথে কাসকেটের কাছে যখন পৌছুলাম, চেষ্টা করেও চোখ অন্য দিকে ঘুরিয়ে রাখতে পারলাম না। শিলার দিকে চোখ পড়তেই আমার পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল যেন। আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিলাম।

"ফিউনারেল হাউজের ওরা ভালো কাজ করেছে, তাই না?" মিসেস রজার্স ফিসফিসিয়ে বললেন।

কাঁদছেন তিনি। কিন্তু আমি তখন সেখানে থেকেও নেই। মনে হচ্ছে যেন ভুল করে অন্য কোন বাস্তবতায় চলে এসেছি। কাসকেটটার দিকে আরো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর সত্যটা অনুধাবন পারলাম।

শিলা রজার্স আসলেও মারা গেছে, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

কিন্তু আমি যাকে ভালোবেসেছি, যার সাথে একই অ্যাপার্টমেন্টে থেকেছি, যাকে বিয়ে করতে চেয়েছি–সে শিলা রজার্স নয়।

উনপঞ্চাশ

অজ্ঞান হইনি, তবে কাছাকাছি পৌঁছে গেছিলাম।

ঘরটা আসলেও চক্কর দিচ্ছে। হোঁচট খেয়ে আরেকটু হলেই পড়ে যাচ্ছিলাম কাসকেটের শিলা রজার্সের ওপর। তাকে আগে কখনো দেখিনি আমি। একটা হাত দ্রুত সামলে নিল আমাকে। স্কয়ার্স। পেছনে ফিরে দেখি ওর চোখেও একই দৃষ্টি, তবে কিছু না বলে কেবল আলতো করে মাথা নাড়লো একবার।

না, ভুল কিছু দেখিনি আমি। পুরোটাই বাস্তব। স্কয়ার্সও দেখেছে।

শেষ পর্যন্ত থাকলাম আমরা। আর কী-ই বা করার ছিল? অচেনা শিলা রজার্সের দিক থেকে চোখই সরাতে পারছিলাম না, কথা বলা তো দূরের কথা। পুরো শরীর কেঁপে উঠছিলো একটু পরপর, তবে কেউ একবারের বেশি দুবার তাকালো না। তাদের চোখে আমি শিলার শোক সন্ত্রস্ত বয়ফ্রেন্ড।

সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলে এডনা রজার্স আমাদের বারবার বললেন তাদের সাথে বাসায় যেতে। কিন্তু দেরি হয়ে গেলে ফেরার প্লেন পাবো না, এই যুক্তি দেখিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিলাম আমি আর স্কয়ার্স। দ্রুত ভাড়া করা গাড়িটা চালিয়ে তাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে এলাম। আরো কিছুদূর এগোনোর পর একপাশে গাড়ি থামিয়ে আমার দিকে তাকালো স্কয়ার্স।

"আমি যা দেখেছি, তুমিও কি সেটাই দেখেছো?" জিজ্ঞেস করলো সে।

মাথা নেড়ে সায় জানালাম, এখন আগের চেয়ে কিছুটা ভালো অবস্থা আমার। তবে এবারে কাঁপছি আনন্দের আতিশায্যে। খুব বেশি গভীরে গিয়ে কিছু ভাবতে পারছি না অবশ্য।

"শিলার ব্যাপারে আমরা যা যা জেনেছি," বললো স্কয়ার্স। "তার বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া, লুইস কাস্টম্যানের সাথে কাজ করা, তোমার আগের

গার্লফ্রেন্ডের সাথে একই হোস্টেলে থাকা, নিউ মেক্সিকোর বাসাটায় আঙুলের ছাপ পাওয়া–এগুলো সব–"

"কিছুক্ষণ আগে দাফন করা সেই অচেনা মহিলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য," ওর হয়ে বাক্যটা শেষ করে দিলাম।

"তাহলে আমাদের শিলা, মানে যাকে আমরা দুজন শিলা হিসেবে চিনি–"

"সে এসবের সাথে জড়িত নয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন একজন মানুষ।"

"অনবদ্য, অবিশ্বাস্য, অসম্ভব...আর কিছু বলার মতো খুঁজে পাচ্ছি না।"

"আমিও না," কোনমতে মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে বললাম।

"আমাদের শিলা যদি মারা না গিয়ে থাকে, তাহলে সে বেঁচে আছে," প্লেনে বললো স্কয়ার্স।

ভ্রু উঁচু করে তার দিকে তাকালাম।

"আমার এসব জ্ঞানগর্ভ বাণী শোনার জন্যে লোকে টাকা খরচ করে আসে, জানো?"

"আর আমি বিনামূল্যেই শুনতে পাচ্ছি।"

"এখন আমরা তাহলে কী করবো?"

"ডোনা হোয়াইট," বুকের ওপর হাত ভাঁজ করে রেখে বললাম।

"গোল্ডবার্গদের কাছ থেকে কেনা সেই ছদ্মপরিচয়টার কথা বলছো?"

"হ্যাঁ, তোমার পরিচিত লোকেরা তো বোধহয় কেবল এয়ারলাইন্সগুলোয় খোঁজ নিয়েছে?"

"হ্যাঁ, তবে খুব বেশি জায়গায় এখনও খোঁজ নিতে পারেনি।"

"একটু দ্রুত কাজ করতে বলো ওদের, খোঁজের পরিধিও বাড়াতে বলো।"

"ঠিক আছে।"

কিছুক্ষণ পর ফ্লাইট অ্যাটেন্ড্যান্ট এসে 'স্ন্যাকস' দিয়ে গেল আমাদের। আমার মস্তিষ্কের চাকাগুলো অবশ্য এক মুহূর্তের জন্যে থামছে না। এই ফ্লাইটটার একটা ভালো দিক হচ্ছে, ধীরে ধীরে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বাস্তবতায় ফিরে আসতে পারছি।

"অনেক কিছুই পরিষ্কার এখন," বললাম।

"যেমন?"

"ও তো সবকিছুতে একটু বেশি বেশি গোপনীয়তা রক্ষা করে চলতো। নিজের জিনিস বলতেও বেশি কিছু ছিল না। আবার অতীত নিয়েও কথা বলতে চাইতো না।"

মাথা ঝাঁকালো স্কয়ার্স।

"একবার শিলা–" বলতে গিয়েও থেমে গেলাম কারণ এটা নিশ্চয়ই তার আসল নাম নয়-"ভুল করে বলে ফেলেছিল যে সে বড় হয়েছে খামারে। কিন্তু আসল শিলা রজার্সের বাবা একটা গ্যারেজ-ডোর-ওপেনার প্ল্যান্টে চাকরি

করে। বাবা-মায়ের নম্বরে ফোন করতে চায়নি, কারণ ওনারা ওর আসল বাবা-মা নন। আর এতে আমি ভেবে নিয়েছিলাম যে শৈশবটা ভালো কাটেনি বেচারির।"

"কিন্তু এমনটাও তো হতে পারে যে সে শিলা রজার্সের ছদ্মবেশে লুকিয়ে ছিল?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে আসল শিলা রজার্সের সাথে," মাথা উঁচু করে বললো স্কয়ার্স, "মানে যাকে একটু আগে কবর দিয়ে আসলাম আমরা, তোমার ভাইয়ের সম্পর্ক ছিল?"

"তাই তো মনে হচ্ছে।"

"মার্ডার সিনেও তার আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে।"

"হ্যাঁ।"

"আর তোমার শিলা?"

কাঁধ ঝাঁকালাম একবার।

"বেশ," স্কয়ার্স বললো। "তাহলে আমরা ধরে নিচ্ছি যে নিউ মেক্সিকোতে প্রতিবেশীরা যে মহিলাকে তোমার ভাইয়ের সাথে দেখেছিল, সে মৃতা শিলা রজার্স।"

"ঠিক।"

"আর তাদের সাথে ছোট একটা মেয়ে ছিল," বলে উদ্দেশ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো সে।

তৎক্ষণাৎ কিছু মাথায় এলো না বলার মতো।

"বুঝতে পারছো কিছু?"

মাথা নাড়লাম। "ছোট মেয়েটা হচ্ছে কার্লি। আর কেইন সম্ভবত তার বাবা।"

"হ্যাঁ।"

সিটে হেলান দিয়ে বসল স্কয়ার্স। স্ন্যাকসের প্যাকেট খুলে বিড়বিড় করে এয়ারলাইন্স কোম্পানির উদ্দেশ্যে গালি দিল।

"উইল?"

"বলো।"

"তুমি যাকে ভালোবাসতে, তার আসল পরিচয় সম্পর্কে কোন ধারণা আছে?"

"না," বলে চোখ বুজলাম।

পঞ্চাশ

বাসায় চলে গেল স্কয়ার্স। ডোনা হোয়াইটের ব্যাপারে কিছু জানতে পারলে সাথে সাথে ফোন করে জানাবে বলেছে। আমিও রওনা হলাম বাসার দিকে, খুব বেশি ক্লান্ত। অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় চাবি ঢোকাচ্ছি, এসময় কেউ একজন হাত রাখলো আমার কাঁধে। চমকে উঠলাম।

"ভয়ের কিছু নেই," চেনা একটা কণ্ঠস্বর বললো।

কেটি মিলার।

কিছুটা খসখসে শোনাচ্ছে ওর কথা। গলায় একটা নেক ব্রেস। চেহারা ফুলে আছে। চোখ টকটকে লাল। ব্রেসের আড়ালে বেগুনি কালশিটে চোখে পড়তেই পেটের ভেতরে মোচড় দিয়ে উঠলো।

"ঠিক আছো তুমি?"

জবাবে মাথা নাড়লো ও।

সাবধানে জড়িয়ে ধরলাম ওকে, যাতে ব্যাথা না পায়।

"কখন বের হয়েছো?" জিজ্ঞেস করলাম।

"কয়েক ঘণ্টা আগে। খুব বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না। বাবা যদি একবার জানতে পারে যে আমি কোথায়–"

"আর বলতে হবে না," হাত উঁচিয়ে বললাম।

দরজা খুলে একসাথে ভেতরে পা দিলাম আমরা। স্বাভাবিক নড়াচড়াতেও কষ্ট হচ্ছে ওর। হাত ধরে কাউচ পর্যন্ত নিয়ে এলাম। কিছু খাবে কিনা জিজ্ঞেস করাতে মানা করে দিল।

"হাসপাতাল থেকে বের হওয়াটা কি ঠিক হয়েছে তোমার?"

"ওরা মানা করেনি, তবে খুব একটা খুশিও বলা যাবে না।"

"বাবার কাছ থেকে পালালে কীভাবে?"

"একটু একগুঁয়ে স্বভাবের আমি।"

"তা তো দেখতেই পাচ্ছি।"

"মিথ্যেও বলেছি।"

"জানতাম।"

"ধন্যবাদ, উইল," ধরা কণ্ঠে বললো কেটি।

মাথা ঝাঁকালাম। "আমার বারবার মনে হয়েছে যে তোমার এই পরিস্থিতির জন্যে আমিই দায়ী।"

"ফালতু কথা," বললো সে।

"আচ্ছা, ঐ হারামিটা যখন তোমাকে আক্রমণ করেছিল, জন নামটা বলেছিলে বোধহয় একবার?"

"পুলিশের লোকদের কাছ থেকে সেটাই শুনলাম।"

"তোমার মনে নেই?"

"না," মাথা ঝাঁকিয়ে বললো।

"কী মনে আছে তোমার?"

"আমার গলা চেপে ধরেছিল কেউ," গম্ভীর স্বরে বললো। "ঘুমোচ্ছিলাম। হঠাৎ কারো হাতের স্পর্শ টের পেলাম গলার কাছটায়। পাগলের মতো করছিলাম শ্বাস নেয়ার জন্যে-" আর বলতে পারলো না।

"তুমি কী জানো জন অ্যাসেল্টা কে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ, জুলির বন্ধু ছিল সে।"

"তার নামই কী বলছিলে?"

"মানে জন বলে যে চেঁচিয়ে উঠেছিলাম, তখন?" বলে কিছুক্ষণ ভাবলো কেটি। "আমি জানি না, উইল। কেন?"

"আমার মনে হয়-" পিস্টিলোর সাথে হওয়া আলাপচারিতার কথা মনে পড়লো আমার। তাকে আমি কথা দিয়েছি যে কেটি এসবে আর জড়াবো না। "আমার ধারণা তার সাথে জুলির খুনের কোন সম্পর্ক আছে।"

"খুনের সম্পর্ক আছে মানে-"

"আপাতত এর চেয়ে বেশি কিছু বলা সম্ভব না আমার পক্ষে।"

"পুলিশদের ভাষায় কথা বলছো দেখি।"

"অদ্ভুত একটা সপ্তাহ কাটিয়েছি," বললাম।

"নতুন কিছু জেনেছো?"

"আমি জানি তুমি সাহায্য করতে চাইছো আমাকে, কিন্তু এ মুহূর্তে ডাক্তারদের নির্দেশ মেনে চলা উচিত তোমার।"

"মানে?" ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো কেটি।

"তোমার বিশ্রাম নেয়া উচিত।"

"আমাকে এসব থেকে দূরে থাকতে বলছো?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার ধারণা আবার হয়তো বিপদে পড়বো?"

"হ্যাঁ।"

"নিজের খেয়াল রাখতে জানি আমি," চোখে আগুন জ্বলছে ওর এখন।

"সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু খুব বিপজ্জনক একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আমরা সবাই।"

"এতদিন তাহলে কী করলাম আমরা?"

"আমার ওপর ভরসা করতে পারো তুমি।"

"উইল?"

"হ্যাঁ?"

"এত সহজে আমাকে ঝেড়ে ফেলতে পারবে না।"

"তোমাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইছিও না," বললাম। "বলতে পারো তোমাকে নিরাপদে রাখতে চাইছি।"

"সেটাও পারবে না," ক্ষীণস্বরে বললো কেটি। "ভালো করেই জানো সেটা।"

কিছু বললাম না।

আমার দিকে এগিয়ে এলো কেটি। "এর শেষ দেখে ছাড়তে চাই আমি। আর কেউ না হোক, তুমি তো বুঝতে পারছো সেটা?"

"পারছি।"

"তাহলে?"

"আমি কথা দিয়েছি যে কিছু বলবো না।"

"কাকে কথা দিয়েছো?"

"আমার ওপর আস্থা রাখো, ঠিক আছে?" মাথা ঝাঁকিয়ে বললাম।

"কিছু ঠিক নেই," উঠে দাঁড়ালো ও।

"আমি চেষ্টা করছি–"

"এখন আমি যদি হঠাৎ তোমাকে বলি এসব থেকে দূরে থাকতে, আমার কথা শুনবে?"

"কিছু বলতে পারবো না," আবারো বললাম মাথা নিচু করে।

দরজার দিকে হাঁটা দিল কেটি।

"দাঁড়াও," বললাম।

"এখন এসবের সময় নেই আমার," বললো ও। "বাবা নিশ্চয়ই চিন্তা শুরু করে দিয়েছে।"

"ফোন দিও আমাকে, ঠিক আছে?" উঠে দাঁড়িয়ে বললাম। একটা মোবাইল ফোন নম্বর দিলাম ওকে। ওরটা মুখস্থ করে ফেলেছি আগেই।

ইচ্ছে করেই জোরে দরজা লাগিয়ে বের হয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যে রাস্তাটায় পৌঁছে গেল কেটি। গলায় প্রচণ্ড ব্যাথা করছে। আজকে যে বাড়াবাড়ি করে ফেলছে, সেটা নিজেও বুঝতে পারছে। কিন্তু

এছাড়া আর কী-ই বা করার আছে ওর? উইলকে সব জানিয়ে দিয়েছে ওরা? সে-ও কি তাহলে অন্য সবার মতোই? নাকি সে আসলেও বিশ্বাস করে যে কিছু না বলার মাধ্যমে ওকে রক্ষা করেছে?

এখন থেকে আরো সাবধানী হতে হবে।

গরমে গলা শুকিয়ে কাঠ। কিন্তু ঠান্ডা কিছু খেতেও পারবে না। গিলতে গেলেই ব্যাথা করে। *কবে যে ঠিক হবে সবকিছু*, ভাবলো। *তাড়াতাড়ি হলেই ভালো।*

এবারে এর শেষটা দেখেই ছাড়বে সে, নিজেকে কথা দিয়েছিল। জুলির খুনির আসল মুখোশ খুলে না দেয়া পর্যন্ত হাল ছাড়বে না।

১৮ নম্বর সড়ক হয়ে মিট-প্যাকিং ডিস্ট্রিক্টের দিকে এগোচ্ছে সে। গোধূলীর সময় হওয়াতে চারপাশ বেশ নির্জন। এই শহরটাই এরকম। দুটো অঙ্কে বিভক্ত সবকিছু। এক দলের কর্মব্যস্ততা শেষ হয় দিনের সাথে, আরেক দলের সবে শুরু। মাঝে কিছুক্ষণের বিরতি। তবে দিন হোক আর রাত, এই রাস্তাটায় কাঁচা মাংসের গন্ধ সার্বক্ষণিক। ভয়টা ফিরে এসেছে আবার।

দাঁড়িয়ে পড়লো রাস্তার মাঝে। মন থেকে তাড়ানোর চেষ্টা করছে অনুভূতিটা। গলার কাছে সেই হাতজোড়ার স্পর্শ এখনও অনুভব করতে পারে। যেভাবে পেঁচিয়ে ধরেছিলো...

যতক্ষণ ওর নড়াচড়া না বন্ধ হয়, ততক্ষণ চেপে ধরে ছিল শক্ত করে।

ঠিক জুলির মতো।

দুঃসহ স্মৃতিটায় এতটাই হারিয়ে গিয়েছিল যে আশপাশে নজর দেয়ার সুযোগই পেলনা। তার কনুইয়ে যখন হাত রাখলো সে, চমকে ঘুরে দাঁড়ালো, "কে-?"

হাত সরালো না ঘোস্ট। "আমাকে নাকি ডাকছিলে তুমি?" হেসে বললো। "এসে গেছি।"

একান্ন

কেটি চলে যাবার পরেও কাউচ ছেড়ে উঠলাম না। রাগ করাটা যুক্তিসংগত। তবে এই মুহূর্তে ওর নিরাপত্তার মূল্য আমার কাছে ঢের বেশি। কিছুক্ষণের জন্যে চোখ বুজলাম। অন্তত আমার কাছে 'কিছুক্ষণই' মনে হলো। কিন্তু ফোনের শব্দে যখন চোখ খুললাম, দেখি সকাল হয়ে গেছে। কলার আইডিতে স্কয়ার্সের নাম দেখাচ্ছে। দ্রুত রিসিভার তুলে নিয়ে কানে চাপালাম।

"হ্যালো," বললাম।

"আমাদের শিলার খোঁজ পাওয়া গেছে খুব সম্ভবত," কোনপ্রকার ভূমিকা ছাড়াই বললো আমার বন্ধু।

আধঘণ্টা পর রেজিনা হোটেলের লবিতে প্রবেশ করলাম আমি।

আমার অ্যাপার্টমেন্টের এক মাইলের মধ্যেই হোটেলটা। আমরা ভেবেছিলাম ও হয়তো দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চলে গেছে। কিন্তু শিলা (এ ছাড়া অন্য কী নামে ডাকবো?) কাছাকাছিই আছে!

স্কয়ার্স যে ডিটেক্টিভ এজেন্সির সাহায্য নিয়েছে তাদের খুব একটা কষ্ট হয়নি শিলার অবস্থান খুঁজে বের করতে। তাছাড়া আসল শিলার রজার্সের মৃত্যুর পর অনেকটাই বেখেয়ালী আচরণ করেছে সে। ফাস্ট ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের একটা অ্যাকাউন্টে টাকা ডিপোজিট করার পর ভিসা কার্ডের মাধ্যমে সেখান থেকে খরচ করেছে। এই শহরে ক্রেডিট কার্ড ছাড়া খুব বেশিক্ষণ টেকা যায় না। বেনামে মোটেলে গিয়ে নগদ টাকায় বিল মিটিয়ে আত্মগোপন করার দিন শেষ। কয়েকটা 'বিশেষ' হোটেল ছাড়া বেশিরভাগ জায়গায় ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমেই বিল পরিশোধ করতে হয়। এতে রুমের কোন ক্ষতি করলে সহজেই সেই অতিথিকে খুঁজে বের করতে পারে কর্তৃপক্ষ।

সে নিশ্চয়ই ভেবেছিল কেউ তাকে খুঁজে পাবে না। ভাবাটাই স্বাভাবিক, গোল্ডবার্গদের কাছ থেকে খরচ করে নতুন পরিচয় কেনার উদ্দেশ্যই তো ছিল

সেটা। এখন আমরা যে গোল্ডবার্গদের কাছে গিয়েই হাজির হবো, তা ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি। এটা একমাত্র সম্ভব হয়েছে কারণ র‍্যাকেল আর স্কয়ার্সকে গোল্ডবার্গরা খুব ভালো করে চেনে। তাছাড়া শিলার 'খুন' হবার জন্যে আংশিকভাবে নিজেদের দায়ী করে দুই বুড়ো-বুড়ি। আর সবচেয়ে বড় কথা, মারা যাবার পর তাকে কেন খুঁজবে কেউ?

গতকাল ক্রেডিট কার্ডটা ব্যবহার করে ইউনিয়ন স্কয়ারের একটা এটিএম বুথ থেকে টাকা তোলা হয়েছে। এটা জানার পর কাজ অনেকটাই সহজ হয়ে যায়। আশপাশে যে হোটেলগুলো আছে সেগুলোয় ঠিক করে খোঁজ নিতেই বেরিয়ে আসে সত্যটা। বেশিরভাগ ডিটেক্টিভ এজেন্সিরই ফোন কোম্পানি, ট্যাক্স ব্যুরো বা ক্রেডিট কার্ড কোম্পানিগুলোতে সোর্স আছে। আপনার যদি ধারণা থেকে থাকে যে এখনকার দিনে এসব কোম্পানি থেকে বাইরের কেউ তথ্য বের করতে পারে না, তাহলে পেপার পড়া ছেড়ে দেয়ার পরামর্শ দিব।

তবে এক্ষেত্রে এত জটিল কিছুও করতে হয়নি। কেবল হোটেলগুলোর রিসিপশনে ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছে ডোনা হোয়াইটের সাথে কথা বলা যাবে কিনা। কেউ না কেউ বলবেই-'জি, একটু লাইনে থাকুন দয়া করে'। রেজিনা হোটেলে পা দিতেই পেটের ভেতরে প্রজাপতির নাচন টের পেলাম। বেঁচে আছে ও। এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না আসলে। নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত বিশ্বাস হবেও না। এই আশা জিনিসটা বড্ড খারাপ। কিছুক্ষণ আগেও যেখানে মনে হচ্ছিল যে অলৌকিক কিছু ঘটা হয়তো আসলেও সম্ভব, সেখানে এখন মনে হচ্ছে শেষমুহূর্তে সব হারিয়ে ফেলবো। এবারে কাসকেটের দিকে তাকিয়ে হয়তো দেখবো, আমার শিলাই শুয়ে আছে।

সবসময় ভালোবেসে যাব তোমাকে।

ওর রেখে যাওয়া চিরকুটটায় এ'কথাই লেখা ছিল। সবসময়।

ফ্রন্ট ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়ালাম। স্কয়ার্সকে বলেছি আজকে আমি একাই আসতে চাই এখানে। বুঝেছে ও, কথা বাড়ায়নি। সোনালি চুলের রিসিপশনিস্ট এ মুহূর্তে ফোনে কথা বলতে ব্যস্ত। মৃদু হেসে আমাকে অপেক্ষা করার অনুরোধ করলো সে ইশারায়। তাড়া নেই-এমন ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালাম জবাবে।

"কীভাবে সাহায্য করতে পারি আপনাকে?" মিনিটখানিক বাদে রিসিভার নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলো সে।

"মিস ডোনা হোয়াইটের সাথে দেখা করতে এসেছি আমি। তার রুম নম্বরটা বলতে পারবেন?"

"দুঃখিত স্যার, অনুমতি ছাড়া অতিথিদের রুম নম্বর কাউকে জানানোর নিয়ম নেই আমাদের।"

আসলেই বোকার মতো প্রশ্ন করে ফেলেছি। এভাবে রুম নম্বর না জানানোটাই স্বাভাবিক। "বুঝতে পেরেছি। আমার প্রথমে কথা বলে নেয়া উচিত ওর সাথে। আমি কি একটা ফোন করতে পারি?"

"নিশ্চয়ই," বলে ডান দিকে দেয়ালের সাথে ঝোলানো কী-প্যাডহীন তিনটা টেলিফোন সেটের দিকে ইশারা করলো সে। এগিয়ে গিয়ে মাঝের ফোন থেকে রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকালাম। একবার রিং হবার পরেই অপারেটরের কণ্ঠ ভেসে এলো। তাকে বললাম ডোনা হোয়াইটের সাথে কথা বলতে চাই। 'অবশ্যই' বলে একটা রুমে সংযোগ দিয়ে দিল সে। রিং হচ্ছে এখন।

বুকে হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে যেন আমার।

দুইবার রিং হলো। তিনবার। ষষ্ঠবার রিং হবার পর হোটেলের ভয়েস মেইল সিস্টেমে চলে গেল কলটা। একটা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর আমাকে জানালো যে রুমের অতিথি এ মুহূর্তে ব্যস্ত আছেন বা বাইরে গিয়েছেন। চাইলে মেসেজ রেকর্ড করে রাখতে পারবো। লাইন কেটে দিলাম।

এখন কী?

অপেক্ষা করা ছাড়া তো আর কোন উপায় দেখছি না। স্ট্যান্ড থেকে একটা খবরের কাগজ কিনে লবিতে গিয়ে বসলাম। যেখানে বসেছি সেখান থেকে দরজার দিকে সহজেই নজর রাখা যাবে। খবরের কাগজটা মুখের ওপরে ছড়িয়ে রেখেছি। নিজেকে কোন গোয়েন্দা সিনেমার চরিত্র মনে হচ্ছে।

খবরগুলো আসলেও পড়ার চেষ্টা করলাম এক দুইবার, কিন্তু লাভ হলো না। এরকম অবস্থায় কিছু পড়া সম্ভব না। মনোযোগই দিতে পারছি না। তাছাড়া বর্তমানে দেশের কোথায় কী হচ্ছে সে বিষয়ে কোন আগ্রহও নেই। কিছুক্ষণ পরপর দরজার দিকে তাকাচ্ছি। এরমধ্যে বেশ কয়েকবার অবশ্য পাতা উল্টে ফেলেছি। প্রতিবেদনের সাথে ছাপা ছবিগুলো দেখছি এখন। অবস্থা এতটাই করুণ যে কমিক্সের পাতায় বিটল বেইলিও আমার মনোযোগ ধরে রাখতে পারলো না।

কয়েকবার চোখাচোখি হয়েছে ফ্রন্ট ডেস্কের সোনালিচুলো রিসিপশনিস্টের সাথে। প্রতিবারই একটা মাপা হাসি ফুটেছে তার মুখে। হয়তো ভাবছে যে এতক্ষণ ধরে এখানে বসে কী করছি আমি; কিংবা কিছুই ভাবছে না, সবই আমার অতিকল্পনা। সন্দেহজনক কিছু তো করিনি আমি, চুপচাপ পেপার পড়ে চলেছি কেবল।

দেখতে দেখতে এক ঘণ্টা পার হয়ে গেল। এসময় মোবাইল ফোন বেজে ওঠায় পকেট থেকে সেটা বের করে কানে চাপালাম।

"দেখা হয়েছে?" স্কয়ার্স জিজ্ঞেস করলো।

"রুমে নেই ও। অথবা ইচ্ছে করে ফোন ধরছে না।"

"তুমি এখন কোথায়?"

"লবিতে বসে নজর রাখছি।"
বিড়বিড় করে কি যেন বললো স্কয়ার্স।
"কী?" জিজ্ঞেস করলাম।
"আসলেও বললে যে 'নজর রাখছি?'"
"এখন এসব বলো না তো।"
"আমরা এজেন্সি থেকে দুজনকে পাঠাতে পারি কাজটা করার জন্যে। শিলাকে দেখলে ফোন করে জানাবে।"
ভাবলাম কিছুক্ষণ। "আরেকটু দেখি।"
আর ঠিক তখনই হোটেলে প্রবেশ করলো ও।
চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকলাম বোকার মতো। শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠছে। খোদা! আসলেও আমার শিলা বেঁচে আছে। আরেকটু হলেই ফোনটা ফেলে দিচ্ছিলাম।
"উইল?"
"রাখছি এখন," বললাম।
"এসেছে ও?"
"পরে ফোন দেবো।"
লাইন কেটে দিয়ে ফোনটাই বন্ধ করে দিলাম। আমার শিলা (হ্যাঁ, এই নামেই ডাকবো) তার চুলের স্টাইল বদলে ফেলেছে। খাটো চুলগুলো এখন খানিকটা কোঁকড়ানো, রঙও ভিন্ন। মনে হচ্ছে কেউ যেন বিরাশি শিক্কার থাপ্পড় কষিয়েছে আমার গালে।
শিলা অবশ্য আমাকে দেখেনি। উঠে দাঁড়াতে গিয়েও আবার বসে পড়লাম, মাথা ঘোরাচ্ছে। লিফটের দরজা খোলা। সবসময়ের মতোই কোনরকম দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়া আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে সেদিকে হেঁটে যাচ্ছে সে। সময়মতো পৌঁছুতে পারবো বলে মনে হয় না।
লিফটে পা রাখলো ও। আমি উঠে দাঁড়ালাম। না দৌড়ে যতটা দ্রুত সম্ভব এগিয়ে গেলাম। চাই না কারো কোন প্রকার সন্দেহ হোক। ওর পরিচয় গোপন করে এখানে লুকোনোর নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে। হঠাৎ করে নাম ধরে ডাক দেয়াটা বড় রকমের বোকামী হবে।
আমার চোখের সামনে বন্ধ হয়ে গেল লিফটের দরজা।
ধুর।
কল বাটনে চাপ দিলাম। আরেকটা লিফটের দরজা খুলে গেল পাশে। সেটায় চড়তে গিয়েও থেমে গেলাম। কোথায় যাবো? আমি তো জানি না ও কয়তলায় থাকছে। শিলার লিফটটা অবশ্য এখনও ওপরে উঠেই চলেছে। পাঁচতলা। ছয়তলা।
শিলা তো খুব সম্ভবত একাই ছিল লিফটে।

দশতলায় গিয়ে থামলো লিফটটা। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। সেই লিফটটাই নেমে এলো নিচে। দ্রুত ভেতরে ঢুকে বাটনে চাপ দিলাম, আশা করছি ও ঘরের দরজা খোলার আগেই পৌঁছে যাবো। কিন্তু এবারে লিফটের দরজা বন্ধ হতে গিয়েও আটকে গেলো। হাঁপাতে হাঁপাতে ভেতরে প্রবেশ করলো বিজনেস স্যুট পরিহিত মাঝবয়সী একটা লোক। সে বারো তলার বাটনটায় চাপ দেয়ার দুসেকেন্ড পর বন্ধ হলো দরজা।

"বাইরে অনেক গরম," আমার দিকে তাকিয়ে বললো লোকটা।

"হ্যাঁ," জবাবে বললাম।

"হোটেলটা ভালোই, তাই না?" লম্বা শ্বাস ছেড়ে জিজ্ঞেস করলো সে।

লোকটা শহরে নতুন এসেছে নিশ্চয়ই। এর আগে অন্তত লাখখানেক লিফটে উঠেছি এখানে। নিউ ইয়র্কারদের একটা অলিখিত নিয়ম হচ্ছে লিফটে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা।

আবারো হ্যাঁ বলে মাথা নাড়লাম। এসময় খুলে গেল দরজা। বাইরে বেরিয়ে এলাম দ্রুত। লম্বা একটা করিডোর। বামে তাকিয়ে কাউকে চোখে পড়লো না। ডান দিকে তাকাতেই একটা ঘরের দরজা বন্ধ হবার শব্দ কানে এলো। শিকারি কুকুরের মতো শব্দ লক্ষ্য করে ছুটলাম। শব্দটা করিডোরের একদম শেষ মাথা থেকে এসেছে খুব সম্ভবত। হয় রুম ৯১২ নতুবা ৯১৪।

দুটো দরজাতেই নক করলাম। মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছি।

কিছুই হলো না।

আবারো নক করলাম, এবার আগের তুলনায় জোরে। কেউ নড়ে উঠলো ৯১২ নং রুমে। শার্টের কলারটা ঠিক করে নিলাম। সিকিউরিটি চেইনটা খোলার শব্দ কানে এলো। দরজাটা খুলে গেল পরমুহূর্তে।

বিরক্তচোখে তাকিয়ে আছে মাঝবয়সী একটা লোক। পরনে ভি-গলার আন্ডারশার্ট আর বক্সার। "সমস্যা কী?"

"মাফ করবেন। ডোনা হোয়াইটকে খুঁজছিলাম আমি।"

"আমাকে দেখে কি ডোনা হোয়াইট মনে হচ্ছে?" কোমরে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলো সে।

অদ্ভুত শব্দ ভেসে আসছে তার রুম থেকে। খানিকটা গোঙানির মতো। একটু মনোযোগ দিতেই বুঝতে পারলাম কী চলছে ভেতরে। টিভিতে পর্ন মুভি দেখায় ব্যস্ত ছিলেন মহাশয়। হোটেলগুলোয় এখন এই 'সুব্যবস্থা'-ও আছে।

"দুঃখিত," বললাম।

মুখের ওপর দরজার বন্ধ করে দিল সে।

৯১২ নম্বর রুম তাহলে বাদ। আমার ভেতরে কী চলছে এখন তা বলে বোঝাতে পারবো না। ৯১৪ নম্বর দরজায় কড়া নাড়ার জন্যে হাত তুলেছি,

এসময় পেছন থেকে কেউ একজন বলে উঠলো, "আপনাকে কোনভাবে সাহায্য করতে পারি?"

ঘুরে দাঁড়াতেই করিডোরের মাঝামাঝি নীল রঙের ব্লেজার পরিহিত পোক্ত শরীরের এক নিরাপত্তা কর্মীকে দেখতে পেলাম। অনুভূতিহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

"না, ঠিক আছি আমি," বললাম।

ভ্রু কুঁচকে গেল তার। "আপনি কি এই হোটেলের গেস্ট, স্যর?"

"হ্যাঁ।"

"কত নম্বর রুমে উঠেছেন?"

"রুম নম্বর নেই।"

"কিন্তু কেবলই তো বললেন-"

উপায়ান্তর না দেখে দরজায় কিল বসালাম। দ্রুত আমার দিকে এগিয়ে আসছে লোকটা। লাফিয়ে সরে যাবার ইচ্ছেটা জোর করে দমালাম।

"আমার সাথে আসুন, প্লিজ," বললো সে।

তার কথা উপেক্ষা করে আবারো নক করলাম দরজায়। এবারে আমার বাহু শক্ত করে চেপে ধরলো নিরাপত্তা কর্মী। হ্যাঁচকা টানে সেটা ছুটিয়ে নিয়ে আবার নক করে চিল্লিয়ে বললাম, "আমি জানি তুমি শিলা নও।" কথাটা শুনে বিভ্রান্তি ভর করলো লোকটার চেহারায়। তবে আমাকে ধরে আর টানাটানি করছে না। দুজনেই দরজার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছি এখন। কিন্তু খুললো না সেটা। এবারে আগের চাইতে কোমল ভঙ্গিতে আমার হাত ধরে সেখান থেকে সরিয়ে আনলো নিরাপত্তা কর্মী। আমিও কোন বাঁধা দিলাম না। কোনপ্রকার শোরগোল না করে আমাকে ফুটপাথ অবধি এগিয়ে দিল সে।

এখন কী করবো?

নিউ ইয়র্ক সিটির আরেকটা অলিখিত নিয়ম হচ্ছে ফুটপাথে না হেঁটে দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না। লোকজন মাথা নিচু করে দ্রুত হাঁটতে থাকে। কেউ যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এটা অধিকাংশ সময়েই চোখে পড়ে না।

উপায় না দেখে এক কোনায় চলে আসলাম। দরজার দিক থেকে চোখ সরাইনি অবশ্য। মোবাইল ফোনটা বের করে হোটেলে কল দিয়ে বললাম ডোনা হোয়াইটের সাথে কথা বলতে চাই। এবারেও রিং হবার পর ফোন ধরলো না কেউ।

তবে একটা মেসেজ রেকর্ড করতে ভুললাম না। আমার মোবাইল ফোনের নম্বর বলে অনুরোধ করলাম কল দিতে।

পকেটে ফোনটা ঢুকিয়ে আবারো নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম, "এখন কী করবো?"

আমার শিলা ভেতরেই আছে। এই চিন্তাটা পরিষ্কার করে কিছু ভাবতে দিচ্ছে না। অনেকগুলো 'যদি' মাথার মধ্যে ঘুরছে। পাত্তা না দেয়ার চেষ্টা করলাম কিছুক্ষণ, কিন্তু লাভ হলো না।

আচ্ছা, পরিস্থিতি তাহলে কী এখন? অন্য কোন দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে শিলা? বেজমেন্ট হয়ে? নাকি হোটেলের লবিতে পা দেয়ার আগেই আমাকে দেখে ফেলেছিল, সেজন্যেই ওভাবে দ্রুত লিফটের দিকে হেঁটে গেছে। তবে এটা জানি যে দশতলায় ওর রুম। আসলেই কি? আমাকে দেখে ইচ্ছে করে ভুল তলায় নামেনি তো?

আমাকে কি এখন দেখতে পাচ্ছে?

জানি না আমি। এখন বাসায় যাওয়াও সম্ভব নয় আমার পক্ষে। লম্বা একটা শ্বাস নিলাম। চারপাশে পথচারীরা হেঁটে যাচ্ছে। এক সেকেন্ডের জন্যেও কমছে না ভিড়। আর ঠিক তখন এই ভিড়ের মাঝেই দেখতে পেলাম ওকে।

দম বন্ধ হয়ে গেল আমার।

চুপচাপ আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আমার অবস্থা এমন যে নড়তেই পারছি না। মুখে হাত দিয়ে কান্না চাপলাম। আমার দিকে এগিয়ে এলো শিলা। ওর চোখেও পানি। মাথা ঝাঁকালাম। তবে থামলো না সে। আমার কাছে এসে জড়িয়ে ধরলো।

"সব ঠিক হয়ে যাবে," ফিসফিসিয়ে বললো বুকে মাথা রেখে।

চোখ বন্ধ করে ফেললাম। লম্বা একটা সময় শক্ত করে ধরে রাখলাম একে অপরকে। কেউ কোন কথা বলছি না। যেন অন্য কোন বাস্তবতায় চলে গেছি।

বায়ান্ন

"আমার আসল নাম নোরা স্প্রিং।"

সাউথ পার্ক এভিনিউয়ের একটা স্টারবাকসে বসে আছি দুজন এখন। একদম কোনার সিট দুটো বেছে নিয়েছি ইচ্ছে করেই। আশপাশে আর কেউ নেই। তবুও একটু পরপর উদ্বিগ্ন চোখে সিঁড়ির দিকে তাকাচ্ছে ও। ভয় পাচ্ছে যে কেউ হয়তো আমাকে অনুসরণ করেছে। অন্যান্য সব স্টারবাকসের মতোই এটার ভেতরেও ছবির কোন অভাব নেই। সেখানে হাসিমুখে কফি গাছের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বাদামি চামড়ার কয়েকজন লোক। ও নিয়েছে আইসড ল্যাটে আর আমি ফ্র্যাপুচিনো।

বেগুনি চেয়ার দুটো পাশাপাশি ঠেলে নিয়েছি আমরা। এখন হাত ধরাধরি করে বসে আছি। মাথায় হাজারটা প্রশ্ন ঘুরছে আমার, সেগুলোর উত্তরও চাই। কিন্তু মিথ্যে বলবো না, এ মুহূর্তে আমার চেয়ে সুখী মানুষ খুব কমই আছে পৃথিবীতে। হয়তো স্বার্থপরের মতো শোনাবে কথাটা। বেশ অনেকদিন পর প্রশান্তির পরশ পাচ্ছি চিত্তে। আসলেও খুশি আমি। একটু পর ওর কাছ থেকে যা-ই শুনি না কেন, তা আমাকে দমাতে পারবে না। যাকে ভালোবাসি, তাকে ফিরে পেয়েছি।

কফির কাঁপে চুমুক দিল ও। "সরি," বললো আস্তে করে।

ওর হাতে মৃদু চাপ দিলাম একবার।

"ওভাবে পালিয়ে যাওয়া...আমি মারা গেছি এটা শোনার পর তোমার ভেতরে কী চলছিলো, তা কল্পনা করতেও কষ্ট হচ্ছে," আমার চোখে চোখ রাখলো ও, "বিশ্বাস করো, তোমাকে কষ্ট দিতে চাইনি।"

"ঠিক আছি আমি," বললাম।

"তুমি কীভাবে জানলে যে আমি শিলা নই?"

"তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় গিয়েছিলাম।"

"ভেবেছিলাম যে তোমাকে বলবো। বিশেষ করে সে খুন হয়েছে এটা জানার পর।"

"বলোনি কেন?"

"কেইন বললো এতে তোমার ক্ষতি হতে পারে।"

ভাইয়ের নাম শুনে কেঁপে উঠলাম। অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে নোরা। ওর ঘাড়ে হাত রাখলাম, উত্তেজনায় একদম শক্ত হয়ে আছে। ধীরে ধীরে হাত বুলালাম সেখানে, আগেও অনেকবার করেছি কাজটা। চোখ বন্ধ করে ফেললো ও। লম্বা একটা সময় কেউ কথা বললাম না। আমিই নীরবতা ভাঙলাম অবশেষে, "আমার ভাইকে কতদিন ধরে চেন তুমি?"

"প্রায় চার বছর," বললো ও।

অবাক হলেও মুখে কিছু বললাম না, কেবল মাথা নাড়লাম। চাচ্ছি যে ও নিজে থেকেই কিছু বলুক। কিন্তু এখনও অন্য দিকে চোখ ঘুরিয়ে রেখেছে। আস্তে করে ওর চিবুকে হাত দিয়ে আমার দিকে মুখটা ঘুরালাম। আলতো চুমু খেলাম ঠোঁটে।

"তোমাকে অনেক বেশি ভালোবাসি আমি," বললো ও।

এই একটা কথা যেন ভাসিয়ে নিয়ে গেল আমাকে। "তোমাকেও যে কতটা ভালবাসি, চিন্তা করতে পারবে না।"

"ভীষণ ভয় করছে আমার, উইল।"

"আমি আছি," সাহস দেয়ার কণ্ঠে বললাম।

"তোমাকে এতদিন ধরে মিথ্যে বলে এসেছি," এবারে আর চোখ সরিয়ে নিল না।

"জানি।"

"এরপরেও কি আমাদের মধ্যে সব ঠিক থাকবে?"

"একবার হারিয়েছি তোমাকে," বললাম। "আর হারিয়ে যেতে দেব না।"

"আসলেই?"

"তোমাকে ভালোবাসি আমি," আবারো বললাম। "এটা কখনো বদলাবে না।"

আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো ও, জানি না কী খোঁজার চেষ্টা করছে। "আমি বিবাহিত, উইল।"

চেষ্টা করলাম যতটা সম্ভব নির্বিকার ভাব ধরে রাখতে, কিন্তু কাজটা সহজ নয়। মনে হচ্ছে যেন একটা সাপ সর্বশক্তিতে পেঁচিয়ে ধরেছে আমার হৃদয়টাকে।

"খুলে বলো," বললাম।

"পাঁচ বছর আগে, আমার স্বামীর কাছ থেকে পালিয়ে আসি। ওর নাম ক্রে। আস্ত ইতর। অত্যাচার করতো বললেও কম বলা হবে। যাই-হোক, ওকে নিয়ে বেশি কথা বাড়াবো না। ক্র্যামডেন নামের একটা শহরে থাকতাম

আমরা। কানসাস সিটি থেকে বেশ কাছেই। এক রাতে ক্রেয়ের অত্যাচারের কারণে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয় আমাকে, সেখান থেকেই পালিয়ে যাই। তোমার এটুকু জানলেই চলবে, ঠিক আছে?"

মাথা নাড়লাম।

"পরিবার বলতে কেউ নেই আমার। কয়েকজন বন্ধু ছিল, তবে ওদের এসবে জড়াইনি ইচ্ছে করেই। ক্রে একটা বদ্ধ উন্মাদ। আমি যে ওকে ছেড়ে চলে আসবো, সে-ই সুযোগটাই দিতে চাইতো না কখনো। হুমকি দিত..." বলতে গিয়েও থেমে গেল নোরা। "কী হুমকি সেটা না জানলেও চলবে। কিন্তু আমার জন্যে অন্য কাউকে ঝুঁকিতে ফেলতে চাইছিলাম না। তাই একটা শেল্টার খুঁজে বের করি যারা আমার মতো নারীদের সাহায্য করে। তাদের জানাই যে আবারো নতুন করে জীবন শুরু করতে চাই আমি, ওখান থেকে চলে আসতে চাই। কিন্তু ক্রেকে ভীষণ ভয় ছিল আমার। ও পুলিশ অফিসার। তুমি চিন্তাও করতে পারবে না...ওরকম আতঙ্কের ভেতর লম্বা একটা সময় কাটালে, এক পর্যায়ে মনে হতে থাকে যে সে সর্বেসর্বা। বলে বোঝানো সম্ভব না।"

ওর আরেকটু কাছে এগিয়ে বসলাম। এখনও হাত ধরে আছি। মানসিক অত্যাচার একজন মানুষের কতটা ক্ষতি করতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা আছে আমার।

"ঐ শেল্টারের সহায়তায় ইউরোপে চলে যাই আমি, স্টকহোমে। খুব কষ্ট হয়েছে প্রথম দিকে। ওয়েট্রেস হিসেবে রেস্টুরেন্টে চাকরি নেই। একাকীত্বে ভুগতাম। অনেকবার ভেবেছি যে ফিরে আসবো, কিন্তু ক্রেয়ের ভয় কাজ করতো সবসময়। ছয় মাস যেতে না যেতেই মনে হচ্ছিল পাগল হয়ে যাবো। দুঃস্বপ্ন দেখতাম ক্রেকে নিয়ে..."

ধরে আসলো ওর কণ্ঠ। আরো শক্ত কর চেপে ধরলাম, চেয়ারের হাতল দুটো একটা আরেকটার ওপরে উঠে গেছে প্রায়।

"যাইহোক, কিছুদিন পর এক অ্যামেরিকান মহিলার সাথে পরিচয় হলো। ওখানেই থাকতো সে-ও। শুরুর দিকে খুব সাবধানী ছিলাম দুজনেই। কিন্তু ওর চোখেও সেই 'ঘর-পালানো' চাহনিটা ঠিকই চিনতে পেরেছিলাম। দুজনেই ভীষণ একাকী ছিলাম আমরা, যদিও সে তার স্বামী আর মেয়ের সাথে থাকতো। তবে এটা প্রথমদিকে বুঝতে পারিনি যে গোটা পরিবারই লুকিয়ে আছে।"

"সে-ই কি শিলা রজার্স?" বললাম।

"হ্যাঁ।"

"আর তার স্বামী," বলে একবার ঢোঁক গিললাম। "আমার ভাই।"

"হ্যাঁ, কার্লি নামে ওদের একটা মেয়েও আছে।"

সবকিছু মিলে যাচ্ছে এখন।

"শিলা আর আমার মধ্যে খুব দ্রুত বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তবে কেইন অত সহজে ভরসা করতে পারেনি। শুরুতে কিছুটা আড়ষ্ট ব্যবহার করলেও, একসময় ঠিকই বিশ্বাস করতে শুরু করে আমাকে। ওদের সাথেই উঠে পড়ি আমি, কার্লির খেয়াল রাখতে সাহায্য করি। তোমার ভাতিজি খুবই ভালো একটা বাচ্চা, উইল। বুদ্ধিমান, সুন্দর...বাড়িয়ে বলছি না কিন্তু।"

আমার ভাতিজি। কেইনে একটা মেয়ে আছে অথচ আমরা জানতামও না।

"তোমাকে নিয়ে সবসময় গল্প করতো তোমার ভাই। তোমার বাবা-মা, মেলিসার কথা কালেভদ্রে শুনেছি, কিন্তু তুমিই ছিলে ওর সবকিছু। তোমার ক্যারিয়ার সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখতো। কোভেন্যান্ট হাউজে কাজ করছো, এটাও জানতো। ততদিনে ওর পালিয়ে থাকার প্রায় সাত বছর হয়ে গেছে, বুঝতেই পারছো তোমার কথা কতটা মনে পড়তো বেচারার। আমাকে মন থেকে বিশ্বাস করতো, তাই অতটা লুকোছাপা করেনি। তোমাকে নিয়েই বেশি কথা হয়েছে আমাদের।"

টেবিলের দিকে তাকিয়ে আছি এখন। সবসময়ের মতোই ওদের টিস্যুতে কফি নিয়ে কী যেন লেখা। রিসাইকেল করা কাগজ থেকে তৈরি হয় ওগুলো। ব্লিচ ব্যবহার করে না, তাই বাদামি রঙের।

"ঠিক আছো তুমি?" জিজ্ঞেস করলো নোরা।

"হ্যাঁ," বলে মুখ তুললাম। "এরপর কী হলো?"

"আমি আমার এক বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করি। সে জানায় যে ক্রে নাকি এক প্রাইভেট ডিটেক্টিভ ভাড়া করেছে। আমি স্টকহোমে আছি, এটাও জানে। ভয় পেয়ে যাই। ততদিনে অবশ্য সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম যে দেশে ফিরবো। ক্রে আর আমি থাকতাম মিসৌরিতে, তাই ভাবি যে আমি যদি নিউ ইয়র্কে আসি, তাহলে কখনো খুঁজে বের করতে পারবে না। তবুও আরো ভালোমতন আত্মগোপন করতে হবে, কখনো যদি ক্রে আবারো খুঁজতে শুরু করে? শিলারও একই দশা, ওর নামটাও বদলাতে হতো আত্মগোপনের সুবিধার্থে। খুব সহজ একটা বুদ্ধি আসে তখন আমাদের মাথায়।"

মাথা নাড়লাম, বুঝতে পারছি ও কী বলবে। "পরিচয় বদল করলে তোমরা।"

"হ্যাঁ। ও নোরা স্প্রিং হয়ে গেলো আর আমি শিলা রজার্স। এভাবে ক্রে যদি কখনো খোঁজ নিতে নিতে স্টকহোমেও হাজির হয়, তাহলে অন্য কাউকে দেখবে। আর যারা শিলা রজার্সকে খুঁজবে, তারা পাবে আমাকে।"

ভাবলাম কিছুক্ষণ, কী যেন একটা ঠিক মিলছে না। "তাহলে তুমি শিলা রজার্স পরিচয় নিয়ে নিউ ইয়র্কে চলে আসলে।"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু-" এ বিষয়টাই বুঝতে পারছি না। "-আমার সাথে দেখা হয়ে গেল তোমার।"

"হ্যাঁ।"

হাসলো নোরা। "আমাদের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছো, তাই না?"

"হ্যাঁ।"

"তোমার হয়তো মনে হচ্ছে যে পুরোটাই কাকতালীয়। এত জায়গা থাকতে কিনা কোভেন্যান্ট হাউজেই ভলান্টিয়ার হিসেবে যোগ দিলাম।"

"একটু বেশিই কাকতালীয়।"

"ঠিক সন্দেহ করেছো। কাকতালীয় ছিল না ঘটনাটা," বলে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে লম্বা শ্বাস টানলো নোরা। "কীভাবে যে বোঝাবো তোমাকে, উইল।"

ওর হাত ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

"একটা কথা মনে রেখো, ইউরোপে বড্ড একাকী সময় কাটিয়েছি আমি। তোমার ভাই, শিলা আর কার্লি ছাড়া কারো সাথে কথা হতো না। আর তোমাকে নিয়ে কেইন যা বলতো সবসময়...ভাবতাম, অন্য সবার চাইতে আলাদা তুমি। আমার বিশ্বাস, ওর কথা শুনতে শুনতেই তোমার প্রেমে পড়ে যাই। তাই ঠিক করি যে নিউ ইয়র্কে এলে তোমার সাথে একদিন অবশ্যই দেখা করবো। দেখবো যে বাস্তবে উইল ক্লেইন কেমন মানুষ। আর সুযোগ হলে জানাবো যে তোমার ভাই বেঁচে আছে, নিরপরাধ সে। যদিও কেইন বারবার সাবধান করে দেয় আমাকে, বলে তুমি হয়তো বিপদে পড়তে পারো সেজন্যে। নিউ ইয়র্কে ফেরার পর লম্বা সময় তোমার থেকে দূরে থাকি, কিন্তু একদিন ঠিকই গিয়ে হাজির হই কোভেন্যান্ট হাউজে। নিয়তির ফের বলো বা অন্যকিছু, তোমার ওপর চোখ পড়ার সাথে সাথে বুঝে যাই যে এই মানুষটাকেই বাকি জীবন ভালোবাসবো। খুব নাটুকে শোনাচ্ছে, না?"

একই সাথে ভয়, বিভ্রান্তি আর আনন্দ কাজ করছে আমার ভেতরে। মুখে হাসি।

"কী?" জিজ্ঞেস করলো নোরা।

"আই লাভ ইউ।"

আমার কাঁধে মাথা রাখলো ও। কেউ কিছু বলছি না। এখনও অনেক কিছু শোনা বাদ আছে নিশ্চয়ই। আপাতত একে অপরের সান্নিধ্য উপভোগ করছি।

কিছুক্ষণ পর আবারো কথা শুরু করলো নোরা। "কয়েক সপ্তাহ আগের কথা। তোমার মায়ের সাথে হাসপাতালে ছিলাম আমি। এত কষ্ট পাচ্ছিলো সে, উইল। আমাকে বলেছিলো যে আর সহ্য হচ্ছে না, মারা গেলে বেঁচে যাবে। বুঝতে পারছো?।"

মাথা নাড়লাম।

"তোমার মাকে খুব ভালোবাসি আমি। সেটা নিশ্চয়ই জানো?"

"হ্যাঁ," বললাম।

"তাকে ওরকম দশায় দেখে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে। তাই কেইনের কাছে করা ওয়াদাটা ভেঙে সব খুলে বলি তাকে। এটা প্রাপ্য ছিল তার। জানাই যে কেইন বেঁচে আছে, তাকে ভীষণ ভালোবাসে এখনও আর সে নির্দোষ।"

"সব বলেছিলে?"

"হ্যাঁ। কিন্তু ওরকম কষ্টের মধ্যেও আমার কথা বিশ্বাস করেনি সানি। প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস করতোও না।"

ওর দিকে তাকালাম মুখ তুলে। এবারে বুঝতে পারছি। এখান থেকেই ঘটনার শুরু। মায়ের শেষকৃত্য শেষে তার রুমে গিয়ে ফ্রেমের পেছনে লুকোনো ছবিটা খুঁজে পাই আমি। "তাহলে তুমিই মাকে কেইনের ছবিটা দিয়েছিলে?"

মাথা নড়লো নোরা।

"জুলি মারা যাবার পর তাকে কখনো সামনাসামনি দেখেনি সে।"

"না, দেখেনি।"

এজন্যেই আমাদের সাথে এব্যাপারে কখনো আলাপ করেনি মা। "কিন্তু তুমি তাকে বলেছিলে যে কেইন ফিরে আসবে।"

"হ্যাঁ।"

"মিথ্যে বলেছিলে?"

কিছুক্ষণ ভাবলো নোরা। "পুরোপুরি মিথ্যেও না আসলে। কেইনকে এফবিআইয়ের লোকেরা খুঁজে পাওয়ার পর শিলা যোগাযোগ করেছিল আমার সাথে। সবসময়ই খুব সাবধানী ছিল তোমার ভাই। কার্লি আর শিলার নিরাপত্তার জন্যে আগে থেকেই ব্যবস্থা করে রেখেছিল। তাই সে ধরা পড়লে ওরা দুজন পালিয়ে যায়। পরিস্থিতি ঠান্ডা না হওয়া অবধি দেশের বাইরেই থাকে। এরপর কেইন সবুজ সংকেত দিলে ফিরে আসে।"

"আসার পরেও তোমার সাথে যোগাযোগ করেছিল?"

"হ্যাঁ।"

সব মিলে যাচ্ছে। "নিউ মেক্সিকোর একটা পে-ফোন বুথ থেকে।"

"হ্যাঁ।"

পিস্টিলো নিশ্চয়ই এই ফোনকলটার ব্যাপারেই কথা বলছিলেন। "তারপর?"

"যাবতীয় গোলমালের শুরু এর পরেই," বললো নোরা। "আমার সাথে যোগাযোগ করে কেইন। পুরো পাগলের মতো করছিল ফোনে। কেউ একজন ওদের খোঁজ পেয়ে গেছে। ও আর কার্লি বাইরে ছিল, এইসময় দুজন লোক নিউ মেক্সিকোর বাসাটায় ঢুকে পড়ে। শিলাকে টর্চার করে কেইন কোথায় আছে সেটা জানার জন্যে। সেসময় বাসায় ফেরে কেইন। দুই গুন্ডাকেই গুলি

করে। কিন্তু শিলা মারাত্মক জখম হয়। আমাকে ফোনে বলে গা ঢাকা দিতে, কারণ শিলার আঙুলের ছাপ খুঁজে পাবে পুলিশের লোকেরা। ম্যাকগুয়ান আর তার সাঙ্গপাঙ্গরাও জেনে যাবে সে শিলা রজার্স ছিল ওর সাথে।"

"তখন শিলাকে খুঁজতে শুরু করবে ওরা," বললাম।

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু শিলা বলতে তো লোকে এখন তোমাকে চেনে। তাই পালিয়ে যাও।"

"তোমাকে জানাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কেইন বলে যে তুমি কিছু না জানলেই নিরাপদ থাকবে। তাছাড়া কার্লির কথাও চিন্তা করতে হবে আমাদের। ওর মাকে অত্যাচার করে খুন করেছে ওরা। এখন বাচ্চাটার যদি কিছু হয়ে যায়, আমি সহ্য করতে পারবো না।"

"কার্লির বয়স কত?"

"এখন প্রায় বারোর কাছাকাছি হবে।"

"তাহলে কেইন পালিয়ে যাবার আগেই ওর জন্ম।"

"ছয় মাস ছিল বোধহয় তখন ওর বয়স।"

আবারো কষ্ট পেলাম। কেইনের একটা বাচ্চা আছে, অথচ সে আমাকে তখন কিছু বুঝতেও দেয়নি। "এটা ও গোপন করেছিল কেন?"

"জানি না আমি।"

এখন পর্যন্ত সব ঠিকঠাক মিলে গেছে। কিন্তু কার্লির ব্যাপারে ধোঁয়াশা কাটছেই না। ভাবলাম কিছুক্ষণ। ওর জন্ম কেইন গা ঢাকা দেয়ার ছয় মাস আগে। তখন কী চলছিলো ওর জীবনে? এফবিআইয়ের সাথে হাত মিলিয়েছিল নিশ্চয়ই। সেজন্যেই কি ভয় কাজ করছিলো ওর মনে? কেউ যদি জানতে পারে একটা মেয়ে আছে তার, তাহলে ক্ষতি করার চেষ্টা করবে–এটাই ভেবেছিল বোধহয়।

তবুও, খচখচানি পুরোপুরি দূর হলো না মন থেকে।

নোরাকে আরেকটা প্রশ্ন করতে যাবো, এসময় ফোন বেজে উঠলো। খুব সম্ভবত স্কয়ার্স। কিন্তু পকেট থেকে ফোন বের করে দেখি স্ক্রিনে অন্য একটা নম্বর দেখাচ্ছে। তবে এই নম্বরটাও আমার চেনা। কেটি মিলার। অ্যান্সার বাটনে চাপ দিয়ে ফোন কানে ঠেকালাম।

"কেটি?"

"আহহা, ভুল করে ফেললে। বলো দেখি আমি কে?"

আবারো আতঙ্ক চেপে বসলো চিত্তে। খোদা! ঘোস্ট! চোখ বন্ধ হয়ে এল আপনা থেকেই, "ওর যদি কিছু হয়–"

"উইল," ঘোস্ট বললো আমার কথা শেষ হবার আগেই। "এসব কথা তোমার মুখে মানায় না।"

"কী চাও তুমি?"

"আমাদের কথা বলা দরকার।"

"ও কোথায়?"

"কে? ওহ, কেটির কথা জানতে চাইছো? আমার পাশেই আছে।"

"ওর সাথে কথা বলতে চাই আমি।"

"আমার কথা তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না, উইল? কষ্ট পেলাম।"

"ওর সাথে কথা বলতে চাই আমি," আবারো বললাম।

"প্রমাণ চাইছো যে ও বেঁচে আছে?"

"ওরকমই।"

"তাহলে একটা কাজ করি নাহয়," স্বভাবসুলভ শীতল স্বরে বললো ঘোস্ট, "ওকে তোমার নাম ধরে চিৎকার করতে বাধ্য করি, চলবে?"

চোখ বন্ধ করে নিলাম।

"তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি না, উইল।"

"না।"

"তুমি নিশ্চিত? খুব কষ্ট হবে না কিন্তু আমার।"

"ওকে ছোঁবে না, প্লিজ," বললাম। "ওর তো এসবের সাথে কোন সম্পর্ক নেই।"

"তুমি কোথায় এখন?"

"সাউথ পার্ক এভিনিউ।"

"সাউথ পার্ক এভিনিউয়ের কোথায়?"

দুই ব্লক দূরের একটা ঠিকানা দিলাম।

"পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওখানে একটা গাড়ি পাঠাচ্ছি আমি। চুপচাপ উঠে পড়বে। বুঝেছো?"

"হ্যাঁ।"

"আর উইল?"

"কী?"

"কাউকে ফোন দিবে না। কিছু বলবে না। কেটি মিলারের গলার অবস্থা কী, সেটা তো দেখেছো নিজের চোখে? খুব বেশি কষ্ট কিন্তু করতে হবে না আমাকে, বুঝেছো?"

"হ্যাঁ।"

তিপান্ন

হন্তদন্ত হয়ে জোসেফ পিস্টিলোর ঘরে প্রবেশ করলো ক্লডিয়া ফিশার।

মাথা উঁচু করলেন পিস্টিলো। "কী?"

"রেমন্ড ক্রমওয়েলের কাছ থেকে কোন রিপোর্ট পাইনি আমরা।"

ক্রমওয়েল হচ্ছে এফবিআইয়ের একজন আন্ডারকভার এজেন্ট। তাকে জশুয়া ফোর্ডের সহকারী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। "ওর সাথে তো আমাদের সবসময় যোগাযোগ হওয়ার কথা ছিল।"

"ম্যাকগুয়ানের সাথে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল ওদের দুইজনের। তাই মাইক্রোফোন খুলে ফেলতে হয়েছে।"

"অ্যাপয়েন্টমেন্টের পর ওর সাথে কারো দেখা হয়নি?"

"মি. ফোর্ডকেও পাওয়া যাচ্ছে না," মাথা নেড়ে বললো ফিশার।

"ঈশ্বর!"

"এখন কী করবো আমরা?"

ইতিমধ্যে উঠে পড়েছেন পিস্টিলো। "এ মুহূর্তে ডিউটিতে নেই, এমন সব এজেন্টকে তৈরি হতে বলো। ম্যাকগুয়ানের অফিসে রেইড দিব আমরা।"

নোরাকে (নামটায় বেশ তাড়াতাড়ি অভ্যস্ত হয়ে গেছি) এভাবে একা ছেড়ে যেত ইচ্ছে করছে না, কিন্তু উপায় কী? কেটি যে এখন ওরকম একটা বদ্ধ উন্মাদের সাথে একা আছে, এটা ভাবতেই তো রোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। বিছানার সাথে হাতদুটো ওভাবে আটকে ফেলার পর কেমন লেগেছিল তা স্পষ্ট মনে আছে আমার। কেটিকে আক্রমণ করেছিল শয়তানটা, আর অসহায়ের মতো পড়ে ছিলাম আমি। মাথা ঝাঁকিয়ে দৃশ্যটা মন থেকে দূর করার চেষ্টা করলাম।

নোরা চেষ্টা করলো আমাকে থামাতে, তবে খুব বেশি জোর দিল না। এই কাজটা যে আমাকে করতেই হবে তা বুঝতে পারছে। ওর ঠোঁটে একবার চুমু খেয়ে বিদায় নিলাম।

"তাড়াতাড়ি আমার কাছে ফিরে এসো," আবারো চোখে পানি ওর।

আসবো বলে তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেলাম।

একটা ফোর্ড ফিউশন অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। ভেতরে ড্রাইভার বাদে আর কেউ নেই। তাকে চিনলাম না। আমার হাতে একটা কালো কাপড় দিয়ে চোখের চারপাশে বেঁধে পেছনের সিটে শুয়ে পড়তে বললো সে। যা বললো তাই করলাম। চলতে শুরু করলো গাড়ি। সময়টা চিন্তা করে কাটালাম। এখন অনেক কিছু জেনে গেছি আমি, তবে পুরোটা না।

মনে মনে একটা দৃশ্যকল্প দাঁড় করানোর চেষ্টা করলাম। এগারো বছর আগে ম্যাকগুয়ান আর ঘোস্টের পাল্লায় পড়ে কোন অবৈধ কাজে জড়িয়ে যায় কেইন; এ সম্পর্কে এখন আমি মোটামুটি নিশ্চিত। খারাপ কিছু করেছিলো অবশ্যই। আমার চোখে সে একজন ভালো ভাই হতে পারে, কিন্তু মেলিসাও ভুল বলেনি। মারামারি বা সহিংসতায় ঝোঁক ওর ছোট থেকেই।

এক পর্যায়ে এফবিআই তাকে ধরে ফেললে ম্যাকগুয়ানের বিরুদ্ধে প্রমাণ যোগাড় করে দেয়ার আশ্বাস দেয়। সেজন্যে নিজের জীবন বিপন্ন করতেও রাজি ছিল। কিন্তু ম্যাকগুয়ান আর ঘোস্ট টের পেয়ে যায় কোনভাবে। পালাতে হয় কেইনকে। তখনই ওর সাথে বাসায় দেখা হয় আমার। কেন আত্মগোপন করতে সে লিভিংস্টোনেই এসেছিল, বলতে পারবো না। এই ঘটনায় জুলির ভূমিকাটা কী, সেটাও জানি না। এর আগে প্রায় এক বছর বাসায় ফেরেনি সে। কেইন যখন ফিরে আসলো, ঠিক তখনই তারও সেখানে ফেরাটা কি কাকতালীয়? নাকি কেইনের সাথে যোগাযোগ করেই এসেছিল? ওদের সম্পর্ক ছিল আগে থেকেই? ঘোস্ট কি কেইনকে খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যেই তার পিছু নেয়?

আপাতত এই প্রশ্নগুলোর উত্তর নেই আমার কাছে।

যাইহোক, ঘোস্ট ওদের ঠিকই খুঁজে বের করে, বেশ স্পর্শকাতর একটু মুহূর্তে। সাথে সাথে আক্রমণ করে বসে। কেইন আহত হলেও পালিয়ে যায়। কিন্তু ভাগ্যদেবী জুলির পক্ষে ছিল না। কেইনের ওপর চাপ প্রয়োগ করার জন্যে সবকিছু এমনভাবে সাজানো হয় যাতে সবাই ভাবে সে-ই খুন করেছে জুলিকে। ভয় পেয়ে আত্মগোপন করে কেইন। তৎকালীন গার্লফ্রেন্ড শিলা রজার্স আর মেয়ে কার্লিকে নিয়ে পুরোপুরি উধাও হয়ে যায়।

চোখে কাপড় বাঁধা অবস্থাতেও বুঝতে পারলাম যে অন্ধকার আগের তুলনায় গাঢ় হয়েছে। একটা টানেলে প্রবেশ করেছে গাড়ি। খুব সম্ভবত লিংকন টানেলই হবে। তাহলে মোটামুটি আন্দাজ করা যায় যে নিউ জার্সির

দিকে যাচ্ছি। পুরো ঘটনায় পিস্টিলোর ভূমিকা কী, সেটা নিয়ে ভাবলাম কিছুক্ষণ। পেশাগত কর্তব্যের পাশাপাশি এই কেসটা তার জন্যে কিছুটা ব্যক্তিগতও বটে। 'কিছুটা' বলা ভুল হলো বোধহয়। তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চিন্তা করলে অবশ্য সমীকরণটা বেশ সহজ হয়ে যায়। কেইন একজন অপরাধী। তবুও তার সাথে চুক্তি করেছে এফবিআই। কিন্তু পালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে সেই চুক্তির বরখেলাপ করেছে সে। তাই তাকে ইচ্ছেকৃতভাবে পুরো দুনিয়ার সামনে খুনি হিসেবে উপস্থাপন করেছেন পিস্টিলো, যাতে দ্রুত খুঁজে বের করা যায়।

এভাবেই কেটে যায় অনেক বছর। কেইন আর শিলা একসাথেই থাকে গোটা সময়। কার্লি বড় হয়। এরপর একদিন কেইনকে ধরে ফেলে এফবিআই, নিয়ে আসে অ্যামেরিকাতে। অনেকে হয়তো ভাবতে পারে খুনের আসামীকে ধরা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত সত্যটা সম্পর্কে পিস্টিলোর আগে থেকেই ধারণা ছিল। তার লক্ষ্য পালের গোদা ম্যাকগুয়ানকে ধরা। তাই তখন এফবিআইয়ের সাথে আবারো চুক্তিতে যায় কেইন।

নিউ মেক্সিকোতে তাকে আত্মগোপনের ব্যবস্থা করে দেয় তারা। যখন কেইন নিশ্চিত হয় যে জায়গাটা যথেষ্ট নিরাপদ, শিলা আর কার্লিকে সুইডেন থেকে চলে আসতে বলে। কিন্তু শত্রু হিসেবে ম্যাকগুয়ান অনেক বেশি সেয়ানা। ঠিকই জেনে যায় যে কেইন ফিরেছে। দুজন পোষা গুন্ডাকে পাঠায় তাকে হত্যা করতে। কিন্তু তারা যখন নিউ মেক্সিকোর বাসাটায় ঢোকে, কার্লিকে নিয়ে বাইরে ছিল কেইন। তখন শিলাকে টর্চার করে সে কোথায় এটা বের করার জন্যে। কোন একভাবে বাইরে থেকে এসে তাদের হত্যা করে কেইন। এরপর আহত শিলা আর মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যায়। এক ফাঁকে নোরাকে সাবধান করে দেয় কারণ নিউ ইয়র্কে শিলার পরিচয়ে আছে সে। এফবিআই আর ম্যাকগুয়ান যে কোন সময় তাকে তুলে নিয়ে যেতে পারে। পালাতে বাধ্য হয় নোরা।

আপাতত এটুকুই জানি আমি।

গাড়িটা থেমে গেল। টের পেলাম যে ইঞ্জিন বন্ধ হয়েছে। মানুষের কথা অনুযায়ী অনেক কাজ করেছি এতদিন, এখন নিজের অস্তিত্ব জানান দিতে হবে। টান দিয়ে চোখে বাঁধা কাপড়টা খুলে ফেললাম। হাতঘড়িতে তাকিয়ে দেখি প্রায় একঘণ্টা ধরে গাড়িতে আছি আমি। উঠে বসলাম।

ঘন বনের মাঝে একটা জায়গায় আছি এখন। চারপাশে পাইন গাছ। এরকম সবুজ সাধারণত শহরে দেখা যায় না। ওয়াচটাওয়ারের মতো করে বানানো ছোট্ট একটা ঘর চোখে পড়লো। মাটি থেকে প্রায় দশ ফিট ওপরে বানানো হয়েছে সেটা। দরজায় জং।

"গাড়ি থেকে নামুন," ঘাড় ঘুরিয়ে বললো ড্রাইভার।

যা বললো শুনলাম। এখনও ওয়াচটাওয়ারটার দিকে তাকিয়ে আছি। এসময় দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো ঘোস্ট। কালো পোশাক পরনে তার। আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লো।

"হ্যালো, উইল।"

"কোথায় সে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"কে?"

"নাটক বাদ দাও।"

"ওরে বাবা," বুকের ওপর হাত ভাঁজ করে বললো ঘোস্ট। "চিংড়ির আবার মেরুদণ্ড গজিয়েছে নাকি?"

"কোথায় ও?"

"কেটি মিলার?"

"তুমি ভালো করেই জানো কার কথা বলছি।"

মাথা নাড়লো ঘোস্ট। ওর হাতে কী যেন একটা আছে, দড়ি বাঁধা জিনিসটার মাথায়। জমে গেলাম।

"মেয়েটার চেহারা একদম জুলির মতো, তাই না? নিজেকে কীভাবে সামলাবো বলো? গলাটা বারবার টানছিল, যদিও আগেই আহত–"

"কেটি কোথায়?" চেষ্টা করছি গলা থেকে মরিয়া ভাবটা দূরে রাখতে।

"ও মারা গেছে, উইল।"

পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গেল।

"তোমার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে আর ভালো লাগছিলো না, তাই–" বলেই হাসতে শুরু করলো জানোয়ারটা। এই নৈঃশব্দে বড্ড কানে লাগছে হাসির শব্দটা। বিস্মিত হবার ক্ষমতাটুকুও বোধহয় হারিয়েছি আমি। "আবারো বোকা বানিয়েছি তোমাকে, উইলি। মজা করছিলাম। কেটি ঠিক আছে," বলে আমাকে ভেতরে যাওয়ার ইঙ্গিত দিল। "এসে দেখো।"

দ্রুত মই বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম। ঘোস্ট এখনও হাসছে। তার পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিলাম।

কেটি আসলেও আছে এখানে।

ঘোস্টের হাসিটা এখনও কানে বাজছে। দ্রুত কেটির দিকে এগিয়ে গেলাম। চোখ খোলাই আছে ওর, যদিও কিছু চুল সামনে এসে পড়েছে। গলার দাগগুলো এখন হলদেটে লাগছে। একটা চেয়ারের সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে ওকে, বাকি সব ঠিকঠাকই মনে হচ্ছে।

"ঠিক আছো তুমি?" ঝুঁকে চেহারার ওপর এসে পড়া চুলগুলো সরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ।"

"তোমার গায়ে হাত দিয়েছে হারামিটা?" ভেতরে রাগ টগবগ করছে এখন।

"না," মাথা ঝাঁকিয়ে বললো কেটি। "কিন্তু আমাদের কাছে কী চায় ও?"

"দয়া করে আমাকেই উত্তরটা দেয়ার সুযোগ দাও।"

ঘুরে দেখলাম যে ঘোস্ট পা দিয়েছে ভেতরে। মেঝেতে বিয়ারের বোতল ছড়ানো চারিদিকে। কোনায় পুরনো ফাইল কেবিনেট। ল্যাপটপও আছে একটা। এছাড়া ঘরে আসবাব বলতে তিনটা ফোল্ডিং চেয়ার, যেটার একটায় কেটি বসে আছে এখন। দ্বিতীয়টায় ঘোস্ট বসে আমাকে ঠিক ওর বাম দিকেরটায় বসতে বললো। কিন্তু দাঁড়িয়েই থাকলাম আমি। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আবারো উঠে দাঁড়ালো ঘোস্ট।

"তোমার সাহায্য চাই আমার, উইল," বলে কেটির দিকে তাকালো সে। "মিস মিলারকে এখানে নিয়ে এসেছি, যাতে আমাকে সাহায্য করতে একটু হলেও 'অনুপ্রাণিত' হও তুমি।"

"আবারো বলছি, ওর গায়ে হাত–"

কথাটা শেষ করতে পারলাম না। চোখের পলকে আমার গলা চেপে ধরে দেয়ালের সাথে মাথাটা ঠুকে দিল ঘোস্ট। সামলে নেয়ার আগেই ঘুষি বসিয়ে দিল কিডনি বরাবর। হাঁটু ভেঙ্গে বসতে বাধ্য হলাম। ব্যাথায় চোখে সর্ষে ফুল দেখছি।

"বীরপুরুষগিরি অনেক হয়েছে, বিরক্ত লাগছে এখন," আমার দিকে তাকিয়ে বললো ঘোস্ট।

খুব কষ্টে বমি চাপলাম।

"তোমার ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে আমাদের, সেজন্যেই তোমাকে এখানে আনা হয়েছে।"

"আমি জানি না ও কোথায় আছে," মাথা উঁচিয়ে বললাম।

এবারে আমার সামনে থেকে কেটির চেয়ারের পেছনে চলে গেল ঘোস্ট। আস্তে করে হাত রাখলো ওর কাঁধে। চমকে উঠলো কেটি।

"সত্যি বলছি," বললাম।

"তোমাকে বিশ্বাস করি আমি।"

"তাহলে কী চাইছো?"

"কীভাবে কেইনের সাথে যোগাযোগ করতে হবে তা জানা আছে আমার।"

"কী?" বিভ্রান্ত স্বরে বললাম।

"আগের সিনেমাগুলোয় আত্মগোপনে থাকা অপরাধীরা বিশেষ বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বার্তা চালাচালি করতো, মনে আছে?"

"হ্যাঁ।"

আমার উত্তর শুনে হাসি ফুটলো ঘোস্টের চেহারায়। "আমাদের কেইন আরেক কাঠি সরেস। একটা ইন্টারনেট নিউজগ্রুপ ব্যবহার করে সে। rec.music.elvis এই ঠিকানায় প্রয়োজন হলে বার্তা পাঠায়। বুঝতেই

পারছো এলভিস প্রিসলি ফ্যানদের একটা বোর্ড এটা। ধরো, ওর আইনজীবির যদি কোন দরকার হয়, তাহলে এই বোর্ডে একটা তারিখ, সময় আর কোডনেম রেখে দেবে। কেইন তখন সময় মতো আইএম-এ যোগাযোগ করবে তার সাথে।

"আইএম?"

"ইন্সট্যান্ট মেসেজ। তুমিও ব্যবহার করেছো নিশ্চয়ই? একটা প্রাইভেট চ্যাটরুমের মতো। কিন্তু ট্রেস করা যায়না।"

"এসব কীভাবে জানো তুমি?" জিজ্ঞেস করলাম।

আবারো হেসে কেটির গলার কাছে হাত নিয়ে এলো ঘোস্ট। "তথ্য যোগাড় করা আমার শখ বলতে পারো।"

কেটির কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিল সে। চেপে রাখা শ্বাসটা ছাড়লাম। পকেট থেকে কিছুক্ষণ আগে দেখা সেই দড়িসমেত জিনিসটা বের করে আনলো।

"আমাকে কেন দরকার তোমার?" জিজ্ঞেস করলাম।

"তোমার ভাই তার আইনজীবির সাথে দেখা করতে রাজি হচ্ছে না," ঘোস্ট বললো। "নিশ্চয়ই ধরতে পেরেছে যে ফাঁদ পাতা হচ্ছে ওর জন্যে। তবে তার সাথে আরেকটা আইএম অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঠিক করেছি আমরা। আশা করছি তুমি হয়তো রাজি করাতে পারবে ওকে।"

"আর যদি না পারি?"

দড়িটা উঁচু করে ধরলো ঘোস্ট। একটা হাতল লাগানো ওটার মাথায়। "এটা কোত্থেকে যোগাড় করেছি জানো?"

জবাব দিলাম না।

"ইন্ডিয়া," লেকচার শুরু করার ভঙ্গিতে বললো অ্যাসেল্টা। "ঠগীরা ব্যবহার করতো। ভয়ংকর খুনে একটা দল। কোনপ্রকার শব্দ ছাড়াই মানুষ মারতো দেদারসে। অনেকে বিশ্বাস করে তাদের এখন আর কোন অস্তিত্ব নেই। আসলে..." বাক্যটা শেষ করলো না সে। "বাদ দাও, তাদের ইতিহাস জেনে তোমার কোন কাজ নেই। কিন্তু এটার কাজ কী, সেটা তো বুঝতে পেরেছো?"

"ও বুঝে যাবে যে ফাঁদ পাতা হচ্ছে," বললাম।

"যাতে না বোঝে, সেই দায়িত্ব তোমার। যদি কাজটা করতে না পারো–" বলে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো ঘোস্ট। "–তাহলে দেখতে পাবে কীভাবে জুলি মারা গিয়েছিল।"

আবারো কেঁপে উঠলো আমার পুরো শরীর। "ওকে ডেকে এনে খুন করবে তুমি।"

"না-ও করতে পারি।"

জানি যে মিথ্যে বলছে, তবে চেহারা দেখে বোঝার উপায় নেই।

"তোমার ভাইয়ের কাছে কিছু টেপ আছে, ম্যাকগুয়ানের বিরুদ্ধে প্রমাণাদি," বললো ঘোস্ট। "তবে সেগুলো এখনও এফবিআইয়ের লোকদের দেয়নি সে। লুকিয়ে রেখেছে এতদিন ধরে। এটা থেকে আমরা আশা করতেই পারি যে কেইন হয়তো আমাদের ভালো চায়। তাছাড়া ওর কাছে এমন একটা বিশেষ জিনিস আছে, যেটা আমার চাই।"

"কী?" জিজ্ঞেস করলাম।

আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল ঘোস্ট। "ও যদি আমাদের সব ফিরিয়ে দেয় আর ওয়াদা করে যে কখনো ফিরে আসবে না, তাহলে কোন ঝামেলা হবে না।"

মিথ্যে কথা। কেইনকে মেরে ফেলবে ও। আমাদের সবাইকেই মারবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। "তোমাকে যদি আমি বিশ্বাস না করি?"

দড়িটা কেটির গলায় পরিয়ে দিল ঘোস্ট। অস্ফুট একটা চিৎকার বেরিয়ে এলো ওর মুখ চিরে। হেসে আমার দিকে তাকালো ঘোস্ট। "বিশ্বাস না করে উপায় আছে?"

"না বোধহয়," ঢোঁক গিলে বললাম।

"বোধহয়?"

"যা বলবে তাই করবো।"

এখনও কেটির গলায় ঝুলছে দড়িটা, আক্ষরিক অর্থেই মৃত্যুফাঁস জিনিসটা। "এটা ধরবে না," বললো ঘোস্ট। "এক ঘণ্টা আছে আমাদের হাতে। এই সময়টা ওর গলার দিকে তাকিয়ে কাটাও, উইল। কল্পনা করো দৃশ্যটা।"

চুয়ান্ন

ম্যাকগুয়ান ভাবেনি যে পিস্টিলো আসলেও এরকম কিছু একটা করে বসবে।

সিকিউরিটি মনিটরে এফবিআই এজেন্টদের তার অফিসে প্রবেশ করতে দেখলো সে। জগুয়া ফোর্ড বেশ নামকরা একজন আইনজীবি। তার হঠাৎ অনুপস্থিতি কিছু প্রশ্নের উদ্রেক ঘটাবেই, তাই বলে এরকম প্রতিক্রিয়া? অবশ্য ফোর্ডের স্ত্রীকে ফোন করে বলা হয়েছিল যে 'জরুরী কাজে' কিছুদিনের জন্যে শহরের বাইরে পাঠানো হয়েছে তাকে।

যাইহোক, ম্যাকগুয়ান সবসময়ই প্রস্তুতই থাকে। নতুন এক ধরনের পারঅক্সাইড এজেন্ট দিয়ে রক্ত পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। ইউভি লাইটেও কিছু দেখা যাবে না। চুল বা কোন কাপড়ের টুকরোও যাতে না পাওয়া যায়, সে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আর যদি পাওয়াও যায়, কী হবে? ফোর্ড আর ক্রমওয়েল যে এখানে এসেছিল, সেটা তো অস্বীকার করার জো নেই। হাসিমুখের সব স্বীকার করবে। তবে এটাও বলবে যে কাজ শেষে এখান থেকে চলেও গিয়েছে তারা। চাইলে প্রমাণও দেখাতে পারে। নিরাপত্তা বাহিনীর লোকেরা ইতিমধ্যে সার্ভেইলেন্স টেপগুলো বদলে দিয়েছে। সেখানে ক্রমওয়েল আর ফোর্ডকে দেখলে মনে হবে বিল্ডিং ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে দুজনে।

একটা বাটনে চাপ দেয়ার সাথে সাথে কম্পিউটারের সব ফাইল মুছে গেল। কিছুই পাওয়া যাবে না হার্ডডিস্কে। প্রতি ঘণ্টায় ব্যাক-আপ রাখতো ম্যাকগুয়ান। সাইবারস্পেসে নিরাপদেই থাকবে ফাইলগুলো। কীভাবে ওগুলো অ্যাকসেস করা যাবে সেটা একমাত্র সে-ই জানে।

উঠে দাঁড়িয়ে টাই ঠিকঠাক করছে এমন সময় পিস্টিলো ঝড়ের বেগে প্রবেশ করলো ঘরে। সাথে ক্লডিয়া ফিশার এবং আরো দুই অচেনা এজেন্ট। ম্যাকগুয়ানের কপাল বরাবর বন্দুক তাক করলো পিস্টিলো।

কোনপ্রকার ভয়-ভীতি ছাড়াই হাত উঁচু করলো ম্যাকগুয়ান। "সারপ্রাইজ দেয়ার জন্যে এসেছো নাকি?"

"ওরা কোথায়?" চিল্লিয়ে উঠলো পিস্টিলো।

"কারা?"

"জন্তরা ফোর্ড আর স্পেশাল এজেন্ট রেমন্ড ক্রমওয়েল।"

ওহ, *তাহলে এই ব্যাপার*, ভাবলো ম্যাকগুয়ান। "তুমি কী বলতে চাচ্ছো যে মি. ক্রমওয়েল একজন ফেডেরাল এজেন্ট?"

"হ্যাঁ," আগের স্বরেই বললো পিস্টিলো। "কোথায় সে?"

"আমি তাহলে মামলা করতে চাই।"

"কী?"

"এজেন্ট ক্রমওয়েল নিজেকে একজন আইনজীবি দাবী করেছিলেন," নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললো ম্যাকগুয়ান। "সেই বিশ্বাসেই তার সাথে স্পর্শকাতর বিষয়ে আলোচনা করেছি আমি। এখন বলছ সে তিনি একজন আন্ডারকভার এজেন্ট। তাকে বলা কোন কথা যাতে আমার বিরুদ্ধে ব্যবহার করা না হয়, সেই নিশ্চয়তার দরকার হবে।"

লাল হয়ে উঠেছে পিস্টিলোর চেহারা। "কোথায় সে, ম্যাকগুয়ান?"

"আমি কীভাবে বলবো? মি. ফোর্ডের সাথেই বেরিয়ে যায় সে।"

"তাদের সাথে কী বিষয়ে কথা হয়েছে তোমার?"

"আইনজীবি আর তার মক্কেলের মধ্যে কী আলোচনা হলো সেটা তো তুমি জানতে চাইতে পারো না, পিস্টিলো।"

পিস্টিলো খুব ইচ্ছে করছে ট্রিগারটা টেনে দিতে। এখনও হারামিটার কপাল বরাবর বন্দুকের নল তাক করে আছে সে। বরাবরের মতোই নির্বিকার ম্যাকগুয়ান। "তল্লাশি শুরু করো," চেঁচিয়ে এজেন্টদের নির্দেশ দিল। "সবকিছুতে ট্যাগ লাগিয়ে বাক্সে ভরো।"

কোনপ্রকার বাঁধা দিল না ম্যাকগুয়ান। হাতকড়া পড়ানোর সময়েও কিছু বললো না। প্রমাণ তারা নিজেরা খুঁজে পেলেই ভালো। আরো জোর দিয়ে কথা বলতে পারবে তখন।

তবুও একটা অস্বস্তি দানা বাঁধতে শুরু করলো ভেতরে ভেতরে। গ্রেফতার হতে কোন সমস্যা নেই তার। তাছাড়া এবারই যে সে প্রথম কোন ফেডারেল এজেন্টকে হত্যা করেছে, এমনটাও নয়। কিন্তু কেমন যেন একটা ভয় হচ্ছে, কোন প্রমাণ রয়ে যায়নি তো?

ছোট্ট একটা ভুলই শেষ করে দিতে পারে তাকে।

পঞ্চান্ন

আমাকে আর কেটিকে ভেতরে রেখে বেরিয়ে গেল ঘোস্ট। চেয়ারে বসে ওর গলায় ঝোলানো ফাঁসটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম অনেকক্ষণ। ঘোস্ট যা চেয়েছিল, সেটাই হচ্ছে। কেটিকে এখানে দেখেই বুঝে গিয়েছিলাম যে না চাইলেও সব কথা শুনতে হবে। ওর আর কোন ক্ষতি হোক, এটা কল্পনাই করতে পারি না আমি।

"আমাদের মেরে ফেলবে অ্যাসেল্টা," আমার দিকে তাকিয়ে বললো কেটি।

প্রশ্ন করেনি, সত্যটাই বলেছে। তবুও জোরে করে মন থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করছি চিন্তাটা। কেটিকে আমি কথা দিয়েছিলাম যে ওর খেয়াল রাখবো, কোন একটা উপায় খুঁজে বের করবো। কিন্তু সেটায় ওর চিন্তা একটুও কমেছে বলে মনে হয় না। মেয়েটার জায়গায় আমি থাকলেও ওরকমটা ভাবতাম। গলার ব্যাথাটা কমলেও, কিডনির পাশটায় এখনও প্রচণ্ড ব্যাথা।

কী ঘটতে যাচ্ছে তা পরিষ্কার বুঝতে পারছি। ঘোস্ট কেইনের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিবে আমার। কেইন সেই ফাঁদে পা দিয়ে এখানে আসা মাত্র সবাইকে মেরে ফেলবে। কোন ভাবে সতর্ক করতে হবে ওকে। এমনভাবে বার্তা পাঠাতে হবে যাতে কেইন বুঝতে পারে যে গোটাটাই একটা মরণফাঁদ। তবে ওর ভরসায় থাকলে চলবে না আমাকে, কেটিকে যে করেই হোক বাঁচাতে হবে। সেজন্যে মরতে হলে মরবো। ঘোস্ট নিশ্চয়ই ভুল করবে একবার, সেই ভুলের সুযোগটাই নিতে হবে।

"আমি জানি আমরা কোথায় আছি," কেটি ফিসফিসিয়ে বললো।

"কোথায়?" ওর দিকে ঘুরে জানতে চাইলাম।

"সাউথ অরেঞ্জ ওয়াটার রিজার্ভেশন। এখানে এসে বন্ধুরা মিলে বিয়ার খেতাম আমরা। হোবার্ট গ্যাপ রোডের কাছেই জায়গাটা।"

"কত কাছে?" জিজ্ঞেস করলাম।

"এক মাইল বড়জোর।"

"রাস্তাটা চেনো? যদি এখান থেকে পালাতে পারি, রাস্তা চিনে এগোতে পারবে?"

"মনে হয়," বলে মাথা নাড়লো ও। "পারবো।"

যাক, একটা তথ্য জানা গেল অন্তত। খুব বেশি কিছু না হয়তো, কিন্তু কোথায় আছি এটা না জানা পর্যন্ত অস্বস্তি লাগছিলো। বাইরে উঁকি দিলাম। গাড়িতে হেলান দিয়ে আছে ড্রাইভার। তার সামনে পিঠে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঘোস্ট। কিছুক্ষণ পর একটা সিগারেট ধরালো ড্রাইভারটা।

আবারো মেঝের দিকে তাকালাম, এক কোনায় কিছু ভাঙা কাঁচের টুকরো পড়ে আছে। এরকম কিছুই খুঁজছিলাম। আবারো দরজা দিয়ে বাইরে তাকালাম। দুজনের কেউই উপরে তাকাচ্ছে না। ধীরে ধীরে কেটির চেয়ারের পেছনে চলে আসলাম।

"কী করছো?" জানতে চাইলো কেটি।

"তোমার হাতের বাঁধন কেটে দিচ্ছি।"

"পাগল হলে নাকি? অ্যাসেল্টা যদি দেখতে পায়-"

"কিছু একটা তো করতেই হবে আমাদের," বললাম।

"কিন্তু-" বলতে গিয়েও চুপ করে গেলো কেটি। "আমাকে মুক্ত করলেও লাভটা কী হবে?"

"জানি না," সত্যটাই বললাম। "কিন্তু তৈরি থেকো। একবার না একবার তো সুযোগ পাবোই। তখনই পালাতে হবে।"

কাচের ধারাল অংশ দিয়ে দড়িটা কাটতে শুরু করলাম। বেশ পুরু দড়ি হবার কারণে খুব ধীরে এগোচ্ছে কাজ। তাড়াতাড়ি হাত চালালাম।

প্রায় অর্ধেকটা কেটে ফেলেছি এসময় টের পেলাম যে কেউ একজন মইটা দিয়ে ওপরে উঠছে। ভয়ে অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে কেটির মুখ চিরে। দ্রুত আমার চেয়ারটায় গিয়ে বসার ঠিক পরমুহূর্তেই ভেতরে প্রবেশ করলো ঘোস্ট। আমার দিকে তাকালো।

"হাঁপাচ্ছো কেন, উইলি?"

কাচের টুকরোটা চেয়ারের পেছনে লুকিয়ে ফেলেছি। বলা যায় ওটার ওপরেই বসে আছি এখন। ভ্রু কুঁচকে আমার দিকে চাইলো ঘোস্ট। টের পাচ্ছি যে হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠছে। কেটির দিকে নজর ফেরালো হারামিটা। একই ভঙ্গিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। সাহস আছে, স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু ওর হাতের দিকে চোখ পড়তেই জমে গেল।

প্রায় ছেঁড়া দড়ির অংশটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

"আমরা অপেক্ষা করছি কেন," এসময় বলে উঠলাম।

কাজ হলো কথাটায়, আমার দিকে তাকালো ঘোস্ট। হাত নেড়ে দড়ির ছেঁড়া অংশটা লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে কেটি। খুব একটা লাভ হলো বলা যাবে না, তবে ভালোমতো না তাকালে বুঝবে না কেউ। এক মুহূর্তে অপেক্ষা করে ল্যাপটপটার দিকে এগোলো ঘোস্ট। পেছন ফিরে আছে এখন।

এটাই সুযোগ, ভাবলাম।

লাফিয়ে উঠে কাচের টুকরোটা ওর গলায় বিঁধিয়ে দিলেই হবে। মাথায় ছক কষলাম। খুব বেশি দূরে আছে এখন? মনে হচ্ছে। নিচের ড্রাইভারটা কি ঝামেলা করতে পারে? তার কাছে কি অস্ত্র আছে? আমি-?

এসময় আমার দিকে ঘুরলো ঘোস্ট। যে সুযোগটা পেয়েছিলাম, সেটাও হারালাম বেশি ভাবতে গিয়ে।

ল্যাপটপটা চালু হয়ে গেছে। একটা মডেমের সাহায্যে ইন্টারনেট ব্রাউজ করছে ঘোস্ট। কিছুক্ষণ টাইপ করার পরেই একটা টেক্সট বক্স ভেসে উঠলো স্ক্রিনে। "কেইনের সাথে কথা বলার সময় হয়ে গেছে।"

মোচড় দিয়ে উঠলো পেটে। এন্টার বাটনে চাপ দিল ঘোস্ট। দেখতে পাচ্ছি কী লিখেছেঃ

-আছো?

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর জবাব এলো।

-হ্যাঁ।

হাসলো ঘোস্ট। "কতদিন পর প্রিয়বন্ধুর সাথে কথা বলছি," বলে আবারো কিছু একটা টাইপ করে এন্টার চাপলো ঘোস্ট।

-আমি উইল। মি. ফোর্ড আছেন পাশেই।

লম্বা একটা সময় কিছুই হলো না। এরপর মেসেজ পাঠালো কেইন।

-তোমার প্রথম গার্লফ্রেন্ডের নাম কী?

আমার দিকে তাকালো ঘোস্ট। "জানতাম প্রমাণ চাইতে পারে কেইন।"

জবাবে কিছু বললাম না। মাথায় চিন্তার ঝড় বইছে।

"কী ভাবছো জানি আমি," যেন আমার মনের কথা পড়তে পারছে, এমন ভঙ্গিতে বললো ঘোস্ট। "ওকে কোনভাবে সতর্ক করতে চাইছো। হয়তো এমন উত্তর দিবে যেটা সত্যের কাছাকাছি, কিন্তু কেইন ঠিকই বুঝতে পারবে," বলে কেটির পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো সে। দড়ির সাথে লাগানো হাতলটা ধরে টান দিল একবার। কেটির গলায় চেপে বসলো ওটা।

"কী করতে হবে, তোমাকে আমি বলে দিচ্ছি উইল। ল্যাপটপটার সামনে যাও। ঠিক উত্তরটা টাইপ করবে। যদি আমি বুঝতে পারি যে উল্টোপাল্টা কিছু করার চেষ্টা করছো, তাহলে এখান থেকে জ্যান্ত বেরুতে পারবে না মেয়েটা। বুঝেছো?"

মাথা নাড়লাম।

আবারো হাতল ধরে টান দিল ঘোস্ট। গুঙিয়ে উঠলো কেটি। "যাও।"

দ্রুত ল্যাপটপের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ঠিকই বলেছে ঘোস্ট, এরকম কিছু একটাই ভাবছিলাম আমি। কেইনকে কি তাহলে কোনভাবেই সতর্ক করা যাবে না? কোন উপায় তো মাথায় আসছে না। অগত্যা টাইপ করলাম:

-সিন্ডি শ্যাপ্রিও।

হাসলো ঘোস্ট। "আসলেও? বাহ উইল, তুমি দেখি প্লেবয়।"

দড়িটা ছেড়ে দিল সে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো কেটি। আবারো স্ক্রিনের সামনে চলে এলো ঘোস্ট। পেছনে তাকিয়ে দেখি কাচের টুকরোটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আবার ওটার ওপরে গিয়ে বসে পড়লাম।

-বাড়ি যাও, উইল।

কপালে একবার হাত বুলালো ঘোস্ট। "ভালো উত্তর দিয়েছে দেখি," বললো। কিছুক্ষণ ভাবনা চিন্তার পর আমাকে জিজ্ঞেস করলো, "ওর সাথে প্রথম মেক-আউট করেছিলে কোথায়?"

"কী?"

"সিন্ডি শ্যাপ্রিওর কথা বলছি। কোথায়? ওর বাসায় নাকি তোমার বাসায়?"

"এরিক ফ্র্যাঙ্কেলের বার মিতজবাহ অনুষ্ঠানে।"

"কেইন জানে সেটা?"

"হ্যাঁ।"

হাসলো ঘোস্ট। টাইপ করলো আবারো।

-আমার তো পরীক্ষা নিলে, এবারে তোমার পালা। আমি সিন্ডির সাথে কোথায় মেক-আউট করেছিলাম প্রথম?

আবারো লম্বা বিরতি। উত্তেজনায় সিটের একদম কোনায় এসে বসেছি। ভালো চাল চেলেছে ঘোস্ট। আমরা আসলেও জানি না যে কেইনের সাথেই কথা বলছি কিনা। এবারে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

ত্রিশ সেকেন্ড পর জবাব এলো।

-বাড়ি যাও, উইল।

জবাব টাইপ করলো ঘোস্ট।

-আমি জানতে চাই যে আসলেও তোমার সাথে কথা বলছি, কেইন।

এবারে মনে হলো জবাব আসবেই না। কিন্তু এক মিনিট পর উত্তরটা ভেসে উঠলো স্ক্রিনে।

-ফ্র্যাঙ্কেলের বার মিতজবাহ অনুষ্ঠানে। এবার বাড়ি যাও।

আসলেও কেইনের সাথে কথা বলছি আমরা। কেটির সাথে চোখাচোখি হলো একবার। ঘোস্ট টাইপ করলো আবারো:

-দেখা করতে হবে আমাদের।

-সম্ভব না।

-প্লিজ। ভীষণ জরুরী।

-বাড়ি যাও উইল। নিরাপদ না।

-তুমি কোথায়?

-কোর্ডের খোঁজ কীভাবে পেলে?

"হুম," বলে কিছুক্ষণ ভাবলো ঘোস্ট। এরপর টাইপ করলো–পিস্টিলো।

আবারো লম্বা বিরতি।

-মায়ের কথা শুনেছি আমি। খুব বেশি কষ্ট পেয়েছে?

এ ব্যাপারে আমার সাথে কোন আলোচনা করলো না ঘোস্ট।

-হ্যাঁ।

-বাবা কেমন আছে?

-ভালো না। তোমার সাথে দেখা করতে হবে আমাদের।

-সম্ভব না।

-আমরা সাহায্য করতে পারবো তোমাকে।

-দূরে থাকাই নিরাপদ।

আমার দিকে তাকালো ঘোস্ট। বললো, "ওর প্রিয় জিনিসটার টোপ দেই, কী বলো?"

বুঝলাম না কথাটা। কিন্তু ততক্ষণে টাইপ করা শুরু করে দিয়েছে ঘোস্ট।

-চাইলে তোমার জন্যে টাকার বন্দোবস্ত করতে পারি আমরা। দরকার তোমার?

-দরকার হবে। তবে সেটার ব্যবস্থা পরেও করা যাবে।

এরপর যেন আমার মনের অবস্থা বিবেচনা করেই টাইপ করলো ঘোস্ট:

-তোমার সাথে দেখা করতে চাই আমি, প্লিজ।

-ভীষণ মিস করি তোমাকে, উইল। বাড়ি যাও।

-দাঁড়াও।

-এখন যেতে হবে আমাকে, ভাই। চিন্তা কোরো না।

চেপে রাখা শ্বাসটা ছাড়লো ঘোস্ট। "কাজ হচ্ছে না," বিরক্তস্বরে বললো। এরপর টাইপ করলো:

-তুমি যদি কথা শেষ না করে যাও, তোমার ভাইকে মরতে হবে।

কিছুক্ষণের বিরতি। এরপর–*কে?*

হাসলো ঘোস্ট। -বলো দেখি কে? সূত্র দিচ্ছি দাঁড়াও–ক্যাসপার দ্য ফ্রেন্ডলি।

এবারে জবাব আসতে সময় লাগলো না।

-ওকে ছেড়ে দাও, জন।

-না।

-ওর এসবের সাথে কোন লেনাদেনা নেই।

-এসব আবেগী কথাবার্তা আমার সাথে বলে কোন লাভ নেই, ভালো করেই জানো। দেখা করো, আমি যা চাই সেটা দাও। তাহলে ও বেঁচে যাবে।

-আগে ওকে যেতে দাও। তাহলে যা চাইছো, পাবে।

-ফালতু কথা রাখো। ইয়ার্ডের কথা মনে আছে না তোমার, কেইন? বুঝতে পারছো তো কোন জায়গার কথা বলছি? তিন ঘণ্টা সময় দিচ্ছি, ওখানে এসো।

-অসম্ভব। আমি তো এই মুহূর্তে ইস্ট কোস্টেই নেই।

"ধুর," বিড়বিড় করলো ঘোস্ট। এরপর মরিয়া ভঙ্গিতে টাইপ করলো:

-তাহলে এখনই বের হয়ে যাও। তিন ঘণ্টা, মনে থাকে যেন। তখন যদি তোমাকে ওখানে না দেখি, আঙুল কাটা শুরু করবো। প্রতি আধঘণ্টায় একটা। প্রথমে হাতের আঙুল, এরপর পা। তিন ঘণ্টা, কেইন।

সাইন আউট করলো ঘোস্ট। ল্যাপটপ বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালো।

"ভালোই বাৎচিত হলো তোমার ভাইয়ের সাথে, কী বলো উইল?" হেসে জিজ্ঞেস করলো আমার দিকে তাকিয়ে।

ছাপ্পান্ন

স্কয়ার্সের মোবাইলে ফোন দিল নোরা। যতটা সংক্ষেপে সম্ভব বললো সবকিছু। গাড়ি চালাতে চালাতে স্কয়ার্সও শুনে গেল মন দিয়ে। পার্ক এভিনিউয়ের মেট্রোপলিটন লাইফ বিল্ডিংয়ের সামনে দেখা করলো দুজনে।

ভ্যানে চড়েই স্কয়ার্সকে একবার জড়িয়ে ধরলো নোরা। আবারো এই ভ্যানটায় চড়ে ভালো লাগছে তার।

"পুলিশকে কিছু জানানো যাবে না," স্কয়ার্স বললো গম্ভীর স্বরে।

মাথা নাড়লো নোরা। "উইলও না বলেছে।"

"তাহলে করবোটা কী শুনি?"

"জানি না। আমার খুব ভয় লাগছে, স্কয়ার্স। উইলের ভাইয়ের কাছ থেকে এই লোকগুলোর ব্যাপারে শুনেছি আমি। ওরা মেরে ফেলবে সবাইকে।"

কিছুক্ষণ ভাবলো স্কয়ার্স। "কেইনের সাথে যোগাযোগ করতে কীভাবে তুমি?"

"একটা নিউজগ্রুপের মাধ্যমে।"

"ওকে একটা মেসেজ পাঠাই। হয়তো কোন বুদ্ধি দিতে পারবে।"

আমাদের কাছে ঘেঁষছে না ঘোস্ট।

সময় শেষ হয়ে আসছে দ্রুত। এখনও তক্কে তক্কে আছি আমি, ঝুঁকি নিতেও পিছপা হবো না। কাঁচের টুকরোটা হাতে নিয়ে মনে মনে দৃশ্যটা কল্পনা করছি। আমার ওঠার শব্দ কানে গেলে ঘোস্ট আত্মরক্ষার জন্যে কী করতে পারে, সেটাও ভাবলাম। তার প্রেক্ষিতে আমি কী করবো? তাছাড়া এমন কোথাও আঘাত করতে হবে, যেখানে কেটে গেলে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসবে।

কেটির দিকে তাকালাম। ওর অবস্থা তুলনামূলক ভালোই বলা যায়। পিস্টিলোর কথা মনে পড়লো এসময়। বারবার করে বলে দিয়েছিলেন যাতে কেটিকে এসবে না জড়াই। ঠিকই বলেছিলেন। পুরো দোষ আমার। শুরুতেই রাজি হওয়া উচিত হয়নি। তখনই ওকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছিলাম। এসব করে ওকে কোনভাবে সাহায্য করছি, এই ধারণাটাই ভুল ছিল। ভীষণ অপরাধবোধ হচ্ছে এখন।

ওকে বাঁচাতেই হবে।

ঘোস্টের দিকে তাকালাম আবার। সে-ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখ সরিয়ে নিলাম না এবারে।

"ওকে যেতে দাও," বললাম।

মেকি হাই তোলার ভঙ্গিতে মুখের সামনে হাত নিলো ঘোস্ট।

"ওর বোন তোমার সাথে সবসময় ভালো ব্যবহার করতো।"

"তো?"

"ওকে কষ্ট দেয়ার তো কারণ নেই।"

"কারণের আবার দরকার কী?"

চোখ বন্ধ করে ফেললো কেটি। আমিও আর কথা বাড়ালাম না। এরকম মানুষজনের সাথে কথা বলাটাই বাতুলতা। ঘড়ি দেখলাম। আর দুই ঘণ্টা আছে। 'ইয়ার্ড' বলতে যে জায়গাটার কথা বুঝিয়েছে ঘোস্ট, সেটা চিনি আমি। হেরিটেজ মিডল স্কুলের পাশে ওখানটায় আগে গাঁজাখোরদের আখড়া ছিল। এখান থেকে খুব বেশি হলে তিন মাইল দূরে।

কেন জায়গাটা বেছে নিয়েছে ঘোস্ট, তা বুঝতে শার্লক হোমস হতে হবে না। একদম নিরিবিলি জায়গাটা, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে। চারপাশ থেকে ঘেরা বিধায় কাউকে মেরে ফেলে রাখলেও কেউ জানবে না।

ঘোস্টের মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো এসময়। এমন ভাবে ওটার দিকে তাকালো সে যেন এর আগে কখনো ফোনের শব্দ শোনেনি। এই প্রথম বিভ্রান্তি খেলা করতে দেখলাম ওর সদা আত্মবিশ্বাসী চেহারায়। তবে খুব বেশিক্ষণের জন্যে না। কাঁচের টুকরোটা শক্ত করে চেপে ধরলেও কিছু করলাম না। আরো অপেক্ষা করতে হবে আমাকে।

"বলো," ফোনটা কানে চেপে বললো ঘোস্ট।

একমনে শুনলো কিছুক্ষণ। গায়ের রঙের কারণে তার চেহারা সবসময়ই ফ্যাকাসে ঠেকে। তবে বুঝতে পারছি যে কিছু একটা হয়েছে। ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে পাক্কা দু মিনিট চুপ করে বসে রইলো। এরপর বললো, "বের হচ্ছি এখনই।"

লাইন কেটে আমার দিকে এগিয়ে এলো সে। কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, "এই চেয়ার থেকে যদি একবারের জন্যেও ওঠো, তাহলে মিস

মিলারের অবস্থা এমন করবো যে প্রাণে মেরে ফেলার জন্যে আমার পা ধরতে হবে। বুঝেছো?"

মাথা নাড়লাম।

দরজা বন্ধ করে চলে গেল ঘোস্ট। পুরো অন্ধকার ভেতরে। আলো কমে আসতে শুরু করেছে। সামনের দিকে কোন জানালা না থাকায় বুঝতে পারছি না যে ওরা কী করছে।

"কী হচ্ছে?" ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলো কেটি।

মুখে আঙুল দিয়ে ওকে চুপ থাকতে ইশারা করলাম। একটা গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ কানে এলো। ঘোস্টের হুমকিটার কথা ভাবলাম। চেয়ার ছেড়ে উঠতে না করেছে। ঘোস্ট এমন একজন যার কথার বরখেলাপ করা সহজ নয়। কিন্তু এখন যদি চুপচাপ বসেও থাকি, আমাদের মেরেই ফেলবে সে। মাথা নিচু করে চেয়ার থেকে নেমে গেলাম।

কেটির দিকে তাকালাম একবার। চুপ থাকতে ইশারা করলাম আবারো। মাথা নাড়লো সে।

প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে দরজার কাছে হেঁটে গেলাম। পারলে পুরোপুরি উপুড় হয়ে শুয়েই পড়তাম, কিন্তু কাচের টুকরোগুলোর কারণে পারছি না। সাবধানে এগোলাম, যাতে হাত কেটে না যায়।

দরজার কাছে পৌঁছে মেঝের সাথে মাথা ঠেকিয়ে নিচের ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে বাইরে তাকালাম। গাড়িটা চলে যাচ্ছে। আরেকটু ভালো করে দেখার চেষ্টা করেও কোন লাভ হলো না। কাজটা আসলেও কঠিন। উঠে বসে এবারে দরজার পাল্লার কাছের ফাঁকটায় চোখ রাখলাম। ওই তো দাঁড়িয়ে আছে।

ড্রাইভারটা।

কিন্তু ঘোস্ট কোথায়?

দ্রুত হিসেব কষে নিলাম মাথায়। দুইজন ছিল বাইরে, একজন গাড়ি নিয়ে চলে গেল। অঙ্কে কখনোই অতটা ভালো না আমি, কিন্তু এ মুহূর্তে বাইরে একজনেরই থাকার কথা।

"চলে গেছে ও," ফিসফিসিয়ে বললাম।

"কী?" জিজ্ঞেস করলো কেটি।

"ড্রাইভারটা আছে এখনও। কিন্তু ঘোস্ট চলে গেছে।

চেয়ারে ফিরে এসে কাঁচের টুকরোটা তুলে নিলাম। নিঃশব্দে কেটির চেয়ারের পেছনে চলে এসে কাটতে শুরু করলাম দড়িটা।

"আমরা কী করবো এখন?" জিজ্ঞেস করলো কেটি।

"এখান থেকে পালানোর রাস্তা চেনো তুমি," বললাম আমি। "সুযোগটা নিতেই হবে।"

"অন্ধকার হয়ে আসছে।"

"সেজন্যেই তো এখন করবো কাজটা।"

"অন্য লোকটা," যুক্তি দেখালো কেটি, "তার কাছে হয়তো অস্ত্র আছে।"

"থাকতে পারে। নাহলে কী করবো বলো? ঘোস্টের ফিরে আসার জন্যে অপেক্ষা করবো?"

মাথা ঝাঁকালো কেটি। "সে যে ফিরে আসছে না এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবো কী করে?"

"নিশ্চিত হওয়াটা সম্ভব নয়," বলে দড়ির বাকি অংশটুকুও কেটে ফেললাম। এখন মুক্ত ও। কব্জিদুটোয় হাত বুলাচ্ছে, এমন সময় বললাম, "যাবে তো নাকি?"

আমার দিকে যে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ও এখন, ঠিক এই দৃষ্টিতেই নিশ্চয়ই একসময় কেইনে দিকে তাকাতাম আমি, আশা আর আত্মবিশ্বাসের মিশেলে। না চাইতেও হয়তো চেহারায় কিছুটা আত্মবিশ্বাসী ভাব ফুটে উঠেছিল। মাথা নাড়লো কেটি।

পেছনের দিকে একটা জানালা আছে। আমার পরিকল্পনাটা সহজ। ওখান দিয়ে বাইরে বের হয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পালাবো। চেষ্টা করবো যতটা সম্ভব কম শব্দ করার। যদি ড্রাইভার লোকটা শুনে ফেলে, তাহলে ঝেড়ে দৌড় দিব। মনে মনে আশা করছি যে তার কাছে কোন আগ্নেয়াস্ত্র নেই, বা থাকলেও আমাদের আহত করার অনুমতি নেই। ওরা নিশ্চয়ই জানে যে কেইনকে বাগে আনতে হলে আমাদের জীবিত রাখতে হবে। অন্তত আমাকে।

কিংবা আমরা মারা গেলেও হয়তো কিছু যায় আসবে না।

দীর্ঘদিনের অব্যবহারে জানালাটা আটকে গেছে। অনেকক্ষণ ধরে চেষ্টা করলাম, কিন্তু লাভ হলো না।

"এখন?" কেটির চোখেও হতাশা।

ফাঁদে আটকা পড়া ইঁদুর মনে হচ্ছে নিজেকে। ঘোস্টের বলা কথাটা মনে পড়লো, জুলিকে রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল আমার, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। কিন্তু সেটার পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেয়া যাবে না। যেভাবেই হোক, কেটিকে বাঁচাতে হবে।

"একটাই রাস্তা আছে এখান থেকে বের হবার," বলে দরজাটার দিকে তাকালাম।

"আমাদের দেখে ফেলবে লোকটা।"

"না-ও দেখতে পারে।"

আবারো দরজার পাল্লার ফাঁকে চোখ রাখলাম। সূর্যালোক মিইয়ে আসছে। আশপাশে লম্বা গাছ থাকার কারণে অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে তাড়াতাড়ি। সবচেয়ে আশার বিষয়, আমাদের দিকে পিঠ দিয়ে একটা গাছের গুড়িতে বসে সিগারেট টানছে ড্রাইভারটা।

কাচের টুকরাটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলাম। কেটিকে নিচু হওয়ার নির্দেশ দিয়ে নবে হাত দিলাম দ্রুত। সহজেই ঘুরে গেল। দরজাটা খোলার সময়

অবশ্য ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠলো একবার। থমকে গেলাম, কিন্তু ড্রাইভার পেছনে ফিরলো না। ঝুঁকিটা নিতেই হবে। আবারো টান দিলাম দরজাটা। এক ফুটের মতো খুলে যেতেই থেমে গেলাম। এই ফাঁক গলে কোনমতে বের হওয়া যাবে।

আমার দিকে তাকালো কেটি। মাথা নেড়ে দরজার দিকে দেখালাম। সন্তর্পণে বেরিয়ে গেলো সে। মাথা নিচু করে আমিও একই কাজ করলাম। পাটাতনটা অ্যালুমিনিয়ামের হওয়াতে শব্দ হচ্ছে না। এখন মেঝেতে শুয়ে আছি আমরা। নিচ থেকে তাকালেই দেখা যাবে স্পষ্ট। দরজা ভিজিয়ে দিলাম।

এখনও উল্টোদিকে ঘুরে আছে লোকটা।

এবারে আসল কাজ। এখান থেকে নামতে হবে। মই ব্যবহার করা সম্ভব নয়। বেশি খোলামেলা জায়গায় ওটা। ধীরে ধীরে ওয়াচটাওয়ারটায় অন্য পাশে চলে এলাম দুজনে। এই অংশটা সামনের দিক থেকে দেখা যায় না। মাথা উঁচু করে উঁকি দিতে যাবো এসময় গুঙিয়ে উঠলো কেটি। দ্রুত ওকে ধরলাম, নতুবা পড়েই যেত বেচারি। পাটাতনের নিচে ঠেস দেয়া একটা কাঠ খুলে পড়েছে ভার সইতে না পেরে।

"হচ্ছেটা কী?" ড্রাইভারের গলার স্বর কানে এলো। আমাদের অবশ্য দেখতে পায়নি সে, শুধু শব্দটা শুনেছে।

"আপনারা কী করছেন ওখানে?"

দুজনেই দম ফেলতে ভুলে গেছি যেন। পাতা মাড়াবার শব্দ কানে এলো। তৈরিই ছিলাম এর জন্যে। অপেক্ষা করতে লাগলাম লোকটার উঠে আসার। কিন্তু শেষমুহূর্তে আবারো চিৎকার করে উঠলো সে, "আপনারা দুজন কী করছেন...?"

"কিছু না," যতটা সম্ভব চাপা স্বরে বললাম। এখন যদি কিছু না বলি তাহলে উপরে উঠবেই সে। "ওয়াচটাওয়ারটা অনেক পুরনো। বেশিক্ষণ আমাদের ভার নিতে পারবে বলে মনে হয় না।"

কোন জবাব এলো না।

দুজনই শ্বাস চেপে রেখেছি। কেটি আমাকে ধরে আছে শক্ত করে। বুঝতে পারছি যে সে কাঁপছে। সাহস দেয়ার ভঙ্গিতে ওর পিঠে হাত রাখলাম।

আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরেও যখন পদশব্দ কানে এল না, চোখ দিয়ে কেটিকে একদম পেছনে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত করলাম। কিছুক্ষণ ইতস্তত করলেও কথা শুনলো।

আমার নতুন পরিকল্পনা হচ্ছে ওয়াচটাওয়ারটার একপাশের খুঁটি বেয়ে নিচে নেমে যাবো। প্রথমে কেটির পালা। হয়তো শব্দ শুনে ফেলবে লোকটা। শুনুক, তখন কী করতে হবে সেটাও ভেবে রেখেছি।

রাস্তাটার দিকে দেখালাম। মাথা নেড়ে খুঁটিটার দিকে এগিয়ে গেল কেটি। কিছুক্ষণ পর দেখলাম দমকল-কর্মীদের মতো খুঁটির শেষ মাথা থেকে ঝুলছে। আবারো শব্দ হলো। এবার নিজের চোখে দেখলাম একটা স্ক্রু খুলে পড়তে।

"হচ্ছেটা কী..."

তবে এবারে বাক্যটা শেষ করলো না ড্রাইভার। সোজা এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। ঝুলে থাকা অবস্থাতেই আমার দিকে তাকালো কেটি।

"নেমে দৌড় দাও," চিল্লিয়ে বললাম।

হাত ছেড়ে মাটিতে লাফিয়ে পড়লো কেটি। খুব বেশি উঁচু থেকে লাফ দেয়নি, তাই কোথাও ব্যাথাও পায়নি সম্ভবত। নিচ থেকে এখন তাকিয়ে আমার দিকে, অপেক্ষা করছে।

"দৌড় দাও," আবারো চিল্লিয়ে বললাম।

"দৌড়াবেন না, নাহলে গুলি করবো," এই পরিস্থিতিতেও লোকটা আমাদের আপনি করে বলছে শুনে কিছুটা অবাকই হলাম।

"দৌড়াও! কেটি।"

আমি খুঁটি ধরে ঝোলার ধার ধারলাম না। সোজা লাফ দিলাম নিচে। বেশ উঁচু থেকে লাফ দেয়ায় মাটিতে পড়ার সাথে সাথে ফুসফুসে চেপে রাখা বাতাস বেরিয়ে গেল। কোথায় যেন পড়েছিলাম উঁচু জায়গা থেকে লাফিয়ে নিচে পড়ার সাথে সাথে ডিগবাজি খেতে হবে। সেই চেষ্টা করতে গিয়ে জোরে ধাক্কা লেগে গেল একটা দরজার সাথে। লোকটা আর বড়জোর পনেরো কদম দূরে আছে। চেহারায় রাগের ছাপ স্পষ্ট।

"না থামলে কিন্তু মরবেন।"

হাতে কোন বন্দুক দেখলাম না তার।

"পালাও!" আবার কেটির উদ্দেশ্যে চিৎকার করলাম।

"কিন্তু–"

"আমি আসছি তোমার পেছনে! যাও!"

ও বুঝতে পারছে যে মিথ্যে বলছি আমি। এরকম কিছু একটা যে হবে তা আগেই আন্দাজ করেছিলাম। এখন আমার কাজ হচ্ছে লোকটাকে বাঁধা দেয়া যাতে কেটি পালাতে পারে। কিন্তু বোকা মেয়েটা এখনও একগুয়ে ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রায় পৌঁছে গেছে লোকটা।

"তুমি গিয়ে লোক ডাকতে পারবে," এবারে আমার কণ্ঠে অনুরোধ, "যাও!"

অবশেষে কথা শুনলো কেটি। লাফিয়ে গাছের গুঁড়িগুলো পার হয়ে জঙ্গলে উধাও হয়ে গেল। পকেটে কেবল হাত ঢুকিয়েছি এসময় সর্বশক্তিতে আমাকে ধাক্কা দিল লোকটা। কোনমতে তাল সামলে দুহাতে জড়িয়ে ধরলাম তাকে। একসাথে মাটিতে আছড়ে পড়লাম পরমুহূর্তে। এটাও কোথায় যেন

দেখেছিলাম। হাতাহাতি লড়াই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাটিতেই হয়। সিনেমাতে নায়ক আর ভিলেনের মধ্যে অবশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুষাঘুষি চলে। বাস্তবে, কেউ একজন মাথা নিচু করলেই অন্যজন তাকে প্রথম সুযোগে মাটিতে ফেলে দেয়। লোকটার হাত ভালোই চলছে। মাথা ঠান্ডা রেখে পকেট থেকে কাচের টুকরোটা বের করার চেষ্টা করছি আমি।

শক্ত করে তাকে জাপটে ধরলাম আবারো। জানি যে এতে খুব বেশি ব্যাথা পাচ্ছে না। কিন্তু সেটা আমার মূল উদ্দেশ্যে নয়। কেটি পালানোর মতো সময় পেলেই যথেষ্ঠ। তাই প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে থাকলাম তাকে।

এসময় মুখ দিয়ে আমার মাথায় বাড়ি বসালো লোকটা। যাদের এই অভিজ্ঞতা হয়নি, তারা বুঝবে না। মনে হলো কেউ যেন ব্যাট দিয়ে আঘাত করেছে সর্বশক্তিতে। চোখে পানি চলে এলো। বাধ্য হলাম ঢিল দিতে।

প্রথম সুযোগেই উঠে দাঁড়ালো সে। জানি এখন কী করতে চলেছে। পা দুটো পেটের কাছে এনে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকলাম, যেন ভয় পেয়েছি ভীষণ। আমার পাঁজর বরাবর পা চালিয়ে দিল লোকটা।

এর অপেক্ষাতেই ছিলাম। এবারে আমার পালা। এক হাতে পা-টা আঁকড়ে ধরে অন্য হাত দিয়ে কাঁচের টুকরোটা বিঁধিয়ে দিলাম ওর পায়ের পেছনের অংশে। চিল্লিয়ে উঠলো সে। বনের স্তব্ধতা খানখান করে দিল চিৎকারটা। কাচটা বের করে এনে আরো একবার খোঁচা দিলাম সর্বশক্তিতে, এবারে হ্যামস্ট্রিং বরাবর। উষ্ণ রক্তের ধারার অস্তিত্ব টের পাচ্ছি হাতে।

মাটিত শুয়ে তড়পাতে লাগলো লোকটা।

আরো একবার আঘাত হানতে যাবো এসময় সে বলে উঠলো, "আপনাকে আর আটকাবো না আমি। ছেড়ে দিন!"

ভালো করে তাকালাম তার দিকে। আসলেও এ মুহূর্তে আমাদের আর কোন ক্ষতি পারবে বলে মনে হয় না। অহেতুক রক্তপাত পছন্দ নয় আমার। তাছাড়া সময় শেষ হয়ে আসছে। ঘোস্ট ফিরে আসতে পারে যেকোন মুহূর্তে। তার আগেই পালাতে হবে।

তাই ঘুরে দৌড় দিলাম।

বিশ-ত্রিশ কদম এগিয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখি এখনও মাটিতে পড়ে আছে লোকটা। ওঠার চেষ্টাও করছে না। আবারো দৌড় দিতে যাবো, এমন সময় কেটির গলার শব্দ শুনতে পেলাম। "উইল, এদিকে!"

ডানদিকে ঘুরে একটা গাছের পেছনে আবিষ্কার করলাম ওকে।

"এদিক দিয়ে যেতে হবে," বললো ও।

বাকিটা পথ পাশাপাশি দৌড়ালাম আমরা। মুখের ওপর একটু পরপর ডাল চলে আসছিলো। বেশ কয়েকবার হোঁচট খেলাম শেকড়ে, কিন্তু একেবারে পড়ে গেলাম না। পনেরো মিনিট পর জঙ্গল থেকে হোবার্ট গ্যাপ রোডে বেরিয়ে এলাম।

কেটি আর উইলকে জঙ্গল থেকে বেরুতে দেখলো ঘোস্ট। একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে কিছুক্ষণ নজর রেখে হাসিমুখে গাড়িতে উঠে পড়লো। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো আগের জায়গায়। এখানে যে রক্ত দেখতে হবে, তা ভাবেনি। উইল ছেলেটা একটার পর একটা চমক দেখিয়েই যাচ্ছে।

ভালো।

কাজ শেষে সাউথ লিভিংস্টোন এভিনিউয়ে গাড়ি চালিয়ে চলে এলো সে। কেটি বা উইলের কোন চিহ্ন নেই কোথাও। ব্যাপার না। নর্থফিল্ড এভিনিউয়ের মেইলবক্সটার সামনে গাড়ি থামালো। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে স্লটের ভেতরে দিয়ে ঢুকিয়ে দিল প্যাকেজটা।

কাজ শেষ।

নর্থফিল্ড এভিনিউ থেকে গার্ডেন স্টেটে আসতে লাগলো বিশ মিনিট। আর বেশি দেরি নেই। ঘটনাচক্রের শুরু নিয়ে ভাবলো কিছুক্ষণ। কীভাবে এর ইতি টানা উচিত, সেটাও ভাবলো। ম্যাকগুয়ান, উইল, কেটি, জুলি আর কেইন হচ্ছে বড় একটা নাটকের কুশীলব। সেই নাটকের পর্দা নামবে কিছুদিনের মধ্যে।

তবে এতদিন পরে সে কেন দেশে ফিরে এসেছে তা কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও ভোলেনি। কাউকে কথা দিলে সেটা কখনোই ভোলে না ঘোস্ট।

সাতান্ন

বেশ ঘটনাবহুল কাটলো পরবর্তী পাঁচদিন।

ওয়াচটাওয়ারটা থেকে পালানোর পর কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করি আমি আর কেটি। আমাদের যেখানে আটকে রাখা হয়েছিল সেখানে নিয়ে যাই তাদের। কিন্তু কেউ ছিল না জায়গাটায়। ওয়াচটাওয়ারের ভেতরেও ফাঁকা। আমি যেখানে ড্রাইভারকে কাচ দিয়ে আঘাত করেছিলাম সেখানে অবশ্য রক্তের উপস্থিতি খুঁজে পায় পুলিশের লোকজন। তবে আঙুলের ছাপ বা ফাইবার জাতীয় কিছু ছিল না। আশাও করিনি যে পাওয়া যাবে। গেলে কী-ই বা হতো?

এতদিন পর *প্রায়* সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে।

ফিলিপ ম্যাকগুয়ানকে গ্রেফতার করা হয়েছে আন্ডারকভার এফবিআই এজেন্ট রেমন্ড ক্রমওয়েল এবং নামকরা আইনজীবি জশুয়া ফোর্ডকে খুনের দায়ে। তবে এই প্রথম তার জামিন নামঞ্জুর করা হয়েছে আদালত থেকে। পিস্টিলোর সাথে দেখা হতেই বুঝলাম যে সন্তুষ্ট তিনি। নিজের চিরশত্রুকে বাগে পেয়েছেন অবশেষে।

"সবকিছু একদম খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে এবার," আমার মনের কথাটাই হাসিমুখে বললেন পিস্টিলো। "এই খুনের মামলা থেকে কোনভাবেই ছুটতে পারবে না ম্যাকগুয়ান।"

কীভাবে এই ধুরন্ধর অপরাধীকে অবশেষে ধরলেন তিনি, সেটা না জিজ্ঞেস করে পারলাম না। পিস্টিলোও বলতেই চাচ্ছিলেন।

"ম্যাকগুয়ান তো নকল সার্ভেইলেন্স টেপের ব্যবস্থাও করে রেখেছিল। ওটা দেখলে মনে হবে যে রেমন্ড আর মি. ফোর্ড তার অফিস থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আদালতে এটাকেই অ্যালিবাই হিসেবে ব্যবহার করার ইচ্ছে ছিল

তার। সত্যি বলতে টেপটা দেখে কারো বোঝার সাধ্য ছিল না যে ওটা নকল।"

"তাহলে?"

হাসলেন পিস্টিলো। "কেউ একজন ডাকের মাধ্যমে আরেকটা টেপ পাঠায় আমাদের। আপনাদের লিভিংস্টোন থেকেই এসেছিল প্যাকেজটা। আসল টেপটা ছিল ওখানে। সেটায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো যে দুজন লোকের মৃতদেহ লিফটে তুলছে ম্যাকগুয়ানের দুই চেলা। একটু ডলা দিতেই দুজনই দোষ স্বীকার করেছে। ম্যাকগুয়ানের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতেও রাজি এখন। প্যাকেজে একটা চিরকুটে লেখা ছিল কোথায় লাশদুটো পাওয়া যাবে। সবচেয়ে দারুণ ব্যাপার, সার্ভেইলেন্স টেপটার পাশাপাশি আপনার ভাই ম্যাকগুয়ানের বিরুদ্ধে যত প্রমাণাদি যোগাড় করেছিল, সব ছিল ভেতরে।"

অনেক ভাবনাচিন্তা করার পরেও, কাজটা কার হতে পারে তা মাথায় আসলো না। "কে পাঠিয়েছে প্যাকেজটা, জানেন?"

"না," পিস্টিলো বললেন। এ নিয়ে খুব বেশি মাথাও ঘামাচ্ছেন না।

"জন অ্যাসেন্টাকে নিয়ে কী করলেন?" জিজ্ঞেস করলাম।

"তার নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হয়েছে।"

"গ্রেফতারী পরোয়ানা তো অনেক আগে থেকেই ছিল।"

কাঁধ ঝাঁকালেন পিস্টিলো। "এর চেয়ে বেশি কিছু করা সম্ভব না আপাতত।"

"জুলি মিলারকে খুন করেছে সে।"

"ঘোস্ট একজন ভাড়াটে খুনি, উইল। তাকে যা বলা হবে, সে করবে।"

ভালো লাগলো না কথাটা শুনতে। "তাকে বোধহয় ধরার আশা ছেড়ে দিয়েছেন আপনারা।"

"তাকে ধরতে পারলে আমাদের চেয়ে খুশি আর কেউ হতো না, কিন্তু আপনাকে মিথ্যে আশ্বাস দিতে চাচ্ছি না। তাকে পাকড়াও করা সহজ কথা নয়। অ্যাসেন্টা ইতিমধ্যে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে গেছে; সেই খবরও পেয়েছি আমরা। বড় কোন রাজনৈতিক নেতা বা স্বৈরশাসকের হয়ে কাজ করা শুরু করবে আবারো। সে-ই নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে ওর। তবে একটা কথা ভুলবেন না, ঘোস্ট একটা অস্ত্র বৈ কিছু না। মানব অস্ত্র। যে তাকে ব্যবহার করে তাকে ধরাটাই আমাদের মূল লক্ষ্য।"

তার কথার সাথে একমত না হলেও তর্ক করলাম না আর। কেইনের জন্যে এখন পরিস্থিতিটা কীরকম, সেটা জিজ্ঞেস করলাম। জবাব দেয়ার আগে কিছুক্ষণ ভেবে নিলেন।

"আপনি আর মিস কেটি মিলার আমাদের সবকিছু বলেননি, তাই না?"

একটু নড়েচড়ে বসলাম সিটটায়। আসলেও কেইনের সাথে যোগাযোগের ব্যাপারটা চেপে গেছি আমরা। "সব বলেছি, কিচ্ছু লুকোইনি।"

আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কাঁধ ঝাঁকালেন পিস্টিলো। "সত্যিটা হচ্ছে, তাকে আমাদের আর খুব বেশি একটা দরকার নেই। সে এখন নিরাপদ, উইল," বলে সামনে ঝুঁকে বসলেন। "আমি জানি তার সাথে আপনার যোগাযোগ হয়নি-" চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে কথাটা বিশ্বাস করেন না তিনি। "-কিন্তু কখনো যদি হয়, তাহলে বলবেন যে আর গা ঢাকা না দিয়ে থাকলেও চলবে। তাছাড়া, পুরনো যে প্রমাণগুলো আছে, সেগুলোর ব্যাপারে তার সাহায্য দরকার হবে।"

যেমনটা বললাম, ঘটনাবহুল পাঁচটা দিন।

পিস্টিলোর সাথে মিটিংটা বাদে বাকি সময়টুকু নোরার সাথে কাটালাম। ওর অতীত নিয়ে কথা বলেছি, তবে খুব বেশি গভীরে যাইনি। তখনকার কথা উঠতেই বারবার ভয়ের একটা ছায়া দেখতে পাচ্ছিলাম ওর চোখেমুখে। প্রাক্তন স্বামীকে এখনও প্রচণ্ড ভয় পায়। ব্যাপারটা ভেতরে ভেতরে রাগিয়ে তুললো আমাকে। মিসৌরির এই ক্রে স্প্রিংয়ের সাথে বোঝাপড়া আছে আমাদের। কীভাবে কী করবো সেটা জানি না। কিন্তু বাকিটা জীবন নোরা ভয়ে ভয়ে কাটাবে, এটা হতেই পারে না।

নোরা আমাকে আমার ভাইয়ের ব্যাপারেও অনেক কিছু বললো। কীভাবে সুইজারল্যান্ডের ব্যাঙ্কে টাকা ট্রান্সফার করে রেখেছিল সে এখান থেকে পালাবার আগে, কীভাবে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতো শান্তির আশায়-এসব। শিলা রজার্সের ব্যাপারেও অনেক কিছু বললো নোরা। বিষাক্ত অতীত শেষে ছোট মেয়েটাকে লালন পালনের মধ্যেই পাপমোচনের পথ খুঁজে পায় সে। তবে সবচেয়ে বেশি কথা হলো আমার ছোট্ট ভাতিজি কার্লিকে নিয়ে। নোরার মুখ জ্বলজ্বল করছিল ওর ব্যাপারে কথা বলার সময়। বাবার মতোই কার্লিও পাহাড় খুব পছন্দ করে। সুযোগ পেলেই বইয়ে মুখ গুঁজে থাকে। হাসিটা এতটাই ছোঁয়াচে যে একবার হাসতে শুরু করলে নাকি ঘরে উপস্থিত অন্য সবাই আপনা আপনি হেসে ফেলে। প্রথম দিকে নোরার সাথে কথা বলতে লজ্জা পেতো কার্লি। কেইন বা শিলা, কেউই বাইরের মানুষের সাথে তেমন একটা মিশতে দিত না তাকে। তাই নোরাই হয়ে ওঠে কার্লির একমাত্র বন্ধু। যখন সে আমেরিকায় চলে আসে, সবচেয়ে বেশি খারাপ লেগেছিল বাচ্চাটার জন্যেই।

কেটি মিলার নির্দিষ্ট একটা দূরত্ব বজায় রেখেছে আমাদের সাথে। ঐ ঘটনার পরেই ওর বাবা-মাকে বলে কোথায় যেন গেছে সে। আমিও জোর দেইনি জানার জন্যে। তবে প্রায় প্রতিদিনই ফোন দেয়। এখন সত্যটা জানে সে, তবে সেটা খুব একটা কাজে এসেছে বলে মনে হয় না। ঘোস্টকে যতদিন না গ্রেফতার করা হবে, শান্তি পাবে না সে। সত্যি কথা বলতে, আমার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আপনা থেকেই ভিড়ের মধ্যে ঘাড় ঘুরিয়ে কাকে যেন খোঁজা শুরু করি। এই ভয়টা কি আদৌ কখনো দূর হবে?

যাইহোক, আমার জন্যে মোটামুটি সিনেমার 'হ্যাপি এন্ডিং'-ই বলা যায়। শুধু আমার ভাইয়ের সাথে দেখা করতে চাই। নির্জনে, নিভৃতে তার কাটানো সময়গুলোর কথা মনে হতেই খারাপ লাগে। কেইন তো এরকম ছিল না। লোকজনের মাঝে থাকতে পছন্দ করতো সে, আড়ালে নয়।

পুরনো অনেকগুলো কারণে ওর সাথে দেখা করতে চাই আমি। তার সাথে একটা ফুটবল ম্যাচ দেখতে যাবো, আগের দিনের সিনেমাগুলো দেখবো, টেনিস খেলবো। তবে এখন কিছু নতুন কারণও আছে।

যেমনটা বলেছি, তার সাথে কথা হওয়ার ব্যাপারটা চেপে গেছি আমি আর কেটি। এর পেছনে মূল কারণটা হচ্ছে, আমরা চাই ওর সাথে যোগাযোগের পথটা খোলা থাকুক। খুব বেশি ভাবতে হয়নি অবশ্য। *ব্লু অয়স্টার কাল্ট* ব্যান্ডের ভক্তদের একটা নিউজগ্রুপের ঠিকানা রেখে দিয়েছিলাম আগের সেই এলভিস প্রিসলির নিউজগ্রুপটায়। পাশে লিখে রেখেছিলাম '*ডোন্ট ফিয়ার দ্য রিপার*'–কেইনের সবচেয়ে পছন্দের গানের নাম। ওখানেই আইএম এর জন্যে দিনক্ষণ ঠিক করি।

কেইন এখনও খুব বেশি সাবধানী। তবে একজন মানুষ এভাবে আর কতদিন থাকতে পারে? এর অবসান চায় সে-ও। বাবা আর মেলিসার সাথে এখনও নিয়মিত যোগাযোগ হয় আমার, গত এগারো বছর মা-ও আমাদের সাথে ছিল। কেইনের অনুপস্থিতি খুব পীড়া দিয়েছে আমাকে, এটা সত্য। তবে ওর যন্ত্রণার কাছে সেটা কিছুই নয়।

যাইহোক, কিছুটা সময় নিয়ে হলেও এক পর্যায়ে কেইনের সাথে পুনর্মিলনীর ব্যবস্থা করি আমি।

আমার যখন বারো বছর বয়স, কেইনের সাথে ম্যাসাচুসেটসের একটা সামার ক্যাম্পে গিয়েছিলাম। ক্যাম্প মিলস্টোন। ওখানে কেবিনগুলোর নাম ছিল সব বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে। কেইন থাকতো ইয়েলে আর আমি কর্নেলে। সময়টা বেশ ভালো কাটাই দুভাই মিলে। বাস্কেটবল আর সফটবল খেলতাম নিয়মিত। খাবার তেমন একটা সুবিধের না হলেও একদম খারাপও ছিল না। আমাদের কাউন্সিলররাও ছিল মজার মানুষ। তবে এটা নিশ্চিত, আমি আমার বাচ্চাকে কখনো ওরকম সামার ক্যাম্পে পাঠাবো না (এমন অনেক কিছুই হয় যেগুলো শুনলে অভিভাবকরা খুব একটা খুশি হবেন না)।

স্ববিরোধী কথাবার্তা হয়ে গেল বোধহয়।

চার বছর আগে স্কয়ার্সকে ক্যাম্প মিলস্টোনে নিয়ে যাই আমি। বন্ধকীর টাকা দিতে না পারায় ক্যাম্পের জমিটা নিলামে তোলার কথাবার্তা চলছিল তখন। স্কয়ার্স নিজেই জায়গাটা কিনে নিয়ে ইয়োগা রিসোর্ট গড়ে তুলে সেখানে। ক্যাম্পের ফুটবল মাঠটায় নিজের জন্যে একটা ফার্মহাউজও বানায়। সেখানে যাওয়া আসার একটাই রাস্তা আর ফার্মহাউজটা মাঠের মাঝখানে হওয়ায় কেউ সেখানে প্রবেশ করলে আগে থেকেই দেখা যাবে।

কেইনের সাথে দেখা করার জন্যে একদম সঠিক জায়গা।

সিয়াটল থেকে চলে এলো মেলিসা। আমরা একটু বেশি ভয় পাচ্ছিলাম বিধায় ওকে ফিলাডেলফিয়াতে নামতে বলি। আমি, বাবা আর ও দেখা করি নিউ জার্সি টার্নপাইকের ভিন্স লম্বার্দি রেস্ট হাউজে। নোরা, কেটি আর স্কয়ার্স বাদে আর কেউ আমাদের সাক্ষাতের ব্যাপারটা জানে না। তবে ওরা তিনজনও আলাদা আলাদাভাবে এখানে আসবে কালকে। নাহলে আয়োজনটা পূর্ণতা পাবে না।

তবে আজকে রাতটা শুধুই পরিবারের সদস্যদের জন্যে।

গাড়ি চালাচ্ছি আমি। বাবা পাশের প্যাসেঞ্জার সিটে আর মেলিসা পেছনে। কেউই খুব বেশি কথা বলছি না। উত্তেজনায় বুক ধুকপুক করছে তিনজনেরই-তবে আমার সবথেকে বেশি। এখন আর না দেখে কিছু বিশ্বাস করি না আমি। কেইনকে যতক্ষণ নিজের চোখে না দেখবো, জড়িয়ে না ধরবো-বিশ্বাস হবে না যে সে ঠিক আছে।

শিলা আর নোরার ব্যাপারে ভাবলাম। ঘোস্ট আর ফিলিপ ম্যাকগুয়ানকে নিয়েও চিন্তা করলাম বেশ কিছুক্ষণ। ম্যাকগুয়ানের পরিণতি হয়তো অনেকের কাছে আশ্চর্যজনক মনে হয়েছে, তবে সত্যি বলতে আমি খুব একটা অবাক হইনি। এরকমটাই হবার ছিল।

সময় কাটানোর জন্যে ব্রুস স্প্রিংস্টিনের গান ছাড়লাম সিডিতে। তবে খুব বেশি লাভ হলো না। রুট ৯৫-এ মেরামতি চলছে বিধায় শামুকের গতিতে এগোচ্ছে গাড়ি। প্রায় পাঁচঘণ্টা লেগে গেল। অবশেষে লাল রঙের ফার্মহাউজটার সামনে গাড়ি থামালাম আমি। একটা নকল সাইলোও[৪] আছে এখানে। অন্য কোন গাড়ি চোখে পড়লো না। এরকমটাই হবার কথা ছিল। কেইনের আগেই আমরা পৌঁছুবো বলেছিলাম।

প্রথমে মেলিসা গাড়ি থেকে নামলো। দরজা আটকানোর শব্দ প্রতিধ্বনিত হলো মাঠটায়। সিটবেল্ট খুলে বাইরে পা দেয়ার সাথে সাথে পুরনো ফুটবল মাঠটায় দৌড়ে বেড়ানোর স্মৃতি মনে পড়ে গেল। এখন যেখানে গ্যারেজ, সেখানে আগে গোলপোস্ট ছিল। বাবার দিকে তাকিয়ে দেখি সে পকেটে হাত দিয়ে ভাবনায় হারিয়ে গেছে।

কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলাম আমরা। এরপর আমিই নড়লাম প্রথমে। ফার্মহাউজটার দিকে এগোলাম, বাবা আর মেলিসা আসছে পেছন পেছন। তিনজনই মাকে নিয়ে ভাবছি। তারও এখানে থাকার কথা ছিল। ছেলের সাথে আর একটাবার দেখা হওয়ার কথা ছিল। তাহলেই সেই পুরনো হাসিটা ফিরে আসতো আবারো। নোরা মাকে ছবিটা দেখিয়ে ভালো কাজ করেছে। কথাটা মনে হতেই কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো বুক।

---

৪ শস্যাগার

কেইন অবশ্য একাই আসবে। কার্লি নিরাপদ কোথাও আছে এখন, কোথায় সেটা জানি না। আইএমে যোগাযোগের সময় মেয়েটাকে নিয়ে খুব বেশি কথা হতো না। আমাদের সাথে দেখা করে নিজেকে ঝুঁকিতে ফেলতে রাজি কেইন, কিন্তু মেয়েকে ঝুঁকিতে ফেলবে না কোনভাবেই। বুঝেছি আমি ব্যাপারটা।

ঘরের মধ্যেই পায়চারি করতে লাগলাম তিনজন। লিভিংরুমে গ্র্যান্ডফাদার ক্লকটা সময় জানিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। অবশেষে বাবা বসলো। আমার দিকে এগিয়ে এলো মেলিসা। বড় বোন সুলভ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, "দুঃস্বপ্নটার অবসান ঘটতে চলেছে অবশেষে, এরকমটা অনুভব করতে পারছি না কেন আমি?"

এরকম একটা কথা নিয়ে ভেবে সময় কাটানোর কোন ইচ্ছে নেই আমার।

পাঁচ মিনিট পর একটা গাড়ির শব্দ ভেসে এলো বাইরে থেকে।

তিনজনই দৌড়ে গেলাম জানালার কাছে। পর্দা সরিয়ে বাইরে উঁকি দিলাম। সন্ধ্যা নামলেও বাইরে বেশ আলো আছে এখনও। একটা ধূসর রঙের হোন্ডা অ্যাকর্ড থেমেছে বাইরে। সাধারণ দর্শন একটা গাড়ি, ভিড়ে সহজেই মিশে যাবে। হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে গেল আমার। ইচ্ছে করছে দৌড়ে বাইরে যেতে, কিন্তু যেখানে ছিলাম সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

কয়েক সেকেন্ড কিছুই হলো না। এরপর ড্রাইভিং সিটের দরজাটা খুলে গেল হঠাৎ করে। বাবা এত শক্ত করে পর্দা আঁকড়ে আছে যে আরেকটু হলে ছিড়েই যাবে। ধীরে ধীরে কেউ একজন বেরিয়ে এলো বাইরে।

কেইন।

আমাকে দেখে হাসলো ও। সেই পুরনো *কোন-চিন্তা-নেই* মার্কা হাসি। এটুকুই দরকার ছিল আমার জন্যে। খুশিতে বাচ্চাদের মতো লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে ছুট লাগালাম। এক ধাক্কায় খুলে ফেললাম পাল্লাটা। কেইনও আমার দিকে দৌড়ে আসছে। বাড়ির ভেতরে ঢুকে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। একসাথে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছি দুজন, পাগলের মতো হাসছি–সেই ছোটবেলার মতো।

এরপর বাবা ঝাঁপিয়ে পড়লো আমাদের ওপর। মেলিসাও দূরে থাকতে পারলো না। কিছুক্ষণের জন্যে একদম হারিয়ে গেলাম আমরা। কেইনকে ধরে বারবার গালে আর কপালে চুমু খাইছে বাবা, চোখ বেয়ে পানি পড়ছে তার। মেলিসাকে বাচ্চাদের মতো কোলে তুলে নিল কেইন। মেলিসাও শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো তাকে, যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না।

এগারোটা বছর।

কতক্ষণ ওরকম জড়াজড়ি করে থাকলাম আমরা, বলতে পারবো না। এক পর্যায়ে সবাই শান্ত হয়ে কাউচে বসলাম। কেইন আমার কাছাকাছিই আছে।

ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার আমার মাথা ডানহাত দিয়ে জাপটে ধরেছে বক্সারদের মতো। মাথায় চাটি খেতেও যে ভালো লাগতে পারে, তা আগে কখনো বুঝিনি।

"ঘোস্টের সাথে লড়াই করে বেঁচে ফিরেছো তুমি," কেইন বললো। "এখন আর বড় ভাইকে দরকার নেই, কী বলো?"

"না, দরকার আছে," মরিয়া ভঙ্গিতে বললাম।

অন্ধকার নেমে আসলে বাইরে বেরুলাম সবাই। রাতের পরিষ্কার বাতাসে প্রাণ ভরে শ্বাস নিলাম। কেইন আর আমি সামনে সামনে হাঁটছি। মেলিসা আর বাবা ইচ্ছে করেই কিছুটা দূরে আছে এখন। আমাদের মনের কথা বুঝতে পেরেছে নিশ্চয়ই। ক্যাম্পে একবার ফুটবল খেলায় পেনাল্টি মিস করায় হেরে যায় আমাদের দল। অন্যান্য ছেলেরা সেটা নিয়ে ক্ষেপাতে শুরু করে আমাকে। সেদিনও রাতের বেলা এভাবে আমার কাঁধে হাত রেখে হেঁটেছিলো কেইন।

আমাকে সবকিছু খুলে বলতে শুরু করলো ও। বেশিরভাগই আমি যেরকম আন্দাজ করেছিলাম, তার সাথে মিলে গেল। খারাপ কিছু কাজ করে ফেলেছিল ও। এরপর এফবিআইয়ের সাথে হাত মেলায়। অ্যাসেন্টা আর ম্যাকগুয়ান সব ধরতে পারে একসময়।

তবে বাড়ি কেন ফিরে এসেছিল এবং সেই রাতে জুলিদের বাসায় কেন গিয়েছিল এ বিষয়ে সরাসরি কিছু বলছিলো না। কিন্তু এই উত্তরগুলো জানা দরকার আমার, অনেক তো লুকোছাপা হলো। তাই সরাসরিই জিজ্ঞেস করলাম। "তুমি আর জুলি লিভিংস্টোনে ফিরেছিলে কেন?"

একটা সিগারেরটের প্যাকেট বের করলো কেইন।

"সিগারেট খাও এখন?" জিজ্ঞেস করলাম।

"হ্যাঁ, কিন্তু ছেড়ে দেব," বলে আমার দিকে তাকালো সে। "জুলি আর আমি ভেবেছিলাম ওখানে দেখা করাটাই ভালো হবে।"

কেটির বলা কথাগুলো মনে হলো এসময়। কেইনের মতো জুলিও এক বছরের বেশি বাড়ি ফেরেনি। এরপর সে কী বলে তা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছি। একটা সিগারেট হাতে নিয়ে সেটার দিকে তাকিয়ে আছে এখনও।

"সরি," বললো ও।

"সমস্যা নেই।"

"আমি জানতাম যে ওকে তুমি ভুলতে পারোনি, উইল। কিন্তু তখন নেশা করতাম, মাথা ঠিক মতো কাজ করতো না। কিংবা বলতে পারো আসলেও আমি খুব বেশি স্বার্থপর।"

"এখন আর এসবে কিছু যায়-আসে না," বললাম। কথাটা আসলেও সত্য। "কিন্তু একটা জিনিস বুঝদে পারছি না। জুলি এসবে জড়ালো কীভাবে?"

"ও সাহায্য করছিলো আমাকে।"

"কীভাবে?"

সিগারেটটা ধরালো কেইন। ওর চেহারায় বলিরেখার ছাপ স্পষ্ট এখন। তবে এই বয়সের ছাপ সৌন্দর্য যেন আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। চোখের দৃষ্টি অবশ্য এখনও আগের মতো শীতল। "জুলি আর শিলা হেভারটনের কাছে একটা অ্যাপার্টমেন্টে থাকতো। বন্ধু ছিল ওরা," বলে মাথা ঝাঁকালো কেইন। "আসলে জুলিও আমাদের কাজে জড়িয়ে যায়, দোষ আমারই। শিলা হেভারটনে আসার পর ওদের পরিচয় করিয়ে দেই আমি। এক পর্যায়ে ম্যাকগুয়ানের হয়ে কাজ করা শুরু করে ও।"

জানতাম, এরকম কিছু একটাই ঘটেছিল। "মাদক বিক্রির কাজে ওকেও লাগিয়ে দেয় ফিলিপ।"

"হ্যাঁ। কিন্তু যখন আমি ধরা পড়ে যাই, ম্যাকগুয়ানের বিরুদ্ধে প্রমাণ যোগাড়ের জন্যে ভেতরের কারো সাহায্য দরকার ছিল। প্রথমে ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু পরে ভাবি যে কাজটা করলে হয়তো পাপের পথ থেকে ফিরে আসতে পারবো। বুঝেছো?"

"খানিকটা।"

"যাইহোক, আমার ওপর কড়া নজর রাখতো ওরা। কিন্তু জুলিকে কোন সন্দেহ করতো না। সন্দেহ করার কোন কারণই ছিল না। গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাগজপত্র বের করে আনতে আমাকে সহায়তা করে ও। ভিডিও করার পর টেপগুলো ওকে দিয়ে দিতাম। সেজন্যেই আসলে ওই রাতে দেখা করেছিলাম আমরা। যথেষ্ট পরিমাণ প্রমাণ যোগাড় করতে সক্ষম হই দুজন মিলে। এফবিআইয়ের হাতে কোনমতে ওগুলো তুলে দিতে পারলেই কাজ শেষ।"

"বুঝলাম না, তোমাদের কাছে রাখতে কেন টেপগুলো? সাথে সাথে এফবিআইকে দিয়ে দিলেই তো হতো।"

হাসলো কেইন। "পিস্টিলোর সাথে দেখা হয়েছে তোমার?"

মাথা নাড়লাম।

"এখানে একটা কথা তোমাকে বুঝতে হবে, উইল। আমি বলছি না যে সব পুলিশই দুর্নীতিবাজ। কিন্তু তাদের অনেকে আসলেও খুব খারাপ। যেমন ধরো ম্যাকগুয়ানকে তো এফবিআইয়েরই কেউ একজন বলেছে যে আমি নিউ মেক্সিকোতে আছি। তাদের মাঝে অনেকে আবার খুব বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী। আমাকে নিজের দিকটাও তো দেখতে হবে, নাকি? তাই প্রমাণগুলোও নিজের মর্জিমাফিক তাকে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেই।"

যুক্তি আছে ওর কথায়। "কিন্তু ঘোস্ট জেনে যায় যে তুমি কোথায় আছো।"

"হ্যাঁ।"

"কীভাবে?"

বেড়ার কাছাকাছি চলে এসেছি আমরা। পেছনে তাকিয়ে দেখলাম বাবা আর মেলিসা এখনও বেশ কিছুটা দূরে। "সেটা জানি না, উইল। আমি আর ও তখন খুব ভয়ে ভয়ে থাকতাম সবসময়। যাইহোক, কাজ প্রায় গুছিয়ে এনেছিলাম আমরা। জুলির বাসায় যে কোন বিপদ হতে পারে সেটা চিন্তাও করিনি। বেইজমেন্টে ওর কাউচে বসে কথা বলার এক পর্যায়ে ঘনিষ্ঠ হতে শুরু করি দুজন...এরপর..." বলে অন্য দিকে তাকালো ও। অসম্পূর্ণ কথা বুঝে নিলাম।

"এরপর?"

"হঠাৎই কে যেন দড়ি দিয়ে গলা পেঁচিয়ে ধরে আমার," বলে সিগারেটে লম্বা একটা টান দিল কেইন। "তখন জুলির ওপরে ছিলাম আমি। ঘোস্ট চুপচাপ যে ভেতরে ঢুকে এসেছে, সেটা টেরই পাইনি। নিঃশ্বাস নেয়ার জন্যে হাঁসফাঁস করতে শুরু করি। ভেবেছিলাম দড়িটা বুঝি আমার গলা চিড়ে ঢুকে যাবে। এরপর কী ঘটেছিল, তা পরিষ্কার মনে নেই। জুলি নিশ্চয়ই কোনভাবে আঘাত করেছিল ওকে। সেজন্যেই দড়িটা ঢিল হয়। ওর মুখ বরাবর ঘুষি চালিয়ে দেয় ঘোস্ট। আমি কাউচ থেকে উঠে হারামিটার ওপর লাফিয়ে পড়তে যাবো এসময় বন্দুক বের করে গুলি চালিয়ে দেয় সে। আমার কাঁধে লাগে গুলিটা," বলে চোখ বন্ধ করলো কেইন। "পালাই আমি। অন্য কিছু চিন্তা না করে দৌড়ে বেরিয়ে যাই সেখান থেকে।"

ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক কানে আসছে এখন। কেইন আরেকটা সিগারেট ধরিয়েছে। জানি কি ভাবছে। সেদিন ও পালিয়ে যাবার পরেই ঘোস্ট খুন করে জুলিকে।

"একটা বন্দুক ছিল ওর কাছে," বললাম সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে। "তোমার কোন দোষ নেই।"

"বলতে পারো," মুখে বললেও কেইনের চেহারা দেখে মনে হলো না কথাটা মানে সে। "এরপর কী হয়েছিল তা নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছো। শিলা আর কার্লির কাছে পালিয়ে যাই আমি। ম্যাকগুয়ানের সাথে কাজ করার সুবাদে ততদিনে বেশ ভালো পরিমাণ টাকা জমাতে পেরেছিলাম। তিনজন গা ঢাকা দেয়ার কিছুদিন পর পেপার দেখেই চমকে যাই। সেখানে জুলির সন্দেহভাজন খুনি বলে উল্লেখ করা হচ্ছিল আমাকে। বুঝতে পারি যে শুধু ম্যাকগুয়ান বা অ্যাসেন্টা না, পুরো অ্যামেরিকার লোক খুঁজছে আমাকে।

অনেকক্ষণ ধরেই করতে চাওয়া প্রশ্নটা অবশেষে করেই ফেললাম, "তুমি কার্লির ব্যাপারে কিছু বলোনি কেন আমাকে?"

এমনভাবে পেছনে সরে গেল কেইন যেন ওর মুখ বরাবর ঘুষি বসিয়েছি আমি।

"কেইন?"

আমার দিকে তাকাচ্ছে না ইচ্ছে করেই। "আপাতত এই প্রশ্নটা করো না, উইল।"

"না, জানতে চাই আমি," একগুঁয়ে কণ্ঠে বললাম।

"ওরকম গোপনীয় কোন কারণ নেই," একটু অদ্ভুত শোনাচ্ছে এখন ওর কণ্ঠস্বর। আগের আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে একটু একটু করে, তবুও কী যেন নেই সেখানে। "খুব বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ছিলাম আমি। কার্লি জন্মানোর কয়েকদিন আগে এফবিআইয়ের লোকেরা ধরে আমাকে। ভয় পেয়ে যাই, তাই ওর ব্যাপারে কাউকেই কিছু বলিনি। প্রায়ই যেতাম দেখা করতে কিন্তু কখনো ওদের সাথে থাকিনি। কার্লি থাকতো জুলি আর শিলার সাথে। বুঝেছো?"

"হ্যাঁ," বললাম। হাসছে কেইন।

"কী?"

"ক্যাম্পের কথা মনে পড়ছে।"

আমার মুখেও হাসি ফুটলো।

"এখানকার সময়টা দারুণ কাটিয়েছিলাম কিন্তু।"

"হ্যাঁ," বললাম। "কেইন?"

"কী?"

"এত লম্বা সময় কীভাবে লুকিয়ে থাকলে?"

"কার্লি," বলে মৃদু হাসলো ও।

"কার্লি তোমাদের লুকিয়ে থাকতে সাহায্য করেছে?"

"কেউ তো ওর কথা জানতো না। সেজন্যেই বেঁচে গেছি আমি।"

"কীভাবে?"

"সবাই ধরেই নিয়েছিল যে একা পালিয়েছি। বড়জোর আমার সাথে প্রাপ্তবয়স্ক একটা মেয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তিনজনের একটা পরিবারের কথা কারো মাথায় আসেনি।"

সব পরিষ্কার হয়ে গেলো।

"এফবিআইয়ের লোকেরা ভাগ্যজোরে ধরতে পেরেছিল আমাকে। শেষের দিকে বেখেয়ালী হয়ে পড়েছিলাম কিছুটা। কিংবা, মনে মনে হয়তো চাচ্ছিলাম যে এরকম কিছু একটা ঘটুক। সবসময় অচেনা একটা দেশে, অচেনা একদল লোকের মাঝে ভয়ে ভয়ে থাকাটা–খুব বেশি কষ্টের। ক্লান্ত হয়ে উঠেছিলাম। তোমাদের সবার কথা মনে পড়তো, বিশেষ করে তোমার কথা। তাই আর পরোয়া করিনি বোধহয়।"

"তোমাকে ধরে এখানে নিয়ে আসে ওরা।"

"হ্যাঁ।"

"এরপর আবারো চুক্তি করো।"

"ভেবেছিলাম জুলির খুনের দায়ে জেল হয়ে যাবে এবারে, কিন্তু পিস্টিলোর সাথে দেখা হবার পর বুঝলাম এখনও ম্যাকগুয়ানকে ধরার আশা ছাড়েনি সে। জুলিকে নিয়ে আসলে কখনোই অতটা ভাবেনি লোকটা। জানতো যে কাজটা আমি করিনি। তাই..." বলে কাঁধ ঝাঁকালো কেইন।

এরপর নিউ মেক্সিকোর বাসাটায় লুকিয়ে থাকার ব্যাপারে বললো সে। এফবিআইয়ের লোকেরা শিলা বা কার্লির ব্যাপারে কিছু জানতো না। "আমি চাইনি ওরাও এত তাড়াতাড়ি দেশে ফিরুক," নরম স্বরে বললো কেইন। "কিন্তু শিলা আমার কথা শুনতেই চাচ্ছিলো না।"

কেইন বললো কীভাবে কার্লিকে নিয়ে বাসায় ফিরে সে দেখে যে তার এতদিনের সঙ্গীকে তথ্য আদায়ের জন্যে টর্চার করছে ম্যাকগুয়ানের পাঠানো দুই গুন্ডা। তাদের দুজনকেই মেরে শিলা আর কার্লিকে নিয়ে আবারো পালায় কেইন। পথে ফোনবুথ থেকে নোরাকে কল দিয়ে সতর্ক করে দেয়। জানতো যে এফবিআইয়ের লোকেরা শিলার আঙুলের ছাপ খুঁজে পাবে বাসাটায়। আর এফবিআই যদি খুঁজে না-ও পায়, ম্যাকগুয়ান ঠিকই পিছু নেবে। তাই পরিস্থিতি ঠান্ডা হওয়া অবধি লুকিয়ে পড়তে বলে তাকে।

মুখ বন্ধ রাখবে এরকম একজন ডাক্তার খুঁজে পেতে দুইদিন লেগে যায় তার। কিন্তু লাস ভেগাসের সেই ডাক্তারও খুব একটা সাহায্য করতে পারেনি। শিলা রজার্স, ওর এগারো বছরের প্রেমিকা, মারা যায় পরদিন। মা যখন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তখন গাড়িতেই ঘুমিয়ে ছিল কার্লি। প্রথমে কেইন বোঝেনি যে লাশটা নিয়ে কী করবে। পরে নোরাকে বিপদ থেকে মুক্তি দেয়ার কথা ভেবে রাস্তার পাশে ভালোবাসার মানুষটাকে শুইয়ে রেখে চলে যায়।

মেলিসা আর বাবা আমাদের বেশ কাছাকাছি চলে এসেছে এতক্ষণে।

"এরপর কী হলো?" ক্ষীনস্বরে জানতে চাইলাম।

"কার্লিকে শিলার এক বন্ধুর জিম্মায় রেখে এদিকে আসার পরিকল্পনা করি।"

কেইন কথাটা বলা মাত্র আমার মনে হতে লাগলো যে কী যেন একটা মিলছে না। এরকমটা কখনো হয়েছে আপনাদের সাথে? ধরুন মনোযোগ দিয়ে কারো কথা শুনছেন, মাথা নাড়ছেন। খুঁটিনাটি সবকিছু মিলেও যাচ্ছে। কিন্তু খুব সাধারণ একটা তথ্যের কারণে হঠাৎ করেই অস্বস্তিবোধ করতে শুরু করবেন ভেতরে ভেতরে। এরপরেই বুঝতে পারবেন যে কোথাও একটা বড়সড় ভুল হয়ে গেছে।

"মায়ের শেষকৃত্য হয় মঙ্গলবারে," বলি আমি।

"কী?"

"মায়ের শেষকৃত্য হয় মঙ্গলবারে," আবারো বললাম।

"আচ্ছা," কেইন বললো খানিকটা বিভ্রান্ত স্বরে।

"তুমি তো তাহলে সেদিন লাস ভেগাসে ছিল?"

"হ্যাঁ," কিছুক্ষণ ভেবে জবাব দিল সে।

চোখ বন্ধ করে মাথায় হিসেব করলাম আবারো।

"কী হয়েছে?" কেইন জিজ্ঞেস করলো।

"একটা ব্যাপার মিলছে না।"

"কী?"

"শেষকৃত্যের দিন বিকেল বেলা–" ওর আমার দিকে তাকানো অবধি অপেক্ষা করলাম। "–কেটি মিলারের সাথে কবরস্থানে দেখা হয়েছিল তোমার।"

বিভ্রান্তি আরো গাঢ় হলো কেইনের চেহারায়। "কী বলছো আবোল তাবোল?"

"কেটি তোমাকে কবরস্থানে দেখেছিল। জুলির কবরের পাশে একটা গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলে। এরপর কেটিকে বলো যে তুমি নিরপরাধ। আসল খুনিকে খুঁজে বের করবে। তুমি যদি দেশের অন্য প্রান্তে থেকে থাকো তাহলে এটা কী করে সম্ভব?"

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো আমার ভাই। খারাপ কিছু একটা ঘটতে চলেছে, এটা ভাবতে না ভাবতেই একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

"মিথ্যে বলেছিলাম আমি।"

একটা গাছের পেছন থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো কেটি। হাতে উদ্যত বন্দুক, কেইনের দিকে তাক করে রেখেছে। মেলিসা আঁতকে উঠলো। "না!" বলে বাবাকে চিৎকার করতে শুনলাম। কেটি আমার দিকে তাকিয়ে আছে এখন, যেন কিছু একটা বলতে চাচ্ছে চোখ দিয়ে।

মাথা ঝাঁকালাম।

"তখন আমার বয়স ছিল ছয় বছর," কেটি বললো। "সাক্ষী হিসেবে কেউ পাত্তাই দেয়নি। আমার কী-ই বা বলার থাকতে পারে? ছোট বাচ্চা একটা। তোমার ভাইকে সেই রাতে দেখেছিলাম আমি, উইল। সেই সাথে জন অ্যাসেন্টাকেও দেখেছিলাম। পুলিশের লোকেরা হয়তো বলবে তাদের দুজনকে গুলিয়ে ফেলি আমি। জুলির লাশ বুকে চেপে ধরে কে কাঁদছিলো, সেটাও ছয় বছরের একটা বাচ্চার পক্ষে ঠিক করে বলা সম্ভব না। বিশেষ করে নিজের বোনকে খুন হতে দেখার পর। আমার বলা কথাগুলো তাই নিজেদের মতো করে সাজিয়ে নেয় পিস্টিলো আর তার লোকেরা। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল ম্যাকগুয়ানকে ধরা। আর আমার বোন–মফস্বলের বখে যাওয়া নেশাখোর এক তরুণী।"

"কী বলছো এসব?"

কেইনের দিকে ঘুরে গেল ওর দৃষ্টি। "সে রাতে ওখানে ছিলাম আমি, উইল। বাবার পুরনো আর্মি ট্রাঙ্কের পেছনে। সব নিজের চোখে দেখেছি,"

বলে আবারো আমার দিকে তাকালো কেটি। সন্দেহ বা বিভ্রান্তির কোন ছাপ নেই দৃষ্টিতে।

"জন অ্যাসেন্টা খুন করেনি আমার বোনকে," বললো ও। "কেইন করেছে।"

আবারো পাগলের মতো মাথা ঝাঁকাতে লাগলাম। এসব কী বলছে মেয়েটা? মেলিসার দিকে তাকালাম, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে তার চেহারা। বাবা মাথা নিচু করে আছে।

"তুমি আমাদের একসাথে কাউচে দেখেছিলে," কেইন বললো।

"না," একটুও কাঁপছে না কেটির গলা। "তুমি খুন করেছো ওকে, কেইন। ইচ্ছেকৃতভাবে শ্বাসরোধ করে মেরেছিলে যাতে দোষটা ঘোস্টের ওপর গিয়ে পড়ে। লরা এমারসনকেও ঠিক ওভাবেই মেরেছিলে। মাদক ব্যবসার ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছিল মেয়েটা।"

এক পা সামনে এগোলাম। কেটি আমার দিকে তাকাতেই থেমে গেলাম ওখানেই।

"ম্যাকগুয়ান নিউ মেক্সিকোতে কেইনকে হত্যা করতে ব্যর্থ হলে আমার সাথে যোগাযোগ করে অ্যাসেন্টা," এবারে আসল গল্পটা বলা শুরু করলো কেটি। বলার ধরন শুনে মনে হচ্ছে এজন্যে প্রস্তুতি নিয়েই এসেছে সে। "তার কাছেই জানতে পারি কীভাবে তোমার ভাইকে সুইডেন থেকে গ্রেফতার করে এখানে নিয়ে আসে এফবিআই। শুরুতে বিশ্বাস হয়নি। কারণ, কেইন ধরা পড়লে আমরা জানবো না কেন? তখন শুনলাম কেইনের ব্যাপারে কাউকে কিচ্ছু জানানো হয়নি কারণ এফবিআই ম্যাকগুয়ানকে ধরতে চায় এখনও। আর সেই কাজে কেইন তাদের সাহায্য করতে পারবে। নিজের কানে শুনেও বিশ্বাস করতে পারিনি কথাটা। আমার বোনের খুনি আবারো এভাবে মুক্তি পেয়ে যাবে? সেটা তো হতে দিতে পারি না। এতগুলো বছর আমাদের পরিবারকে কেমন সময় কাটাতে হয়েছে তা তো নিজের চোখে দেখেছি। অ্যাসেন্টাও জানতো সেটা। সেজন্যেই যোগাযোগ করেছিলো।"

এখনও মাথা ঝাঁকাচ্ছি, কিন্তু কেটি থামলো না।

"আমার কাজ ছিল তোমার কাছাকাছি থাকা, কারণ আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে কেইন যদি কারো সাথে যোগাযোগ করে, সেটা হবে তুমি। সেজন্যেই কবরস্থানে তার সাথে দেখা হবার গল্পটা বানিয়ে বলি, যেন তুমি আমাকে বিশ্বাস করো।"

"কিন্তু তোমাকে তো আমার অ্যাপার্টমেন্টে মেরে ফেলার চেষ্টা করে," বললাম।

"হ্যাঁ।"

"তখন অ্যাসেন্টার নাম ধরে চিৎকারও করেছিলে।"

"ঠান্ডা মাথায় একটু ভেবে দেখো, উইল," আত্মবিশ্বাসের কোন ঘাটতি নেই কেটির কণ্ঠে।

"কী ভাববো?" জিজ্ঞেস করলাম।

"তোমাকে বিছানার সাথে ওভাবে আটকে রাখা হয়েছিল কেন?"

"কারণ আমাকে ফাঁসিয়ে দিতে চেয়েছিল, ঠিক যেভাবে–"

হাত উঁচিয়ে আমাকে থামিয়ে দিল কেটি। এখন সে মাথা ঝাঁকাচ্ছে। "তোমাকে আটকে রেখেছিল, যাতে দুর্ঘটনাবশত কোন ব্যাথা না পাও।"

মুখ খুললাম, কিন্তু কোন শব্দ বেরুলো না।

"আমাকে একা দরকার ছিল ওর। মেরে ফেলার আগে এটা জানতে হতো যে তোমাকে কতটা বলেছি। আর হ্যাঁ, জনের নাম ধরে চেঁচিয়েছিলাম সে-রাতে। তবে সেটা তাকে থামতে বলার জন্যে নয়, সাহায্যের আশায়। তুমি আসলেও আমার জীবন বাঁচিয়েছ, উইল। নাহলে ও আমাকে মেরেই ফেলতো।"

কেইনের দিকে তাকালাম।

"মিথ্যে বলছে ও," কেইন বললো। "জুলিকে কেন খুন করবো আমি? আমাকে তো সাহায্য করছিল সে।"

"কথাটা আংশিক সত্য," কেটি বললো। "জুলি আসলেও ম্যাকগুয়ানকে ধরিয়ে দিয়ে আবারো স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে চেয়েছিল। সেজন্যে কেইনকে সাহায্যও করে। কিন্তু তোমার ভাই বরাবরই একটু বেশি সাবধানী।"

"মানে?"

"কেইন জানতো যে ঘোস্টের মুখও বন্ধ করাতে হবে। আর সেটার একমাত্র উপায় হচ্ছে লরা এমারসনের খুনের ঘটনায় তাকে ফাঁসানো। ভেবেছিল জুলিও হয়তো মেনে নিবে ব্যাপারটা। কিন্তু এখানেই ভুলটা করে। তুমি তো জানো যে জুলি আর ঘোস্ট কতটা ঘনিষ্ঠ ছিল?"

কোনমতে মাথা নাড়লাম।

"এই ঘনিষ্ঠতার কারণ আমি নিজেও জানি না। ওরা দুজনও জানতো নাকি সন্দেহ। কিন্তু জুলি আসলেও ঘোস্টকে নিয়ে চিন্তা করতো। সত্যি কথা বলতে গোটা দুনিয়ায় একমাত্র তারই ভরসা ছিল ঘোস্টের প্রতি। ম্যাকগুয়ানকে ধরিয়ে দিতে তার কোন সমস্যা নেই, কিন্তু অ্যাসেন্টার ক্ষতি হয় এমন কিছু কখনোই করবে না।"

মুখের ভাষা হারিয়েছি আমি।

"গাঁজাখুরি কথাবার্তা," কেইন বললো। "উইল?"

এবারে ওর দিকে তাকালাম না।

"কেইনের উদ্দেশ্য টের পেয়ে অ্যাসেন্টাকে সাবধান করে দেয় জুলি," কেটি বললো। "কেইন সেরাতে আমাদের বাসায় এসেছিল প্রমাণগুলো নিয়ে

যেতে। জুলি ইচ্ছে করে দেরি করায় তাকে। এরপর কেইন যখন তার কাছে টেপগুলো চায়, দিতে অস্বীকৃতি জানায় সে। কেইন বারবার জিজ্ঞেস করে যে ওগুলো কোথায় লুকিয়েছে, কিন্তু মুখে কুলুপ আটে জুলি। ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে সেখানেই তখন তাকে খুন করে কেইন। ঘোস্টের পৌছুতে দেরি হয়ে যায়। গুলি চালায় সে, কিন্তু লাভ হয় না। পিছুও নিত, কিন্তু জুলিকে ওভাবে পড়ে থাকতে দেখে থেমে যায়। ওর নিথর দেহটা কোলে তুলে নেয়...বিশ্বাস করো, ওভাবে চিৎকার করে কখনো কাউকে কাঁদতে দেখিনি আমি।"

কেটি সামনে এগিয়ে এসেছে কথা বলতে বলতে। এখনও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

"কেইন ম্যাকগুয়ান বা অ্যাসেন্টার ভয়ে পালায়নি, উইল। পিস্টিলো তাকে ফাঁসিয়ে দেবে, এই ভয়েও না," কেটি বললো। "জুলিকে আসলেও খুন করেছিলো ও সেই রাতে, সেটাই পালানোর মূল কারণ।"

মনে হচ্ছে পাহাড়ি গভীর একটা খাদের কিনারায় দাঁড়িয়ে নিচের খরস্রোতা নদীতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হয়েছে আমাকে। তবুও খড়কুটো ধরে ভেসে থাকার শেষ চেষ্টা চালালাম। "কিন্তু ঘোস্ট তো কিডন্যাপ করে আমাদের..."

"ওটা সাজানো ছিল। ইচ্ছে করেই আমাদের পালাতে দিয়েছিল ও সেদিন। তবে আমরা কেউই ভাবিনি যে তুমি আসলেও এত তাড়াতাড়ি পালানোর চেষ্টা করবে। ড্রাইভারকে বলা হয়েছিল যাতে তোমার কোন সন্দেহ না হয়। তাকে যে ওভাবে আহত করবে তুমি, তা ঘোস্ট কল্পনাও করেনি।"

"কিন্তু কেন?"

"কারণ ঘোস্ট সত্যটা জানতো।"

"কোন সত্যের কথা বলছো?"

"এটাই যে শুধুমাত্র তোমার জীবন বাঁচানোর জন্যে কখনোই নিজেকে বিপদে ফেলবে না কেইন," বলে কেইনের দিকে আরেকটু এগোলো কেটি। "এরকম পরিস্থিতি ছাড়া কখনোই তোমার সাথে দেখা করতে রাজি হবে না।"

আবারো মাথা ঝাঁকালাম।

"সেদিন ইয়ার্ডে আমাদের হয়ে একজন অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল, উইল। কেউ আসেনি।"

মাতালের মতো পেছনে সরে আসলাম। মেলিসা আর বাবার দিকে তাকাতেই সব পরিষ্কার হয়ে গেল। কেটির বলা কথাগুলো সব সত্য।

জুলিকে আসলেও খুন করেছে কেইন।

"তোমাকে কোন প্রকার কষ্ট দেয়ার ইচ্ছে ছিল না আমার," কেটি বললো। "কিন্তু আমার পরিবারের ন্যায়বিচার পাবার অধিকার আছে।

এফবিআই ওকে ছেড়ে দিত। কী করতাম তখন, বলো? আমার বোনের খুনি এভাবে বারবার ছাড়া পেয়ে যাবে?"

"তাহলে এখন তুমি কী করবে কেটি?" এই প্রথমবারের মতো কিছু একটা বললো বাবা। "ওকে গুলি করবে?"

"হ্যাঁ," নির্দ্বিধায় বললো কেটি।

নরক গুলজার শুরু হয়ে গেল পরমুহূর্তে।

প্রথম ঝড়টা বাবার ওপর দিয়ে গেল। চিৎকার করে কেটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হলো সে। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে ট্রিগার টেনে দিল মেয়েটা। তবে থামলো না বাবা, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সামনে এগিয়ে ওর হাত থেকে বন্দুকটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। পরমুহূর্তেই পা চেপে ধরে বসে পড়লো।

কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে ইতোমধ্যে।

চোখ তুলে দেখি কেইন ওর বন্দুকটা বের করে এনেছে। তার বরফ শীতল দৃষ্টি এখন কেটির ওপর নিবদ্ধ। যে কোন মুহূর্তে গুলি করে দেবে। কোন প্রকার দ্বিধা বা অনুতাপের ছাপ নেই চেহারায়।

ট্রিগারে হাত দিতেই লাফিয়ে ওর ওপর গিয়ে পড়লাম আমি। একদম শেষমুহূর্তে নিশানা চুকে গেল। কেটির দশহাত ওপর দিয়ে বাতাস কেটে চলে গেল গুলিটা। কেইনকে সাথে নিয়ে আবারো নিচে পড়ে গেছি আমি। তবে এবারের পরিস্থিতির সাথে কিছুক্ষণ আগের মাটিতে গড়াগড়ি খাওয়ার কোন তুলনাই চলে না। কনুই দিয়ে আমার পেটে সর্বশক্তিতে আঘাত করলো সে। দম আটকে গেল প্রায়। উঠে আবারো কেটির দিকে বন্দুক তাক করলো কেইন।

"না," বললাম আমি।

"কাজটা করতেই হবে আমাকে।"

আবারো ধাক্কা দিলাম সর্বশক্তিকে। ধস্তাধস্তির মাঝেই কেটিকে বললাম পালাতে। মনোযোগের এই সামান্য বিচ্যুতির সুযোগ নিয়ে আমার ওপরে চড়ে বসলো কেইন। চোখ রাখলো আমার চোখে।

"ওর মুখ বন্ধ হলেই আর কোন ভয় নেই আমার," বললো শান্তকণ্ঠে।

"আর কাউকে খুন করতে দেবো না আমি তোমাকে।"

এবারে বন্দুকের নলটা আমার কপালে ঠেকালো কেইন। আমাদের চেহারার দূরত্ব বড় জোড় দুই ইঞ্চি। মেলিসার চিৎকার কানে এলো। হাত দিয়ে ইশারা করলাম ওকে দূরে থাকতে। মোবাইল ফোন বের করে কাকে যেন ফোন দিচ্ছে সে।

"ট্রিগার টানছো না কেন?" জিজ্ঞেস করলাম।

"তোমার কি মনে হয়, আমি ট্রিগার টানবো না?"

"তুমি আমার ভাই।"

"তো?"

আসলে ঠিকই বলে সবাই। শয়তান কখনো ভালো হয় না।

"কেটির কথাগুলো তোমার কানে যায়নি? এখনও বুঝতে পারোনি আমি কতটা বিপজ্জনক? কতজন মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি।"

"আমার সাথে তো করোনি।"

হেসে উঠলো কেইন। এখনও আগের অবস্থানেই আছে। বন্দুকটা চেপে রেখেছে আমার কপালে। "কী বললে?"

"আমার সাথে তো বিশ্বাসঘাতকতা করোনি।"

এবারে কেইনের হাসিটা উন্মাদের মতো শোনাচ্ছে। পুরো মাঠে অনুরণিত হচ্ছে শব্দটা। এই গরমেও ভীষণ শীত লাগছে আমার কেন যেন। "তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি?" আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে বললো। "আমার জীবনের সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতাটা তোমার সাথেই করেছি, উইল।"

মনে হলো একটা চলন্ত ট্রাকের সাথে বাড়ি খেয়েছি। চোখমুখ শক্ত হয়ে উঠলো ওর। যে কোন মুহূর্তে ট্রিগার টেনে দিবে। চোখ বুজে অপেক্ষা করতে লাগলাম। অনেক দূর থেকে হট্টগোলের শব্দ ভেসে আসছে। তবে সেসব ছাপিয়ে কানে বাজছে একটা কান্নার শব্দ। কেইন কাঁদছে। চোখ খুললাম। মনে হচ্ছে পুরো পৃথিবীতে একমাত্র আমি আর ও-ই আছি।

জানি না কেন ও গুলি করেনি। সবসময়ের মতো এবারেও আমি মাটিতে অসহায়ের মতো পড়ে আছি দেখে? কিন্তু এবার তো আমার এই অবস্থানের জন্যে দায়ী সে নিজেই। বড় ভাইয়ের মমতা থেকে গুলি করেনি? যেই মমতার জন্যে ছোটবেলায় সবসময় অন্যদের হাত থেকে রক্ষা করেছে আমাকে? জানি না।

আমাকে শক্ত করে চেপে ধরে রাখা হাতটায় অনেকটাই ঢিল দিয়েছে কেইন। "আমাকে একটা কথা দাও, উইল," বললো ও।

"কী?"

"কার্লির ব্যাপারে।"

"তোমার মেয়ে।"

চোখ বন্ধ করে ফেললো কেইন। ওর চেহারায় এখন যে যন্ত্রণার ছাপ দেখতে পাচ্ছি, তাতে কোন ভেজাল নেই। "নোরাকে খুব পছন্দ করে কার্লি। আমি চাই তোমরা দুজন মিলে ওকে বড় করবে। কথা দাও?"

"কিন্তু শিলার-"

"প্লিজ," মরিয়া স্বরে বললো কেইন। "প্লিজ কথা দাও।"

"ঠিক আছে।"

"আর কথা দাও ওকে কখনো আমার সাথে দেখা করাতে নিয়ে আসবে না।"

"কী?"

এখন অঝোরে কাঁদছে কেইন। চোখের পানি নাকের পানি এক হবার যোগাড়। "কথা দাও! ওকে কখনো আমার ব্যাপারে কিছু বলবে না। নিজের মেয়ে হিসেব বড় করবে। আমি যে জেলে আছি, এই ব্যাপারে কিছু বলবে না। কথা দাও উইল, কথা দাও। নাহলে গুলি করবো।"

"বন্দুকটা আগে আমার হাতে দাও," বললাম। "তাহলে তোমার সব কথাই শুনবো।"

আমার দিকে তাকালো কেইন। এরপর বন্দুকটা হাতে তুলে দিয়ে কপালে লম্বা একটা চুমু খেল। আবারো জড়িয়ে ধরলাম ওকে। আমার ভাই, জুলির খুনি। বাচ্চাদের মতো কাঁদছে এখন। লম্বা একটা সময় ওভাবেই ছিলাম। সাইরেনের শব্দ ভেসে এলো।

ওকে সরিয়ে দিতে চাইলাম। "যাও," ফিসফিসিয়ে বললাম। "পালাও।"

কিন্তু কেইন নড়লো না। এবারে আর কোথাও যাবে না সে। কেন? সেটা বলতে পারবো না। হয়তো এই পাপের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে তাকে। কিংবা আমার আলিঙ্গনে জীবনে প্রথমবারের মতো নিজেকে নিরাপদ অনুভব করছিল সে। পুলিশের লোকেরা এসে ওকে সরিয়ে নেয়ার আগ পর্যন্ত ওভাবেই থাকলাম দুই ভাই।

আটান্ন
চার দিন পর

ঠিক সময় মতোই ছেড়েছে কার্লির প্লেন।

স্কয়ার্স লিফট দিয়েছে আমাকে আর নোরাকে। এয়ারপোর্টের সি টার্মিনালের দিকে হাঁটছি এখন আমরা তিনজন। নোরা আমাদের চেয়ে বেশ খানিকটা সামনে এগিয়ে গেছে। কার্লিকে দেখার জন্যে তর সইছে না ওর। আমার কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে।

"ওয়ান্ডার সাথে কথা হয়েছে আমার," স্কয়ার্স বললো।

ওর দিকে তাকালাম।

"সব খুলে বলেছি ওকে।"

"এরপর?"

থেমে কাঁধ ঝাঁকালো স্কয়ার্স। "আমরা দুজনেই হঠাৎ করে বাবা হতে যাচ্ছি।"

জড়িয়ে ধরলাম ওকে। খুব বেশি খুশি হয়েছি আসলেই। তবে আমার নিজের অবস্থা সুবিধের না। বারো বছরের একটা মেয়েকে বড় করে তোলার দায়িত্ব এসে পড়েছে আমার কাঁধে, যাকে এর আগে কখনো দেখিনি। নিজের সর্বোচ্চটা দিয়ে চেষ্টা করবো, স্কয়ার্স ভুল বলেনি, কিন্তু কখনো কার্লির আসল বাবা হতে পারবো না। কেইনকে যে বাকি জীবনটা জেলে কাটাতে হবে, সেটা একরকম মেনে নিয়েছি সবাই। তবে নিজের মেয়ের সাথে ওর কখনো দেখা না করতে চাওয়ার ব্যাপারটা পীড়া দিচ্ছে আমাকে। হয়তো মেয়ের ভালোর জন্যেই এই অনুরোধ করেছে সে। ভাবছে, তার সংস্পর্শে এলে কার্লিও হয়তো একই পথ বেছে নিবে।

'*হয়তো*' বলছি কারণ ওকে সরাসরি প্রশ্নটা করা সম্ভব হবে না আমার পক্ষে। গ্রেফতার হবার পরে আমার সাথেও দেখা করার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জানিয়েছে সে। জানি না কেন, কিন্তু সেদিন ওর ফিসফিসিয়ে বলা কথাগুলো ভুলতে পারিনি এক মুহূর্তের জন্যেও...

আমার জীবনের সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা তোমার সাথেই করেছি, উইল।

সেদিন থেকে বারবার মাথার ভেতরে বেজেই চলেছে কথাটা।

স্কয়ার্স আর ভেতরে আসলো না আমাদের সাথে। নোরাকে নিয়ে আমি টার্মিনালে পা রাখলাম। এনগেজমেন্টের আঙটিটা শোভা পাচ্ছে ওর হাতে। বেশি তাড়াতাড়ি চলে এসেছি আমরা। ইনকামিং গেটটা দেখে দ্রুত করিডোর বেয়ে এগিয়ে গেলাম। নোরা ওর পার্সটা এক্সরে মেশিনের বেল্টে নামিয়ে রাখলো। আমার হাতে ঘড়িটার কারণে মেটাল ডিটেক্টর বেজে উঠলেও সেরকম কোন সমস্যা হলো না। গেটের দিকে দৌড়ে গেলাম, যদিও প্লেনটা ল্যান্ড করতে এখনও প্রায় পনেরো মিনিটের মতো সময় লাগবে।

ওয়েটিং জোনে হাত ধরাধরি করে বসে পড়লাম আমি আর নোরা (সেদিনের পর থেকে কেউ কাউকে ছাড়তেই চাইছি না এক মুহূর্তের জন্যে)। মেলিসা থেকে গিয়েছে। বাবার খেয়াল রাখছে বাসায়। ভন স্টার্নোই একমাত্র গণমাধ্যম কর্মী যাকে সবকিছু বলেছি আমি। জানি না এই প্রতিবেদন তার ক্যারিয়ারের মোড় ঘুরিয়ে দেবে কিনা। দিলে ভালো। এখনও এডনা রজার্সের সাথে যোগাযোগ করিনি। করবো শিগগির।

কেটির বিরুদ্ধে কেউ কোন অভিযোগ করেনি। বারো বছর ওরকম একটা ব্যাপার নিজের মধ্যে চেপে রাখলে কারো মানসিক অবস্থা কীরকম হবে, তা নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন।

হয়তো কেইনের গ্রেফতার হওয়াতে কিছুটা হলেও শান্তি পেয়েছে সে।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ইন চার্জ জোসেফ পিস্টিলো ঘোষণা দিয়েছেন যে বছর শেষে অবসর গ্রহণ করবেন। কেটি মিলারকে কেন এসব থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলেন তিনি, সেটাও এখন একদম স্পষ্ট। ওর নিরাপত্তা নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা ছিল না তার, বরং খুনের রাতে কেটি যা দেখেছিল, তা গোপন রাখাই ছিল মূল উদ্দেশ্যে। কেটির জবানবন্দী নিয়ে এজন্যেই এগারো বছর ধরে এত রাখঢাক করে আসছে এফবিআই।

কেইন আসলে কি করেছিল, এটা জানার পর সত্যিই ভীষণ কষ্ট পেয়েছি। তবে মিথ্যে স্বান্তনার চেয়ে তেতো সত্যই বেশি উপাদেয়। বাকি জীবন আর কোন মিথ্যে আশ্বাস দিতে হবেনা নিজেকে।

নোরা ঝুঁকে এলো আমার দিকে। "তুমি ঠিক আছো?"

"একটু ভয় লাগছে," বললাম।

"আই লাভ ইউ," এই নিজে হাজারতম বার বললো গত চারদিনে। "কার্লিও খুব পছন্দ করবে তোমাকে, দেখো।"

নিয়মিত বিরতিতে অ্যারাইভাল মনিটরে চোখ রাখছি আমরা। কিছুক্ষণ পর ৬৭২ লেখাটা ফুটে উঠলো ওখানে। কন্টিনেন্টাল এয়ারলাইন্সের গেটকিপার মাইক্রোফোনে ঘোষণা করলো ৬৭২ নং ফ্লাইটের অবতরণের কথা। এই ফ্লাইটেই আছে কার্লি। নোরার দিকে ফিরলাম। আমার হাতে আলতো করে একবার চাপ দিল সে।

কী মনে করে একবার অপেক্ষারত যাত্রীদের দিকে তাকালাম। স্যুট পরা ব্যবসায়ী, সাথে করে বড় ক্যারি-অন নিয়ে আসা বয়স্ক মহিলা, ছুটি কাটাতে যাওয়া স্বামী-স্ত্রী–নানা রকম মানুষের সমাহার। আনমনে তাদের দেখছি এসময় হঠাৎ থমকে গেলাম। একটা লোক শীতল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

ঘোস্ট।

কেঁপে উঠলো পুরো শরীর।

"কী হয়েছে?" জিজ্ঞেস করলো নোরা।

"কিছু না," বললাম।

ইশারায় আমাকে ডাকলো ঘোস্ট। উঠে দাঁড়ালাম।

"কোথায় যাচ্ছো?"

"আসছি এখনই।"

"কিন্তু ও এসে পড়বে তো!"

"বাথরুমে যাবো আর আসবো।"

নোরার কপালে চুমু খেলাম একবার। চেহারায় দুশ্চিন্তা ভর করেছে ওর। গেইটের দিকে তাকালো। কিন্তু ঘোস্ট কেটে পড়েছে। আসলে আমার না গিয়ে উপায় নেই। নতুবা জন নিজেই খুঁজে নেবে আমাকে।

এর চেয়ে এখানেই ওর মুখোমুখি হওয়া ভালো।

ও যেখানটায় ছিল সেদিকে হাঁটতে শুরু করলাম। পা কাঁপছে, তবে থামলাম না এক মুহূর্তের জন্যেও। সারি সারি পে-ফোনের সামনে দিয়ে যাচ্ছি, এসময় ওর কণ্ঠ কানে এলো।

"উইল?"

ঘুরে দাঁড়াতেই দেখলাম ওকে। পাশে বসার ইশারা করলো। এখন আমরা দুজনেই রানওয়ের কাঁচের দেয়ালটার সামনে বসে আছি।

"তোমার ভাইয়ের জন্যে ফিরে আসিনি আমি," ঘোস্ট বললো। "কার্লির জন্যে এসেছি।"

"ওকে ছুঁতেও পারবে না তুমি," দৃঢ় স্বরে বললাম।

"তুমি বুঝতে পারছো না," হাসলো ঘোস্ট।

"তাহলে বোঝাও।"

আমার দিকে কিছুটা সরে এলো ঘোস্ট। "তুমি সবসময় মানুষকে খারাপ বা ভালো—এই দুইভাগে ভাগ করতে চাও, উইল। ব্যাপারটা এত সহজ নয়। মানুষের মনের চেয়ে জটিল কিছুই নেই পৃথিবীতে। যেমন ধরো ঘৃণার সৃষ্টি কিন্তু ভালোবাসা থেকেই। আদিম ভালোবাসা।"

"তোমার কথার মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না।"

"তোমার বাবা," বললো ও। "কেইনকে খুব বেশি ভালোবাসতো। কেইনের আজকের এই অবস্থার জন্যে যদি কোনকিছুকে দায়ীকে করতে বলো, তাহলে আমি তার ওই ভালোবাসাকেই দায়ী করবো।"

"এখনও বুঝছি না।"

"তোমাকে এখন যা বলবো আমি, সেটা এর আগে কেবল একজনকে বলেছিলাম। বুঝেছো?"

মাথা নেড়ে বললাম বুঝেছি।

"তখন আমি আর কেইন ফোর্থ গ্রেডে ছিলাম," বললো ঘোস্ট। "আসলে ড্যানিয়েল স্কিনারের বুকে আমি ছুরি চালাইনি, কাজটা করেছিলো কেইন। কিন্তু তোমার বাবা ওকে এতটাই ভালোবাসতো...মানতেই পারেননি ব্যাপারটা। যেকোন মূল্যে বড় ছেলেকে বাঁচানোটাই তার কাছে ছিল মুখ্য। আমার বাবার সাথে দেখা করে তাকে পাঁচ হাজার ডলার দেন তোমার বাবা। বিশ্বাস করো, তোমার বাবার ধারণা ছিল যে তিনি ঠিক কাজটাই করছেন। আমার বাবা তো প্রায় প্রতিদিনই মারতো আমাকে। সবাই এক প্রকার ধরেই নিয়েছিল, আগে হোক বা পরে—সরকার থেকে পালক বাবা-মায়ের ব্যবস্থা করা হবে আমার জন্যে। যাইহোক, তোমার বাবা জানতো আত্মরক্ষার অজুহাতে বেঁচে যাবো আমি, বড়জোর সংশোধন কেন্দ্রে পাঠানো হবে।"

মুখে রা সরছে না আমার। লিটল লিগের মাঠে কিছুদিন আগে আমাদের তিনজনের দেখা হবার ঘটনাটা নিয়ে ভাবলাম। প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিল বাবা সেদিন। "কাউকে মারতে চাইলে, আমাকে মারো"—অ্যাসেন্টাকে বলেছিল সে। আবারো সবকিছু খাপে খাপে মিলে যাচ্ছে।

"সত্যটা কেবলমাত্র একজনকেই বলেছিলাম আমি," ঘোস্ট বললো। "বলো দেখি কাকে?"

"জুলি," ওদের আপাত অদ্ভুত সম্পর্কটাও জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল।

"তাহলে এখানে এসেছো কেন তুমি?" জিজ্ঞেস করলাম। "কেইনের মেয়ের ওপরে প্রতিশোধ নিতে?"

"না," হেসে মাথা নাড়লো ঘোস্ট। "ঘটনাটা মুখে ব্যাখা করা কঠিন, উইল। সেজন্যেই বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছি আমি।"

আমার হাতে একটা ফাইল তুলে দিল ঘোস্ট। "খোলো।"

খুললাম।

"এটা হচ্ছে কিছুদিন আগে মারা যাওয়া শিলা রজার্সের ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন," সে বললো।

ভ্রূ কুঁচকে ফেললাম। এটা কীভাবে যোগাড় করলো ঘোস্ট? নিশ্চয়ই ভালো জায়গায় সোর্স আছে তার। "এটা দেখে কী করবো?"

"এখানে দেখো," বলে কাগজটার মাঝামাঝি আঙুল দিয়ে নির্দেশ করলো সে। "কী লেখা দেখেছো? পিউবিক বোনে পেরিয়োস্টিয়ামের কারণে কোন ক্ষত সৃষ্টি হয়নি। অবশ্য আমার তোমার মতো সাধারণ কেউ এই লেখা দেখে কিছু বুঝবে না।"

"কী বুঝবে না?"

ফাইলটা বন্ধ করে দিল ঘোস্ট। "এটাই যে ভিক্টিম কখনো সন্তান প্রসব করেনি।" বিভ্রান্তি ভর করলো আমার চেহারায়। "সহজভাবে বললে, শিলা রজার্স কার্লির মা হতে পারে না।"

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার আগেই ঘোস্ট আরেকটা ফাইল তুলে দিল আমার হাতে। এবার প্রথমেই নামটা দেখলাম।

জুলি মিলার।

কেউ যেন সাড়াশি দিয়ে চেপে ধরেছে আমার হৃৎপিণ্ডটা। "পিউবিক বোনে ক্ষত, স্তন এবং ইউটেরিন পেশিতে স্পষ্ট পরিবর্তনের ছাপ," বললো ঘোস্ট। "মন্তব্যে দেখো কি লেখা–ক্ষতটা খুব বেশিদিন আগের নয়। বুঝতে পারছো? তাছাড়া এপিসিয়োটমির লক্ষণও স্পষ্ট।"

লেখাগুলোর দিক থেকে চোখ সরাতে পারছি না।

"জুলি যে শুধু কেইনের সাথে দেখা করার জন্যে বাড়ি ফিরেছিল, তা নয়। বেশ খারাপ একটা সময় কাটানোর পর ওখানে নিজেকে গুছিয়ে নেয়ার জন্যে এসেছিল সে, উইল। তোমাকে সত্যটা বলতে চেয়েছিল।"

"কোন সত্য?"

প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল ঘোস্ট। "হয়তো কথাটা তোমাকে আগেই বলতো, কিন্তু তোমার প্রতিক্রিয়া কী হবে সেটা বুঝতে পারেনি। ও সম্পর্ক ভেঙে ফেলার কথা বলার পর, তুমিও অতটা জোর দাওনি। ওর জন্যে লড়াই করার কথা ছিল তোমার...সেদিন এজন্যে বলেছিলাম কথাটা। ওকে চলে যেতে দিয়েছিলে তুমি।"

ঘোস্টের দিকে তাকালাম।

"মারা যাবার ছয় মাস আগে মা হয় জুলি," ঘোস্ট বললো। "তখন মেয়ের সাথে শিলার অ্যাপার্টমেন্টে থাকতো সে। জুলি হয়তো সেই রাতে তোমাকে কথাটা বলতো, কিন্তু কেইন আর সেই সুযোগ দেয়নি তোমাকে। শিলাও বাচ্চাটাকে খুব পছন্দ করতো। জুলি খুন হবার পর কেইন যখন আত্মগোপনে যেতে চায়, শিলা কার্লিকে নিজের কাছে রেখে দেয়ার কথা বলে। আর কেইন...ও ভেবে দেখে যে একটা বাচ্চা সাথে থাকলে আত্মগোপন করা অনেক সহজ হয়ে যাবে। ওর বা শিলার বাচ্চা নেই কোন, কেউ সন্দেহও করবে না।"

আমার জীবনের সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা তোমার সাথেই করেছি, উইল।

কেইনের বলা কথাগুলো মাথার ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছে আবারো।

"কী বলছি বুঝতে পারছো, উইল?" ঘোস্টের কথায় ঘোর কেটে গেল। "তুমি এখন থেকে কার্লির নতুন বাবার দায়িত্ব পালন করবে, এটা ভাবলে ভুল করবে। তুমিই ওর আসল বাবা। কার্লি তোমার নিজের মেয়ে।"

চোখে শূন্য দৃষ্টি নিয়ে ওর দিকে তাকালাম।

বিশ্বাসঘাতকতা।

কেইন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে আমার সাথে। আমার মেয়েকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে।

উঠে দাঁড়ালো ঘোস্ট। "প্রতিশোধ বা ন্যায়বিচার–এসবের কারণে ফিরে আসিনি আমি," বললো সে। "কিন্তু সত্যটা হচ্ছে আমাকে বাঁচাতে গিয়ে মারা যায় জুলি। ওকে বাঁচাতে পারিনি। তাই তখনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ওর মেয়েকে বাঁচাবো। এগারো বছর লাগলো।"

কোনমতে চেয়ার ছেড়ে উঠলাম। এখন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি আমরা। প্লেনের যাত্রীরা একে একে বের হয়ে আসছে। আমার পকেটে একটা কাগজ ঢুকিয়ে দিল ঘোস্ট। একবার দেখলামও না কি লেখা কাগজটায়।

"পিস্টিলোকে প্যাকেজটা আমিই পাঠিয়েছিলাম, যাতে ম্যাকগুয়ান তোমাদের আর কোন সমস্যা না করে। জুলি যেদিন মারা যায়, সেদিনই ওগুলো খুঁজে পেয়েছিলাম আমি। এতদিন ধরে লুকিয়ে রেখেছি। তোমার আর নোরার কোন ভয় নেই এখন। আমি সব সামলে নিয়েছি।"

প্যাসেঞ্জারদের আরেকটা দল বেরিয়ে এলো। সেদিকে তাকিয়ে ঘোস্টের কথা শুনছি এখন।

"মনে রেখো, কেটি কার্লির খালা। মিস্টার মিলার, মিসেস মিলার ওর নানা-নানী। তাদেরও ওর জীবনের অংশ করে নেবে, বুঝেছো?"

মাথা নাড়লাম। ঠিক তখনই কার্লি বেরিয়ে এলো গেট দিয়ে। সবকিছু ভুলে গেলাম। এমন ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে মেয়েটা...পুরো মায়ের মতো। কিছুক্ষণ ইতি-উতি দেখার পর নোরার ওপর যখন চোখ পড়লো ওর, সুন্দর একটা হাসি ফুটলো মুখে। সেই জগতমোহিনী হাসি। এই হাসিটাই এগারো বছর আগে সবসময় লেগে থাকতো আমার মায়ের মুখে। কার্লির মাধ্যমে তার স্মৃতি কিছুটা হলেও ফিরে পেলাম।

কান্না চাপতে কষ্ট হচ্ছে। আমার পিঠে হাত রাখলো ঘোস্ট।

"যাও," বলে আস্তে করে এগিয়ে দিল আমার মেয়ের দিকে।

ঘুরে তাকালাম, কিন্তু ততক্ষণে জন অ্যাসেন্টা কেটে পড়েছে। এ মুহূর্তে করার মতো একটা কাজই আছে আমার।

ভিড় ঠেলে এগিয়ে চললাম আমার ভালোবাসার মানুষ আর মেয়ের দিকে। আমার পুরো পৃথিবী।

পরিশিষ্ট

রাতে কার্লি ঘুমিয়ে যাবার পর ওর কপালে চুমু খেয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসলাম। পকেটে হাত ঢোকাতেই একটা কাগজের টুকরো হাতে লাগল। মনে পড়লো যে ঘোস্ট আমার পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিল এটা। একটা খবরের কাগজের ছেঁড়া অংশ।

কানসাস সিটি হেরাল্ড

গাড়ি থেকে পুলিশ অফিসারের মৃতদেহ উদ্ধার

ক্র্যামডেন প্রতিনিধি

গতকাল রাতে স্থানীয় এক বারের পার্কিং লট থেকে ক্র্যামডেন পুলিশ ফোর্সের অফিসার ক্রে স্প্রিংয়ের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিক সুরতহাল থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছে তাকে। পুলিশ চিফ ইভান ক্রেফট এ মুহূর্তে কোন সন্দেহভাজনের নাম জানাতে পারেননি। তবে পুরোদমে তদন্ত চলছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পুলিশ সদস্য জানিয়েছেন, খুব সম্ভবত ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছেন অফিসার স্প্রিং...

শেষ

ছোটো থেকেই বড়ো ভাই কেইনের গুণমুগ্ধ উইল ক্লেইন। নিউ জার্সির এক মফস্বল শহরে বাবা-মা, বোন আর ভাইকে নিয়ে ভালোই সময় কাটছিল তার। কিন্তু সব হিসেব-নিকেশ বদলে যায় এক রাতে। উইলের ভালোবাসার মেয়েটা নৃশংসভাবে খুন হয় নিজ বাসার বেইজমেন্টে। প্রধান সন্দেহভাজন–উইলের ভাই। পালিয়ে যায় কেইন, সব প্রমাণও তার বিরুদ্ধে। হাসিখুশি পরিবারটা আর হাসিখুশি থাকে না। ঘটনাটা পাল্টে দেয় প্রত্যেকের জীবনের গতিপথ। এক পর্যায়ে তারা ধরেই নেয় চিরতরে হারাতে হয়েছে কেইনকে।

এগারো বছর পরের ঘটনা। উইল প্রমাণ পায় তার ভাই বেঁচে আছে। শুধু তাই নয়, এতদিন ধরে সে যা বিশ্বাস করে এসেছে, সব বদলে যেতে থাকে একের পর এক। বাধ্য হয় সে সত্যের পিছু নিতে। কিন্তু জীবন তার জন্যে যা সাজিয়ে রেখেছে, তা কল্পনাকেও হার মানাবে। পাঠক, আপনাকে স্বাগতম শ্বাসরুদ্ধকর এক সত্যের অনুসন্ধানে।





ISBN 978-984-92382-5-6

